বিচিত্র-জগৎ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রেণুকে

বারাকপুর
ভাদ্র, ১৩৪৪।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

'বিচিত্র-জগৎ' প্রকাশিত হোল। বইখানি প্রকাশের সঙ্কল্প আমাদের অনেক দিনের হ'লেও নানা অনিবার্য্য কারণে সেটা এতদিন সম্ভব হয় নি।

'বিচিত্র-জগৎ' নাম থেকে যদিও বইখানির স্বরূপ ও বিশেষত্ব বেশ বোঝা যায়, তবুও আমাদের মনে হয়, এ-সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ইংরাজিতে Countries of the World, World of Wonder, Lands and Peoples প্রভৃতি যে-শ্রেণীর বই, বিবিধ ও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের বৈচিত্র্যে, মনোরম চিত্রের প্রাচুর্য্যে, সহজ ও সরস বর্ণনার সৌন্দর্য্যে বাঙলা ভাষায় 'বিচিত্র-জগৎ' হয়েছে সেই শ্রেণীর বই। যে সব অজ্ঞাত, অপূর্ব্ব দেশ, পাহাড়-পর্ব্বত, মরুভূমি, নদী-সমুদ্র, বিশাল অরণ্য, অজ্ঞাত দ্বীপসমূহ, নানা প্রাচীন ও আধুনিক সহর ও গ্রামসমূহ, নানা অজ্ঞাত জাতির অদ্ভুত রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, তাদের ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ—তাদের বিস্ময়কর জীবন-কাহিনী, আপনার মনের আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান—'বিচিত্র-জগৎ' বহু গুণে বাড়িয়ে তুলবে। বইখানির বিষয় নির্ব্বাচন ব্যাপারে কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নি। যে সব লেখক, পর্য্যটক, অভিযানকারী বা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রবন্ধ বা কাহিনী 'বিচিত্র-জগৎ' রচয়িতার ভাল লেগেছে, নানা কারণে যে সব কাহিনী তাঁর বিচিত্র ও অপূর্ব্ব মনে হ'য়েছে, সে সবই তিনি তাঁর নিজস্ব অনুকরণীয় ষ্টাইলে মনোরম গল্পের মত বর্ণনা ক'রেছেন।

পৃথিবীর নানান দেশ—কত বিচিত্র, কত অদ্ভুত, কত বিস্ময়কর! মানব-সভ্যতার গোড়াকার ইতিহাসের কথা মনে ক'রবার সঙ্গে সঙ্গেই 'গ্রীস্' কথাটা সর্ব্বপ্রথমে মনে আসে—হোমার, প্লেটো, আরিষ্টট্‌ল্, সফোক্লিস্, সাফোর দেশ! কিন্তু বর্ত্তমান উন্নতিশীল গ্রীসের সঙ্গে সেই প্রাচীন গৌরবময় দেশের যেন কোনও যোগ নেই। যে নির্ম্মল নীলাকাশের তলায় জহুরীরা গ্রোপাইলিয়া ও পার্থেননের মূল্যবান পাথর বসিয়েছিল—সে আকাশ এখন কলকারখানার ধোঁয়ায় মলিন। প্যালেষ্টাইন, পার্সিপোলিস, মাঞ্চুরিয়া, বলিভিয়া প্রভৃতিরও এই একই অবস্থা—আধুনিকতার স্রোতে সবাই প্রবহমান। আধুনিক বাণিজ্য কেন্দ্র বা অট্টালিকা পরিবেষ্টিত, কোলাহলমুখর সহর যদি আপনার ভাল না লাগে তবে আসুন গাছপালাবেষ্টিত শ্যামল, নিস্তব্ধ পল্লীপথে—দেখবেন, ভোরের হাওয়ায় টাট্‌কা গোলাপের গন্ধে সমস্ত পথ ভুর্ ভুর্ করছে। এখানে ওখানে চমৎকার চমৎকার গোলাপ, প্যান্‌সি, লাল কার্ণেশন, হলদে আইরিস্ ফুলের সম্মিলিত সুগন্ধে বনপ্রান্ত আমোদিত। দূরের পর্ব্বতশিখর তরুণ তপনের সোনালী আলোয় রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে; বনফুলের গন্ধের মধ্যে, চেরী গাছে পাখীরা কলধ্বনি করে উঠলো!

গাছপালাশূন্য মরুময় পথেরও অন্ত নেই, যদি আসতে চান পারস্য, সিরিয়া, আরব, তুর্কিস্থান, আরিজোনা, লিবীয়ার বালুময় দেশে—দুর্দ্ধর্ষ বেদুইন জাতির দল, উটের পিঠে যাযাবর জাতির বিরামহীন যাত্রা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস! অনাবৃত রুক্ষদর্শন পাহাড় চারিধারে; মাঝে মাঝে খর্জ্জুরকুঞ্জবেষ্টিত শ্যামল মরুদ্যান!

এ রকম আরও কত অন্তহীন মরুভূমি, সমুদ্র, সমুদ্রতলের অজ্ঞাত প্রাণীজগৎ, বিরাট স্রোতস্বতী নদী, সীমাহীন শ্বাপদ-সঙ্কুল বিশাল অরণ্য, কত অজ্ঞাত, অদ্ভুত দ্বীপপুঞ্জ—যাদের অকল্পনীয় সৌন্দর্য্য ও অবর্ণনীয় রূপের তুলনায় স্বর্গের সৌন্দর্য্যও ম্লান হ'য়ে যায়।

এক কথায় আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত জগতের বাইরে যে একটা ব্যাপকতর, অজ্ঞাত, সৌন্দর্য্যময় জগৎ আছে—যে জগৎ রূপে, বর্ণে, গন্ধে, মাধুর্য্যে—অপূর্ব্ব সমগ্রতায়—অবর্ণনীয়, অপরূপ; 'বিচিত্র-জগতের পাতায় সেই জগতেরই, অনাস্বাদিত, আনন্দময় রূপ বিকশিত হ'য়েচে, প্রবাহিত হ'য়েচে শান্ত সমুজ্জ্বল বর্ণোৎসবের দীপ্তি!...

বিচিত্র-জগৎ পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে বঙ্গশ্রী মাসিক পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রেছেন। 'বিশ্ব-প্রকৃতি' নামে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত যে-সব অংশগুলি 'বিচিত্র-জগতে' সন্নিবেশিত হ'য়েছে, তার জন্য আমরা 'বিচিত্রা'র কর্ত্তৃপক্ষকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বইখানির মুদ্রণ ব্যাপারে মেসার্স মেট্রোপলিটান্ প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস্ লিঃর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্য আমরা সবচেয়ে বেশী পেয়েচি। তিনি যে ভাবে নানা অসুবিধা ও কষ্ট স্বীকার করে বইখানি এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করবার সুযোগ দিয়েছেন, তার মূল্য সামান্য ধন্যবাদের চেয়ে অনেক বেশী। যাঁরা 'বিচিত্র-জগৎ' প্রকাশে আমাদের নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদেরও এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'বিচিত্র-জগতে'র মত অপূর্ব্ব বই বাঙ্‌লা ভাষায় বোধ হয় এই প্রথম, সুতরাং আমরা আশা করি বইখানি বাঙালী পাঠক-সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে।

কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩৪৪

প্রকাশক

সূচী

আধুনিক গ্রীস

'গ্রীস' কথাটা উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মানব-সভ্যতার ইতিহাসের এক গৌরব-সমৃদ্ধ দিনের কথা মনে পড়ে। গ্রীস বলতে আমরা বুঝি হোমার, প্লেটো, আরিষ্টটল; গ্রীস বলতে আমরা বুঝি ফিডিয়াস, সফোক্লিস, সাফো। কিন্তু আধুনিক কালের গ্রীসের বিষয়ে আমরা কিছুই খোঁজ রাখি না। এখন সেখানে আর দেবতারা বাস করেন না, আমাদের মত মর-জীবকুলই বাস করে থাকে, তা হলেও বর্ত্তমান গ্রীস পৃথিবীর মধ্যে অতি সুন্দর দেশ।

বিখ্যাত পর্য্যটক মেনার্ড উইলিয়াম্‌সের গ্রীস সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করা গেল :—

আমার পিতার কাছে প্রাচীন গ্রীসের মত দেশ ছিল না জগতে, গ্রীসের অতীত-গৌরবের কাহিনী তাঁর ভোজ-টেবিলের খোসগল্প ছিল, ওলিম্পাস পর্ব্বতের দেবতারা ছিলেন তাঁর সুপরিচিত বন্ধু। কিন্তু যখন তিনি ২৫ বছর
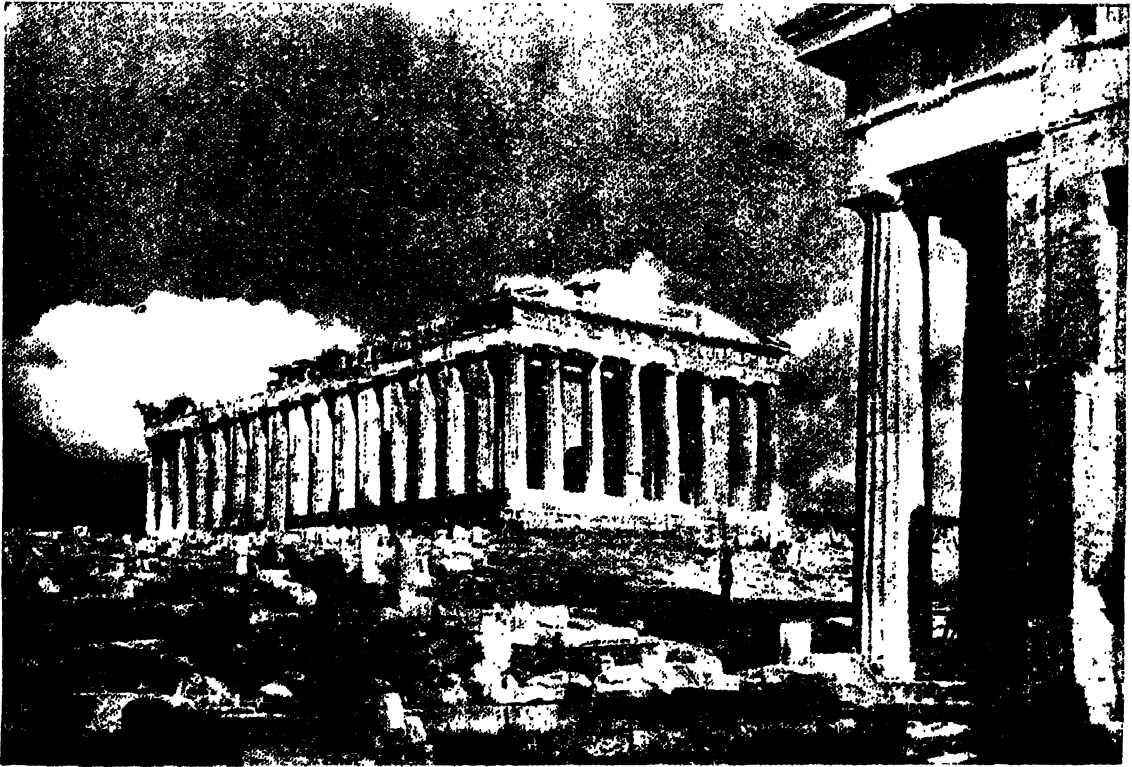
পার্থেনন — ২৪৩ বৎসর পরে পুনঃ সংস্কৃত

আগে গ্রীস দেখতে গিয়েছিলেন, তখন জেউস, আফ্রোদিতে, হারমিস্ এপোলো বন্য বৈদেশিকে পরিণত হয়েছেন— এই হিসাবে যে, তাঁহাদের বাসস্থান ওলিম্পাস পর্ব্বত তখন গ্রীসের সীমার বাইরে।

প্রাচীন গ্রীসের লোকসংখ্যা অপেক্ষা বর্ত্তমান হেলেনিক্ রিপাবলিকের লোকসংখ্যা অনেক বেশী, প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রীস আর প্রাচীন কালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেই। আমার পিতার গ্রীস-ভ্রমণের পরে এথেন্সের আকাশ পর্য্যন্ত বদলে গিয়েচে। যে নির্ম্মল নীল আকাশের তলায় জহুরীরা প্রোপাইলিয়া ও পার্থেননের মূল্যবান পাথর বসিয়েছিল—সে আকাশ এখন কলকারখানার ধোঁয়ায় মলিন।

কিন্তু গ্রীস-দেশের সাধারণ কৃষকশ্রেণীর লোকেও তার স্বপ্ন ভেঙে দেবে না, যদি অতীতের স্বপ্ন-মাখানো চোখে কোন ভ্রমণকারী আধুনিক গ্রীসে বেড়াতে এসে আক্রোপোলিসের ধ্বংসস্তূপে 'অশ্বারোহী চতুষ্টয়'এর অনুসন্ধান করে—বরং যা সে খুঁজতে এসেছিল, তার চেয়ে ভাল কোনো জিনিস সে দেখবে এদের মধ্যে।

তুরস্কের অধীনতাপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার একশত বছরের মধ্যে গ্রীস সকল বিষয়ে অসাধারণ উন্নতি করেছে। নবীন গ্রীস অত্যন্ত উন্নতিশীল, পুরাতনের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো যোগ নেই—নবীন গ্রীসের আদর্শ মার্কিন যুক্তরাজ্য। ছাত্রেরা এখান থেকে পড়তে যায় আমেরিকায়। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ—আমেরিকা গ্রীসের তামাক, ফল ও কার্পেট কেনে—গ্রীস আমেরিকার নিকট প্রতি বৎসর ২৫ কোটি ডলারের মাল কেনে।

কর্ফু ওডিসিউসের জাহাজ

আমরা আকাশ-পথে প্রথম গ্রীস ভ্রমণে যাই। ব্রিন্দিসিতে যে স্তম্ভটি প্রাচীন যুগের রোমান পথ 'এপিয়ান ওয়ে'র শেষ সীমা জ্ঞাপন করছে, আমাদের ভ্রমণ সুরু হয়েছিল সেখান থেকে—উর্ব্বর অথচ ম্যালেরিয়াসঙ্কুল ইটালির জলাভূমির ওপর দিয়ে আমরা গেলাম ওট্রান্টো পর্য্যন্ত, পার হয়ে গেলাম কর্ফুতে, পর্ব্বতময় কর্ফুর পশ্চিমতীর প্রদক্ষিণ করে এবং 'ইউলিসিসের জাহাজ' নামে অতি সুন্দর ছোট দ্বীপটার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে আমরা কর্ফুসহরের প্রাচীন দুর্গের অনতিদূরে মাটীতে নামলাম।

জলপাই-বাগানে ও সাইপ্রেস-কুঞ্জে সুসজ্জিত এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্যে পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ এখানে অবসর সময় অতিবাহিত করতেন, ট্রয়যুদ্ধের সুন্দরতম বীরপুরুষ একিলিসের নামে এই আবাসস্থানের নাম রেখেছিলেন একিলিয়ন্। সমুদ্রতীরের বাগান যেখানে ঢালু হয়ে জলের দিকে নেমে গিয়েছে—সেখানে জার্ম্মান কবি হাইনের মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল—এলিজাবেথের মৃত্যুর পরে কাইজার বাড়ীটা কিনে নিয়ে সর্ব্বপ্রথমেই এই মূর্ত্তিটা অপসারিত করেন। তখনকার দিনে জার্ম্মান-সম্রাটের প্রমোদতরী প্রায়ই কর্ফুদ্বীপে আসত।

ওপরে একটা ঘরে এই ভূতপূর্ব্ব সম্রাট টেবিলে বসে লেখাপড়া করতেন। একিলিয়ন প্রাসাদ-ঘরে যুদ্ধের হাসপাতাল হয়েছিল, যুদ্ধের অবসান দিনকতক অনাথাশ্রমও হয়েছিল—এখন তার যেমন অবস্থা বোধ হয় শীঘ্র জুয়ার আড্ডায় পরিণত হবে।

কর্ফু থেকে আমরা উড়ে গেলাম ইপাকাতে। আমাদের বাঁ দিকে দিগন্তবিস্তৃত ম্যালেরিয়াসঙ্কুল জলাভূমি। দক্ষিণে আর্তা উপসাগরের বালুময় তীরে অক্টেভিয়ানের স্থাপিত নগরীর ধ্বংসাবশেষ। একস্থানে নেমে আমরা ফোটো তুলবার যোগাড় করছি, একজন সামরিক কর্ম্মচারী এসে নিষেধ করলে।

আমরা বল্লাম—কেন ?

—নিষিদ্ধ স্থান।

—কেন ?

—সামরিক অঞ্চল।

—ও, ওখানে একৃটিয়ামের যুদ্ধ হয়েছিল বটে।

—সে কবে ?

—খৃঃ পূঃ ৩১ সালে।

বহুকাল আগে এণ্টনির নৌবাহিনী অক্টেভিয়ানের হাতে পরাজিত হয়েছিল—এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা এখান থেকে পালাবার পরে আত্মহত্যা করেন।

অক্সিয়া দ্বীপের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের তরঙ্গরাজি এখনও অতীতদিনের যশোবাহিনীর প্রতিধ্বনি করে, ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত খ্রীষ্টান ও মুসলমান নৌবাহিনী লেপাণ্টোর জলযুদ্ধে পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা করে।

আর্কাডি বাজার

লেপাণ্টোর যুদ্ধে নূতন ও পুরানোকালের যুদ্ধাস্ত্র-রাজির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হয়েছিল, একজন তরুণ স্পেনীয় সৈন্যের এই যুদ্ধে বাঁ হাত নষ্ট হয়ে যায়, যদি এই যুবক যুদ্ধে নিহত হ'ত, তবে আমরা ডন কুইক্‌সোট ও সাঙ্কো পাঞ্জার দর্শন পেতাম না—কারণ, এই যুবকই ডন সিগুয়েল ডি সার্ভেন্টিস—অমর কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক।

একটু দূরে আর-একস্থান আর-এক প্রতিভাবান স্পর্শে পবিত্র হয়েছিল—স্থানটা মিজোলঙ্গি, কবি বায়রন যেখানে মারা পড়েন—স্বাধীনতার যুদ্ধে গ্রীসকে দু হাজার ডলার দান করে-ছিলেন, তিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব উজাড় করে। বায়রনের মত অত বড় হৃদয়-বান কবি ক'জন দেখা যাবে ?

করিন্থ অ্যাপোলো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

নিকটেই পাত্রাস বন্দর—বছরে একবার করে আমেরিকাগামী বড় জাহাজ এখানে দাঁড়ায়। গ্রীক্ কিউরাণ্ট ফল এখান থেকে রপ্তানী হয় বলেই পাত্রাস বন্দরের প্রাধান্য। কিন্তু আজকাল অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফোর্নিয়ার কিউরাণ্ট গ্রীসের ফলের ব্যবসা নষ্ট করেছে।

পিলোপোনেসাসের উপকূলভাগ ধরে আমাদের প্লেন চলেছে, কোরিন্থ উপসাগরের ওপারে আমাদের ডাইনের দিকে পার্ণেসাস, চেলমস ও কাইলিন পর্ব্বত মেঘের ওপর তাদের ৭৭০০ ফুট উচ্চ শিখরদেশ সগর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নীচের সমতলভূমি কোথায় শুষ্ক, কোথাও বেগবতী পার্ব্বত্য নদীর জলে উর্ব্বর ও শস্যশ্যামল।

একটু দূরে স্থালামিসের নৌযুদ্ধের স্থান। থেমিষ্টোক্লিসের বীরত্বে ও কৌশলে পারসিক নৌবাহিনী যেখানে বিধ্বস্ত হয়েছিল—এথেন্সের গৌরবের দিনের সুরু স্থালমিসের যুদ্ধ বিজয়ের পর থেকেই। এখানে উচ্চস্তরের বায়ুমণ্ডলে ঝড় বইছে, আমাদের প্লেন অগ্রসর হতে না পেরে ফালেরনের সমতল-ভূমিতে অবতরণ করতে বাধ্য হল। এখান থেকে থোরিকো পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে বড় বড় কৃষিক্ষেত্র। গ্রীস দেশের উৎকৃষ্ট সিগারেটের তামাক এখানেই উৎপন্ন হয়। উত্তরে অনেক দূরে সাদা মেঘের মধ্যে তুষারাবৃত একটা পর্ব্বতশৃঙ্গ যেন হাওয়ায় ভাসছিল।

টিরিন্স সাইক্লোপিয়ান গ্যালারি

তার পরে আমরা মেপারাতে পৌঁছে গেলাম। এখানে মেয়েরা সেকালের পোষাকে সজ্জিত হয়ে উটের পিঠের মত আকৃতির একটা ছোট পাহাড়ের ওপর জল নিয়ে যাচ্ছে; সেখানে স্থানীয় একটি মেলা বসেছে, নিজেদের বাড়ীর সাম্‌নে বড় বড় উনুনে খরিদ্দার-দের জন্য রুটী সেঁক্‌ছে। সহরের একটু দূরেই মাঠের মধ্যে ঈষ্টারের সময়ে এই মেলা বসে প্রতি বৎসর। মাঠের মধ্যে ছোট ছোট তাঁবু খাটানো হয়েছে, তার মধ্যে চায়ের দোকান, কফির দোকান। তাঁবুর সাম্‌নে মাঠে বসে লোকে কফি ও পিঠে খাচ্ছে, বিচিত্র পোষাকপরা নর্ত্তকীর দল দাঁড়িয়ে ভিড় করছে।

এক সময়ে এই পথে অত্যন্ত দস্যুর ভয় ছিল। এখন গভর্ণমেণ্টের কড়া ব্যবস্থায় দস্যুর উৎপাত থেমেছে। এখনও পর্য্যন্ত এই পার্ব্বত্য-পথে সন্ধ্যার পরে মোটর-আরোহীরা যেতে ভরসা করে না।

সকালে আমরা মোটরে পাত্রাসে ফিরলাম। সেখান থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্য দিয়ে এলিস্‌ সহরে পৌঁছলাম। জগদ্বিখ্যাত ওলিম্পিক্‌ ক্রীড়ার জন্যে এই স্থানটি প্রসিদ্ধ। ক্রোনোস্‌ পাহাড়ের পাদদেশে এখানে অনেক প্রাচীন মন্দির, দুর্গ, ধনভাণ্ডারের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রথম আমলের একটা গির্জ্জার ইঁট পাথর এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

তুচ্ছ একটা জলপাইয়ের শাখা ছিল পুরস্কার, কিন্তু কত দেশবিদেশ থেকে লোকে সেই সামান্য জয়চিহ্নকে লাভ করবার আগ্রহে ছুটে আস্‌তো। গ্রীসের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগীদল কত বিভিন্ন দেশ থেকে

আসতো—এসিয়া মাইনর, ইজিপ্ট, থ্রেস, ইটালি। দুজন রোমান সম্রাট ওলিম্পিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিলেন, তার মধ্যে একজন বেহালাবাদক হিসেবে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন, অন্ততঃ অপযশের দিক দিয়ে—তিনি হচ্ছেন নীরো। ১১৭০ বছর ধরে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও এই মল্লক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রতি বৎসরই অনুষ্ঠিত হয়েছে; অবশেষে বাইজাণ্টাইন্ সম্রাট থিওডোসিয়াসের হুকুমে ওলিম্পিক মেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়, নির্বীর্য্য এথেন্সের দিকে তখন দুর্দ্ধর্ষ পথ-আক্রমণকারীরা এগিয়ে আসছে।

গ্রীসের পল্লীপ্রান্তে সর্ব্বত্র দেখেছি লোকের বাড়ীর সামনে বড় বড় উনুন বসানো আছে—বাড়ীসুদ্ধ লোকের রুটী তৈরী হয় এই একটা উনুনেই। উনুনগুলি প্রায়ই কাদায় গড়া, নীচের দিকে পাথর দিয়ে বাঁধানো শুক্‌নো কাঠকুটো, লতাপাতার জাল দেওয়া হয়, বড় বড় কাঠের বারকোসে রুটীর ময়দা মাখা হয়, পাতলা টিনের পাতে কাঁচা

ডেলফির প্রাচীন থিয়েটার — এস্কাইলাসের "সাপ্লায়াণ্টস্" নাটকের অভিনয় অনুসরণে
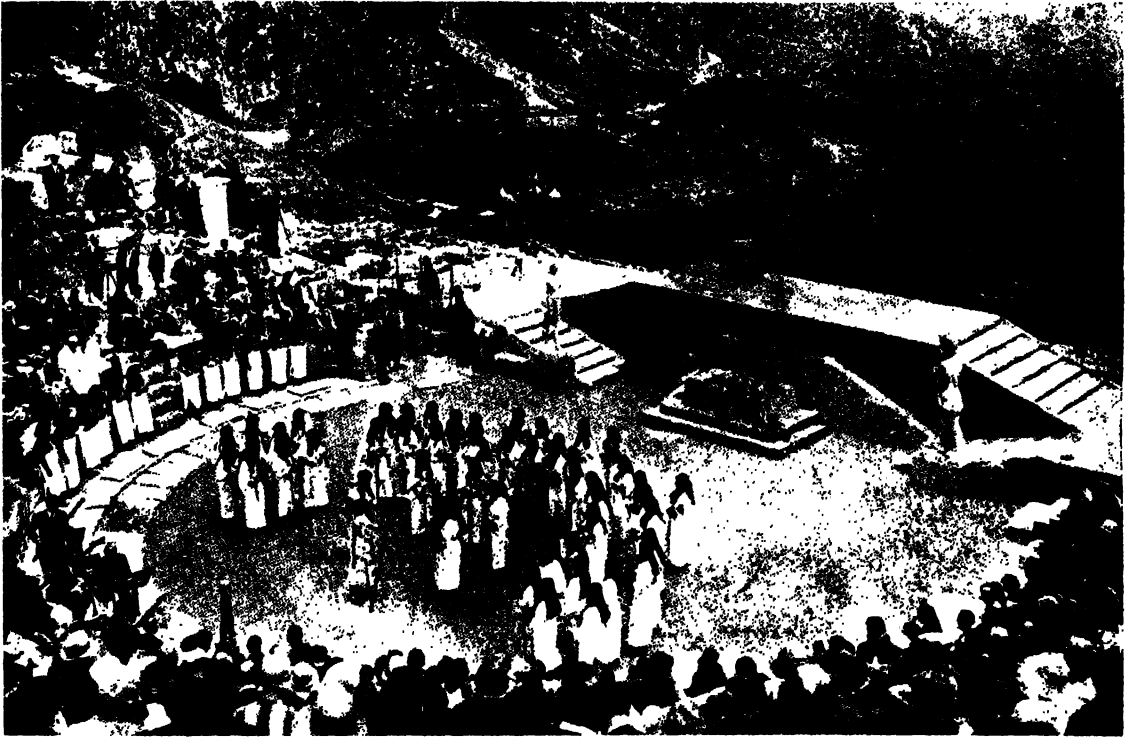
রুটী বসিয়ে উনুনের মধ্যে বসিয়ে দেয়। ম্যাসিডোনিয়ার পথে মোটরে যেতে যেতে কত গ্রামের মধ্যে গাছতলায় গাড়ী থামিয়ে কৃষকদের এই রুটী গড়ানো ও সেঁকা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। এরা আবার ক্যামেরাকে বড় ভয় করে, কি জানি কেন ক্যামেরা বার করলেই সকলে গিয়ে ঘরের মধ্যে ওঠে।

ফিলিপ ও আলেকজাণ্ডারের রাজ্য পার হয়ে আমরা আলবানিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত গেলাম। এখানে অনেক বড় বড় হ্রদ আছে। যদি এই সব হ্রদের জল কৃষিক্ষেত্রে সেচন করবার কোনো ব্যবস্থা করা হয় তবে এই হ্রদমালা হেলাসের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন বর্দ্ধন করছে, তার কৃষিসম্পদও তেমন বর্দ্ধন করবে। আটিকার রৌদ্রদগ্ধ দৃশ্যের পরে কাস্টোরিয়া সহরের প্রায় চারিপাশ ঘিরে যে অপূর্ব্ব নীলহ্রদ বর্ত্তমান, যার উত্তর ধারে অসংখ্য বাইজাণ্টাইন ভজন-মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ বর্ত্তমান, সেইটিই রূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আয়তনেও বটে।

ফ্লোরিনাতে ছোট ছোট গ্রাম্য দোকানে নানা রংয়ের কম্বল রেখেছে বিক্রির জন্য সাজিয়ে। পথে একটা খোলাজল নদীর তীরে ছোট ছোট গর্ত্ত খুঁড়ে গ্রাম্য মেয়েরা পরিষ্কার জল সংগ্রহ করছে। সম্রাট গ্যালেরিয়াসের নির্ম্মিত খিলানযুক্ত তোরণদ্বার যখন পার হয়ে আসছি তখন নিকটেই একটা ছোট পুকুরে কৃষকরমণীরা কাপড় কাচছে—আশ্চর্য্যের বিষয় এখনও এই জলাশয়টা আলেক্‌জাণ্ডারের স্নানের স্থান বলে অভিহিত। এতকাল পরেও নিজের দেশের বীরকে এরা ভুলে যায় নি।

এথেন্স ক্রমশঃ আধুনিক সহরে পরিণত হয়ে উঠছে। ওমোনিয়াতে বড় হোটেল নির্ম্মিত হয়েছে, প্যারিসের হোটেলের তুলনায় তা নিকৃষ্ট নয়। পূর্ব্বে সহরে জলকষ্ট ছিল, এখন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারদের চেষ্টায় ও যত্নে সেখানে পানীয় জলের সুব্যবস্থা হয়েছে। মারাথনের খুব কাছে কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করা হয়েছে পার্ব্বত্য নদীর জলস্রোত মার্ব্বেল পাথরের বাঁধ দিয়ে আট্‌কে—এই পেন্টেলিক মার্ব্বেল দিয়েই এক সময়ে এক্রোপোলিস্‌ গঠিত হয়েছিল।

চিলির লোকেরা এখন আণ্ডিজ পর্ব্বতমালাকে অগ্রাহ্য করিয়া উঃ আমেরিকা ও ইউরোপের সহিত কথা কহিতে সক্ষম।

প্রাচীন দিনের যে অ্যাম্ফিথিয়েটারে বসে হাজার হাজার দর্শক সফোক্লিসের নাটকের অভিনয় ও মল্লক্রীড়া দেখবার জন্যে জড়ো হত—অনেকদিন সেটা ভগ্নাবস্থায় বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল—কিন্তু গ্রীসে বদান্য ধনী ব্যক্তির অভাব নেই, তাদের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে এই প্রাচীন দিনের ক্রীড়াভূমি নূতন করে গড়া হয়েছে ও মার্ব্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো হয়েছে। লোকের উৎসাহের অভাব নেই। ১৯০৬ সালে লুয়োস্‌ ব'লে একজন থেসালির কৃষক যখন মারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে, মেয়েরা তখন নিজেদের গায়ের গহনা খুলে তাকে পুরস্কৃত করেছিল, একজন গরীব বুট পালিশওয়ালা বলেছিল যাবজ্জীবন বিনা পয়সায় লুয়োসের বুট-জুতা পালিশ করে দেবে।

যে সব গ্রীক গত মহাযুদ্ধের পরে আমেরিকা থেকে ফিরে দেশে এসেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই আর আমেরিকায় ফিরে যায় নি—তাদের এখানকার জীবন অসহ্য হয়ে পড়েছে। আমেরিকার জন্য তাদের প্রাণ তৃষিত হয়ে আছে, কিন্তু সেখানে ফেরবার আর উপায় নেই। পয়সাকড়ি হাতে যা ছিল, খরচ হয়ে গিয়েছে।

তারা প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করতো—তুমি আমেরিকান ?

—হাঁ।

—বাঃ বেশ। কোথায় তোমার নিবাস ?

—ওয়াশিংটন।

—ওয়াশিংটন ষ্টেট না ওয়াশিংটন ডি-সি ?

—ওয়াশিংটন ডি-সি।

—বাঃ চমৎকার! ওয়াশিংটন ডি-সি চমৎকার সহর—তুমি ভাগ্যবান লোক। আমি বোকার মত কাজ করেছি তোমাদের দেশ থেকে চলে এসে।

যুক্তরাজ্যের বড় সহরের কর্ম্মব্যস্ত, জটিল জীবনযাত্রার পরে গ্রীসের ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য গ্রামের অলস জীবন এদের আর ভাল লাগে না।

নূতন জগতের ছাদের উপর যীশুখ্রীষ্টের প্রতিমূর্ত্তি (চিলি ও আর্জেন্টিনার প্রত্যন্ত সীমায়)

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ টেলিফোন লাইন

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে চিলি এখন প্যারিসের সঙ্গে কথা বলে, হিমময় দুরারোহ আণ্ডিজ পর্ব্বতের ওপর দিয়ে নূতন টেলিফোন লাইন পাতা হয়েছে তারই সাহায্যে। পৃথিবীর মধ্যে এইটিই সর্ব্বোচ্চ আন্তর্জ্জাতিক টেলিফোন লাইন। বিপদ, শীত, তুষারপাত ইত্যাদি অগ্রাহ্য ক'রে উত্তর আমেরিকা ও চিলির ইঞ্জিনিয়ারেরা অসীম ধৈর্য্য ও সাহসের সঙ্গে ভারী টেলিফোনের তার আণ্ডিজের তুষারাবৃত, ঝটিকাময়, দুর্গম শিখর ও গিরিবর্ত্ম পার করে নিয়ে গিয়েছে। বছরের মধ্যে এই সব জায়গা অন্ততঃ ছ'মাস বরফে ঢাকা থাকে। ঘন তুষারপাতের জন্য পর্ব্বতে প্রায়ই ধ্বস্ নামে—এ অবস্থায় খুব মজবুত ও ভারী টেলিফোনের খুঁটিও ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত কোথায় উড়ে যাবে—সুতরাং টেলিফোন লাইন বাঁচাবার জন্যে পাহাড়ের ওপর গভীর পরিখা খুঁড়ে তা'র মধ্যে তার বসানো হয়েছে।

আণ্ডিজপর্ব্বতের পাদমূলে আর্জ্জেন্টিনার দিকে, লাস্ কুয়েভাস্ বলে যে ছোট গ্রামখানা আছে, সেখানে এই লাইনের উচ্চতা সমুদ্রবক্ষ থেকে ১২,৩০০ ফীট। আবার সমুদ্রগর্ভে ২১,০০০ ফীট জলের তলা দিয়ে চিলি থেকে সামুদ্রিক কেব্‌ল্ ইউরোপে ও মার্কিন যুক্তরাজ্যে গিয়েছে।

উচ্চতম আণ্ডিজের এই সব গিরিবর্ত্ম অত্যন্ত দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল, কিন্তু মানুষ বহুকাল ধ'রে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে এই পথে চলাচল ক'রে আসছে। পায়ে হেঁটে লামাদের পিঠে বোঝাই দিয়ে প্রাচীন যুগের ইণ্ডিয়ান্‌রা বক্রতোয়া আকন্‌কাগুয়া নদীর ধারে ধারে গিয়ে আণ্ডিজ পর্ব্বতে উঠতে সুরু করত, উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দেওয়ালের কাছ দিয়ে ক্রমশঃ ওপরে উঠত, বড় বড় শিখরদেশ টপকে যেত, নদীখাদ পার হত, তুষার-বর্ষণকে অগ্রাহ্য করে আণ্ডিজের ওপারে যথাস্থানে পণ্যদ্রব্য পৌছে দিত।

আণ্ডিজের হিমশীতল গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া কেব্‌ল্ লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকা যখন স্পেনের রাজপ্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হত, তখন আণ্ডিজ পর্ব্বতের এই সব দুর্গম গিরিবর্ত্ম দিয়ে যুদ্ধের রসদবাহী-পশুর দল ও সৈন্যবাহিনী চিলির সান্তিয়াগো সহর থেকে টকুমান ও কুয়ো-ইণ্ডিয়ানদের দেশে যেত। আবার এক বৎসর পূর্ব্বে যখন চিলি ও আর্জ্জেন্টিনা স্পেনের শাসনশৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করবার জন্যে যুদ্ধ করেছিল, তখন সান মার্টিনের বিখ্যাত "আণ্ডিজ বাহিনী"র জয়োল্লাসে এই জনবিরল হিমবর্ত্তী গিরিপথ কতবার মুখরিত হয়েছে।

আণ্ডিজের এই টেলিফোন লাইন অনেকদূর পর্য্যন্ত আণ্ডিজের বিখ্যাত 'র‍্যাক্' রেললাইনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে গিয়েছে। এই রেলপথও জগতের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য জিনিষ—অনেক বৎসর ধরে অনেক বড় বড় রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের পরিশ্রমে এই পার্ব্বত্য রেলপথ নির্ম্মিত হয়।

আর্জ্জেন্টিনা দেশের দিকে আণ্ডিজের পাদমূলে মেণ্ডোজা সহরে আরোহীরা বড় রেলপথ ছেড়ে মরুপার্ব্বত্য রেল-লাইনের গাড়ীতে চড়ে। কয়েক ঘণ্টা ধরে গাড়ী যায় আণ্ডিজের নীচের অংশ দিয়ে—যত ওপরে উঠতে থাকে, তত ইঞ্জিনের গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়, রেলের লাইনের সেখানে খাঁজ-কাটা, রেলপথের খাড়াই সেখানে ক্রমশঃ বাড়ে, টানেল দীর্ঘতর হয় এবং সংখ্যাতেও বৃদ্ধি পায়, উদ্ভিদরাজি অদৃশ্য হয়।

জুন বা জুলাই মাসে এই রেলপথে ভ্রমণ করলে আণ্ডিজ্ পর্ব্বতের পরিপূর্ণ মহিমা ও তুষারাবৃত রুক্ষরূপের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। তখন এমন একটা কিছু দেখা যায়, জীবনে যা আর কখনো দেখা হয় নি। এর কারণ জুন বা জুলাই মাস দক্ষিণ আমেরিকার শীতকাল, আণ্ডিজের উচ্চতর অঞ্চলের তুষার ঝটিকা, বরফপাত, কুয়াসাবৃত শিখররাজির রূপ এই সময়ে যা দেখা যায় এবং যত আরামের সঙ্গে গদী-আঁটা আসনে বসে দেখা যায়—পৃথিবীর কোন উচ্চ পর্ব্বতমালায় এ শীতের রূপ তত আরামে দেখা যায় না। অনেক সময় তুষাররাশি সরিয়ে ফেলবার কল এঞ্জিনের আগে আগে যায়। ১৯৩০ সালে রেলপথের ওপর ২৫ ফীট পুরু হয়ে তুষার পড়েছিল, দুদিকের ট্রেন আরোহীসমেত কয়েকদিন ধরে মাঝপথে আটকে গিয়েছিল।

ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠতে উঠতে রেলপথ মাউন্ট টুপুন্ গাতোর (২১,৫৫০ ফীট) পাদদেশ দিয়ে চিলির দিকে গিয়েছে—নিকটেই একটা অদ্ভুত-গঠনের পর্ব্বতশৃঙ্গ, দেখতে ঠিক যেন ধূসর বর্ণের আলখেল্লা-পরা খৃষ্টান সন্ন্যাসী। মাউন্ট টুপুন্ গাতোর ঘন ছায়া ছাড়িয়ে আবার সূর্য্যালোকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার কিছু পরেই ট্রেন 'পুয়েন্টো ডেল ইঙ্কা' ব'লে একটা প্রকৃতির নির্ম্মিত পাথরের সেতু পার হয়,—দিন পরিষ্কার থাকলে এই সেতু পার হবার সময়ে আরোহীরা দক্ষিণ দিকে চেয়ে বিশাল অ্যাকনকাওয়া পর্ব্বতের মহিমময় দৃশ্য দেখতে পাবে—সমগ্র আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে অ্যাকনকাওয়া সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত তার চিরতুষারাবৃত শিখর সমুদ্রবক্ষ থেকে ২৩,০৮০ ফীট ঊর্দ্ধে আকাশকে স্পর্শ করেছে।

পশ্চিমমুখী ট্রেন লাস্ কুয়েভাসে চিলির সীমান্তে পৌঁছে যায়। এখান থেকে ওপর দিকে চেয়ে দেখলে পাহাড়ের ওপর দিকে টেলিফোন লাইন দেখা যাবে—এবং যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তবে লাস্ কুয়েভাস্ ষ্টেশনে পৌঁছবার ঠিক আগে, যেমন দু মাইল দীর্ঘ টানেল পার হয়ে ট্রেন রৌদ্রালোকিত চিলি স্পর্শ করবে, ঠিক সেই সময় পাহাড়ের ওপরের দিকে চাইলে টেলিফোন লাইনেরও অনেক ওপরে চিলি ও আর্জ্জেন্টিনা এ দুই দেশের আন্তর্জ্জাতিক শান্তির প্রতীকস্বরূপ স্থাপিত জগৎবিখ্যাত শান্তি-স্তম্ভ 'ক্রাইষ্ট অফ দি আণ্ডিজ' চিলি আর্জ্জেন্টিনা-সীমান্তে সমুদ্রবক্ষ থেকে ১২,০০০ ফীট উঁচু একটা পর্ব্বতের ওপর দেখা যাবে।

অনেক নীচে দেখা যাবে পর্ব্বতশৃঙ্গবেষ্টিত ইঙ্কাহ্রদ—সেও সমুদ্রবক্ষ থেকে ৯০০০ ফীট উচ্চে। এখান থেকে ট্রেন—বড় বড় টানেলের মধ্য দিয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে, দুধারে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল, তাদের সৌন্দর্য্য ও মহিমা অবর্ণনীয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিরাপদ, ষ্টীম দ্বারা উত্তপ্ত ট্রেনের কামরায় বসে আরোহীরা তাসের টেবিল থেকে মুখ তুলে দেখতে পাবে যীশুখৃষ্টের শান্তমূর্ত্তি তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালার পটভূমিতে তখনও অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। উচ্চতর গিরিপথের স্বর তাদের কানে যাবে—তুষারপাতের শব্দ, পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে ঝড়ের গর্জ্জন ধ্বস্‌-নামার গুরুগম্ভীর রব। তাস খেলতে খেলতে একজন প্রথমশ্রেণীর সেলুনের যাত্রী বাইরের দিকে চেয়ে বললেন, অনেক উঁচু দিয়ে ওটা কি চলে গিয়েছে সাদা দড়ির মত?

কেউ উত্তর দিলে না।

তাদের মধ্যে অনেকেই জানে না ওটা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ টেলিফোন লাইন, সান্তিয়াগোর হোটেলে বসে তুষারাচ্ছন্ন আণ্ডিজ, সুন্দর পাম্পাস প্রান্তর, সমুদ্র, অরণ্যানীর ব্যবধান এড়িয়ে যে কেউ স্বচ্ছন্দে ইউরোপ বা যুক্ত রাজ্যের কোনো বন্ধুর সঙ্গে খোসগল্প করতে পারে যে কোনো সময়। প্রাচীন দিনের ইঙ্কা-বীর তুপাক্ উপাঙ্কি যেদিন তাঁর বিজয়ী সৈন্যবাহিনী আণ্ডিজের বিপদসঙ্কুল গিরিপথের ওপর দিয়ে আর্জ্জেন্টাইনের দিকে পরিচালিত করেছিলেন—কত দূরের হয়ে গিয়েছে সে সব দিন।

আজ সান্তিয়াগোতে বসে প্রণয়ী প্যারিসের প্রণয়িনীকে বলছে—কেমন আছ বন্ধু? প্রণয়িনী হেসে বলছে—ভাল আছি, প্রিয়তম।

গভীর পাহাড়ের খড়ের এ পারে দাঁড়িয়ে জেনারেল সান্ মার্টিন, ওপারে বৃদ্ধ ইঙ্কাবীর তুপাক্ উপাঙ্কি দুজনে কি কথাবার্ত্তা কইছেন উচ্চৈঃস্বরে, তুষার ঝটিকার গর্জ্জনে কেউ কারোর কথা শুনতে পাচ্ছেন না।

পারস্য

(পার্সিপোলিস্)

অতীত কালের বহু গুপ্ত রহস্য আবিষ্কৃত হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিকের কোদালের আগায়। ইজিপ্ট, সিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া তাদের প্রাচীন মহিমা গোপন রাখতে পারে নি, এবার পালা পড়েছে পারস্য দেশের…

যীশুখৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করবার ৩৩১ বছর পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট যখন পার্সিপোলিস্ সহর লুঠ-তরাজ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছিলেন, তারপর সর্ব্বপ্রথম আজ (১৯৩৩-৩৫) প্রাচীন পার্সিপোলিসের রহস্যময় কাহিনী লোকসমাজে প্রচারিত হচ্ছে।

পার্সিপোলিস কথাটার অর্থ 'পারস্যের সহর'। এ রকম নাম হবার মানে এই যে, এই সহরের আসল নামটি যে কি ছিল, তা কারো জানা নেই। প্রাচীন যুগের কুয়াসার আড়ালে তা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে বহুকাল। কেবল এইটুকু জানা আছে যে, ২৫০০ বছর আগে পারস্য-সম্রাট দরায়ুস দ্বারা এই সহর নির্ম্মিত হয়—যাঁর পুত্র জ্যারাক্সেস বা খয়হর্ষ এথেন্স নগরীর নিকটবর্ত্তী শৈলচূড়ায় বসে স্যালামিসের যুদ্ধ ও গ্রীক বহর কর্ত্তৃক পারস্য বহরের পরাজয় লক্ষ্য করেছিলেন।

বর্ত্তমান শিরাজ সহরের ৩৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে রৌদ্রদগ্ধ মর্ভদস্ত্ উপত্যকায় এই বিশাল প্রাচীন কালের নগরীকে—তার সমাধি, বিরাটকায় প্রস্তরমূর্ত্তি, রাজপ্রাসাদ, স্নানাগার, হারেম, স্তম্ভাবলী—বহুকাল ধরে মরুভূমির কটা বালুরাশির নীচে কৌতূহলী চক্ষুর দৃষ্টি থেকে গোপন রেখেছিল—দরায়ুস্ ও খয়হর্ষের সাধের এই রাজধানীকে এতদিনে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউট খনন করে দিনের আলোয় প্রকাশ করবার ভার নিয়েছে।

এর ভারপ্রাপ্ত নেতা প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক চার্লস্ ব্রেষ্টেড। খনন-কার্য্যের পরিচালক ডাঃ আর্ণষ্ট হার্জ্জফিল্ড। এঁরা যে শুধু এখানে রাজপ্রাসাদ ও শিল্পদ্রব্য বার করেছেন তা নয়, পারস্য-সম্রাটের একটা পুস্তকাগার পর্য্যন্ত এঁরা বার করেছেন, তাতে বিশ হাজার কাদার ইটের গায়ে কিউনিফর্ম্ম বা বানমুখো অক্ষরে লিখন আছে।

ব্রেষ্টেড বলেন, এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ আবিষ্কার। এই ইটগুলির পাঠোদ্ধার করলে সুদূর অতীত যুগের কি ছবিই না পাওয়া যাবে!

কি ভাবে দরায়ুসের আমলের নাগরিকেরা দিন কাটাত, দিনে মর্ভদস্ত্ মরুভূমির বালুর ঝড়ে ঝাল্‌সাপোড়া হয়ে সান্ধ্য জ্যোৎস্নায় তারা প্রাসাদের বিস্তৃত সোপানাবলীতে বসে বসে চারিধারের দূর পর্ব্বতমালার দিকে চেয়ে কি গল্প করত, কোন্ সে সব হারাণো প্রেমের কাহিনী? না বুঝে তাদেরও যে সব প্রিয় হয়ত রাগ করে বসে থাকত নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত—ঐ সব ইটের গায়ে তীক্ষ্ণধার লেখনীর ফলার মুখে চিরকালের মত খোদাই হয়ে আছে সেই সব অবুঝ প্রিয়ের উদ্দেশে লিখিত কত বেদনা-নম্র নিবেদন।

পারস্য গোলাপ আর বুলবুলের দেশ হলে কি হবে, প্রেমের পথে গোলাপ ফুটে থাকে না, কোনো কালেই বুলবুলও ডাকে না, সে পথ ঐ মর্ভদস্ত্ মরুভূমির পথ।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুদের কাছে পার্সিপোলিস্ সুপরিচিত। একটা দেওয়ালের গায়ে লেখা আছে, "হেন্‌রী ষ্ট্যান্‌লি, নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড, ১৮৭০"। প্রাচীন নগরীর নানা প্রস্তরময়

দেবদেবী ও অজ্ঞাত, ভীষণদর্শন জন্তু জানোয়ারের মূর্ত্তি পুরাকালের ভ্রমণকারীদের ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করে এসেছে।

এখনও কুসংস্কারগ্রস্ত ব্যাক্‌ট্রিয়ান্ বেদের দল সন্ধ্যার পরে এ পথে হাঁটতে সাহস পায় না, খয়হর্ষের রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বারে যে দুই বিশালকায় পক্ষযুক্ত বৃষের প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, তার সম্বন্ধে অনেক গল্প নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচলিত।

এই পক্ষযুক্ত বৃষ দুটীর মূর্ত্তি যেন প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতীক, প্রাচীন দিনের সমস্ত রাজ্যকে যেন তারা সদর্পে যুদ্ধে আহ্বান করছে।

প্লুটার্ক তাঁর আলেক্‌জাণ্ডারের জীবনীতে লিখেছেন যে, পার্সিপোলিস্ অগ্নিপাত দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। এতকাল পরে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ডাঃ হার্জ্জফিল্ড প্রাসাদগুলির দেওয়ালের আশে পাশে, ঘরের মেঝেতে, গৃহপ্রাঙ্গনে অনেক পোড়া কয়লা ও ছাইয়ের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন।

প্লুটার্কের বিবরণে পাওয়া যায়, পারস্যদেশ বিজয়ের সময় আলেক্‌জাণ্ডার পশ্চিম-পারস্যের সুসা নগরীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেন এবং পার্সিপোলিস অগ্নিদ্বারা বিধ্বস্ত করেন। এখানে এত মুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান্ জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছিল যে, সে-গুলো বহন করবার জন্য ১০,০০০ জোড়া অশ্বতর ও ৫০০০ উটের আবশ্যক হয়।

পার্সিপোলিস: জারাক্সাসের (খয়হর্ষ) প্রাসাদ-তোরণ। তোরণ-গাত্রস্থ পক্ষযুক্তবৃষ মূর্ত্তিদ্বয় দ্রষ্টব্য। এই পদ্ধতি এসিরিয়া হইতে পারস্যে আনীত বলিয়া অনুমান করা হয়।

পার্সিপোলিস-জয়ের পরে আলেক্‌জাণ্ডার একদিন শিবিরে সুরাপানে মত্ত অবস্থায় আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময়ে একটি মেয়ে সর্ব্বপ্রথম পার্সিপোলিস নগরীতে অগ্নিদানের প্রস্তাব করে। খয়হর্ষের প্রাসাদে প্রথমে আগুন দেওয়া হয়, পরে সারা নগরীতে অগ্নিপাত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

পাথরের স্তম্ভ, দেওয়াল, প্রস্তরমূর্ত্তি ইত্যাদি কিছুই নষ্ট হয় নি আগুনে। প্রাসাদের ছাদ ও কড়িবরগা ছিল কাঠের, সেগুলোর কয়লা ঘরের মেঝেতে পাওয়া গিয়েছে। আলেক্‌জাণ্ডারের প্রস্থানের পর পার্সিপোলিস পরিত্যক্ত

হয়। তারপরও এ পথে বহু লুণ্ঠনকারী এসেছে ও গিয়েছে, তাদের মধ্যেও অনেকে নগরীর ধ্বংসাবশিষ্ট দ্রব্যাদি অপহরণ করতে দ্বিধাবোধ করে নি।

এমন কি প্রাচীন পারস্য সম্রাটের সমাধিগুলি পর্য্যন্ত তস্করদের হাত থেকে অব্যাহতি পায় নি। পাহাড়ের গায়ে খোদাই মূর্ত্তির অনেকগুলি তারা ভেঙ্গে নষ্ট করে দিয়েছে। মাটীর উপরে যেসব স্তম্ভ বা প্রস্তরমূর্ত্তি ছিল, ধ্বংস-কারীদের নিষ্ঠুর হাতের চিহ্ন তার সর্ব্বদেহে।

আলেকজাণ্ডারের অভিযানের হাজার বছর পরে ইরাণের মরুভূমির অশ্বারোহী বেদুইন দস্যুদল পার্সি-পোলিসের উদ্ধকণ্ঠে অনেকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি নষ্ট করে দেয়।

বুশায়ার বা বন্দর আব্বাস পারস্যের একটী প্রধান বন্দর, পারস্য উপসাগরের তীরে। এখান থেকে শিরাজ ১৯৯ মাইল, ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের উপর দিয়ে রাস্তা। চিরকাল ধরে যারা ভ্রমণ করে এসেছে, তাদের পক্ষেও এই পথে ভ্রমণ একটা বিভীষিকার ব্যাপার। বহু পর্ব্বতমালার মাথার উপর দিয়ে দিয়ে মোটরের পথ শেষে গিয়ে নামে মর্ভদস্ত্ উপত্যকায়। মর্ভদস্ত্ সমতল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে মরু-প্রান্তর মাত্র। এই মর্ভদস্ত্ প্রান্তরের কেন্দ্রস্থলে পার্সি-পোলিস অবস্থিত।

পার্সিপোলিস: রাজ-অশ্ব; আধুনিক অশ্বারোহীর সকল প্রিয় সজ্জাই ইহার অঙ্গে পাওয়া যাইবে।

পার্সিপোলিস সহরের কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে কারুন ভ্যালি তেলের খনি। পারস্যের মধ্যে এটাই বর্ত্তমানে সকলের চেয়ে বড় তেলের খনি।

পার্সিপোলিসের সঙ্গে কিন্তু এ সব আধুনিক ব্যাপারের কোন যোগ নেই। মরুবালুর মধ্যে বসে সে তার প্রাচীন গৌরবের স্মৃতিতে ভোর হয়ে আছে। বিংশ শতাব্দীর পারস্যকে পার্সিপোলিস চেনে না।

১৬২১ খৃষ্টাব্দে জনৈক ইটালীয়ান ভ্রমণকারী মর্ভদস্তের এই ধ্বংসস্তূপগুলিকে প্রাচীন পারস্যের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বলে নির্ণয় করেন। কিন্তু তখনকার সময়ে স্তূপখনন বিষয়ে কারও কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বর্ত্তমান পারস্য গবর্ণমেণ্ট ১৯৩০ সালে ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউটের হাতে খননকার্য্যের ভার না দিলে আরও কতদিন পার্সি-পোলিস অনাবিষ্কৃত থাকত কে জানে!

খননকার্য্যের যিনি ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ডাঃ হার্জ্জফিল্ড, তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি খুঁজে বার করা যেত না। পারস্যে তিনি ত্রিশ বৎসরের উপরে আছেন এবং এদেশে প্রচলিত সকল রকম ভাষাতেই কথা বলতে পারেন।

বহু বৎসর পূর্ব্বে তিনি পার্সিপোলিসের ধ্বংসস্তূপ পর্য্যবেক্ষণ করে ঠিক করেন যে, দরায়ুস ও খয়হর্ষের হারেম অন্য সব অংশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালভাবে আছে। সুতরাং যখন অনেকদিন পরে ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউটের তরফ থেকে পার্সিপোলিসের খননভার তাঁর উপর পড়ল, তখন তিনি প্রাসাদের এই অংশটা প্রথমে উদ্ধার ক'রে ও মেরামত ক'রে তাঁর আপিস সেখানে বসাবেন ভাবলেন।

কিন্তু কাজটা বড় সহজ ছিল না। এক একখানা প্রস্তর খণ্ড নতুন করে বসাতে হ'ল, যার ওজন কুড়ি টন। তা ছাড়া মাটীর কাজও অনেক করতে হ'ল। এসব মেরামতের কাজ শেষ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খনন-কারীর দল তাঁবুতে বাস করত, আর সে তাঁবু পাতা হ'ল দরায়ুসের প্রাসাদের ছাদে—কারণ ছাদ তখন চারিপাশের জমির সঙ্গে সমতলে অবস্থিত।

খনন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ ছোট বড় জিনিস পাওয়া যেতে লাগল—পুঁতির দানা, ছোট ছোট প্রস্তরমূর্ত্তি, মৃৎপাত্র, খেলনা ইত্যাদি।

প্রাসাদের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয় ক'রে তারপর ডাঃ হার্জ্জফিল্ড একটা নক্সা তৈরী করলেন। নীচের সমতলভূমি মেপে প্রাসাদের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত একসারি পাথরের সোপানাবলী। সোপানাবলী গিয়ে শেষ হয়েছে ঐ বিখ্যাত সিংহদ্বারের সম্মুখে, যার দুপাশে পূর্ব্বোক্ত পক্ষযুক্ত বৃষদ্বয়ের বিরাট মূর্ত্তি অবস্থিত। এই সিংহদ্বার নির্ম্মাণ করেন সম্রাট খয়হর্ষ।

প্রাসাদ একটী নয়, অনেকগুলি—দরায়ুসের প্রাসাদ, দরায়ুসের হারেম, খয়হর্ষের প্রাসাদ ও খয়হর্ষের হারেম। পরবর্ত্তী জনৈক সম্রাট আর্ত্তখয়হর্ষের প্রাসাদ। এই প্রাসাদশ্রেণীর মাঝখানে আর একটা সিংহদ্বার আছে, যার দুদিকে দুটী সুবৃহৎ সভাগৃহ। প্রত্যেক সভাগৃহে একশো প্রস্তর-স্তম্ভ—স্তম্ভের অরণ্য বলা যেতে পারে।

এই সব স্তম্ভের মাথায় কড়িকাঠগুলি ছিল সব কাঠের। পার্সিপোলিস নগরী যেদিন দগ্ধ হয়, সেইদিন এই দুই সভাগৃহে কি ভীষণ ভাবেই না অগ্নি পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল! সভাগৃহ দুইটীর মেঝেতে ছাই জমে ছিল ২৬ ফুট উঁচু।

পার্সিপোলিস: রাজার নিকট প্রজা উপহার সামগ্রী বহন করিয়া চলিতেছে। উপরে সিংহী ও সিংহ-শিশু, নিম্নে অশ্ব দ্রষ্টব্য (বা-রিলিফ)।

প্রাসাদের অন্তঃপুরের দিক থেকে এই সভাগৃহে আসবার কোনও সোপানশ্রেণী প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয় নি। কিন্তু হার্জ্জফিল্ড ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে, এই সব ভগ্নস্তূপ অপসারিত হ'লে সোপানশ্রেণী পাওয়া যাবেই।

তাঁর নির্দ্দেশমত সেই ২৬ ফুট উঁচু ভস্মস্তূপ সরানো হ'ল এবং ফলে দুই সারি প্রস্তরময় সোপান তাদের বিচিত্র কারুকার্য্যসহ আড়াই হাজার বছর পরে আবার দিনের আলোয় মুখ দেখালে। ওরিয়েন্টাল ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ম্মচারিগণ বিবেচনা করেন, এই দুই সারি সোপানশ্রেণী তাঁদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

এতকাল পর্য্যন্ত জগতের বিভিন্ন মিউজিয়মে প্রাচীন পারস্য শিল্প ও ভাস্কর্য্যের যে সব নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছিল ঐ দুই সোপানশ্রেণীর আবিষ্কারের ফলে তাদের সংখ্যা হঠাৎ দ্বিগুণ বেড়ে গেল, মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে।

সোপানশ্রেণীর বাইরের দিকে কোন প্রাচ্য দরবারের চিত্র খোদাই করা। পারস্য-সম্রাটের শরীররক্ষী ও প্রাসাদরক্ষী সৈন্যদল একসারি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে পারস্য ও মিডিয়া দেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণ ও পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন আটাশটি বিজিত জাতির রাজদূত। দূতগণের হাতে মূল্যবান্ উপঢৌকন—সোনা, ইবোনি ও হাতীর দাঁতের তৈরী শিল্পদ্রব্য, দামী পক্ষীপুচ্ছ, মধু, নানা প্রকার ফল, গবাদি পশু, সিংহ ও সিংহের বাচ্চা, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদপূর্ণ পেটিকা।

পারস্য দেশীয় নববর্ষের দিন তারা সম্রাটকে অভিনন্দন করতে এসেছে, এই হ'ল ছবির বিষয়। ২৭শে মার্চ্চ প্রাচীন পারস্য দেশীয় পঞ্জিকার নববর্ষের প্রথম দিন।

এই সব ছবিতে খোদাই মূর্ত্তিগুলির উচ্চতা প্রায় ছ' ফুট এবং যতখানি জমিতে ছবি খোদাই আছে, তার দৈর্ঘ্য প্রায় হাজার ফুটের বেশী। একটি জায়গায় ছবিগুলি জড় করলে সাত হাজার বর্গফুট পরিমিত একখানা বড় প্যানেল হয়।

প্রাসাদের দেওয়াল পতনের সময় উপরের সারির কোন কোন ছবি যদিও একটু একটু নষ্ট হয়েছে, কিন্তু মোটের উপর মূর্ত্তিগুলির ভাব আজও এমন সুন্দর ও তাজা যে, মনে হয় শিল্পী কাল মাত্র তার বাটালীর কাজ শেষ করেছে।
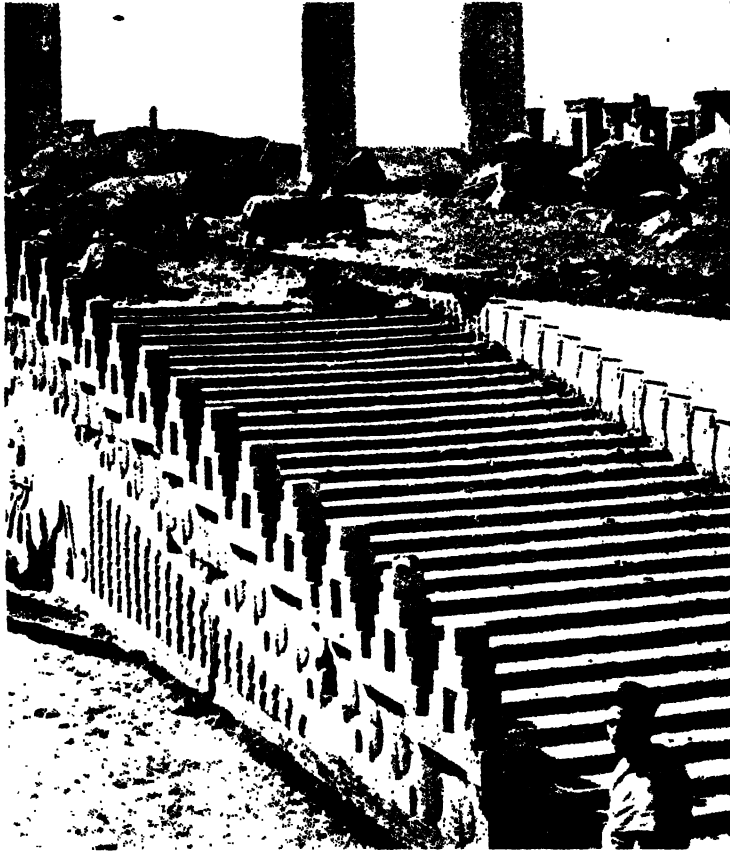
পার্সিপোলিস: রাজ-প্রাসাদের সম্মুখস্থ সোপান-শ্রেণী।

প্রাচীন কিংবদন্তী যে অনেক পরিমাণে সত্য, বর্ত্তমান প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, যেমন ট্রয় নগরীর ধ্বংস সম্বন্ধে যে সব গল্প প্রচলিত আছে, তা সত্য হ'ক না হ'ক, ট্রয় নগরী যে আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছিল, তার অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। পার্সিপোলিস-দাহ সম্বন্ধে কিংবদন্তী বহুকালের, কিন্তু এখন খনন করে দেখা যাচ্ছে, কথাটা খুবই সত্য।

পার্সিপোলিস বহু ব্যবহারের ফলে ক্ষয় হয়ে যায় নি, হঠাৎ পরিত্যক্ত হয়েছিল। একটা ঘরে এমন সব চিহ্ন আছে, যা দেখে মনে হয় বাড়ীর লোক ঘরের মধ্যে আহারে বসেছিল, হঠাৎ কোন বিপদ্‌পাতের দরুণ খাবারের পাত্র ফেলে উঠে পালিয়েছে। আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বে প্রাচীন পার্সিপোলিসের এই বাঁধান গৃহতলে কোন্ বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হয়ে গিয়েছে, আজ কে তার খবর রাখে?

ছোট রেললাইন পাতা হয়েছে রাবিশ বইবার জন্য। রাবিশের মধ্যে হয়তো মূল্যবান্ দ্রব্য থাকতে পারে সেজন্য রাবিশ এক জায়গায় জড় করে তা বেছে দেখা হয়, যদি কিছু তার মধ্যে মেলে। এক জায়গায় রাবিশ সরাবার পরে খুব লম্বা নর্দ্দমা বার হয়ে পড়েছে, প্রাসাদের জল নিকাশ হ'ত এই নর্দ্দামা দিয়ে। নর্দ্দামা একটা নয়, অনেকগুলি এবং নানাদিকে তাদের বহু শাখাপ্রশাখা আছে।

এই সব নর্দ্দামার মোট দৈর্ঘ্য এখনও মাঁপ হয় নি। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এই সকল নর্দ্দামার প্রস্তুতপ্রণালী বর্ত্তমান কালেরও যে কোনো স্যানিটারি এঞ্জিনিয়ারের গৌরবের বিষয়। অনুমান করা হয়, প্রাচীন পারসীকগণ

আসিরীয়া ও ব্যাবিলোনিয়া থেকে নর্দ্দামার গঠনপ্রণালী শিক্ষা করে। আসিরীয়া রাজ্য ছিল বর্ত্তমানে যা উত্তর-ইরাক এবং দক্ষিণ-ইরাকে ছিল সেকালের ব্যাবিলোনিয়া। বাগ্‌দাদ সহর থেকে ৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে টেল্‌-আসমার প্রান্তরে ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট খৃষ্টপূর্ব্ব ২৬০০ বৎসরের একটি প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় নগরী খুঁড়ে বার করেছেন, তাতে সহরের বড় বড় রাজপথের তলায় এই ধরণের পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত দেখা যায়।

পার্সিপোলিস সহর থেকে কিছু দূরে মর্ভদস্ত্‌ প্রান্তরের বক্ষে ছয় হাজার বৎসরের প্রাচীন একটী প্রস্তরযুগের গ্রামের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এই গ্রামের একটা ঘরের মেঝেতে কতকগুলো মৃৎপাত্র ছিল, তাদের গায়ে নানা রকম ফুল লতা-পাতা আঁকা। ঘরের দেওয়াল রাঙা গিরিমাটী দিয়ে রং-করা।

আধুনিক ঐতিহাসিকগণের ধারণা—এশিয়ার এই সব অঞ্চলে মানব-সভ্যতা প্রথম জন্মলাভ করে। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট বর্ত্তমানে এই সভ্যতার ইতিহাসের উপকরণ খুঁজতে ব্যস্ত। উত্তরে তুরস্ক, দক্ষিণে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও ইজিপ্ট, পূর্ব্বে পারস্য—সব শুদ্ধ জড়িয়ে প্রায় ৪০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী স্থান এঁদের কর্ম্মক্ষেত্র। এই সব অঞ্চলের জনহীন মরুপ্রান্তরের মধ্যে কত প্রোথিত প্রাচীন নগরীর অস্তিত্ব আছে, তার ঠিকানা নেই। এঁরা তার একটা তালিকা করছেন। ১৯৩২ সালে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর একটা মনোপ্লেন ভাড়া করে এঁরা কায়রো সহরের হেলিওপোলিশ এরোড্রোম থেকে ওড়া সুরু করেন এবং প্যালেষ্টাইন, উত্তর ও দক্ষিণ-ইরাক, পূর্ব্বে পারস্য উপসাগরের তীরবর্ত্তী বন্দর আব্বাস এবং উত্তর-পশ্চিমে শিরাজ, পার্সিপোলিস সমস্ত দেশ উড়ে বেড়িয়ে দেখেন, কোথায় কোন্ প্রাচীন নগরীর চিহ্ন আছে ও আকাশ থেকে তাদের ফটো নেন।

ইরাকের মরুভূমিতে সে সময় ছিল ঝড়ের সময়, কারণ ওঁরা উড়তে সুরু করেন মার্চ্চ মাসে; দিন রাত মরু-বালুর ঝড় বইছে, উপরে নীচে অন্ধকার, ইরাকে আবার এই ঝড়ের বালি ১৫০০০ হাজার ফুট উঁচুতে পর্য্যন্ত ঠেলে ওঠে—পাইলট শুধু বেতারে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর রেডিওষ্টেশনগুলি থেকে পথ জেনে নিয়ে চোখ বুঁজে এরোপ্লেন চালালে দিন দুই। তখন সকলে বললে, এতে কোন কাজ হবে না, এত ধূলোতে ফটো নেওয়া যায় কি করে? নাম মাটীতে, ঝড় থামতে দাও।

এরোপ্লেন থেকে পার্সিপোলিস ও বহু প্রাচীন স্থানের সুন্দর ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছে। এই এরোপ্লেনের চালক ছিলেন বিখ্যাত কাপ্তেন ওলি, যিনি এক সময়ে প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সের এরোপ্লেনের পাইলটের কাজ করেছেন। ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউটের অন্যতম পরিচালক ডাঃ জেমস্‌ ব্রেষ্টেড বলেন:—

"মানুষের সভ্যতার উত্থান ও পতনের ইতিহাস একটা গোলোকধাঁধার মত। এর সব খেই খুঁজে পাওয়া ভার। তবুও আমার মনে হয় প্রাচ্যদেশের এই সব অঞ্চলেই ওর চাবিকাঠির সন্ধান মিলবে। উত্তর-সিরিয়ায় এলেক্‌জাড্রেট্টা ও আলেপ্পো সহর দুটোর মধ্যে চাটাল হুয়ুক নামে যে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্তূপ আছে, তার উপর দাঁড়িয়ে আমি দূরবীণ দিয়ে দেখেছি, চারিদিকের প্রান্তরের মধ্যে আরও পঞ্চাশটী প্রাচীন নগরীর স্তূপ বর্ত্তমান। আমরা পশ্চিম-এসিয়ার এই রকম ষোলটা স্তূপ খুঁড়বার ভার নিয়েছি—আমাদের বেশী টাকা নেই। ইউরোপ ও আমেরিকার অন্য অন্য প্রতিষ্ঠান যদি আমাদের মত এদিকে মন দেয়, তবে মানব সভ্যতার একটা অন্ধকার যুগে সত্যের আলোকপাত হবে। হাজার হাজার এরকম প্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্তূপ রয়েছে সমস্ত পশ্চিম এসিয়ার মরুভূমিতে ছড়িয়ে।"

বর্ত্তমান প্যালেষ্টাইন

গত দশ বৎসরে প্যালেষ্টাইনের বহু পরিবর্ত্তন হয়েছে—এত বেশী পরিবর্ত্তন হয়েছে যে, যীশুখৃষ্টের জন্মের পর থেকে এ সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তা হয় নি।

প্যালেষ্টাইন: জাফা বন্দর। উত্থিত পর্ব্বত-চূড়াসমূহ ব্রেকওয়াটারের কাজ করে।

খৃষ্টানদের পরম পবিত্র তীর্থ প্যালেষ্টাইন, এই নামের সঙ্গে বাইবেলোক্ত কত প্রাচীন কাহিনীর যোগ রয়েছে, কত সাধু-মহাত্মার পুণ্যপদরেণুস্পর্শে ধন্য হয়েছে এই দেশ! এখনও কি এখানে মেষপালকের বেশে সজ্জিত হয়ে ডেভিড মেষদল মাঠে নিয়ে যান!

এখন প্যালেষ্টাইন আধুনিক রীতিনীতি গ্রহণ করেছে—সভ্য হয়েছে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, পরস্পরের মিলন-ভূমি হয়ে উঠেছে।

যে গিরিগুহায় রাজা সল এণ্ডরের ডাইনি বুড়ীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তার নীচে দিয়েই ছ'শো সাতাশ মাইল লম্বা পাইপ-লাইন ইরাকের খনিজ তেল বহন করে নিয়ে মরুভূমি ও পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করে চলেছে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে।

জোসেফ যে-পথে উটের পিঠে ইজিপ্টে গিয়েছিলেন, এখন সেখানে হালফ্যাসানের বড় বড় মোটরগাড়ী ছোটে।
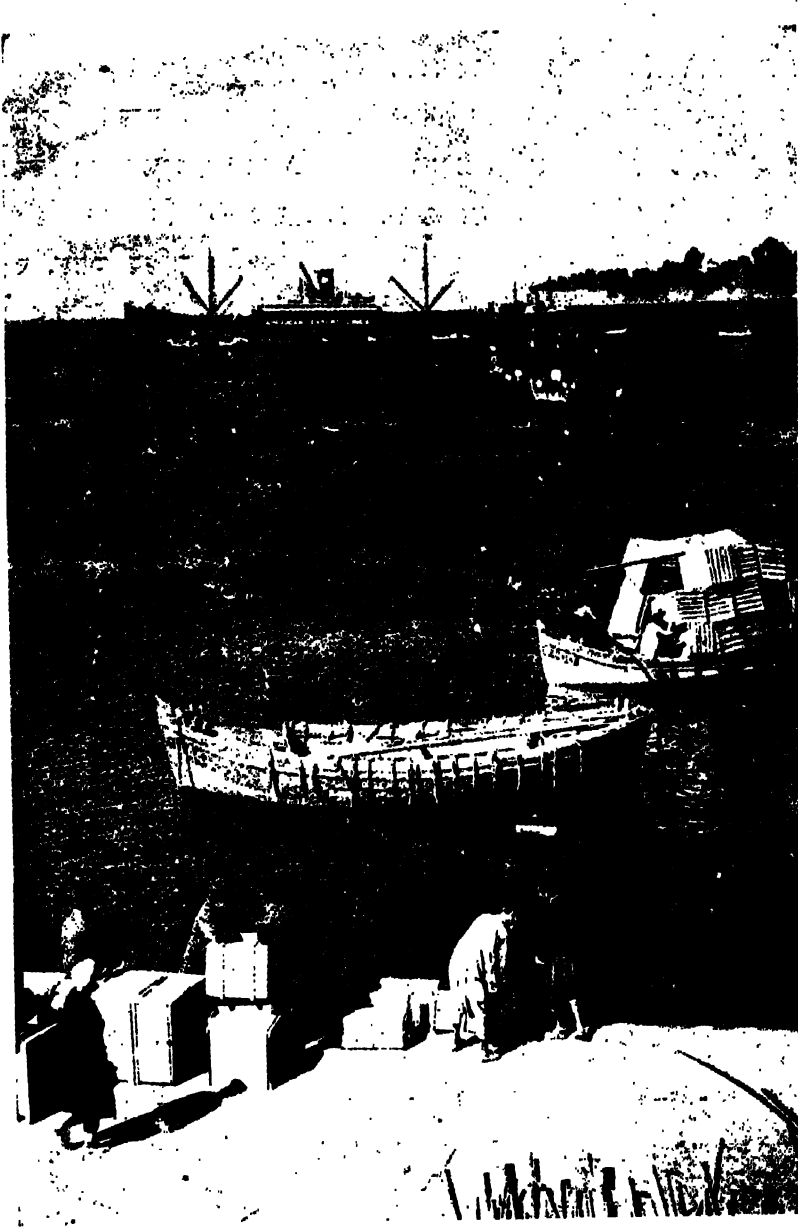
পবিত্র জর্ডান নদীর জলে কলকব্জা বসিয়ে যে তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হয়, শারণের বাইবেল-প্রসিদ্ধ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে বড় বড় লোহার খুঁটী সেই তড়িৎ শক্তি কত ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বালাচ্ছে, আগে যে-সব ঘরে জলপাইয়ের তেলে প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলত।

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কাজেই মাউন্ট কারমেলের পাদদেশে হাইফা বলে যায়গায় নতুন একটি বন্দর খুলতে হয়েছে। হাইফা একটি ছোট সহর, একর উপসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত, প্যালেষ্টাইনের সারা উপকুলের মধ্যে এই একমাত্র প্রকৃতি-নির্ম্মিত উপসাগর। জাফা প্যালেষ্টাইনের প্রাচীন বন্দর, কিন্তু সেটা বড় সমুদ্রের মুখে, বহির্সমুদ্রের ঢেউয়ের আক্রমণ থেকে ছোট ছোট জাহাজের বাঁচাবার উপায় নেই সেখানে। প্যালেষ্টাইনে উৎপন্ন কমলালেবু পূর্ব্বে জাফা থেকে রপ্তানী হত, এখন হয় হাইফা থেকে।
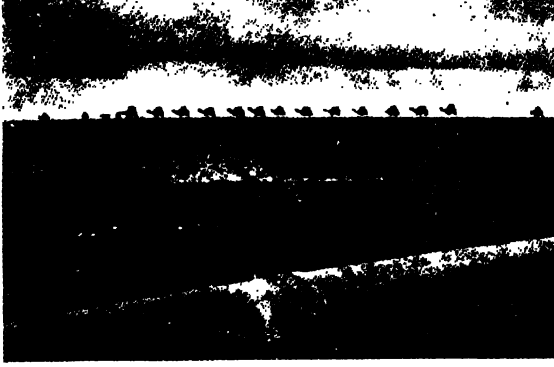
চক্রবালসীমায় উষ্ট্রবাহিনী পুরাতন প্যালেষ্টাইনের নিদর্শন। সম্মুখে পাইপলাইন বর্ত্তমান প্যালেষ্টাইনের পরিচয়। অধুনা এই দুইটিই পাশা-পাশি দেখিতে পাওয়া যায়।

হাইফা উত্তর শাসন-বিভাগের হেড-কোয়ার্টার। এই বিভাগ সিরিয়া দেশের সীমানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, প্রাচীন ফিনিসিয়া, গ্যালিলি ও সামারিয়ার খানিকটা অংশ এর মধ্যে পড়ে। হেজাজ রেলওয়ে হাইফা বন্দরকে সিরিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে এবং প্যালেষ্টাইন রেলওয়ে একে জেরুজালেম, জাফা ও ইজিপ্টের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

বাইবেল-প্রসিদ্ধ বেথ্‌লেহেম এখনও আছে, তবে মধ্য-ইউরোপের বুল্‌ভার্‌সমূহ থেকে সদ্য-প্রত্যাগতা, আধুনিকতম পোষাকে সুসজ্জিতা সুন্দরী ইহুদী তরুণী সেখানে মধ্যযুগের দীর্ঘ ও ঢিলাঢালা পোষাক পরিহিতা গ্রাম্য মেয়েদের গা ঘেঁসে একই পথে চলে।

কৃষিকার্য্যের অবস্থা কিন্তু সমানই আছে। আরব চাষীরা কাঠের লাঙলে বলদ, উট অথবা গাধা জুড়ে চাষ আজও করে—এশিয়ার সর্ব্বত্র যে ভাবে করা হয়, তেমনি। এদেশের প্রধান শস্য যব, গম, জনার ও তিল। প্রত্যেকের বাড়ীতে দুটো দশটা জলপাইয়ের গাছ আছে—আমাদের দেশে যেমন আম কাঁটালের গাছ থাকে। জলপাই গাছ এদেশে একটা সম্পত্তি। জলপাই ফলের সময় গরীব লোকে জলপাই খেয়ে দিন কাটিয়ে দেয়। গৃহপালিত পশুর অবস্থা সমানই খারাপ। কোনোরকম পশুর খাদ্যের চাষ করার চলন নেই, যেমন প্রাচ্যদেশের কোথাও বড় নেই। ফলে দুর্ব্বল পশু দিয়ে চাষের কাজ যেমন হবার তেমনি হয়।

হাইফা: প্যালেষ্টাইনের আধুনিক বন্দর। (১৯৩৩ সনে নির্ম্মিত)

প্যালেষ্টাইনে জার্ম্মানদের দু একটা বড় বড় কৃষিক্ষেত্র আছে, এই সব কৃষিক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট থেকে আধুনিক পদ্ধতির চাষ প্রচলন করবার চেষ্টা চলছে। আরব চাষীরা সম্প্রতি এদিকে মন দিয়েছে। গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের লোকে চাষীদের জমিতে গিয়ে এই সব পদ্ধতি বুঝিয়ে দেয় ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করবার চেষ্টা করে।

এখানে লোকে যা করবে তা বলবদ্ধ হয়ে করবে। কিছু করতে হলে গ্রাম্য মসজিদে সবাইকে ডেকে এনে সভা করে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করা হয়। এতে ফল হয় ভালই, ছোট ছোট গ্রামেও আজকাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে—তা থেকে ভাল বীজ বিতরণ করা হয়, পশুর রোগ হলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়, টাকা অগ্রিম দেওয়া হয় চাষ কাজের সুবিধার জন্যে।
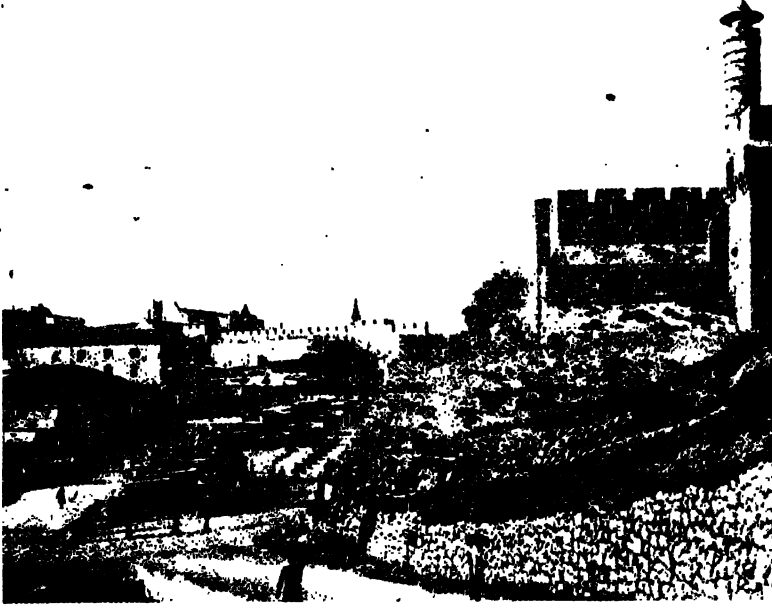
জেরুসালেম : মোটরবাসের টার্মিনাস।

বহু শতাব্দী ধরে ইজিপ্ট, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, -মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক রয়েছে—বণিকেরা উটের পিঠে পণ্য বোঝাই দিয়ে প্যালেষ্টাইনের পথ দিয়েই যাতায়াত করে। অথচ এই পথ চলে গিয়েছে দুস্তর মরু-ভূমি পার হয়ে, যে-পথে পুলিশ নেই, পাহারা নেই; আইনের

বাইবেলোক্ত নাজারেথ : বর্ত্তমানে লাঙ্গলের সাহায্যে চাসের বন্দোবস্ত হইতেছে।

আশ্রয় থেকে বিতাড়িত দস্যুদল পথিকদের উপর অত্যাচার না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। যখন এ-অঞ্চল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন রোমানরা এটা বুঝেছিল এবং সীমানাকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে জর্ডান নদীর ওপারে বহুদূর ব্যেপে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিল।

প্রাচীন প্যালেষ্টাইনে আধুনিক বিজ্ঞানের অধ্যাপনা চলিতেছে।
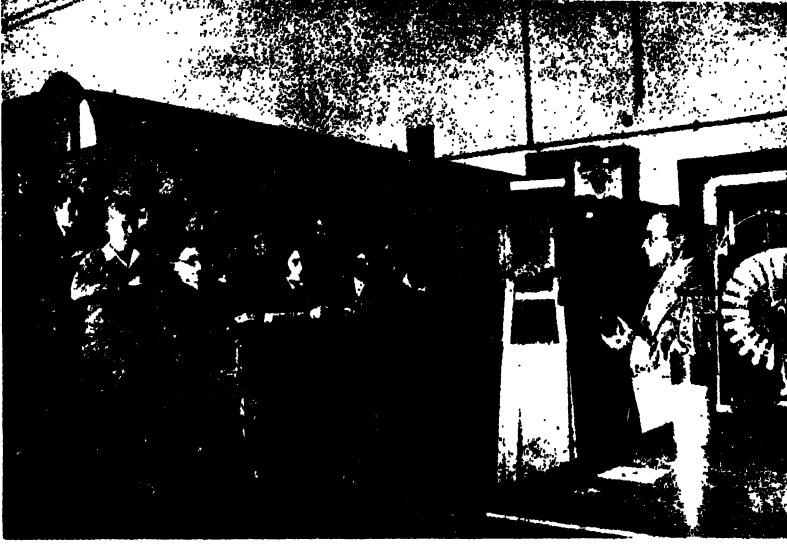
পামিরা থেকে জেরাশ ও পেট্রা পর্য্যন্ত পথের মধ্যে প্রাচীন যুগের সামরিক ঘাঁটির এই সব ধ্বংসাবশেষ রোমান শাসন-পদ্ধতির দূরদর্শিতার নীরব সাক্ষ্য প্রদান করছে। রোমানদের এই নিয়ম তুর্কীদের সময়ে ছিল না। তখন পথের ধারের বড় বড় গঞ্জ বা গ্রাম পথিকদের কাছ থেকে কিছু কিছু কর নিয়ে তার বদলে তাদের দস্যুদলের হাত থেকে রক্ষা করার ভার নিত। এ ব্যবস্থাতে তুর্কী গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ভার অনেক লাঘব হয়েছিল সন্দেহ নেই, কাজও হত ভাল। যে গ্রামের শাসন-সীমানার মধ্যে ডাকাতি, লুটপাট বা খুন হয়েছে, পুলিশের লোকে সেই গ্রামের কর্ত্তৃপক্ষকে ডাকাতির জন্য দায়ী করত।

বর্ত্তমান প্যালেষ্টাইনে আধুনিক নিয়মের পুলিশদল গড়ে উঠেছে—ইংরেজ ও সে-দেশের কনষ্টেবল দুই-ই আছে পুলিশদলে। তারা বড় বড় আরবী ঘোড়ায় চেপে সহরের পথে ট্রাফিক-পুলিশের কাজ করে, কিংবা পাহাড়ের উপরে ডিউটিতে যায়। আজকাল পথে-ঘাটে তেমন অত্যাচার নেই এবং কৃষকেরা বাজারে তাদের জিনিষপত্র বেচতে নিয়ে যেতে পারে অনেকটা নিরাপদেই। তবুও মাঝে মাঝে পাহাড়ের মধ্যে এখনও দস্যুরা কখনো কখনো দেখা দেয় ও শাসন-বিভাগ, প্রজাবর্গ ও পুলিশকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। যতদিন পর্য্যন্ত তাদের উচ্ছেদসাধন না ঘটবে ততদিন পর্য্যন্ত এ দুর্ভোগ চলবে।

প্যালেষ্টাইন: কমলালেবুর বাগান।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনে মোটর-চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না, কারণ তখন সমগ্র প্যালেষ্টাইনে মোটরগাড়ী ছিল মাত্র একখানি।

বর্ত্তমানে উপলসঙ্কুল নদীখাত ও শিলাস্তৃত পর্ব্বতপথের পরিবর্ত্তে প্যালেষ্টাইনের সর্ব্বত্র সিরিয়া থেকে ইজিপ্টের সীমানা পর্য্যন্ত, ভূমধ্য-সাগর থেকে জর্ডান নদী পর্য্যন্ত, ওদিকে সিনাই উপদ্বীপ ও বাগদাদ পর্য্যন্ত আধুনিক ধরণের রাস্তা তৈরী হয়েছে, মোটর যাতায়াতের কোনো অসুবিধা নেই।

এ পর্য্যন্ত চার হাজার মোটরগাড়ী রেজিষ্ট্রী হয়েছে পুলিশ আপিসে—তার মধ্যে মোটরবাসই বেশী—এগুলি মোটর-লরির ফ্রেমের উপরে কাঠের ঘর বসানো মাত্র। কিন্তু এরা ঘোড়ায় টানা দেশী গাড়ীগুলো তাড়িয়েছে, এখন মোটরবাসে সবাই যায়, প্রাচ্য সম্ভ্রান্ত লোক থেকে বোরখা পরা মুসলমান মহিলা, আপিসের কেরাণী থেকে বৈদেশিক ভ্রমণকারী পর্য্যন্ত।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনের একমাত্র রেলপথ ছিল ফরাসীদের নির্ম্মিত জাফা থেকে জেরুজালেম পর্য্যন্ত একটা ছোট রেল লাইন—হাইফা থেকে এরই শাখা পূর্ব্বদিকে জর্ডান নদী পার হয়ে ডামস্কাস-মদিনা রেলপথের সঙ্গে মিশেছিল। যুদ্ধের সময় সুয়েজ থেকে সিনাই উপদ্বীপের উপর দিয়ে, গাজা ও লিড্ডা এই দুই প্রাচীন সহর পথে রেখে হাইফা পর্য্যন্ত একটা নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে যাত্রীরা প্রাতর্ভোজন ও বৈকালিক চা-পানের মধ্যে গোটা সিনাই উপদ্বীপ ও প্যালেষ্টাইন পার হয়ে যেতে পারে যা পার হতে মোজেসের লেগেছিল চল্লিশ বছর।

কমলালেবু বস্তা বোঝাই হইয়া ইউরোপ, ইংলণ্ড ও ইজিপ্টে চালান হইতেছে।

এরোপ্লেনেরও অভাব নেই —বরং এই মরুপর্ব্বতসঙ্কুল দেশে এরোপ্লেনে যাওয়াই সুবিধা। গ্যালিলি সাগরে (আসলে একটা হ্রদ) এখন আকাশ থেকে উড়ো-জাহাজ নেমে প্রাচীন ধীবরদের বিস্মিত করে দেয়, কারণ গ্যালিলি এখন ইউরোপ থেকে পূর্ব্ব-এশিয়াগামী উড়ো-জাহাজের পেট্রোল ভর্ত্তি করবার জায়গা।

গ্যালিলি ও গাজা সহর থেকে এখন হালফ্যাসানের সৌখীন সাজসজ্জাযুক্ত উড়োজাহাজ মাল ও যাত্রী নিয়ে পূর্ব্ব-এশিয়ার দিকে রওনা হয়—এই সব উড়োজাহাজে মালসমেত কুড়িজন যাত্রী বহন করতে পারে—চার ইঞ্জিনযুক্ত, ঘণ্টায় বেগ গড়ে ১২০ মাইল। রেলে এবং আকাশপথে তিনদিনে প্যালেষ্টাইন থেকে লণ্ডনে যাওয়া যায়।

মহাযুদ্ধের শেষে প্যালেষ্টাইনের একজন বৃদ্ধ ইহুদী জনৈক আমেরিকান ভ্রমণকারীর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল—'ঘরে আমাদের রাত্রে আলো জ্বলে না কেন, জিগ্যেস করছেন? আজ্ঞে, হুজুর, জলপাই তেলের প্রদীপ মিট্‌মিটে আলো দেয়, তাতে তো কোনো কাজ হয় না, তাই আমরা সূর্য্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় শুয়ে পড়ি।'

এখন জর্ডান নদীতে কলকব্জা বসিয়ে যে তড়িৎশক্তি উৎপাদন করা হয়, জর্ডান থেকে হাইফা পর্য্যন্ত, ওদিকে টেল্ আভিভ ও জাফা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বড় বড় লোহার খুঁটী ও তারের সাহায্যে সেই বিদ্যুৎ পাঠানো চলছে।

ডেড্ সি বাল্যকাল থেকে প্রত্যেকেরই পরিচিত। নামে সমুদ্র যদিও, আসলে এটাও গ্যালিলি সমুদ্রের মত একটা হ্রদ। এই হ্রদে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ নেই, থাকা সম্ভব নয়—জলে পটাশ ও ব্রোমিন এত বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান। এখানে চোলাইয়ের কল বসিয়ে হ্রদের জল থেকে পটাশ ও ব্রোমিন বার করে নিয়ে বিদেশে রপ্তানী করা হয়। শীঘ্রই উভয় দ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাণ বছরে ১০০,০০০ টন দাঁড়াবে।

যাঁরা ভাবেন যে কলার চাষ ট্রপিক্স্ ভিন্ন সম্ভব হয় না—তাঁরা ডেড্ সি থেকে কয়েক মাইলের মধ্যে জেরিকো সহরের উপকণ্ঠে বিস্তৃত কলাবাগান দেখে বিস্মিত হবেন। কাটা খালের সাহায্যে এই কলার ক্ষেতে জল সেচন করা হয়—তবে বাৎসরিক বৃষ্টি পতনের পরিমাণ এসব মরুদেশে এত সামান্য যে, বর্ষণধারামুখর ট্রপিক্সের মত অত বড় গাছও এখানে হয় না বা ফলও ও-ধরণের হয় না। স্থানীয় বাজারে আদৃত হলেও অন্যদেশে সে কলা রপ্তানী করার যোগ্য নয়।

গ্যালিলি হ্রদের উত্তরে একটা ছোট হ্রদ আছে—এখানকার জলে জলজ ঘাস, শেওলা, দাম অত্যন্ত বেশী। এখান থেকে ম্যালেরিয়া-বীজাণুবাহী মশা উৎপন্ন হয়ে সারা প্যালেষ্টাইনে ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে দিত। গবর্ণমেণ্ট ও ধনী ইহুদী ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে এই হ্রদের জল বড় বড় খাল কেটে নানা দিকে বার করে দেওয়া হচ্ছে, ঘাস ও শেওলা পরিষ্কার করা হয়েছে—ফলে প্যালেষ্টাইনে এখন ম্যালেরিয়া অনেক কম। বিখ্যাত রক্ফেলার ফাউণ্ডেশন ট্রাষ্ট্ এই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য না করলে বোধ হয় এত সত্বর সাফল্য লাভ সম্ভবপর হত না।

কমলালেবুর ক্ষেত। আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইহার চাষ হয়। ব্যবসায় হিসাবে ইহা খুব লাভজনক।

৫২ বছর আগে ব্যারণ এডমণ্ড রথচাইল্ড রিশন ল্য জিয়ন নামক স্থানে একটা ইহুদী উপনিবেশ স্থাপন করেন—এবং ব্যবসার নিমিত্ত দ্রাক্ষার চাষ সেখানে প্রথম সুরু হয়। আঙুর থেকে সুরা তৈরী করবার কলকব্জা বসানো হয় - মদের গুদাম ও কারখানা গড়ে ওঠে। কয়েকটি খৃষ্টীয় মঠেও ভাল মদ প্রস্তুত হয়।

কিন্তু লেবু জাতীয় ফলই প্যালেষ্টাইনের প্রধান পণ্য। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও জাফার কমলালেবু ইউরোপে বিখ্যাত ছিল। কমলালেবুর ফসলের সময়ে প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ বাক্স কমলালেবু বিদেশে রপ্তানী হত।

এদেশের লেবুফলের চাষ বহু পুরাতন, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে এর সুরু—ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় লেবুজাতীয় ফলের চাষ আরম্ভ হয়েছে অনেক পরে। এসিয়ার দূরতম প্রদেশসমূহ থেকে এই প্যালেষ্টাইনের মধ্য দিয়েই ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী সব স্থানে লেবুর চাষ ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন কালের খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের

বিবরণে ও ক্রুজেডের সামরিক ইতিহাস-লেখকদের গ্রন্থে মধ্যযুগে প্যালেষ্টাইনে কমলালেবু, গোঁড়ালেবু, মুসাম্বির, লাইম প্রভৃতি লেবু জাতীয় ফলের বিস্তৃত বাগানের উল্লেখ আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানকার কমলালেবু ইউরোপে রপ্তানী করবার রেওয়াজ প্রচলিত হয়। বর্ত্তমানে লেবু রপ্তানীর ব্যবসা প্যালেষ্টাইনের অন্য সব ব্যবসাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং লেবু জাতীয় ফলই এখানকার সর্ব্বপ্রধান কৃষিসম্পদ। ১৯৩৩ সালে এক জাফা বন্দর থেকে ৪,০০০,০০০ বাক্স ফল বিদেশে চালান গিয়েছিল।

অধিকাংশ দেশে ইতিহাস লেখা থাকে প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসস্তূপে, আচার-ব্যবহারে ও প্রাচীন মুদ্রায়। প্যালেষ্টাইনে সে সব ছাড়া আর একটা জিনিষে বহু শতাব্দীব্যাপী নানা বৈদেশিক অধিকার ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ইতিহাস লিখিত আছে—খৃষ্টান, ইহুদী ও মুসলমান, ধর্ম্ম ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা অনুসারে লোকের মাথার টুপির গড়ন, রং, আকৃতি সব ভিন্ন ভিন্ন ও বিচিত্র। দরবেশদের দীর্ঘ ও ধূসর রঙের টারবুশ, ইউরোপীয় মধ্যযুগের লালটুপি, যার উপরের দিকটা মোচার অগ্রভাগের মত সরু, এখনও বেথলেহেমের মেয়েদের মাথায় দেখা যায়। সম্ভবতঃ ক্রুজেডের সময় ইউরোপ থেকে এই গড়নের টুপি এদেশে এসেছিল, তার পাশেই দেখা যাবে ফ্রান্সিস্কান্ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের গোল টুপি, এও ইউরোপ থেকে মধ্যযুগে আমদানী, এখন এখানকার কৃষকেরা ব্যবহার করে। তারপর আছে গরীব আরবদের ছাগলের লোমে নির্ম্মিত 'আগল', সৌখীন নগরবাসী আরব ভদ্রলোকের টক্‌টকে লাল টারবুশ, আর্ম্মেনিয়ানদের দীর্ঘ কালো টুপি, উপরের দিকটা পবিত্র আরারাট পর্ব্বতের মত দেখতে। ইহুদী সাইনডের প্রধান রাব্বিদের পশম বসানো গোল টুপি, ক্যাথলিক পাদ্রিদের টুপি, জর্জ্জিয়ান ও পারসী ইহুদীদের টুপি, কপ্ট্, আবিসিনীয় ও তুর্কীদের টুপি, প্যারিসের আধুনিকতম ফ্যাসানের তৈরী মেয়েদের টুপি সব পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যাবে।

গ্যালিলি হ্রদ: হ্রদমধ্যস্থ বিমানপোতের ঘাঁটি দেখা যাইতেছে।

নবনির্ম্মিত হাইফা বন্দরের ঠিক পিছনেই কারমেল পাহাড়, সেখান থেকে চারিপাশের দৃশ্য বড় সুন্দর—পৃথিবীর মধ্যে খুব বেশী বন্দরে অত সুন্দর দৃশ্য দেখা যাবে না। সামনেই কারমেলের সানুদেশে ঘন সবুজ ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের পাইন, তারপর চাষীদের মাটীর ঘর, তারপর পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যে হাইফা সহর, তার পরই প্রহরে প্রহরে পরিবর্ত্তনশীল সমুদ্র, এই ধূসর, এই ঘন নীল, এই আবার অন্য রকম—কারমেলের পূবদিকে বহু দূরব্যাপী খর্জ্জুরকুঞ্জ, তারপর ধূসর বালুময় এস্‌দ্রিলনের মরুভূমি থাকে থাকে উঠেছে, কারণ, ওদিকটা পাহাড়। তার পরেই মরুভূমির মধ্যে দিয়ে জীর্ণকায়া নার্-এল্-মুকাত্তা নদী বয়ে চলেছে।

বর্ত্তমান মাঞ্চুরিয়া

মাঞ্চুরিয়ার বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্বন্দ্ব এখনও পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে—তবে অন্যান্য দেশে বর্ত্তমান সভ্যতা যেরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, মাঞ্চুরিয়ায় ঠিক তাহা নহে, উদাহরণ স্বরূপ কোরিয়ার কথা বলা যাইতে পারে। জাপানের প্রভাবে কোরিয়া অতি দ্রুত বর্ত্তমান সভ্যতাকে আয়ত্ত করিতেছে। মাঞ্চুরিয়ায় অত দ্রুত না হইলেও চীনের অপেক্ষা বেশী। চীন দু' হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতাকে এখনও আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে—অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সেখানে কোন পরিবর্ত্তন হইবার উপায় নাই।

মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সংকীর্ণ। কারণ, এখনও বহির্জগতের সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ার আদান-প্রদান সুরু হয় নাই। এখানে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা ও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা পাশাপাশি বর্ত্তমান—একটা আর একটাকে গ্রাস করিবার চেষ্টায় আছে—এবং বোধ হয় শেষেরটাই জয়ী হইবে। তবে সে বিজয়ের দিন এখনও অনেক দূরে।

মাঞ্চুরিয়া : মুকদেনের পূর্ব্বাঞ্চলে ফুসুনস্থিত পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ কয়লার খনি।

গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের উভয় পার্শ্বে জাপান, ও চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেলপথের দুই পাশে রাশিয়া নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতেছে—ইহার ফলে বর্ত্তমানে হাজার হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থানে মোটরের কার-খানা, ট্রাম, বিজলী বাতির কারখানা, কলের লাঙলের সাহায্যে উন্নততর প্রণালীর কৃষিকার্য্য ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার কার্য্য সুরু হইয়াছে।

মাঞ্চুরিয়া লইয়া ১৯২৯ সালে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল এবং ১৯৩১ সালে চীন ও জাপানের মধ্যে সেই বিবাদ আরও অধিকতর মাত্রায় প্রকটিত হইয়াছিল। যে দেশ লইয়া এত বিবাদ, সেই দেশটি প্রকৃত পক্ষেই পূর্ব্ব-দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রাকৃতিক বিভবে, সৌন্দর্য্যে, অনাবিষ্কৃত খনিজ সম্পদে, বাণিজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহা ছাড়া মাঞ্চুরিয়া খুব বড় দেশ, আয়তনে ইহা ফ্রান্স ও স্পেন জড়াইয়া যত বড় হয়, তত বড়।

মাঞ্চুরিয়ায় অতি আধুনিক প্রণালীতে নির্ম্মিত নগর ও কারখানায় পাশাপাশি চামড়ার তাঁবুতে যাযাবার জাতি বাস করিতেছে। উট ও ছাগল এখনও তাদের একমাত্র পার্থিব সম্পদ। আবার দশ মাইলের মধ্যে আধুনিক ধরণের সহরে উন্নত ধরণের আসবাবপত্রে সজ্জিত বালিকা-বিদ্যালয়ে বব্ করিয়া চুল ছাঁটা বালিকাগণ টেষ্ট্‌টিউব হাতে বিদ্যালয়ের
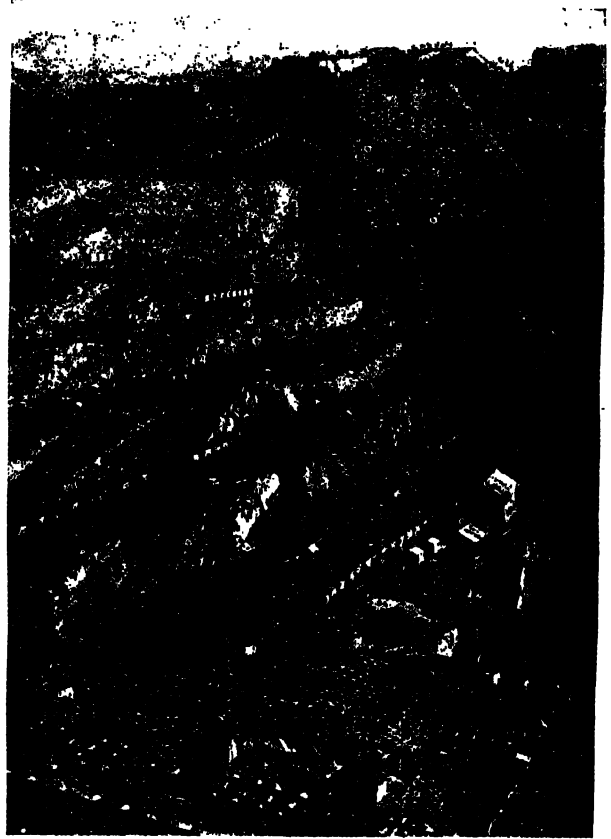
পরীক্ষাগারে কাজ করিতেছে—অবস্থাপন্ন গৃহস্থ মোটরযোগে ছুটির দিনে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছে, মেয়ে-পিয়ন পোষ্টাপিসের চিঠি বিলি করিতেছে।

মাঞ্চুরিয়ায় সর্ব্বত্র আজকাল মোটরবাস হইয়াছে—আগে যে সব সহরে পৌছানো অত্যন্ত কষ্টকর ছিল, এখন দু' একদিনে সে সব স্থানে রেল ও মোটরযোগে যাওয়া যায়। রেলপথ ক্রমশঃ বাড়িতেছে, সমগ্র চীনদেশের সমগ্র রেলপথের অর্দ্ধেক এই মাঞ্চুরিয়াতে আছে—বৈদেশিক স্বার্থ এই রেলপথ বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। মাঞ্চুরিয়া পৃথিবী শুদ্ধ সব সভ্যদেশের বাজার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সকলেই এখানে জিনিস বেচিবার জন্য ব্যগ্র। আমেরিকা মোটরগাড়ী ও মোটরের লাঙল বেচিতে ব্যগ্র—ইংলণ্ডের লোহালক্কড়ের জিনিসের বড় খরিদ্দার মাঞ্চুরিয়া, জাপানের তো ইচ্ছা, ও বাজারে সে একাই বিক্রেতা হইবে। মিঃ ওয়েন্ ল্যাটিমার চীনদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুব ভালই জানেন এবং তিনি চীন ও মাঞ্চুরিয়ায় নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি ১৯৩২ সালে সস্ত্রীক মাঞ্চুরিয়া ভ্রমণে যান। তাঁর লিখিত বিবরণ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—
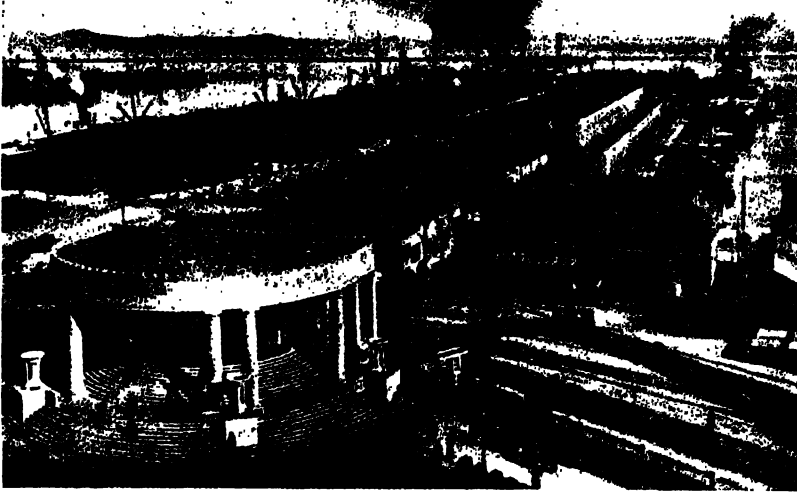
মাঞ্চুরিয়া : ডাইরেন বন্দর। ইহার বিস্তৃত বহির্বাণিজ্য ইহাকে যে কোনও পাশ্চাত্য বন্দরের মত রূপ দিয়াছে। জাপানের অধীনে মাঞ্চুরিয়ার স্থানবিশেষের দ্রুত পাশ্চাত্যানুযায়ী উন্নতির অন্যতম নিদর্শন এই ডাইরেন ফ্রি পোর্ট।

"মাঞ্চুরিয়া দেখবার প্রয়োজন ছিল দুই কারণে। বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্গে সহস্র বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার দ্বন্দ্ব মাঞ্চুরিয়ায় যেমন সজীব ও বাস্তব, এমন বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন দেশেই নয়। আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, ওখানকার বিভিন্ন যাযাবর জাতির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, ঐ সব যাযাবর জাতির মধ্যে আমরা তাদের একজন হয়ে কিছুকাল বাস ক'রব। আমাদের সে ইচ্ছা অনেকটা পূর্ণ হয়েছিল—আমরা কিরিন প্রদেশের একটা মাঞ্চু গ্রামে বাস করেছিলাম প্রায় মাস তিনেক এবং এই স্থানে থাকার সময় বার্গা মালভূমির যাযাবর জাতি ও আমুর নদীর তীরবর্ত্তী তাতারদিগকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

মুকদেন : তিন শত বৎসর পূর্ব্বে চীনের রাজধানী ছিল। এখনও ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এটি একটি বাজারের কিয়দংশ।

চীনদেশ থেকে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক এদেশে বাস করতে আসছে। চীনের ভিতরে নানা গোলমাল— তাছাড়া দারিদ্র্য অনেক বেশী। মাঞ্চুরিয়ার রেলওয়েতে, কৃষিক্ষেত্রে, খনিতে, দোকানে বা ডকে কাজ পাওয়া যায়, চীনদেশে অত সহজে কাজ মেলে না। আমরা এই সব প্রবাসী চীনাদের দেখেছি, সীমান্তরক্ষী সৈন্যদের তাঁবুতে রাত কাটিয়েছি, দেব-মন্দিরে ও অপরিচ্ছন্ন সরাইয়ে সকলের সঙ্গে একত্র বসে খেয়েছি। রেলে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে বেড়িয়েছি এবং রাজকর্ম্মচারী, বণিক, কেরাণী, দোকানদার, ছাত্র, কৃষক, সৈনিক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশেছি।

মাঞ্চুরিয়ার পুরাণো লোকসাহিত্য সংগ্রহ করবার জন্য আমরা রেলপথ থেকে অনেক দূরের গ্রামে গ্রামে বেড়িয়েছি। এই সব গ্রামের জীবনযাত্রাপ্রণালী এত অদ্ভুত যে, মনে হয় না আমরা সভ্য জগতে আছি—মাঝে মাঝে মুকডেন, হারবিন্, ডাইরেন প্রভৃতি বড় বড় সহরে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। মাঞ্চুরিয়ার এ সব বড় সহর অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও ইউরোপীয় ও আমেরিকান্ রীতিতে তৈরী ; সেখানে থিয়েটার, সিনেমা, হোটেল, বড় দোকান, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, ট্রাম, ছাপাখানা, লাইব্রেরী, খবরের কাগজ, রেডিও – সবই আছে।

ডাইরেন : গাড়ীবোঝাই সিমের বীচি বিদেশে পাঠাইবার জন্য ঘাটে যাইতেছে। ঘাটে লাগানো জাঙ্ক-সমূহের পাইল দেখা যায়।

প্রথমে মুকডেনে এসেই আমরা মাঞ্চুরিয়ার শাসনকর্ত্তা জেনারেল চ্যাং শো-লিংএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। চ্যাং শো-লিং অত্যন্ত ভাল লোক, তিনি মাঞ্চুরিয়ার সম্বন্ধে অনেক গল্প করেন, তিনি মাঞ্চুরিয়াকে ভাল করেই জানেন এবং যাযাবার তাতার জাতিদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি। জেনারেল চ্যাং শো-লিং খুব ভাল গল্‌ফ খেলতে পারেন, টেনিস ও পোলো খেলাতেও তিনি সুদক্ষ। তিনি বেশ ইংরেজি বলেন, কিন্তু গল্প বলতে বলতে উৎসাহের মুহূর্ত্তে অনেক সময় হঠাৎ চীনাভাষা বলতে সুরু করেন। চ্যাং শো-লিংএর সাহায্য না পেলে, আমাদের অত ভাল করে দেশটা দেখবার সুযোগ হ'ত না।
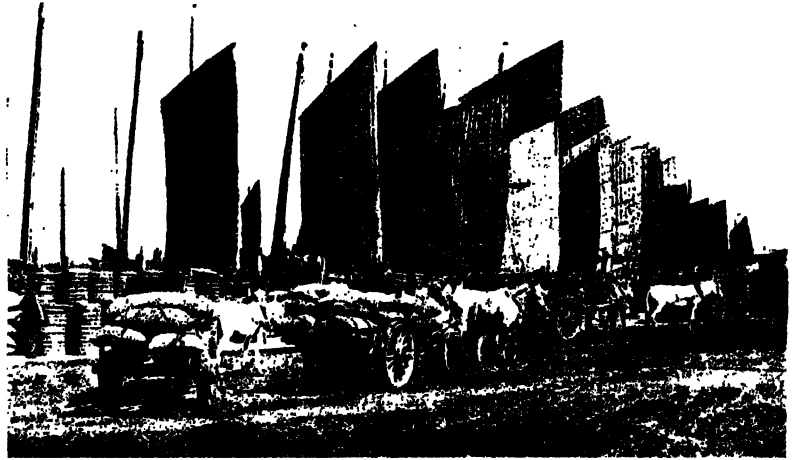
শীতের শেষে আমি মোঙ্গোলদের দেশের অভ্যন্তরে অনেক দূর যাই। একটা লরি বোঝাই সৈন্যের সঙ্গে একত্র বসে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল শুধু ক্যামেরা ও আমার বিছানা। আমার সঙ্গীরা যে খাবার খেত, আমি সেই একই খাবার খেতাম বটে, কিন্তু খাবারের দরুণ আমার কষ্টের অবধি ছিল না, শুধু ময়দার সেউ খেয়ে মানুষে কতক্ষণ খুসী থাকতে পারে! তার চেয়ে মোঙ্গোলদের ভুট্টার খই, শুক্‌নো পনীর ও ভেড়ার মাংস আমি অনেক পছন্দ করতাম।

মোঙ্গোলদের দেশের প্রান্তসীমায় সোলুন নামে ছোট্ট সহর অবস্থিত। এখানে আগে আফিমের চাষ ছিল— চাষীরা সবই চীনা, তারা চড়া খাজনায় মোঙ্গোলদের কাছে জমি বন্দোবস্ত নিত। চীন থেকে এরা চুপি চুপি আফিম সমুদ্রধারের বন্দর ও অন্যান্য নিষিদ্ধ স্থানে চালান দিয়ে দু' পয়সা উপার্জ্জন ক'রত, কিন্তু জুয়া খেলে সব উড়িয়ে দিয়ে

শীতকালে কাজের অভাবে অর্থের জন্যে ডাকাতি ক'রত। এদের উৎপাতে সোলুন সহর থেকে আশেপাশে দিনমানেই কোথাও যাবার উপায় ছিল না। জেনারেল চ্যাং শো-লিং বহু চেষ্টার পরে এদের উৎপাত দমন করেন, কিন্তু অনেকে দূরের পার্ব্বত্য প্রদেশে পালিয়ে যায়—নিরীহ জীবন-যাত্রাপ্রণালী তাদের ধাতে সইল না।

জনৈক ঔষধওয়ালা। হস্তধৃত বর্শাটির আপাদমস্তক সাপের খোলসে মোড়া। লোকের বিশ্বাস যে এই বর্শা দ্বারাই লোকটি আধিব্যাধি দূর করে।

একদল মোঙ্গোল যাযাবর-বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে এখানে বাস করছে—শাসনবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন, আরও অনেক মোঙ্গোল আমদানী করে দেশটাকে মোঙ্গোলপ্রধান করে তোলা। এই দেশেই জাপানী সেনাপতি নাকামুরা চীন সৈন্যদের দ্বারা হত হন, তার ফলে জাপানীরা মুকডেন ও অন্যান্য সহর দখল করে।

উত্তর চীনে দুর্ভিক্ষ হওয়ার দরুণ অনেক লোক পালিয়ে এখানে এসে বাস করেছে। হাতে পয়সা না থাকায় শীতকালে তারা মাঠের মধ্যে পরিখা খুঁড়ে তার মধ্যে বাস করেছিল, এখন বসন্তের প্রারম্ভে বার হয়ে আসছে। এদের জীবন যে কি দুঃখপূর্ণ তা' কল্পনা করা যায় না। গভর্ণমেণ্ট এদের কিছু কিছু জমি দেবার চেষ্টা করছে—প্রথম তিন বছর খাজনা দিতে হবে না, তিন বছর ভাল ফসল পেলে চতুর্থ বৎসর থেকে এদের অবস্থা ভাল হতে পারে।

কিন্তু শুধু জমি দিলেই হ'ল না, এদের মূলধন কাণাকড়িও নেই। কাজেই এরা চড়াসুদে মহাজনের কাছে টাকা কর্জ্জ করতে বাধ্য হয়—এবং ফসলের সময় শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ সুদের জন্য দিতে হয়। বেচারা কৃষকদের থাকে কি! এর উপর আবার যদি জমির খাজনা দিতে হয়, তবে জমি চাষ করবে কেন লোকে! এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য গভর্ণমেণ্ট মতলব করেছে যে, চাষীদের জমি উঠতি হয়ে গেলে পুরস্কারস্বরূপ ঐ জমির কিছু অংশ চাষীকে একেবারে দিয়ে দেওয়া হবে, তার জন্যে কোন কালেই আর খাজনা দিতে হবে না। এ ধরণের ব্যবস্থা ভিন্ন এ অঞ্চলের কৃষির উন্নতি আশা করা যায় না। জেনারেল চ্যাং শো-লিংএর চেষ্টার ফলেই এ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়েছে।

শীতাগমে মাঞ্চুরিয়ার নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। অনায়াসে তখন নদীর উপর দিয়া লোক ও শকট চলাচল করে।

সোলুন অঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশে মাঞ্চু-মোঙ্গোল জাতি বাস করে—এরা এক অদ্ভুত জাতি। জনৈক মোঙ্গোল সর্দ্দারের সঙ্গে একজন মাঞ্চু রাজকন্যার বিবাহ হয়। সেই রাজকন্যার অনুচরগণের বংশ হচ্ছে এই মাঞ্চু-মোঙ্গোল। টাওয়ান্ নগরে আমরা দীর্ঘকাল ছিলাম। সোলুন পর্ব্বতের পাদদেশস্থ একটা বড় প্রদেশের রাজধানী হিসাবে টাওয়ান্ অল্প কয়েক বছরের মধ্যে খুব উন্নতিলাভ করেছে। আমরা একটা ছোট সরাইয়ে ছিলাম—এই সরাইএর মালিক এক সময়ে বড় সেনাপতি ছিল—গৃহযুদ্ধে তাদের দল হেরে যায় এবং এ লোকটা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এখানে এসে সরাই খুলেছে। মাঞ্চুরিয়ায় এ ধরণের লোক অজস্র পাওয়া যায়—দিনকতক পরের লুঠপাট করে বড়মানুষি করলে, আবার কিছুদিন পরে পথে দাঁড়ালো।

আমাদের সরাইএর মালিক খুব সকালে উঠত এবং চাকরবাকরদের উপর চেঁচামেচি করে হুকুম জারি করত। তার ভয়ে চাকরেরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত, কখন কি বলে বসে মালিক তার ঠিক নেই। আমাদের কামরার যে চাকর, তার নাম আর মাঞ্চুরিয়ার একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নাম একই—এই জন্যই বোধ হয় সরাইএর মালিক তাকে যখন তখন চীৎকার করে হুকুম করতে ভালবাসত।

মিঃ নি-ই-উ'র সিগারেটখোর বাচ্চা (প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

টাওয়ান্ সহর রাতারাতি বড় হয়েছে। এ নগরটি মোঙ্গোল জাতির দেশের মধ্যে অবস্থিত। এই মোঙ্গোল জাতি পূর্ব্বে মাঞ্চুরিয়ার অনেক প্রদেশ নিজেদের অধিকারে এনেছিল। মাঞ্চুদের সঙ্গে মিশে এরা চীনদেশ আক্রমণ ক'রে সেখানে মাঞ্চু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সব অনেক দিনের কথা। এখন চীনারা আবার মোঙ্গোলদের তাড়িয়ে সমগ্র মাঞ্চুরিয়ায় রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেছে। টাওয়ান্ সহরের বাড়ীগুলি সবই পাকা, বড় বড় কাঁচের জানালা বসানো, দোকানে রেশমী বস্ত্র, সাবান, এসেন্স ইত্যাদি পাওয়া যায়—অধিকাংশ পণ্যই বিদেশী।

টাওয়ান্ সহরের আশে পাশে দস্যুর উপদ্রব অত্যন্ত বেশী। জেনারেল চ্যাং শো-লিং আমাদের বলে দিয়েছিলেন যে, মোটর গাড়ী ভিন্ন আমরা যেন কোথাও না যাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যখনই আমরা মোটরে বার হ'তাম—আমাদের আগে আগে একটা মোটর সাইকেল ছুটত—তার পেছনে একটা বড় লরি বোঝাই সৈন্য, তার পেছনে আমাদের গাড়ী এবং আমাদের গাড়ীর পেছনে আবার একটা লরি বোঝাই সশস্ত্র সৈন্যদল। আমাদের অগ্রবর্ত্তী মোটর সাইকেল ও লরির ধূলো খেতে খেতে আমাদের অবস্থা হয়ে উঠত শোচনীয়, যেন বাইবেলে বর্ণিত গল্পানুযায়ী ইস্রায়েলের পুত্রগণ ঈশ্বর-প্রেরিত মেঘের স্তম্ভের অনুসরণ করে ইজিপ্টে চলেছেন।

দস্যুর উপদ্রব সত্যিই এত বেশী যে, আমরা প্রতি রাত্রেই সহরের বাইরে সৈন্যদের সঙ্গে তাদের গুলি চালাচালির শব্দ শুনতে পেতাম। দস্যুরা লুঠপাট করে সোলুন পর্ব্বতের মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে পড়ত, আর তাদের কোন সন্ধানই হ'ত না। আবার কখনো কখনো অশ্বারোহী সৈন্যদল দস্যুদের বন্দী করে নিয়ে নগরের মধ্যে ভেঁপু

বাজাতে বাজাতে মহাসমারোহে প্রবেশ করত। দোকানদারেরা তখন তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে দিত—কারণ, নিয়ম হচ্ছে এই যে, বন্দী দস্যুরা যদি কোন দোকান থেকে কোন জিনিষ চায়—দোকানদারকে তখনই তা দিতে হবে। না দিলে সৈন্যেরা দিতে বাধ্য করবে।

মাঞ্চু রাজকন্যার মৃত্যুর পরে তাঁর অনুচরদের জমি দেওয়া হয়েছিল। ঐ জমি এখন তাদের বংশধরদের অধীনে আছে। তারা চাষবাস ও বস্ত্র বয়ন করে, সকলেই বেশ অবস্থাপন্ন এবং যদিও সংখ্যায় খুবই কম, কিন্তু তারা ক্ষমতাপন্ন। দস্যুদল তাদের অধীনস্থ অঞ্চলে প্রবেশ করতে সাহস করে না। ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে ধনী, সে স্থায়ী তাঁবুতে বাস করে, আর সকলে নিজের নিজের গৃহপালিত পশু নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। এ অঞ্চলে পার্ব্বত্য নেকড়ে বাঘের অত্যন্ত বেশী উপদ্রব—সে জন্য প্রত্যেকে বড় বড় গ্রেহাউণ্ড পোষে। সকল মেষপালকের সঙ্গেই দু' পাঁচটা গ্রেহাউণ্ড থাকে—তারা যেমন প্রভুভক্ত, তেমনি উগ্র প্রকৃতির।

মাঞ্চুরিয়ার বাসিন্দা একটি ফিস্‌কিন তাতারী পরিবার।

গ্রেহাউণ্ড মাঞ্চুরিয়ার সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না—এই কুকুর এদেশে অত্যন্ত মূল্যবান্ বিবেচিত হয়। গ্রেহাউণ্ড কেউ বিক্রী করে না, তবে উপহার দেয় বটে। গ্রেহাউণ্ড উপহার দেওয়া অত্যন্ত সম্মানের চিহ্ন বলে গণ্য হয়। ক্যাস্টিলিওন নামক বিখ্যাত জেসুইট্ চিত্রকরের অঙ্কিত মাঞ্চু-সম্রাটের প্রিয় কয়েকখানি গ্রেহাউণ্ডের ছবি পিপিংএর রাজপ্রাসাদে আছে।

মোঙ্গোলেরা কুকুরকে তিত্তির পাখী শিকার করতে শেখায়। শরৎকালে বনের ফল খেয়ে তিত্তির পাখী এমন মোটা হ'য়ে পড়ে যে, তারা বেশীদূর উড়তে পারে না। কুকুরেরা তাদের উড়ন্ত অবস্থায় পেছনে পেছনে ছুটে যায়, এবং যেমনি জমিতে বসে—অমনি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে।

এ দেশে পশুচারণভূমি দাবাগ্নিতে পুড়ে প্রায়ই অকেজো হয়ে যায়। মোঙ্গোলেরা গ্রীষ্মের প্রারম্ভে শুকনো ঘাসে আগুন ধরিয়ে দেয়, আগামী বর্ষায় ভাল ঘাস খাবার জন্য—কিন্তু যখন বাইরের লোক এসে জমি নিয়ে বাস করে, তখন জমির দখল নিয়ে দুই দলে বিবাদ হয় এবং একদল অন্য দলকে জব্দ করবার জন্য মাঠের দীর্ঘ ঘাসে আগুন লাগিয়ে দেয়।

আমরা একটা ছোট পাহাড়ের উপর দিয়ে মোটরলরিতে যাচ্ছিলাম। রাস্তা একদম ছিল না—যে দিকে চাই শুধুই বড় বড় ঘাস। আমাদের সঙ্গী সৈন্যেরা এই ঘাসে লাগিয়ে দিলে আগুন। মোটরলরি ছাড়বার আগেই বাতাসের গতি বদ্‌লে গিয়ে বিরাট আগুনের শিখা আমাদের দিকে ছুটে এল—আর একটু হলেই গিয়েছিলাম আর কি! আমাদের সঙ্গে বেশী গ্যাসোলিন ছিল, তার টিন ফুটো হওয়ার দরুণ মাটীতে সর্ব্বত্র গ্যাসোলিন ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছিল—তাতে একবার আগুন লাগলে আর কি রক্ষা ছিল!

কোন মোঙ্গোল-তাঁবুতে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া নিরাপদ নয়—তা হ'লে কুকুরের দল ছুটে এসে সওয়ারকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেবে। চাবুক মারলেও তারা ভয় পায় না বা ফেরে না—জিনের উপরে লাফিয়ে উঠতে চায়, ঘোড়ার মুখে কামড়াতে যায়। এই জন্মে নিয়ম হচ্ছে এই যে, দূর থেকে চীৎকার ক'রে বলতে হবে, 'আমরা যাচ্ছি, কুকুর সামলাও'। তখন তাঁবুর লোকেরা বেরিয়ে এসে কুকুর বাঁধবে। তুমি যে দস্যু বা আক্রমণকারী শত্রু নও, এ থেকে তারা তা বুঝতে পারবে।

মোঙ্গোলেরা তাদের তাঁবুকে এত ভালবাসে যে, যে সব জায়গায় তারা বাড়ীঘর বেঁধে বাস করেছে, সে সব জায়গাতেও তারা বাড়ীর সঙ্গে চামড়ার গোল তাঁবু অনেক দিন পর্য্যন্ত রেখে দেয়—যখন তাঁবু ছিঁড়ে যায়—তখন তার চারপাশে কাদা দিয়ে লেপে তাকে ভাঁড়ার-ঘর হিসাবে ব্যবহার করে।

মোঙ্গোলদের জীবন খুব স্ফূর্ত্তির ব্যাপার নয় আদৌ। দুর্ভিক্ষের উৎপাত, প্লেগের উৎপাত, দস্যুর উৎপাত, আগুনের উৎপাত এ সব তো লেগেই আছে, তা ছাড়া আছে, উকুন ও মাছির উৎপাত। আমি একবার একজন মোঙ্গোল কৃষকের তাঁবুতে দিন কয়েক ছিলাম। শীতকালে সে লোকটা পশম ও ভেড়ার চামড়ার ব্যবসাও চালাতো! তার হাতে দু' পয়সা আছে, কিন্তু সে গল্প করলে গ্রীষ্মকালে মাছি ও উকুনের উপদ্রবে রাত্রে ও দিনে ঘুম হওয়া অসম্ভব। সারা গ্রীষ্মকাল ধরে শুধুই গা চুলকানো ছাড়া অন্য কোন প্রতিকার নেই এর।

শীতের রাত্রে এদের বিছানায় শুয়েছিলাম। আগুনে তাতানো ইটের ওপর কম্বল পাতা—এই হ'ল বিছানা। আমার সঙ্গে একজন চীনা রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি শোবার আগে গায়ের জামা অনুসন্ধান ক'রে তার মধ্যে কয়েকটা বড় বড় উকুন পেলেন। তারপর লম্বা আফিমের পাইপটি ধরালেন—আমায় বললেন, "বড্ড শীত, আসুন দু' এক টান দিন্ না? কি জানেন, আফিমের ধোঁয়ায় উকুনের উৎপাত কম থাকে।" অদ্ভুত বিশ্বাস বটে।

শীতকালে মাঞ্চুরিয়ার সর্ব্বত্র মোটরবাস যাতায়াত করে। এ দেশের মোটরবাস দেখতে ভারী মজার। কাঠামোটা ফোর্ড মোটরের, কিন্তু তার উপরে এরা নিজের পছন্দ ও খুসিমত গাড়ী বানায়—মনে হয়, একটা চীনা জাঙ্ক্‌কে একটা ফোর্ড এঞ্জিন্ টানছে, মালে ও যাত্রীতে এক একটা বাস এমন ভর্ত্তি করে যে সকলেই না নামলে কেউ গাড়ী থেকে নামতে পারে না!

শীতের শেষে আমরা কিরিন প্রদেশে পৌছুলাম। সেখানকার শাসনকর্ত্তা আমাদের খুব খাতির করলেন। কারণ আমরা চ্যাং শো-লিংএর চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম। রাস্তার লোক অবাক হয়ে আমাদের চেয়ে দেখত। আমরা মাঞ্চুভাষা শিখবার জন্য একজন শিক্ষক খুঁজলাম—প্রথমটা সকলেই আমাদের এমন সন্দেহের চোখে দেখলে যে, শুনলাম সমগ্র কিরিন প্রদেশে মাঞ্চুভাষা শেখাবার শিক্ষক একজনও নেই—সব মারা গিয়েছে। অবশেষে শাসনকর্ত্তার বিশেষ পরোয়ানা আনিয়ে তার বলে আমরা মিঃ নি-ই-উ অর্থাৎ 'গরু' নামধারী জনৈক মাঞ্চু স্কুলমাষ্টারকে খুঁজে বার করলাম। নাম যাই হোক, লোকটা বুদ্ধিমান—দু' রাত্রির মধ্যে মিঃ নি-ই-উ আমাদের তেরশো অক্ষর চিনিয়ে এবং মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিল।

আমাদের এই মাষ্টার মহাশয়ের তিন বছরের একটি ছেলে ছিল—কি সিগারেট-খোরই ছিল এই তিন বছরের শিশুটি। আমরা যখনই সিগারেট ধরাবো, সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটা সিগারেট দিতে হবে—সে ধরিয়ে টানতে থাকবে। আর তার বাবা সস্নেহে তার পিঠ চাপড়ে বলবে, 'বেশ বাচ্চা, বেশ, বেশ!'

বলিভিয়া

বলিভিয়া দক্ষিণ-আমেরিকার একটি ছোট দেশ, এখানে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত। মিঃ ষ্টুয়ার্ট ম্যাকমিলান অনেক দিন বলিভিয়ার রাজধানী লা শাম্ সহরে আমেরিকান কনসাল ছিলেন,—১৯২৬ সালে তিনি বলিভিয়ার পূর্ব্ব-দক্ষিণ অঞ্চলে উচ্চ-মালভূমিতে অবস্থিত টিয়া-হুয়া-নাকো সহরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যান। বহু শতাব্দীর ধুলাবালির তলে আমেরিকা মহাদেশের এই প্রাচীনতম নগরীটা চাপা পড়িয়াছিল—সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় কিছু কিছু খননকার্য্য চলিতেছে। মিঃ ম্যাক্‌মিলানের বিবরণ হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল—

একজন আয়মারা ইণ্ডিয়ান। সাধারণতঃ আয়মারারা বিষণ্ণপ্রকৃতি। প্রকৃতির সঙ্গে কঠিন যুদ্ধ করে এদের বাঁচতে হয়। হাসি দেখে বোঝা যায়, এই ব্যক্তি সাধারণ আয়মারা থেকে ভিন্ন।

"বলিভিয়ার মত এত পুরানো ধ্বংসাবশেষ অন্য কোনো দেশে নেই। এমন উচ্চতম স্থানে অবস্থিত হ্রদও কোথাও নেই। দুটোই আমরা দেখব বলে লা শাম্ থেকে রওনা হলাম। সেপ্টেম্বর মাস, বলিভিয়ায় বসন্তকাল, রেল-লাইনের দুপাশে শস্যক্ষেত্রে কর্ষণকার্য্য শেষ হয়ে গিয়েছে—ডিসেম্বর মাসের প্রথমে যব ও আলু বপন করা হবে। ইণ্ডিয়ান কৃষকেরা যে লাঙল ব্যবহার করে, পাঁচশো বছর আগে তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ লাঙলই ব্যবহার করত—খুব হাল্‌কা কাঠের তৈরী, একজোড়া বলদে টানে, তবে তাতে জমিতে গভীর গর্ত্ত হয় বলে মনে হয় না।

লা পাস্ থেকে কুড়ি মাইল দূরে ভিয়াচা সহরে গাড়ী থামল। ভিয়াচা এমন খুব বড় সহর নয়—গবর্ণমেণ্টের বেতারের ষ্টেসন আছে বলে কিছু-কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। আমেরিকান মেঠাইয়ের দোকান, চকোলেটের দোকান, ফটো তোলার দোকানে হৃষ্টপুষ্ট চোলা ইণ্ডিয়ান মেয়েরা রঙীন পশমী পোষাক পরে ফটো তুলতে এসেছে। ফলের দোকানে তরমুজ, কমলালেবু ও আঙ্গুর বিক্রি হচ্ছে।

জীর্ণ পরিচ্ছদ, খালি-পা বালকেরা থলি ঘাড়ে করে ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্মে ট্রেনের ধারে ধারে হেঁকে বেড়াচ্ছে—Lustre, senor? Lustre? জুতো পালিস করাবেন মশায়? জুতো পালিস করাবেন? আমাদের কামরার বাইরে একজন অশীতিপর ভিক্ষুক মলিন হ্যাট হাতে ভিক্ষা চাইছে। ইণ্ডিয়ান মেয়েরা ঝুড়ি করে এম্পানাডা বলে একরকম মাংসের কচুরী বেচছে—চর্ব্বিতে ভাজা, ভেতরে আলু ও মাংসের পুর—খুব করে রাঙা ঝালের গুঁড়ো ছড়ানো।

ভিয়াচা সহরের বাড়ী সবই যবের খড় দিয়ে ছাওয়া, তবে একটু অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ী ও গবর্ণমেণ্ট-আফিস-গুলি টিনের ও গ্যাল্‌ভানাইজ-করা লোহার পাতের। ষ্টেসনের কাছেই মেরীর মন্দির, অক্টোবর মাসে এই মন্দিরে খুব

বড় মেলা হয়—অনেক দূর থেকে লোক এখানে মেলা দেখতে ও দেবীর কাছে মানত করতে বা মানত শোধ দিতে আসে।

আমাদের ট্রেনের গার্ড হঠাৎ একটা ঘণ্টা বাজিয়ে বল্লে—সব উঠে পড় গাড়ীতে, সময় হয়ে গিয়েছে। আমরা উঠে বসলাম ট্রেনে, ট্রেন ছেড়ে দিলে।

ভিয়াচা ছাড়িয়ে দুধারে পাহাড়—পাহাড়ের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত চাষ হয়েছে—গাছপালা কোথাও নেই, এজন্যে পাহাড়গুলোর কেমন দীনহীন চেহারা—অবশ্য নবীন যবগাছে যখন সানুদেশ ঢেকে দেবে জানুয়ারী মাসে, তখন পাহাড়ের এ চেহারা থাকবে না। নীচের জমিতে গরু, ভেড়া, লামা, গাধা চরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ইণ্ডিয়ানদের গ্রাম।

প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের সাহায্যে বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ানের রচিত বাসগৃহ। খড়ে ছাওয়া চালের নীচে প্রাচীন কালের কারুশিল্পের সুচারু নিদর্শনস্বরূপ প্রস্তরখণ্ড দ্রষ্টব্য।

রেলপথের ধারে ইয়ার্টা কাঠের স্তূপ। এদেশে জ্বালানি-কাঠ একেবারেই নেই, কারণ বলিভিয়ার মালভূমিতে কোনো বড় গাছ জন্মায় না। ইয়ার্টা এক ধরণের ছোট ছোট গাছ, ঝোপ বেঁধে বেড়ে ওঠে। তার সরু সরু ডাল আর শিকড় বলিভিয়ার সর্ব্বত্র জ্বালানি কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মালভূমির উচ্চতম অংশে প্রায় ১৪,০০০ ফিটের ওপরে আর এক রকম শ্যাওলার মত উদ্ভিদ জন্মায়, তাকে স্থানীয় অধিবাসীরা 'টোলা' বলে—এই উদ্ভিদের শুকনো পাতাও জ্বালানির জন্য ব্যবহৃত হয়। ইয়ার্টা ও টোলাগাছ না থাকলে এ দেশে লোকে আগুন জ্বালাতে পারত না।

আয়মারা ইণ্ডিয়ানরা অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ। প্রত্যেক গ্রামে গির্জ্জার চূড়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—পাদ্রীদের এখানে খুব পসার। এদের রান্নাঘর বাড়ীর বাইরে পথের ধারে—প্রত্যেকের বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড মাটীর উনুন পাতা, অনেক সময় দু'তিন ঘর লোকের রান্না একই উনুনে হয়।

এখানে বাঁধানো রাস্তা নেই, পায়ে চলার পথ আছে মাত্র। ইণ্ডিয়ান জাত অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী, যানবাহনের ধার বড় একটা ধারে না, একশো মাইল হেঁটে গিয়ে কোনো একটা কাজ সেরে আবার পরদিন ফিরে আসা

তাদের পক্ষে কিছুই নয়। আয়মারা ইণ্ডিয়ানদের মুখে হাসি দেখা যায় খুব কম, তারা অত্যন্ত গম্ভীর, মুখের ভাব অনেক সময় উদাস ও বিষাদভরা। এদের মধ্যে নৃত্যগীতের প্রচলন নেই, কোনো নতুন বিষয়ে এদের কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ নেই, শুধু ফসল-ক্ষেতে খাটতে জানে। ভারবাহী পশু-মনের মত মনের অবস্থা।

পুরাকালে যেখানে টিয়া-হুয়া-নাকো সহর ছিল, বর্ত্তমানে সেখানে ওই নামের একটা গ্রাম আছে। টিয়া-হুয়া-নাকো নামটিও প্রাচীন সহরের আদি নাম নয়, এমন কি স্পেনীয়গণ যখন বলিভিয়া জয় করে তখনও ও নাম ছিল না। স্পেনের আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার দু'তিনশো বছর পরে নতুন নামকরণ করা হয় সহরের। নামের অর্থ সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ আছে।

টিয়া-হুয়া-নাকো নগরীর ধ্বংসস্তূপের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এখানকার ভাস্কর্য্য, পাথরের উপর

আমেরিকার সুসভ্যতম প্রাচীন জাতির রাজধানী টিয়া-হুয়া-নাকোর একাংশ ঃ তুঙ্কা-পাঙ্কু (দশদুয়ারী)। বিচারাগার হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত বলে মনে হয়।

খোদাইয়ের কাজ, মৃৎপাত্রশিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি থেকে প্রমাণ হয়, বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ানদের অপেক্ষা সভ্যতর জাতি এখানে রাজত্ব ক'রত। আয়মারা ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা এই নগরী স্থাপিত হয়েছিল যাঁরা বলেন, তাঁরা প্রকাণ্ড ভুল করেন। আয়মারা ইণ্ডিয়ান জাতি কুইচোয়া ইণ্ডিয়ানদের শাখা, স্পেনীয়গণের মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে তারা বলিভিয়াতে প্রথমে আসে। পূর্ব্বে এই নগর টিটিকাকা হ্রদের তীরেই অবস্থিত ছিল—এখন হ্রদ প্রায় তেরো মাইল দূরে সরে গিয়েছে।

টিয়া-হুয়া-নাকোর ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে, দুটি বিভিন্ন সভ্যতার ছাপ তার ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যশিল্পে সুস্পষ্ট চিহ্ন রেখে গিয়েছে। প্রথমটির অনেককাল পরে দ্বিতীয় যুগের আবির্ভাব হয়। এক জাতির ধ্বংস-স্তূপের উপর অন্য জাতি নিজেদের নগর প্রতিষ্ঠা করেছিল।

বলিভিয়া ন্যাশনাল মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ডাঃ রোমেরো বলেন, পুরাকালে মধ্য-এশিয়া থেকে মোঙ্গোল জাতির

কোনো শাখা বেরিং প্রণালীর পথে আমেরিকা মহাদেশে এসেছিল, তারাই টিয়া-হুয়া-নাকো সহর স্থাপন করে—এদের সভ্যতা ইউকাতানের মায়া-সভ্যতার সমসাময়িক। এসিয়াবাসী মোঙ্গোলদের সঙ্গে বর্ত্তমান আয়মারা ইণ্ডিয়ানদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণও এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। মোঙ্গোলদের মত এদের চোখ ছোট ও টেরা, গালের হাড় উঁচু, নাক বসা। এদের মুখেও দাড়ি গোঁপ খুব কমই হয়।

টিয়া-হুয়া-নাকো সহরের সংগৃহীত ধ্বংসাবশেষের একটি সুন্দর নিদর্শন।

অনেকের মতে পুরাকালে দক্ষিণ-আমেরিকার চেহারা ছিল অন্য রকম। দক্ষিণ-আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটা প্রকাণ্ড ভূমিভাগ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল -- কালক্রমে এই অংশ সমুদ্রের মধ্যে বসে যায়, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে বর্ত্তমানে যে সকল অসংখ্য ছোট বড় দ্বীপ দেখা যায়—তারা এই অন্তর্হিত মহাদেশের সর্ব্বোচ্চ স্থান—পাহাড়, মালভূমি ইত্যাদি। এই প্রাকৃতিক সেতুপথে এশিয়ার অনেক প্রাচীন জাতি আমেরিকায় এসেছিল এবং বিভিন্ন স্থানে তাদের চিহ্ন সুস্পষ্ট রেখে গিয়েছে। হয় তো মায়া-সভ্যতার সম্বন্ধেও একথা বলা চলে।

"প্রাচীন যুগের একটি দেবমূর্ত্তি এখনও খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, মূর্ত্তির মুখ চোখ নাক কিছুই নেই"···(পরপৃষ্ঠা)।

টিয়া-হুয়া-নাকোর ধ্বংসস্তূপে যে দুটি সভ্যতার ছাপ আছে, তাদের প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি অনেক উন্নত ছিল। দ্বিতীয় সভ্যতার যখন বিস্তারকাল, তখন এখানে লাল বেলে-পাথরের বড় বড় প্রতিমূর্ত্তি তৈরী হয়—গ্রানাইটের অনেক সূক্ষ্ম খোদাই কাজও এই সময়ের। প্রথম যুগের সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের একটা বড় তফাৎ এই যে, প্রথম যুগে যে পাথর শিল্প-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়েছে, আজকাল সে পাথর বলিভিয়ায় কোথাও পাওয়া যায় না; অনেক দূর থেকে সে সব পাথর আনতে হয়েছিল—কিন্তু দ্বিতীয় যুগে ব্যবহৃত পাথর স্থানীয় পাহাড় থেকে কেটে বার করা হয়।

দ্বিতীয় যুগের শেষের দিকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। বহুসংখ্যক স্তম্ভ, মূর্ত্তি, মন্দির আধ-তৈরী অবস্থায় পড়ে আছে—মনে হয় যেন হঠাৎ কোনো রাজনৈতিক বা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটেছিল, যার ফলে শিল্পীরা তাদের হাতের কাজ আর শেষ করতে পারে নি—এসব ফেলে হঠাৎ চলে যেতে বাধ্য হয়। এই ঘটনাটি কি তা আজ জানবার কোনো উপায় নেই—কিন্তু এই রকম যে কিছু একটা ঘটেছিল, তা অনুমান করবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। আর একটা অদ্ভুত

ব্যাপার এই যে, যতগুলো অর্দ্ধসমাপ্ত স্তম্ভ বা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে সবগুলিই ধূসর রংয়ের আর্সেনিক পাথরের।

বর্ত্তমান টিয়া-হুয়া-নাকো গ্রামের পূর্ব্বে অনেকটা জায়গা জুড়ে বড় বড় পাথরে ঘেরা একটা চৌকোণ স্থান আছে। এ যে কত প্রাচীন কালের তা বলা দুষ্কর। যাঁরা ইংলণ্ডে সল্‌স্‌বেরী প্রান্তরের Stonehenge দেখছেন তাঁদের কাছে এ দৃশ্য অপরিচিত মনে হবে না—সেই একই ধরণের খাড়া বিশাল প্রস্তরখণ্ড, ডল্‌মেন্‌ বা বিশাল সমতল পাথরের টেবিল এখানেও বর্ত্তমান।

সম্ভবতঃ এগুলি প্রাচীন কালের রাজা ও বীরগণের সমাধি। যখন ভাস্কর্য্যশিল্প জন্মলাভ করে নি, সে যুগে জাতির বরণীয় ব্যক্তিগণের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখবার জন্যে এ আয়োজন। এটা অবশ্য আমাদের অনুমান মাত্র।

টিটিকাকা হ্রদ : মধ্যস্থ 'সূর্য্যদ্বীপ' ইঙ্কা সভ্যতার জনক মাঙ্কো কাপাকের জন্মভূমি।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে এই ধরণের Stonehenge ও ডল্‌মেন দেখতে পাওয়া গিয়েছে—ডেনমার্ক, জার্ম্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি সব দেশেই। টিয়া-হুয়া-নাকোর Stonehenge অবিকল সেই সব দেশেরই মত।

বলিভিয়ার স্থানীয় অনুসন্ধানকারীগণ ধ্বংসস্তূপের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ইণ্ডিয়ান নাম দিয়েছেন। রেলওয়ে লাইনের কাছে একটা বড় পাহাড়ের নাম 'আকাপানা' অর্থাৎ দুর্গ-পর্ব্বত। পাহাড়টার উচ্চতা প্রায় ১৬৫ ফুট এবং শিখরদেশ টেবিলের মত সমতল। এখানে প্রাচীন কালে বোধ হয় কোনো দুর্গ কিংবা দেবমন্দির ছিল। এই সমতল শিখর দেশের চারকোণে পাথরের পিরামিড আছে। গুপ্ত ধনের সন্ধানে লোকে এখানে অনবরত খুঁড়ে ও পাথরের গাঁথুনি খসিয়ে পিরামিডগুলো নষ্ট করেছে। ইজিপ্টের পিরামিডগুলির সঙ্গে এদের অনেক সাদৃশ্য আছে।

পিরামিডের পাশে যে সব বড় বড় পাথরখণ্ড ছিল, স্থানীয় অধিবাসীরা বাড়ীঘর করবার জন্যে সেগুলি খুলে নিয়ে গিয়েছে। এখন এগুলোকে আর পিরামিড বলে চেনা দুষ্কর। এক সময়ে তলদেশ থেকে উপরে উঠবার সিঁড়ি ছিল, বর্ত্তমানে শুধু সিঁড়ির নীচেকার কয়েকটি ধাপ মাত্র বজায় আছে। একটা পিরামিড থেকে আর একটা

পিরামিডের মধ্যে পাথরে গাঁথা পয়ঃপ্রণালী ছিল, কি উদ্দেশ্যে এই পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হয়েছিল—এখন তা বুঝবার কোনো উপায়ই নেই।

কি জন্যে এই পাহাড়ের উপর এই সব পিরামিড তৈরী হয়েছিল, বা সমতল পর্ব্বতচূড়াতে দুর্গ, মন্দির, কিংবা রাজপ্রাসাদ ছিল, তাও বর্ত্তমানে কিছুই বোঝা যায় না। উত্তর দিকের পয়ঃপ্রণালীর পাশে একস্থানে অনেকগুলি নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে—তা থেকে অনুমান করা যায় যে, সম্ভবতঃ এখানে নরবলি দেওয়া হত।

আকাপান পাহাড়ের উত্তরে, হাজার ফুট নীচে আর একটা স্তূপ আছে—এটির ইণ্ডিয়ান্ নাম কালা-সাসায়া অর্থাৎ সূর্য্য-মন্দির। মন্দিরের কোন বাড়ী ঘর নেই—এটা একটা চতুষ্কোণ স্থান, চারিপাশে বড় বড় পাথর খাড়া করে পোঁতা। আয়তনে সমস্ত স্থানটি প্রায় ৪০০ বর্গ ফুট কিন্তু এই চতুষ্কোণ স্থানটি ভূমিতল থেকে অনেকটা উঁচু—একটা প্রস্তর-বেদীর আকারে গাঁথা, এবং সমস্ত বেদীটা পাথরে বাঁধানো ছিল। দুচারখানা বাদে অধিকাংশ পাথর স্থানীয় লোকে খুলে নিয়ে নিজেদের ঘরবাড়ীতে লাগিয়েছে।

পেরুর এই দেবভূমির একটি প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় মূর্ত্তি। আণ্ডিসে সেরো ডি-পাস্কোর তাম্রখনির নিকটে অবস্থিত। একপাশে একটি লবণ-পর্ব্বত আছে, এমন স্বচ্ছ যে দুই ইঞ্চি পরিমাণ লবণের অন্তরালেও সংবাদ-পত্র রেখে অনায়াসে পড়া যায়।

টিয়া-হুয়া-নাকো: অতীত স্মৃতির রক্ষক। প্রস্তর-স্তম্ভগুলি প্রায় আট ফুট দীর্ঘ, এবং এত প্রশস্ত যে দুই হাতে ধরা চলে না।

বড় বড় পাথরের বেদী প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, এক সময়ে এগুলি স্তম্ভ বা প্রস্তরমূর্ত্তির ভিত্তি ছিল, বর্ত্তমানে স্তম্ভ ভেঙে পড়েছে—প্রস্তরমূর্ত্তি অন্তর্হিত, কেবল বড় একখানা পাথর কেটে তৈরী প্রাচীন যুগের একটি দেবমূর্ত্তি এখনও খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, মূর্ত্তির মুখ, চোখ, নাক কিছুই নেই, কেবল একটি মাত্র কান অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় আছে।

আয়মারা ইণ্ডিয়ানরা টিয়া-হুয়া-নাকো নগরের কিছু রাখে নি, যতদূর নষ্ট করা সম্ভব, তারা তা করেছে। এক সময়ে এখানে বলিভিয়া গবর্ণমেণ্টের সৈন্য-শিবির ছিল, তারা প্রস্তরমূর্ত্তি, মন্দির, ডল্‌মেন প্রভৃতিকে চাঁদমারী স্বরূপ ব্যবহার করে বন্দুক ছুঁড়েছে, যে কোনো উন্নততর দেশ এত বড় প্রাচীন নগরের ধ্বংসস্তূপ জাতীয় সম্পদ হিসেবে সযত্নে রক্ষা করত, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে এতদিন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।

প্রস্তরস্তম্ভগুলি মাটীতে গভীর করে পোঁতা। এমন ভাবে তৈরী যে তারা খুব ভারী পাথরের খিলান কি ছাদের ভার ধারণ করতে সক্ষম। একটা থাম থেকে আর একটার দূরত্ব ১৬ ফুট থেকে ২০ ফুট। ছুটো থামের মধ্যে সোপানশ্রেণী গাঁথা ছিল বেদীতে উঠবার নামবার জন্যে।

সূর্য্যমন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে সুবৃহৎ তোরণদ্বার ছিল—ইণ্ডিয়ানদের ভাষায় এর নাম সূর্য্যতোরণ—এর খানিকটা অংশ এখনও অটুট আছে—এই তোরণ বিরাট, যে সব পাথর দিয়ে এর খিলান গাঁথা হয়েছে, তা এত প্রকাণ্ড যে, সেগুলি স্থানান্তরিত করা স্থানীয় লোকদের সাধ্যাতীত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দশ বৎসর আগে বজ্রপাতে দক্ষিণের খিলান ফেটে গিয়েছে—এটাকে মেরামত করে বজায় রাখবার চেষ্টা চলছে গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে। ১৬ ইঞ্চি পুরু একখণ্ড বিশাল আগ্নেয় প্রস্তর কেটে এর চৌকাঠ তৈরী; দরজার চৌকাঠ থেকে খিলানের উচ্চতা ২৫ ফুট।

হেরাড়ুরা বেলাভূমি: বর্ত্তমান পেরু-সরকারের গ্রীষ্মাবাস।

পাথরের চৌকাঠে সাপ, অদ্ভুতমূর্ত্তি দেবদেবী, গাছপালা খোদাই করা। দরজার দুপাশে ২॥০ ফুট উঁচু ও ৪ ইঞ্চি গভীর কুলুঙ্গি। সম্ভবতঃ এগুলিতে দেবমূর্ত্তি বসানো থাকত। খিলানের উপরে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি খোদা, মূর্ত্তির মাথার চারিপাশে জ্যোতিচ্ছটা, একপাশে জাওয়ারের মূর্ত্তি, একধারে চন্দ্রদেব। টিয়া-হুয়া-নাকো নগরের অনেক স্থানেই পাথরে খোদা জাওয়ারের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে—সম্ভবতঃ এটি প্রাচীন দিনের কোনো দেবতার মূর্ত্তি।

সূর্য্যদেবের হাতে রাজদণ্ড। তাঁর দুপাশে আটচল্লিশটি বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি, চব্বিশটা করে মূর্ত্তি এক এক পাশে। এই চব্বিশটা মূর্ত্তি তিন থাকে খোদা, আটটা করে এক এক থাকে। এদের মুখ সূর্য্যদেবের দিকে ফেরানো, শুধু ফেরানো নয়, এরা যেন দৌড়ে ছুটে চলেছে সূর্য্যদেবের দিকে। প্রাচীন শিল্পিরা অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সঙ্গে এদের এই গতির ছন্দ পাথরে ফুটিয়ে তুলেছে। এদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা রাজদণ্ড। পাখা আছে, সকলেরই মুখ কণ্ডর্ পাখীর মত, (আণ্ডিজ পর্ব্বত মালার সর্ব্বোচ্চ অংশে এই সুবৃহৎ ঈগল জাতীয় পাখী বাসা বাঁধে) এবং সকলের মুখে ক্রোধের ভাব।

সূর্য্যমন্দিরের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে আরও অনেক ধ্বংসস্তূপ বর্ত্তমান।

একস্থানে একটা প্রস্তরবেদী, বোধ হয় বলিদান কার্য্যে ব্যবহৃত হত—তার মাঝখানে মাথা ও ঘাড় রাখবার জন্যে খাঁজ কাটা। বেদীতল থেকে খাঁজের উচ্চতাদৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, প্রধানতঃ মেষ বা লামাশিশু বলির প্রথা প্রচলিত ছিল। সূর্য্যমন্দিরে সম্ভবতঃ নরবলির প্রথা ছিল না।

সূর্য্যমন্দিরের দরজা পর্য্যন্ত চাষ চলেছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে খোদাই-করা প্রস্তরখণ্ড তুলে অজ্ঞ অধিবাসীরা ক্ষেতের বেড়া দিয়েছে বা নিজেদের দীনহীন কুটীরের দরজা করেছে। স্পেনীয়গণ গাড়ী বোঝাই দিয়ে পাথর নিয়ে গিয়ে গির্জ্জা বানিয়েছে—মোটের উপর একটা সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন যত রকমে নষ্ট করা সম্ভব, তা এরা করেছে। টিয়া-হুয়া-নাকোর শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে যেত এতদিন, যদি বলিভিয়া গবর্ণমেণ্ট মিউজিয়ামের ডাঃ রোমেরোর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট না হত।

যে গৌরবময় যুগে এই বিরাট সভ্যতা জন্মলাভ করেছিল, সে গৌরব বলিভিয়া থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। সেই প্রাচীন সভ্যজাতিরই বর্ত্তমান বংশধর এই অজ্ঞ, অশিক্ষিত, অলস, দরিদ্র আয়মারা ইণ্ডিয়ানরা। এরা অতীতের সকল সম্পদই হারিয়েছে, যে দিকে চোখ যায়, পাহাড়ের গায়, সমতল ভূমিতে তাদের যবের খড়ে ছাওয়া কুশ্রী কুটীর, সে কুটীরে জানালা নেই, আলো বাতাস খেলে না—একটি মাত্র বড় ঘরে মানুষ, পশু একত্রে বাস করে।

যাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই বিশাল শিলাবেদী, মূর্ত্তি, সূর্য্যমন্দির গড়েছিল, তারা আজ নিজেদের বাসের কুটীরও ভাল করে তৈরী করতে পারে না।

একটা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, টিয়া-হুয়া-নাকোর ধ্বংসস্তূপে যত মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়েছে—তার মধ্যে অধিকাংশ পাত্রের গায়ে স্বস্তিক চিহ্ন দেখা যায়। পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের পক্ষে এটা গভীরভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা করার ব্যাপার। অত প্রাচীনকালে দক্ষিণ আমেরিকায় স্বস্তিক চিহ্নের প্রথা কোথা থেকে এসেছিল!

ধ্বংসস্তূপ থেকে ১৩ মাইল দূরে বিখ্যাত টিটিকাকা হ্রদ। পৃথিবীর মধ্যে এত উঁচু জায়গায় অবস্থিত আর কোন হ্রদ নেই। টিটিকাকা হ্রদের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। শান্ত, নিস্তরঙ্গ। বিশাল হ্রদের জলের রং কোবাল্টের মত। হ্রদের মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ। এই রকম একটা দ্বীপে ইঙ্কা সম্রাটের স্থাপিত সূর্য্য ও চন্দ্রদেবের মন্দির আছে। কিন্তু সে সব অনেক পরের ব্যাপার। টিয়া-হুয়া-নাকো নগরের মত অত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দক্ষিণ-আমেরিকায় কোথাও নেই।

বেলজিয়ামের খালপথে

মিঃ মেল্‌ভিল্ চেটারের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করা গেল :—

প্যারিসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। ছোট একটা ডোঙা কিনে রওনা হওয়া গেল বেলজিয়মের প্রায় ২০০ মাইল বিস্তৃত খালপথে বেড়াব বলে। এখানে ওখানে প্রায় সর্ব্বত্রই এখনও বিগত মহাযুদ্ধের চিহ্ন বর্ত্তমান—শেলের গর্ত্ত, দগ্ধ বৃক্ষকাণ্ড, ভাঙা গির্জ্জা। অবশেষে যখন বহু বিস্তৃত বিটপালংএর ক্ষেত দেখা গেল—তখন বুঝলাম বেলজিয়মে পৌঁছে গিয়েছি।

ব্র্যাকেন (BRACKEN) : এই ফার্ণ মানুষ এবং পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ব্রুজেস্-এ সেদিন কি একটা উৎসব। অতিকষ্টে বেল্-ফ্রাই স্কোয়ারের একটা হোটেলে দোতলায় একটা ঘর ভাড়া পাওয়া গেল, নইলে যে রকম ভিড়, বাইরে রাত কাটাতে হত। কারণ, আমাদের ডোঙা এত ছোট, তাতে একজনেরই শোবার জায়গা হয় না।

খাল দিয়ে ফুল ও কাগজের আলোকিত রঙীন লণ্ঠন ঝোলানো বড় বড় বজরা যাচ্ছে। বজরাতে নানারকম ঐতিহাসিক দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে। কোনখানার ওপরে বিরাট রাজসভাতে ডিউক ফিলিপ পাত্রমিত্রপরিবৃত হয়ে বসে। আর একখানায় হ্যান্‌সিয়াটিক লিগের কর্ত্তৃপক্ষগণ জোর করে তাঁদের নাগরিক সম্মানের দাবী করছেন। ঐ যে ওখানাতে মেরি অব্ বার্গাণ্ডি ও ব্যাভেরিয়ার ডিউক্ পাশাপাশি কৌচে শুয়ে আছেন—তাঁদের মধ্যে একখানা উন্মুক্ত তরবারি, কারণ, আর্কডিউক ম্যাক্সিমিলিয়ানের পক্ষ থেকে ব্যাভেরিয়ায় ডিউক প্রতিনিধিস্বরূপ বিবাহ করতে গিয়েছিলেন মেরীকে এবং বিবাহ করে নববধূ নিয়ে তিনি ম্যাক্সিমিলিয়ানকে পৌঁছে দিতে চলেছেন।

মরুভূমির ফার্ণ : উত্তাপাধিক্যে ইহার পাতাগুলি অধিকাংশ সময়ে কুঁকড়াইয়া থাকে। বর্ষাগমে দল মেলিলে এই ফটো তোলা হইয়াছে।

পরদিন বেলজিয়মের খালে আমাদের ডোঙা দেখে লোকে তো অবাক্। একজন জিগ্যেস্ করলে, ও জিনিষটা কি ? ওটা দিয়ে কি করবে তোমরা ?

—ওটা ডোঙা। আমরা বেলজিয়ম পার হব ওতে করে।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। ভাবলে ঠাট্টা করছি। একজন একখানা ম্যাপে কি মাপজোঁক করে বললে—সে কতখানি পথ তোমাদের ধারণা আছে ? প্রায় তিন শো কিলোমিটার—

আমরা গম্ভীর মুখে বললাম—আমরা জানি।

দুপুরের পরে ঘেণ্ট অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। খাল বেঁকে বেঁকে গিয়েচে, কেবলই বেঁকেছে, কেবলই বেঁকেছে। সারা বিকেল ধরে সেই বাঁকা খাল বেয়ে ডোঙা বাইলাম দুজনে। সন্ধ্যা হয়, এখনও ঘেণ্ট সহরের আলো কৈ? আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে এল। এমন সময়ে আমার বন্ধু চীৎকার করে উঠল—ঐ যে সহরের আলো।

যাক্, এসে পড়েছি তা হলে। নেমে হোটেলের সন্ধানে ব্যাপৃত হলাম। বন্ধু বললে, প্রায় ত্রিশ মাইল পথ দাঁড় বেয়ে এসেছি, কি বল? হঠাৎ আমাদের দুজনেরই কথা বন্ধ হয়ে গেল। একটা বড় স্কোয়ারে ঢুকে চারধারে আমরা সন্দিগ্ধ চোখে চাইতে লাগলাম। একজন লোককে জিগ্যেস্ করলাম—এটা ঘেণ্ট তো?

ব্রুজেস্ঃ ইউরোপে ইহার নাম, উত্তর-ভিনিস। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ব্রুজেস্ ব্যবসায় জগতের নামকরা বাজার ছিল—এই সময়ে ইহার সমুদ্রে-যাতায়াতের পথ মাটি জমিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

সে বললে—ব্রুজেস।

আমরা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, এটা ঘেণ্টই। সে বললে, ব্রুজেসে সে জন্মেছে, তার কি ভুল হবার যো আছে?

কি সর্ব্বনাশ! আমরা সারা বিকেল আর এই ঘণ্টা-খানেক রাত পর্য্যন্ত ব্রুজেস্ সহরের চারধারে যে খাল আছে, তাতেই দাঁড় বেয়ে মরেছি নিরর্থক। আবার এসে পড়েছি ঠিক বেলফ্রাই স্কোয়ারে, আমাদের বাসার ঠিক সাম্‌নে।

পরদিন আবার ঘেণ্ট রওনা। এক জায়গায় খালের দুটো শাখা দুদিকে গিয়েছে—ডাঙায় একজন বৃদ্ধা বসেছিল, তাকে বললাম—কোন্ পথে ঘেণ্ট যাব?

কোনও উত্তর নেই।

কাছে এসে দেখলাম সেটা একটা পাথরের মূর্ত্তি। জনৈক স্থানীয় অধিবাসী বললে, ও হল জুল্‌সের মা। ১৯১৪ সালে ওর ছেলে যুদ্ধে যখন গেল, ও বললে, বাবা, তুমি যখন ফিরে আসবে, আমি জানালায় দাঁড়িয়ে থাকব তোমাকে এগিয়ে নেবার জন্যে। কিছুদিন পরে যুদ্ধক্ষেত্র

বেলজিয়ামের একমাত্র বন্দর আণ্টোয়ার্প—সমুদ্র হইতে ৫৫ মাইল দূরে।

থেকে খবর এল জুল্‌স্‌-এর কোন পাত্তা নেই। মা কিন্তু বিশ্বাস করলে না। তারপর খুব অসুখ হল জুল্‌স্‌-এর মায়ের। বিছানা থেকে উঠতে পারে না—তখন ওই পাথরের মূর্ত্তি তৈরী করিয়ে ওই খানে বসিয়ে রেখে দিলে, যদি ইতিমধ্যে ছেলে ফিরে আসে, এবং ছেলের সঙ্গে কথা ঠিক না থাকে।

এখন জুল্‌স্‌-এর মা মারা গিয়েছে। এবং জুল্‌স্‌-এর কোন পাত্তা এখনও পাওয়া যায় নি, সুতরাং তার মায়ের মূর্ত্তি ওই খালের ধারে বসে এখনও লিজ্‌-এর দিকে চেয়ে আছে।

বেলজিয়ামের খালে নৌকার উপর মাঝিরা কাপড় শুখাইতেছে।

কেউ জানে না এই মা-টির কথা,—এই স্নেহান্ধ, অবুঝ পল্লীগ্রামের মা, ছেলের সঙ্গে কথা ঠিক রাখবার জন্যে মৃত্যুর পরও যিনি পুত্রের আগমন-প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছেন।

ঘেণ্ট সহরে পৌছে আমরা রয়েল-ক্লাবে আমাদের ডোঙা রেখে একটা হোটেলের সন্ধানে গেলাম।

একটা বহু পুরানো ধরণের বাড়ীর সামনে বসে লোকে দাড়ি কামাচ্ছে, কফি খাচ্ছে, গল্পগুজব করছে দেখে ঠিক করা গেল এটা ঠিক একটা হোটেল হবে।

একজনকে জিগ্যেস্‌ করলাম, এ সরাইটা অনেক পুরানো, কি বলেন? সে বললে—খুব পুরানো আর এমন কি? ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাড়ীটা কোনো বড়-লোকের বাড়ী ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে আল্‌ব্রেক্ট্‌ ড্যুরার এখানে grocer's guild প্রতিষ্ঠিত করেন এই বাড়ীতেই। তারও পরে এটা সরাই হয়েছে—সুতরাং খুব পুরানো কেমন করে বলি?

এখানকার লোক বোধ হয় খুব ভোজনবিলাসী। রাস্তা, স্কোয়ার, গলিঘুঁজির নাম—মাছ, মাখন, মুরগী, পেঁয়াজের অর্থসূচক। যেমন একটা রাস্তার নাম 'হারানো রুটীর রাস্তা'। এই জন্যেই বোধ হয় ফ্লেমিশ্‌ চিত্রকরদের হাতে ভোজন-টেবিলের অত চমৎকার বাস্তব চিত্র ফুটেছে।

বেলজিয়ামের পল্লীদৃশ্য: মনে হয় একটি ছবি।

ঘেণ্ট সহরে অনেক প্রসিদ্ধ লোক জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। এঁদের মধ্যে এক জনের নাম সর্ব্বাগ্রে করা দরকার। ইনি অলিভার মিন্‌জাউ, সেণ্ট নিকোলাস গির্জ্জার প্রস্তরলিপি পাঠে জানা যায় এঁর ছিল সর্ব্বশুদ্ধ একত্রিশটি সন্তান। একবার পঞ্চম চার্লস এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁর সাম্‌নে দিয়ে একুশটি মিন্‌জাউ বালক কাওয়াজ করে চলে যাবার পর তাঁকে বলা হল, এগুলি সমস্ত ছেলেমেয়ের মাত্র ⅔ অংশ, তখন পঞ্চম চার্ল্‌স্‌ গাড়ী থামাতে আদেশ দিয়ে অবাক্‌ হয়ে চেয়ে রইলেন তাদের দিকে।

ঘেণ্ট সহর দেখলে মনে হবে এখনও আমরা ষোড়শ শতাব্দীতে আছি। সেই রকম পাথরবাঁধানো রাস্তা ঘণ্টা-ঝোলানো বড় বড় গির্জ্জা, বিচিত্র রংএর পোষাক পরা নরনারী। বিখ্যাত চিত্রকর ফ্রান্‌স্‌ হান্‌স্‌-এর মডেল যেন চারি-দিকে ছড়ানো।

তারপর আমরা চললাম আণ্টোয়ার্পের দিকে। পথে পথে লাল টালি ছাওয়া জেলেদের বাড়ী, চিমনি, বিচালির গাদা, গাজরের ক্ষেত, ছোটখাটো কারখানা। আণ্টোয়ার্প প্রকাণ্ড সহর। ইউরোপের মধ্যে বড় একটা হীরা কাটা ব্যবসায়ের কেন্দ্র। এখানকার বড় বড় আর্ট-গ্যালারিগুলো ঘুরে দেখতেই দশ বারোদিন কেটে যাবে। আপাততঃ আমরা এখানেই কিছুদিন থাকব।

ব্রূসেল্‌সের খাল: দূরে বাষ্পচালিত নৌকাকে ঢেউ হইতে বাঁচাইবার জন্য ডোঙ্গা কূলে ভিড়ানো হইয়াছে।

নৌকার মাঝিদের রবিবার

যখন আমরা উইলব্রূক সহরের কাছাকাছি গিয়েছি, তখন মনে হল যেন সহরের সমস্ত লোক খালের ধারে জুটেছে কি একটা উৎসবে। বজরা বাঁধবার জায়গায় বড় বড় নৌকা ও বজরার ভিড়, তাদের মাস্তলে রঙীন লণ্ঠন ঝুলছে, চারিদিকে লোকজনের কলরব, গান বাজনার শব্দ, খালের ধারে পথের উপর ছেলে বুড়ো সবাই নাচছে, সকলেরই পরনে রঙীন পোষাক।

ব্যাপার কি? শোনা গেল, আজ নৌকার মাঝিদের ছুটীর দিন। তাই এই রকম। আজ খালে কাজকর্ম্ম বন্ধ, আজ খালের ধারে জুটে সবাই আমোদ-প্রমোদ করে—অর্থাৎ কিনা আজ রবিবার।

বেলজিয়ামের ধীবর: মনে হয় কোনও খ্যাত শিল্পী অঙ্কিত একটি প্রতিকৃতি।

বেলজিয়ামের অনেক শহরেই এই 'বেগুইনি' (beguine) আশ্রম-চারিণীদের দেখা যাইবে। আর্ত্তের কল্যাণকল্পে ইঁহারা জীবন নিয়োগ করিয়াছেন। আজীবন কুমারী থাকিয়া ইঁহারা দেশের মঙ্গল-ব্রতে জীবন-যাপন করিতেছেন—সংখ্যায় ইঁহারা প্রায় ৬০০।

উইলব্রূক সহরের দোতালা তেতালা ঘরগুলো একেবারে অন্ধকার—সেখানে আজ জনপ্রাণী নেই। বারো হাজার নরনারী রাজপথের উপর উৎসবমত্ত।

সহরটা খুব এমন বড় কিছু নয়, তবে অনেক কল-কারখানা আছে। এই সব কারখানার মেয়ে-মজুরেরা খালের মাঝিদের সঙ্গে আজ নেচে বেড়ায়। রাস্তার ধারে ধারে খাবারের দোকান—নাচতে নাচতে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত তরুণ-তরুণীরা সেখানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আর খাবারওয়ালী তার উনুনের ওপর চাপানো কড়া থেকে গরম আলুর তরকারী

ও আলুভাজা কাঠের প্লেটে করে তাদের খেতে দিচ্ছে, খেয়ে গিয়ে আবার অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে তারা নাচছে। আবার খেতে আসছে, আবার নাচবার জন্যে ফিরে যাচ্ছে, এই রকম চলবে দুপুর রাত পর্য্যন্ত। কোথাও বাজি পুড়ছে, কোথাও বক্সিং হচ্ছে, কোথাও ছোট-খাট তাঁবুতে ম্যাজিক দেখানো হচ্ছে। আজ এই উৎসবের জন্যে কত জায়গা থেকে ফর্সা পোষাক পরে ও গলায় রুমাল বেঁধে মাঝিমাল্লার দল এসেছে। আজকার এই রাতটিই তাদের রাত, সপ্তাহে এই একটিবার এ রাত আসে।

ব্রুসেল্‌স্ : ওপারে পার্লামেন্টের বাড়ী। এপার হইতে ছেলেরা কাগজের নৌকা ভাসাইতেছে!

কাল ওরা আবার কতদূর চলে যাবে, কেউ যাবে আণ্টোয়ার্প, কেউ রাইন নদীতে যাবে, কেউ ব্রুজেস্‌এ যাবে। আর ওদের মুখে রং মাখানো নৃত্য-সঙ্গিনীরা কাল সকালে সারি বেঁধে বিরাট কাগজের কলের ফটক দিয়ে পিল পিল করে ঢুকতে সুরু করবে। আবার এক সপ্তাহ নীরস কর্ম্মক্লান্ত জীবন যাপন, আজকার রাতের প্রেমিকের প্রেম-গুঞ্জনের মধুময় স্মৃতি এই এক সপ্তাহ তাদের মনে বল যোগাবে, আশা ও উৎসাহ এনে দেবে, রবিবার তো আবার এল বলে!
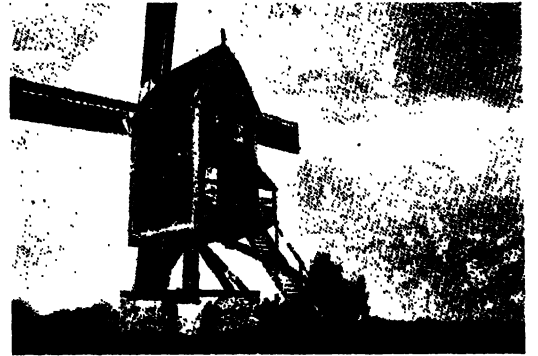
বেলজিয়ামের এখানে ওখানে আজও এই মধ্যযুগের অতি পরিচিত বাতাস চালিত জাঁতা-কল দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বেলজিয়ামের পথে এইরূপ আলাপরত বৃদ্ধাদের প্রায়ই দেখা যায়।

ওই যে লোকটি সোনালী পাড় বসানো টুপি পরে একা দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে। ও নাচছে না কেন এ প্রশ্ন উঠতে পারে বটে কিন্তু ওর নাচবার যো নেই, ও হল পুলিসের পাহারাওয়ালা। তা ছাড়া সহরের কেউ বাদ নেই, শিশু থেকে শিশুর পিতামহ সবাই আছে।

লুভেন

মহাযুদ্ধের গোলার আগুনে যে লুভেন সহর পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল, এ সে লুভেন নয়। বর্ত্তমান লুভেন সহর নূতন তৈরী হয়েছে যুদ্ধের পরে। অনেকটা আমেরিকার প্রভাব এসে পড়েছে বর্ত্তমান লুভেনের উপরে।

বেলজিয়াম : কয়লার খনির নারী-শ্রমিক।

লুভেনের পার্কে দু একটা জার্ম্মান কামান এখনও পড়ে আছে। এখন তার উপরে উঠে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করে। যেন কোন্ বিস্মৃত প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জন্তুর মৃতদেহ।

লুভেনের পর থেকে ছোট ছোট পাহাড় পড়ল। দুটো ছোট পাহাড়ের মধ্যে ঝিরঝিরে ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে—তৃণাবৃত প্রান্তর। ম্যাপে কিন্তু দেখা গেল নদী নয়, এসব

সান্ধ্যভোজনের আয়োজন : বেলজিয়ানরা অত্যন্ত ভোজন-বিলাসী।

দুগ্ধবিক্রয়কারিণী বেলজিয়ান দুহিতা।

খাল। কিন্তু কাটাখালের কৃত্রিমতা এখানে অন্তর্হিত হয়েছে, চারিপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য এত সুন্দর।

বিবাহার্থী তরুণ-তরুণীর পিকনিক

এক জায়গায় মদের দোকানের গায়ে বিজ্ঞাপন দেখলাম—

"যে সব অবিবাহিত যুবক বিবাহ না করার জন্যে এখন মনে মনে অনুতপ্ত, তাঁরা জেনে রাখুন যে, আগামী রবিবার ইৎরএর অবিবাহিত যুবকসম্প্রদায় রঁ ফিয়ের অবিবাহিতা তরুণীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার জন্যে

তাঁদের একটা উৎসবে আহ্বান করেছেন। সেখানে নৌকা বেড়ানো ও খাওয়াদাওয়া হবে। টিকিটের দাম পনেরো ফ্রাঁ। যদি এই রবিবারে উপযুক্ত পাত্রী না মেলে, তার পরের রবিবারে র‍ঁফিয়ের তরুণীগণ ইংর্এর যুবকদের জন্যে আর একটা পিকনিকের আয়োজন করবেন।

সাবধান! এ সুযোগ কেউ হেলায় হারাবেন না।"

জিজ্ঞাসা করে জানা গেল এটি একটি ঘটকসঙ্ঘের বিজ্ঞাপন। এদেশে এ ভাবে সবাই একত্র হয়, কেউ কোন দোষ ধরে না এবং এই বনভোজনের উৎসবের মধ্য দিয়ে অনেক তরুণ যুবক তার মনের মত পত্নীকে খুঁজে পেয়েছে— তাদের বিবাহিত জীবন সুখেরও হয়েছে।

মজা এই যে, বিবাহের বিজ্ঞাপনের পাশে একটা মৎস্য-শিকার প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপনও মারা আছে। অর্থাৎ রবিবার খালের জলে কে কতগুলো মাছ ছিপে গাঁথতে পারে তারই পরীক্ষা।

গ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা এই দুইটি বিজ্ঞাপন পাশাপাশি দেখে বিরক্তমুখে বলে, হুঁঃ বিয়ের পিকনিক আর মাছ ধরা, ও দুইই সমান। তুমি জানই না তোমার বঁশিতে কি গেঁথে উঠবে। অন্ধকারে ঢিল ফেলা আর কি?

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবারও নয়।

বরফের রাজ্য (ফিনল্যাণ্ড)

ফিনল্যাণ্ডের নাম আমাদের দেশে নিতান্ত অপরিচিত নয়—হেলসিংফোর্স সেখানকার রাজধানী। জানুয়ারী মাসে যদি কেউ সেখানে যায়—গিয়ে দেখবে সমস্ত সহরটা সাদা বরফে আবৃত, মাথার ওপর ধূসর আকাশ যেন
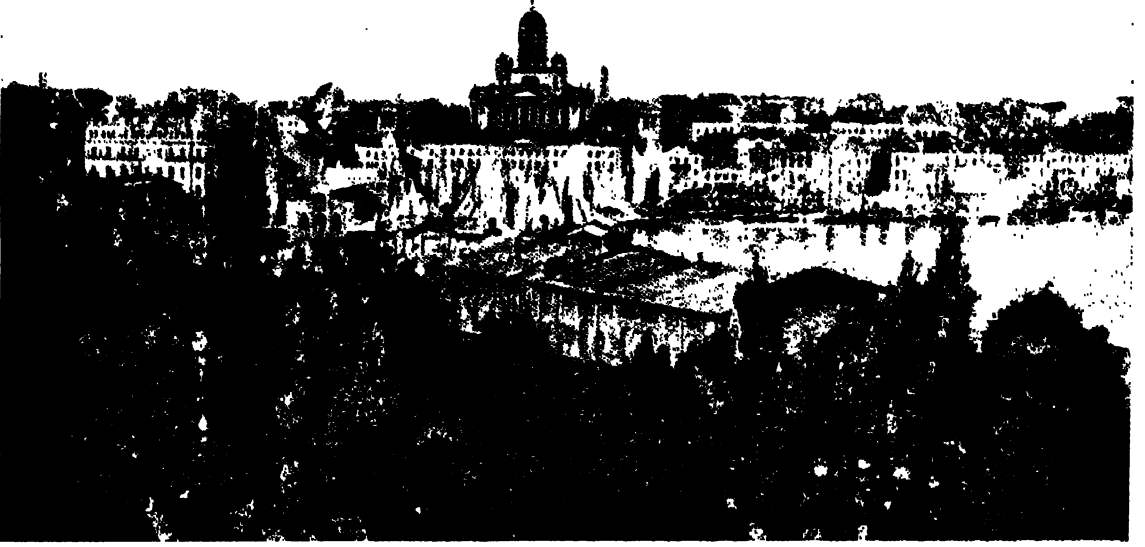
হেলসিংফোর্স: সুউচ্চ এম্পারার নিকোলস চার্চ্চের চূড়া দেখা যাইতেছে। দূরে আবছা চূড়াটিও একটি গির্জ্জার।

ঝুলে পড়ছে—সমস্ত দিনই অন্ধকারে ঢাকা।

সূর্য্যদেব ওঠেন বেলা ন'টার সময়ে। অস্ত যান তিনটের কাছাকাছি। কয়েকঘণ্টা মাত্র দিনের আলো যা থাকে, তাও মেঘে ঢাকা। সুতরাং আফিসে, ইস্কুলে, বাড়ীতে, কারখানায় সর্ব্বত্র দিনরাত বৈদ্যুতিক আলো জলে।

হেলসিংফোস: ব্রোঞ্জনির্ম্মিত মূর্ত্তিটি রাজধানীর অন্যতম দ্রষ্টব্য সামগ্রী।

শীতকালে ফিনল্যাণ্ড অতি ভয়ানক স্থান। বাইরের লোক গিয়ে টিকতে পারে না, ওখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা ঘোরতর শীতে অতি কষ্টে দিন কাটায়। ডিসেম্বর মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ওদের দেশে শীতকাল, জানুয়ারী মাসের প্রথমে হেলসিংফোর্সের সাম্‌নের সমুদ্র জমে যায়, রাস্তাঘাটে বড় একটা লোকজন দেখা

যায় না, আফিসে ইস্কুলে দরজা জানালা বন্ধ করে আলো জ্বেলে কাজ হয়—সমস্ত সহরটা যেন ঘুমুচ্ছে।

ফিনল্যাণ্ড সুন্দরী : বাম পার্শ্বের ছবিটি পাহাড়ী নারীর, ডাহিনের জন দ্বীপবাসিনী। ফিনল্যাণ্ডের মেয়েরা উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ খুব পছন্দ করে।

তবুও হেলসিংফোর্সের ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে ওখানকার শীত খুব বেশী নয়। তবে তুষারপাত যথেষ্ট হয়, বিশেষ করে বছরের প্রথম তিন মাস।

হেলসিংফোর্সে আইন আছে শীতকালে প্রত্যেক বাড়ীর সাম্‌নে থেকে বরফ সরিয়ে ফেলতে হবে—তা তারা নিজেই করুক, বা সহরে এ কাজের জন্য যে ব্যবসায়ী কোম্পানী আছে, তাদের হাতেই ছেড়ে দিক।

এই বিষয়ে বড় একটা আইন ভঙ্গ কেউ করে না। তুষার-পাতের এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায়ই দেখা যায়, প্রত্যেক রাস্তায় কোদাল হাতে কুলীমজুরের দল বরফ সরিয়ে ফেলছে। গাড়ী করে এই সব বরফরাশি হেলসিং-ফোর্সের বন্দরে সমুদ্রের ধারে জমা হয়।

লাপল্যাণ্ডের দক্ষিণে বোথনিয়া উপসাগরের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে জঙ্গল ও জলাভূমির দেশের দুইটি মেয়ে।

শীতের দিন রবিবারে সবাই 'শি' (ski) পরে সহরের রাস্তায় বা সমুদ্রের ওপর চলাফেরা করে। সপ্তাহের মধ্যে এই দিনটিতে শীতকালে যা কিছু সজীবতা দেখা যায়।

হেলসিংফোর্সের বন্দরের বাইরে নিকটে ও দূরে ছোট-বড় অনেক দ্বীপ আছে—এই সব দ্বীপে অনেক লোক বেড়াতে যায় রবিবারের দিনে। কেউ একা যায়—কখনো বা দলবদ্ধ হয়ে যায়—মেয়েরা জমকালো রঙীন পোষাকে ও তরুণেরা বেশ ফিট্‌ফাট হয়ে, পায়ে 'শি' এঁটে পর-স্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে।

শীতকালে বরফের উপর নানারকম মেলা ও আমোদ-প্রমোদ হয়—তার মধ্যে 'শি' পায়ে এঁটে হাঁটা বা দৌড়ানোর প্রতিযোগিতা একটা প্রধান খেলা। 'শি' জিনিসটা দুটো কাঠের দীর্ঘ নাগরা জুতোর মত। 'শি' পায়ে দিয়ে মসৃণ বরফের উপর খুব তাড়াতাড়ি হাঁটা যায়,

দৌড়ানো যায়—তবে এ সমস্তই অভ্যাসসাপেক্ষ। অনেক দিন ধরে অভ্যাস না করলে 'শি' পায়ে দিয়ে হাঁটতে গেলে বিপদও আছে।

এ ছাড়া বরফের ওপর স্কেটিং ও মোটরগাড়ীর রেসও হয়। এসব খেলায় বিপদও কম নয়—বিশেষ করে শীতকালের শেষের দিকে যখন বরফ গল্‌তে সুরু করে। রবিবারে নাচ-ঘর, থিয়েটার ও সিনেমাতে খুব ভিড় হয়, হোটেল রেঁস্তরা ভর্ত্তি থাকে।

এই গেল শীতকালের কথা।

হঠাৎ শীত কেটে যায়, বসন্ত পড়ে, গ্রীষ্ম আসে। এই পরিবর্ত্তন এখানে যেমন আকস্মিক, তেমনই বিস্ময়কর। বসন্ত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রূপ রাতারাতি বদলে যায়—হঠাৎ গাছে নতুন কচিপাতা গজায়, বরফের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ ঘাস চোখে পড়ে। পার্কে নানা ধরণের ফুল ফোটে, লোকে 'শি' ছেড়ে দিয়ে সাইকেলে চেপে কর্ম্মস্থানে যায়।

ফিনল্যাণ্ডের গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়—আমাদের দেশের বর্ষাকালের মত—গ্রীষ্মকালে গরমে আই-ঢাই করতে হয় না, এ সব দেশের তুলনায় খুব শীত। রাত্রি বলে কোন জিনিস নেই, সূর্য্য অস্ত যায় না গ্রীষ্মকালে। অল্প-দিন স্থায়ী বলেই গ্রীষ্মের দিনগুলো সবাই খেলাধূলো, আমোদ-প্রমোদে কাটায়।

হেলসিংফোর্সের অদূরে সমুদ্রবক্ষে ছোট বড় দ্বীপগুলিতে সহরের ধনী ও সচ্ছল মধ্যবিত্ত লোকদের অনেক বাগানবাড়ী আছে—সাধারণ লোকের আমোদ-প্রমোদের জন্যেও অনেক ব্যবস্থা আছে। গ্রীষ্মকালে সহর থেকে অধিকাংশ লোক সকালে উঠে ষ্টীমারে এই সব দ্বীপে গিয়ে সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা সহরে ফেরে। সচ্ছল অবস্থার লোকে এ কয় মাস ওই সব দ্বীপের বাগানবাড়ীতে কাটায়।

ইংলণ্ডের পল্লী

জন্ ম্যাক্ উইলিয়াম্স্ একজন তরুণ আমেরিকান—তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ও ভবঘুরের জীবন আস্বাদ করবার আনন্দে সম্প্রতি ইংলণ্ডের পল্লী-অঞ্চল ভ্রমণ করেন। এঁর হাতে অর্থ ছিল না। পথে কাজকর্ম্ম করে অর্থ সংগ্রহ করতেন। এই তরুণ ভবঘুরে-ভ্রমণকারীর লেখার মধ্যে আমরা ইংলণ্ডের পল্লীজীবনের একটা চমৎকার ছবি পাই :

ওয়েল্স্ : পার্ব্বত্য অঞ্চলে নির্জ্জন কুটীর।

—রাত দুপুর। ব্লুম্স্বেরির পথঘাট জনশূন্য, আমি আমার বাসা থেকে বার হয়ে হাইড্ পার্ক কর্ণারে একটা কফির দোকানে একদল লোকের সঙ্গে মিশে কফি খেলাম।

কফি-পানের সময় দলের সকলকেই একবার ভাল ক'রে দেখে নিলাম। আমার পাশে একজন দীর্ঘাকৃতি লোক, বোধ হয় সে সৈন্যদল কাজ করত, তারই সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা সুরু হ'ল।

সে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি ইংরেজ নও বোধ হয়—না?

আমি বললাম—না। কেন?

—তুমি আস্তে আস্তে কথা বলছ, তাই থেকে মনে হচ্ছে। তুমি আইরিশ না স্কচ্?

—আমি আমেরিকান।

—আমেরিকান! ডলারের দেশ থেকে আসছ?

—আসছি বটে, কিন্তু আমি নিজে প্রায় নিঃসম্বল। আমি পায়ে হেঁটে ইংলণ্ড, ওয়েল্স্ ও স্কট্ল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র বেড়াব স্থির করেছি। পথে কাজ খুঁজে নেব অর্থ উপার্জ্জন করবার জন্যে।

—কাজ কোথায় পাবে? ইংলণ্ডের লোকই কত বসে আছে কাজের অভাবে।

—দেখাই যাক, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। শোন, আজ সারা রাত লণ্ডন সহরটা হেঁটে বেড়িয়ে দেখব। এস না আমার সঙ্গে?

—সে বেশ হবে—আমার কোন আপত্তি নেই।

ওয়েল্স্ : চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ কনওয়ে কাস্ল (Conway castle)।

কফি-পান শেষ করে দু'জনে হাঁটতে সুরু করি। টেম্সের ধারে এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট প্রায় জনশূন্য, দু একজন পুলিশম্যান্ কেবল এখানে ওখানে ঘুরছে, একস্থানে একটী স্ত্রীলোক পথের ধারে ঘুমুচ্ছে। লণ্ডনের নৈশ জীবন বড় বিচিত্র, কত অসহায় গৃহহারা হতভাগ্য লোক যে রাত্রে পার্কের বেঞ্চিতে, পথের ধারে এভাবে শীতের রাত্রি যাপন করে!

ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজের কাছে একজন লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে কাছে এল। একটু ইতস্ততঃ করে বললে—একটা সিগারেট আছে কি ?

আমি বাক্স থেকে একটা সিগারেট বার করে তাকে দিলাম।

লোকটা বললে—বড্ড বাতের বেদনায় ভুগছি। আজ রাত্রে একটা বিছানা-ভাড়ার দাম দিতে পার ?

—কত ভাড়া লাগবে ?

—আট পেনি।

আমি পয়সা বার করবার পূর্ব্বেই আমার বন্ধু একটা শিলিং তার হাতে দিয়ে বললে—কিন্তু সাবধান, এই পয়সায় মদ খেও না যেন। ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজ থেকে আমরা চন্দ্রালোকিত টেম্‌সের দিকে চেয়ে রইলাম—মাঝে মাঝে বজ্‌রা কি মালবোঝাই নৌকা নদী-বক্ষকে একটু চঞ্চল করে দিচ্ছে, লণ্ডন সহর নিস্তব্ধ, রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার ভিড় কম।

ওয়েল্‌স্ ঃ পার্ব্বত্য অঞ্চলে মেষপালের চারণা।

ল্যাম্বেথের দিকে নদীর ধারের বেঞ্চিগুলোতে অনেক লোক ঘুমুচ্ছে। এ সব বেঞ্চে রাত্রে শুয়ে থাকা আইন-বিরুদ্ধ, শায়িত লোকদের উঠিয়ে দিয়ে গেল একজন পুলিশম্যান। এই সব গৃহহারা হতভাগ্যদের টেম্‌স্ নদীর ধারের বেঞ্চি ছাড়া অন্য শয়নের স্থান নেই—কারণ এরা শোওয়ার জায়গার ভাড়া দিতে পারে না। পুলিশ পিছন ফিরতেই অনেকেই আবার শুয়ে পড়ল। উপায় কি বেচারীদের ?

বড় অন্ধকার, একটা বেঞ্চে একটা শায়িত মনুষ্যদেহের উপর আর একটু হ'লে আমরা বসে পড়েছিলাম আর কি! পরে দেখি একটা বৃদ্ধা সেখানে শুয়ে—গায়ে ছেঁড়া একটা আলোয়ান, ভাঙা তোবড়ানো হ্যাটের তলায় তার উস্কো খুস্কো রুক্ষ চুল দেখা যাচ্ছে।

হার্টফোর্ডশায়ার ঃ এ্যালবারির প্রাচীন প্রথায় শাস্তির ব্যবস্থা (দক্ষিণে দ্রষ্টব্য) ঃ অনেকটা আমাদের 'তুড়ুঙ' জাতীয়।

বৃদ্ধা একটু নড়ল, তার পর ধীরে ধীরে যেন কষ্টের সঙ্গে পাশ ফিরলে। ভয়ে ভয়ে চোখ চেয়ে আমাদের দিকে চাইলে, যেন ভূত দেখছে।

আমি বললাম—ভয় পাবার কোন কারণ নেই। চল তোমায় এমন কোনো জায়গায় নিয়ে যাই যেখানে তুমি ভাল বিছানায় শুতে পারবে।

কথা শেষ করেই আমি তার হাতে একটা ফ্লোরিণ দিলাম—দু-শিলিং। রৌপ্যমুদ্রা হাতে পড়তেই তার ঘুমের ঘোর যেন কেটে গেল। সে বললে—ভগবান তোমাদের ভাল করুন। এতে আমার দু'দিন চলে যাবে।

গ্রীষ্মকালের প্রভাত হবার দেরী নেই বেশী। যদিও এখন রাত মাত্র সাড়ে তিনটে—এরই মধ্যে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার ব্রিজ দিয়ে তরিতরকারী বোঝাই গাড়ী যেতে সুরু করেছে।

আমরা কভেণ্ট গার্ডেনে এলাম—লণ্ডনের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় শাক-সবজি ও ফুল-ফলের বাজার এই কভেণ্ট গার্ডেন। কুলীরা মালবোঝাই গাড়ী থেকে ব্যস্তসমস্তভাবে মাল নামাচ্ছে, টাট্‌কা গোলাপের গন্ধ ভুর ভুর করছে ভোরের হাওয়ায়। শাক-সবজি কত ধরণের—চমৎকার সুপক্ক ষ্ট্রবেরি, হট্-হাউসে তৈরী বড় বড় টোমাটো, মটরসুঁটি, খড়ের আঁটি বাঁধা কচি এ্যাস্‌প্যারেগাস শাক, পেঁয়াজ, কচি গোলাপী রংয়ের রুবার্ব, নানারকম জলজ শাক।
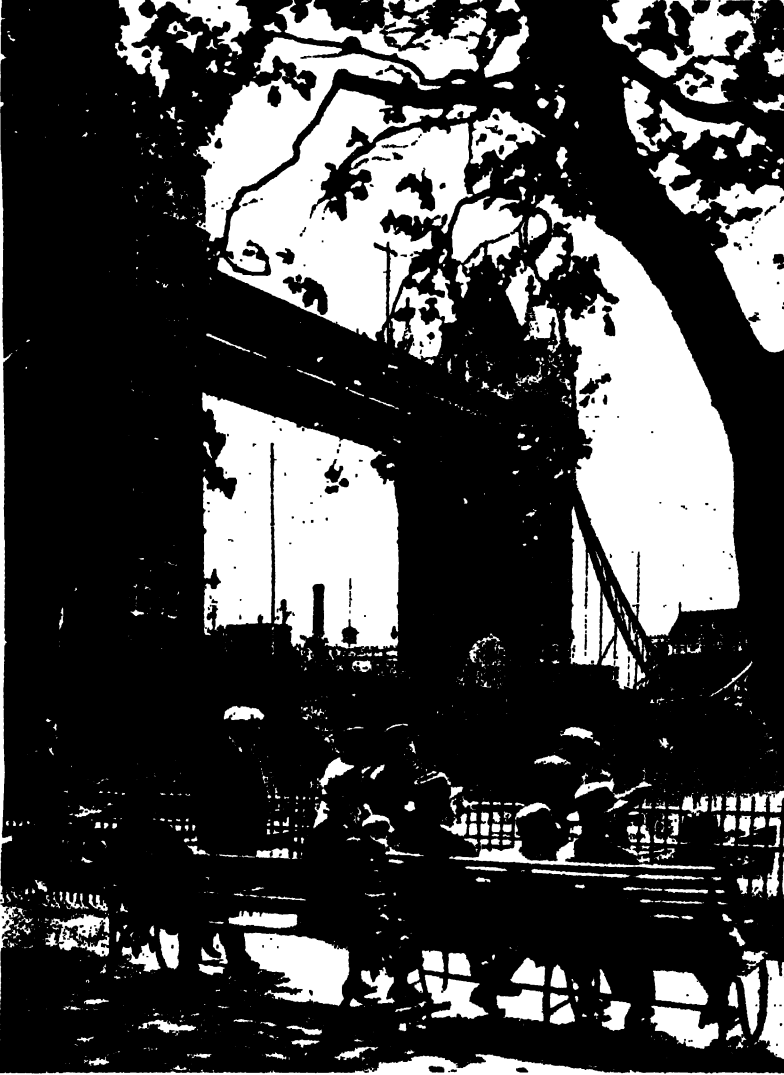
টাওয়ার ব্রিজ; লণ্ডন: টেম্‌স নদীর উপরে, উচ্চতা ১৪২ ফুট।

তরকারী ও টাট্‌কা ফল দেখে আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক হ'ল—একটা দোকান থেকে আমরা কিছু কমলালেবু ও আপেল কিনলাম।

ফুলের বোঝা যেখানে নামাচ্ছে, সেখানে চমৎকার চমৎকার গোলাপ, প্যান্‌সি, লাল কার্ণেশন্, হল্‌দে আইরিস্, সাদা হাইড্রানজিয়া—নানা ফুলের সম্মিলিত সুগন্ধে কভেণ্ট গার্ডেনের সে প্রান্ত আমোদ করেছে।

একটা ছোট্ট আইরিসের তোড়া কিনে আমি ব্রেক্‌ফাষ্টের জন্যে বাসায় ফিরে এলাম।

লণ্ডনের হৈ চৈ, গোলমাল ভাল লাগছিল না। ইংলণ্ডের শান্ত পল্লীপ্রান্তের জীবনধারার মোহ আমাকে টানছে। শুধু তাই নয়, হাতে আমার আর মোটে কুড়িটী শিলিং অবশিষ্ট আছে—কাজ খুঁজে না নিলে আর চলবে না। লণ্ডনের যা ভয়ানক খরচ, তাতে কুড়ি শিলিংএ অৰ্দ্ধ সপ্তাহও চলবে না।

কাজেই দু একদিনের মধ্যেই লণ্ডন ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম। সকলে পথে আমার দিকে চায়—আমার মত পোষাক পরে না কোন ইংরেজ।

লণ্ডন আর ছাড়াতে পারি নে—চলেছে তো এর আর শেষ নেই। লণ্ডন সহর যে কত বড়, পায়ে হেঁটে লণ্ডনে না বেড়ালে তা বোঝা শক্ত হবে। লণ্ডন থেকে অক্সফোর্ডের অৰ্দ্ধেক রাস্তা পৰ্য্যন্ত সহর সঙ্গেই চলেছে—সেই

ভিড়, সেই আলোর সারি, ফুটপাথ, ট্রাম, ঘরবাড়ী। লণ্ডন সহর থেকে কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী হাইওয়াইকুম্ব না অতিক্রম করা পর্য্যন্ত উন্মুক্ত পল্লী-অঞ্চল চোখে পড়ে না।

কিন্তু যখন চোখে পড়ল, তখন মনে হ'ল ইংলণ্ডের এই পল্লীপ্রান্ত প্রথম গ্রীষ্মের দিনে কি মনোমুগ্ধকর! ফুল, ফুল, ফুলে আলো করে আছে মাঠ, মাঠের বেড়া, লোকের বাড়ীর বাগান—মাঠে ফুটেছে বাটারকাপ্ ও কুইন এ্যানের লেস্ (একরকম সাদা সাদা বন্যপুষ্প), লোকের বেড়াতে ফুটেছে লতানে গোলাপ।

অক্সফোর্ড থেকে রওনা হলাম ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন্-এ্যাভনে। ষ্ট্র্যাটফোর্ডে পৌছবার কিছু পূর্ব্বেই আকাশ মেঘে ঘোরালো করে এল, বৃষ্টি পড়তে সুরু করে দিলে—আমার সঙ্গে একটা হাল্কা রেন্‌কোট ছিল—খুলে সেটা গায়ে দিলাম। গোধূলির কিছু পূর্ব্বে এ্যাভন্ নদীর উপরিস্থিত ক্লপটন ব্রিজ পার হয়ে আমি অমর কবির পদচিহ্ন-পূত ষ্ট্র্যাটফোর্ডে প্রবেশ করলাম।

গ্রীষ্মকাল, জুন মাস। আমেরিকান টুরিষ্টদের ভিড় এস্থানে অত্যন্ত বেশী। ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের শান্ত, গম্ভীর আবহাওয়া মাটী করেছে এই চটুলচিত্ত, আমোদপ্রিয় টুরিষ্টদের দল।

ভিড়ের ভয়ে আমি খুব সকালে উঠে হেনলি ষ্ট্রীটের যে বাড়ীতে সেক্সপিয়ার জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে, সেই বাড়ীর বাগানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এলিজাবেথের রাজত্বকালের স্থাপত্য-পদ্ধতিতে নির্ম্মিত বাড়ী, সেকেলে জানালা, বাড়ীর সামনের বাগানে গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, পাখী ডাকছে—পণ্ডিতদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক—আমার পক্ষে এই বাড়ীই যথেষ্ট।

দূরে এডিনবরা কাসল: সম্মুখে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী।

এখান থেকে গ্রাম্যপথ দিয়ে আমি এ্যান হ্যাথাওয়ের পিতৃগৃহ দেখতে গেলাম নিকটবর্ত্তী শটারি গ্রামে।
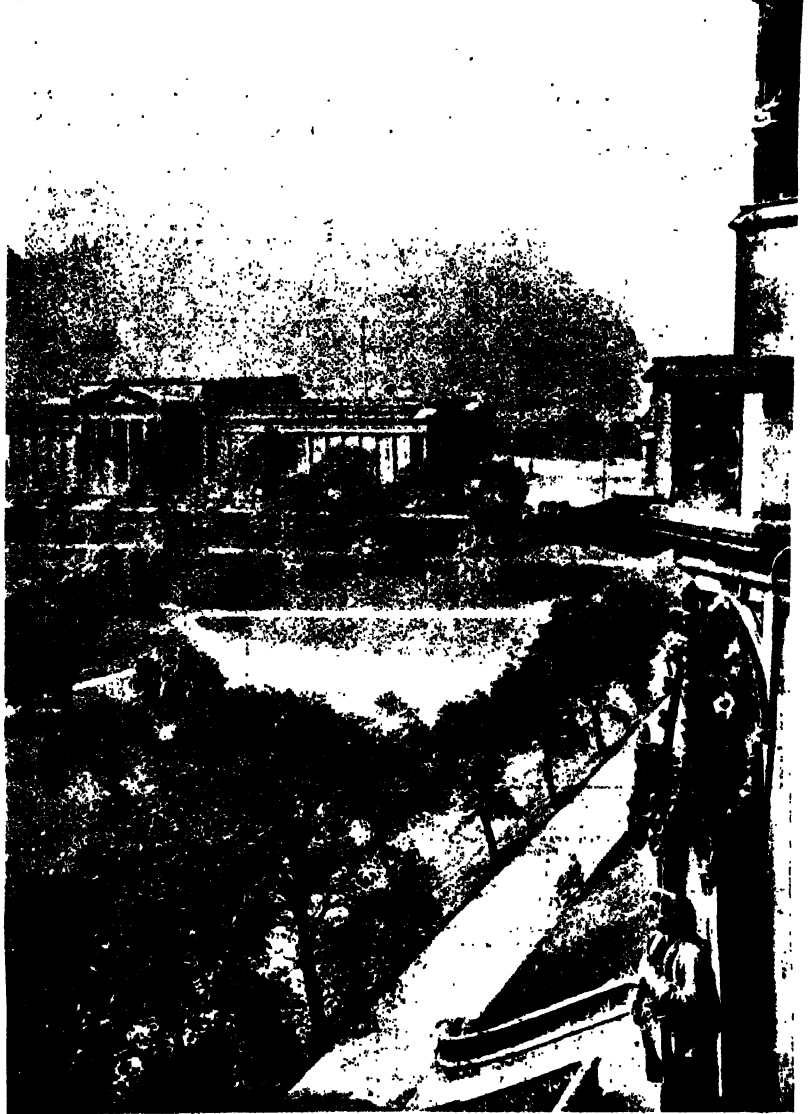
নির্ম্মল, মেঘহীন আকাশ, সুনীল—লণ্ডনের ধোঁয়া ও কুয়াসার পরে চোখ ও মন তৃপ্ত হ'ল এখানে এসে।

একটা বনের মধ্যে ছোট্ট একটা গির্জ্জা। গির্জ্জাটা এমন নির্জ্জন স্থানে বনের মধ্যে অবস্থিত—স্কটের 'আইভ্যানহো'তে বর্ণিত ফ্রায়ার টাকের গির্জ্জার কথা মনে পড়ে। একটু দূরে বন ছাড়িয়েই এ্যানের সুন্দর খড়ে ছাওয়া ঘর, এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত যে, মনে হয় এ্যান বুঝি এখনও এখানেই বাস করে—আমি তার সঙ্গেই দেখা করতে চলেছি।

এ্যানের পৈতৃক ফার্ম্ম এখনও আছে—জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এখনও সে ফার্ম্মে চাষবাস চলে—বর্ত্তমান মালিক এক মাইল দূরে অন্য একটা গ্রামে থাকেন। আমার পকেটে মাত্র আট শিলিং সম্বল, হ্যাথাওয়ে ফার্ম্মে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখাই যাক্ না, সেখানে কোন কাজ পাওয়া যায় কি না!

অল্পক্ষণেই সেখানে পৌঁছে গেলাম। ইংরেজ কৃষকদের যেমন বাড়ী হয়, তেমনি ধরণের বাড়ী আইভিলতায় মণ্ডিত পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। আমি ঢুকতেই একটা তিত্তির পাখী খাঁচার মধ্যে থেকে কর্কশ স্বরে চীৎকার করে উঠল—একটু দূরে গ্রীষ্মকালের মৌশুমী ফুলের ক্ষেতের সামনে একটা রূপগর্ব্বিত ময়ূর এদিক ওদিক পায়চারী করছে।

ষ্ট্রাটফোর্ড: সেক্সপীয়ার-প্রেয়সী অ্যান হ্যাথাওয়ের বাসগৃহ।
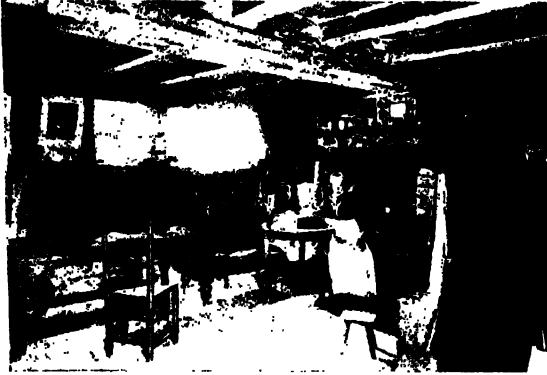
তিত্তিরের কর্কশ রব শুনে একটী মেয়ে ঘর থেকে বার হয়ে ব্যাপার কি দেখতে এল। তার পিছনে পিছনে এল একজন মোটা মত লোক।

আমি তাকে বললাম—এখানে কোন কাজ খালি আছে কি?

—আমি তো জানি নে, আমার বেলিফকে বরং বল। ঐ তার বাড়ী—আচ্ছা, আমি তোমাকে এইমাত্র এ্যান হ্যাথাওয়ের বাড়ীতে দেখলাম না?

—দেখতে পার, সেখানে ছিলাম খানিক আগে।

—আমি আর আমার স্ত্রী মোটরে করে এই মাত্র ওই পথ দিয়েই আসছিলাম। দু'জনেই তোমাকে দেখেছি ওখানে। তুমি লাঞ্চ খেয়েছ?

—না।

আমার হাতে হাত দিয়ে সে বললে—এস, লাঞ্চ খাবার সময় হ'ল, আগে লাঞ্চ খেয়ে নাও, তারপর তুমি গিয়ে আমার বেলিফের সঙ্গে দেখা ক'র।

ফার্ম্মের মালিকের স্ত্রী বেশ শিক্ষিতা—ওদের ছেলের বয়স আমার চেয়ে কিছু বেশী, মা ও ছেলে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করলে। একটী অল্পবয়সী ঝি অনেকগুলি সুস্বাদু স্যাণ্ডউইচ দিয়ে গেল ও এক বোতল বিয়ার। খাওয়া শেষ হলে কৃষকের ছেলে তার সিগারেটের বাক্স আমার দিকে এগিয়ে দিলে। পয়সার অভাবে আজ দুদিন সিগারেট খাইনি—প্রাণভরে ধূমপান করা গেল।

বেলিফের বাড়ীতে গিয়ে দরজায় ঘা দিতেই একজন যুবক বার হয়ে এল—সেই বেলিফ্। আমার আগমনের উদ্দেশ্য শুনে বললে—তুমি গোরু দুইতে জান?

বেপরোয়া ভাবে বললাম—খুব জানি।

অথচ জীবনে একবার মাত্র একটা কৃষকের বাড়ীতে দেশে ওই কাজটা করেছিলাম।

বেলিফ্ বললে গোয়াল পরিষ্কার রাখা ও দুধ দোয়ার জন্যে একটা লোক আমাদের দরকার। আমার মনে হচ্ছে তোমার দ্বারাই কাজ চলবে। মাইনে হপ্তায় ত্রিশ শিলিং—তার মধ্যে হপ্তায় সতের শিলিংএর মধ্যে আমি আমাদের এক প্রজার বাড়ীতে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতে পারব।

গোরুর রাখালি করা কাজটা যদিও আমার মনঃপূত নয়—কিন্তু এদিকেও হাত খালি। নেওয়া যাক কাজটা। হপ্তায় খাওয়া বাদে ১৩ শিলিং বাঁচবে—এক মাস এখানে কাজ করলেই আবার রাস্তায় দু' সপ্তাহ চালিয়ে নেবার মত অর্থ সঞ্চয় করতে পারব এখন।

বড় রাস্তা পার হয়ে গরীব লোকের ছোট ছোট কুঁড়ে-ঘর। তারই একটার সামনে আমরা এসে দাঁড়ালাম। বাড়ীর বাইরেটা শ্রীহীন, জানালায় কাঁচ বসানো নেই। একটী স্ত্রীলোক এসে দোর খুলে দিলে। বেলিফের প্রশ্ন শুনে বললে, থাকার যায়গা সে দিতে পারে না—আমি কি তার ছেলের সঙ্গে এক ঘরে শুতে পারব? তার ছেলেও ওই ফার্ম্মেই কাজ করে।

আমি বললাম—তাতে আমার কষ্ট হবে না। তুমি কি নেবে?

স্ত্রীলোকটী একটু ইতস্ততঃ করে বললে—আমার ছেলে যা দেয়—তাই তুমি দিও, সতেরো শিলিং।

বেলিফ্ পথে আসতে আসতে আমায় বললে—তুমি কোন্ কাপড় পরে কাজ করবে? অন্য কোন পোষাক আছে তোমার?

ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন: সেক্সপীয়ারের সমাধি-প্রস্তর।

এখানেই গোলমাল বাধল। আমার আর কোনো পোষাক নেই, অথচ গোরু-সেবার কাজে থাকলে এ কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে যাবে। কুড়ি শিলিংএর কম আর এক প্রস্থ পোষাক হবে না। কুড়ি শিলিং জমাতে জমাতে গ্রীষ্মকাল কেটে যাবে। সুতরাং কাজ পেয়েও ছাড়তে হ'ল—আবার আমি পথে বেরিয়ে পড়লাম।

নানা গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি। এ সব গ্রামে সবাই গরীব।

ক্রমে আমি ওরসৃষ্টার সহরে পৌঁছলাম। সহরের পাশেই সেভান নদী ও ঘোড়দৌড়ের মাঠ। একজন যুবক জিজ্ঞাসা করলে, আমি থাকবার ঘর খুঁজছি কি না। তার ভগ্নীর বাড়ীতে একটা ঘর ভাড়া দেবে।

তার পর সে বললে—আমায় কিছু সাহায্য কর না? সাত মাস আমার চাকুরী নেই, ছেলেপুলে নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি। ওই দেখ আমার স্ত্রী—কাছেই একটা ছোট ঘরের দরজায় একটী স্ত্রীলোক বসে ছিল—তার কোলে একটী শিশু এবং তার চারি ধারে মলিন পোষাক পরণে ছেলেমেয়ের দল খেলা করে বেড়াচ্ছে।

—তোমাকে সাহায্য করতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু আমার পকেট খালি। চল বরং তোমাকে বিয়ার খাওয়াই।

একটা মদের দোকানে গিয়ে তাকে বিয়ার খাওয়ালাম। তার পর সে আমাকে তার ভগ্নীর বাড়ী-ঘর দেখাতে নিয়ে চলল। ইংলণ্ডের পাড়াগাঁয়ে সব বাড়ীতেই সামনের দিকে একটু ফুলের বাগান থাকে, এমন কি অতি গরীব লোকের বাড়ীতেও। বাগানের গেট খুলে ভিতরে ঢুকতেই একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-পোষাক-পরা মেয়ে এসে দোরে দাঁড়াল। সে তার ভাইকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে বললে—ও, তুমি? খুব সময়ে এসে পড়েছ। আমরা সবে চা খেতে যাচ্ছি—চায়ের সময় আজ একটু খাওয়ার বন্দোবস্ত ভালই আছে। সঙ্গে এটী কে?

—উনি একটা ঘর ভাড়া চান। তোমার তো একটা ঘর আছে, না?
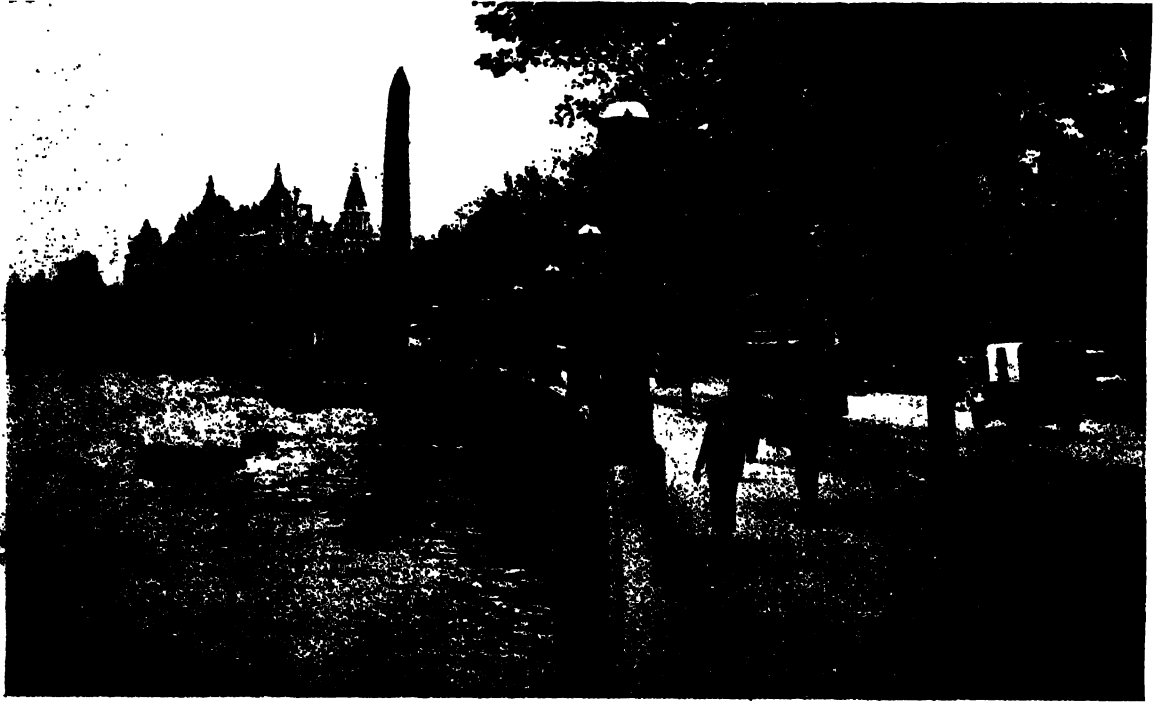
ভিক্টোরিয়া এম্বাঙ্কমেণ্ট; লণ্ডন: দৃষ্ট স্তম্ভটী 'ক্লিয়োপেট্রার সীবনী' (Cleopatra's Needle) নামে খ্যাত। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ অব্দে ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া রটনা; ১৮৭৮ সনে ইহা ইংলণ্ডে আনীত হয়।

—থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে—

তার পর মেয়েটী আমার দিকে ফিরে বললে—এসে ঘরের মধ্যে ব'স। উঃ তুমি যে লম্বা।

আমি আগুনের কাছে গিয়ে বসেছি, মেয়েটী হাত দুটো উপরের দিকে তুলে আশ্চর্য্য হবার সুরে বললে—উঃ, লম্বা বটে! তোমাকে শুতে দেওয়ার মত খাট আমার বাড়ীতে কোথায়?

আমি বললাম—চল দেখি, কি রকম খাট তোমার আছে।

মেয়েটী আমায় একটা ঘরে নিয়ে গেল, ঘরটিতে বেশ হাওয়া আসে, আর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে দু'খানা খাটো—একটাতে মেয়েটির ছোট ভাই থাকে—সে নিকটবর্ত্তী কারখানায় কাজ করে। আর একটা ঘর আছে পাশে, মেয়েটী বললে, সে ঘরে সে নিজে, তার ছোট্ট মেয়ে এবং তার বোন থাকে।

—বেশ, ভাড়া কত?

—যদি এখানে তুমি আস, থাকা আর খাওয়ার জন্যে তুমি দৈনিক চার শিলিং দিও।

বেশ সস্তা বলেই মনে হ'ল—আমি মেয়েটীর প্রতি আরও কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম, যখন সে অগ্রিম কিছু টাকা চাইলে না ভাড়া বাবদ। চাইলে দিতে পারতাম না।

আমরা আবার বাইরে ফিরে গেলে, মেয়েটী বললে—তুমি এক পেয়ালা চা খাবে কি?

—যদি তৈরী থাকে দিতে পার, কিন্তু চা করার কষ্টের মধ্যে যেও না।

—চা করার কষ্ট আর কি? তুমি বিস্কুট আর চিজ্ পছন্দ কর?

একটু পরে মেয়েটী একটা প্লেটে খানকতক ক্র্যাকার ও খুব খানিকটা চিজ্ নিয়ে এল। ইংরেজরা দিনে তিনবার খায়—ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ আর ডিনার—এ ছাড়া বিকেলে চা খায়, রাত আটটার সময় আর একবার চা খায়, একে এরা বলে high tea।

পরদিন ওদের বাড়ীতে ব্রেক্‌ফাষ্ট খেয়ে বুঝলাম ওরা ভালই খেতে দেয়। খাওয়ার পরে হাই ষ্ট্রীট বেয়ে চাকরী খুঁজতে বার হলাম। যতগুলো হোটেল ছিল কাছাকাছি, তাদের একটাতেও কোন কাজ খালি নেই। একটা হোটেলের কর্ত্রী স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকটী আমায় দেখে হেসে উঠে বললে—কাজ খুঁজতে এসেছ? তোমার চাকরীর দরকার কি? তুমি দেখছি আর একজন পাগলা আমেরিকান—বোধ হয় তুমি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বাজী ফেলেছ যে, তুমি এই বাজারেও চাকরী যোগাড় করতে পার কি না এই নিয়ে—ঠিক নয় কি, সত্য কথা বল তো?

স্ত্রীলোকটীর কথা শুনে আমার কৌতুক হল, রাগও হ'ল। বললাম—কে বললে আমি অষ্ট্রেলিয়ান নই? আর সত্যিই কাজ খুঁজছি না!

সে একটু নরম হয়ে বললে—আমি ভেবেছিলাম তুমি আমেরিকান। তা, এখানে কোন কাজ খালি নেই।

ওয়েষ্টমুরল্যাণ্ড: ইংরাজী সাহিত্যে খ্যাত লেক উইণ্ডমিয়ারের অনতিদূরে।

এ দেশের পাড়াগাঁয়ে একটা অদ্ভুত বিশ্বাস আছে যে, প্রত্যেক আমেরিকানই টাকার কুমীর। তাদের আর চাকরী করে খেতে হয় না। আমার স্বদেশ থেকে টুরিষ্ট দল এসে এদের মনে এ বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। তাই হোটেল-কর্ত্রীর ভুল ভেঙে দেবার জন্যে বললাম—তুমি সত্যিই আন্দাজ করেছ, আমি আমেরিকানই বটে, কিন্তু আমার পকেটে টাকা ঝম্ ঝম্ করছে না। আমি নিজের খরচে কাজ করে চালিয়ে পায়ে হেঁটে সারা ইংলণ্ড বেড়াব মতলব করেছি।

হোটেল-কর্ত্রী বললে—কাজকর্ম্ম এখানে পাওয়া যাবে না। তোমাকে বন্ধুর মত বলছি।

সেখান থেকে বার হয়ে অনেকগুলো রেষ্টুরেণ্ট, মদের দোকান খুঁজলাম—সর্ব্বত্র এক কথা—চাকুরী কোথাও খালি নেই। অনেক কারখানা থেকে লোক ছাড়িয়ে দিচ্ছে—নতুন লোক নেওয়া তো দূরের কথা। এতক্ষণ পরে মনে হ'ল হাথাওয়ে ফার্ম্মের চাকুরীটা না নিয়ে কি অন্যায় কাজই করেছি।

পরদিন আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম—ওয়েল্‌সের বনাকীর্ণ পথে। আমার সামনে বড় পাহাড়শ্রেণী, পাহাড়ের ঢালুতে হিদারের বন, আর কিছু দিন পরে আগুনের মত রাঙা ছোট ছোট ফুল ফুটে পাহাড়ের ঢালুতে আগুন লাগিয়ে দেবে। একজন মেষপালক ভেড়া চরিয়ে ফিরছে, সে আকাশে উড়ন্ত একটা সিন্ধু-শকুন দেখিয়ে বললে—ঝড়বৃষ্টি আসবে, পাখীটা কত নীচুতে উড়ছে, দেখছ না? এই বেলা কোথাও আশ্রয় নাও।

ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টি নামল, কিন্তু বাতাস ছিল না। বৃষ্টিতে ভিজেই পথ চলেছি, আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। বার তের মাইলের মধ্যে একখানা মোটরগাড়ীও চোখে পড়ল না। তারপর অন্ধকার হয়ে এল, বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে আমি রাস্তা হারিয়ে ফেললাম। কোথায় যে যাচ্ছি, কিছুই ঠিক করতে পারি না,—মহা বিপদে পড়ে গেলাম। আমার সামনে শুধু তৃণাবৃত প্রান্তর ও ছোট ছোট পাহাড়—পাহাড়ের পর পাহাড়।

কিছুক্ষণ হাঁটবার পরে দূরে অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা বাড়ী দেখা গেল। আনন্দে ও আগ্রহে সে দিকে চললাম, কিন্তু বাড়ীটার খুব কাছে এসে মনে হ'ল বাড়ীটা জনহীন, পরিত্যক্ত। তবুও দরজায় গিয়ে ঘা দিলাম। আমার অদৃষ্ট ভাল, একটী দরিদ্র স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দিলে। আমি বললাম—তুমি রাত্রে আমায় একটু জায়গা দিতে পার ? আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।

স্ত্রীলোকটী বললে—অসম্ভব, আমাদেরই জায়গা হয় না।

আমি যথাসম্ভব সুমিষ্ট সুরে বললাম - কিন্তু এক পেয়ালা চা তুমি অবশ্য আমায় দেবে ?

—আমরা বড় গরীব, শুধু তোমাকে প্লেন চা দিতে পারি।

ঘরে ঢুকে আমি আগুনের কাছে বসলাম। একটু পরে ঘরে একজন ষণ্ডামার্ক গোছের লোক ঢুকে আমার দিকে কটমট দৃষ্টিতে চেয়ে কর্কশ কণ্ঠে স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করলে, কে এ ?

স্ত্রীলোকটী যেন একটু ভয়ের সুরে ইতস্ততঃ করে আমার ব্যাপার যা জানে বললে। লোকটা তখন নরম সুরে বললে—এমন দিনে রাস্তায় বেরতে আছে ! আমাদের এখানে তোমাকে থাকতে দিতে পারব না রাত্রে। আর একটী মাত্র ঘর আছে, তাতে আমার মেয়ে শোয়। মাইল তিনেক দূরে একটা ফার্ম্ম আছে, সেখানে যাও।

স্ত্রীলোকটী চা নিয়ে এল—চায়ের সঙ্গে রুটী, মাখন ও জ্যাম। সব জিনিস টাটকা, দিয়েছেও প্রচুর পরিমাণে। খেয়ে সারাদিনের পথ হাঁটার কষ্ট দূর হ'ল। চা খাওয়া শেষ করে বললাম—কত দাম দিতে হবে ?

স্ত্রীলোকটী বললে—এক শিলিং।

আমি স্ত্রীলোকটীর হাতে একটা শিলিং দিলাম—সে ওর মেয়েকে ডাকলে—মেয়েটীর পরণে চেকের গাউন, বয়স অল্প, একটু লাজুক। তার মা তারই হাতে শিলিংটা দিলে—শিলিংটা পেয়ে মেয়ের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল—কতকাল বোধ হয় পয়সা হাতে পায়নি।

বাইরে ঘোর অন্ধকার—বাতাস জোরে বইছে—ওদের বাড়ী থেকে বার হয়ে আমি সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে লিওমিনিষ্টারের দিকে রওনা হলাম।

নরওয়ের পল্লী

জনৈক মার্কিণ তরুণীর অভিজ্ঞতা

নরওয়ে পাহাড় ও সমুদ্রের দেশ। নরওয়ের দক্ষিণাংশ দেশের অন্য অঞ্চলের অপেক্ষা কিছু সমতল হলেও অন্য দেশের তুলনায় পর্ব্বতময়। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা নরওয়ের পল্লীগ্রামে কিছুদিন কাটাই। সেবার সুযোগও ঘটল। আমাদের বাড়ীতে একজন নার্স ছিল আমাদের বাল্যকালে। আমরা বড় হবার পরে সে দেশে ফিরে গিয়ে বিবাহ করে সংসারী হয়েছে। তার নাম রাস্না। রাস্না হঠাৎ আমাকে পত্র লিখলে সে আমায় দেখতে চায়।

১লা আগষ্ট অসলো বন্দরে নেমেই রাসনাকে পত্র দ্বারা জানালাম শুক্রবারে আমি তার বাড়ীতে যাচ্ছি। নির্দ্দিষ্ট দিনে নেস্‌বিন ষ্টেশনে আমি একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে দেখি রাসনা তার ভাল পোষাকটী পরে আমার অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে আছে।

গত পনের বছরের মধ্যে রাসনা কিছুই বদলায় নি। কিন্তু আমি অনেক বদলে গিয়েছি, তখন আমি ছিলাম দশ বছরের মেয়ে, এখন আমার বয়স পঁচিশ। রাসনা কিন্তু আমায় দূর থেকে দেখেই চিনলে ও ছুটে আমার কাছে এল।

নরওয়ের সুন্দরী (প্রাচীন প্রথায় সজ্জিতা)।

ষ্টেশনের ফটকের বাইরে একখানা ১৯০৮ সালের মডেলের ফোর্ড ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল, দুজনে আমরা তাতে গিয়ে উঠলাম। রাসনার বাড়ী ষ্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে। সেখানে পৌঁছে আমার জিনিসপত্র গাড়ী থেকে নামানো শেষ হবার পূর্ব্বেই আমায় খেতে দেওয়া হল। সব খাবার জিনিসই বাড়ীতে তৈরী বা ক্ষেত থেকে টাটকা সংগ্রহ করা। দুধ, ফল, লেটুস শাক, রুটী ও আচার! রাসনার স্বামীর নাম গুটর্ম্ম। লম্বা জোয়ান চেহারা, বেশ হাসি মুখ, খোলা উদার মন। গুটর্ম্মের বাবা পিণ্ডারের সঙ্গেও আলাপ হল, তাঁর বয়স আশী বছর, গায়ে তাঁর স্ত্রীর বোনা মোটা কাপড়ের পোষাক। রাসনার সাত বছরের ছোট মেয়েটী আমায় দেখে লজ্জায় উঠানের খড়ের গাদার আড়ালে লুকিয়ে রইল। গ্রামের পিছনকার পর্ব্বতের শিখরে মেঘ জমেছে। মাঠে আরও খড় রয়েছে, তুলে না আনলে ভিজে যাবে। গুটর্ম্ম, রাসনা, গুটর্ম্মের বৃদ্ধ পিতা সবাই খড় তুলতে গেল, আমি বললাম, আমিও সাহায্য করব। আমায় খড় জড় করতে দেখে ঠাকুরদাদা হেসেই খুন, প্রতিবাসীদের ডেকে দেখাতে লাগল, দেখ আমেরিকার মেয়েটী কেমন খড় তুলছে।

আমরা যেমন বাড়ী ফিরে এসেছি, একটী বৃদ্ধা আমাদের সামনে এসে আমায় খুব ভদ্রতার সঙ্গে বললে, দয়া করে সামান্য একটু কফি খাও। এই বৃদ্ধাটীকে এই প্রথম দেখলাম, শুনলাম সে রাসনার স্বামীর খুড়ীমা।

ঘরের বাইরে উঠানে আমরা কফি খেতে বসেছি। ইতিমধ্যে রাসনার ছোট মেয়েটী বন থেকে প্রচুর বন্য বেরি সংগ্রহ করে এনেছে, কফির সঙ্গে তাও খাওয়া গেল। দুজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমাদের বাড়ীর সম্মুখের পথ দিয়ে কোথায় যাচ্ছে। তারা বললে, ভাল ?

এরা উত্তর দিলে, ভাল। তোমাদের সব ভাল ?

—খড় তোলা শেষ হয়েছে ?

—প্রায়। একটু কফি খাবে না ?

—থাক, ধন্যবাদ। সময় নেই, অনেকটা যেতে হবে।

—তা হোক। একটা ফোঁটা কফি খেয়ে যাও।

—আচ্ছা, কিন্তু একটী ফোঁটা মাত্র, মনে থাকে যেন !

এইখানকার পল্লী অঞ্চলের প্রথা—নিতান্ত অপরিচিত যদি না হয়, তবে পথচল্‌তি লোককেও ডেকে খাওয়ান এখানকার গ্রাম্য প্রথা।

নরওয়ে গৃহিণী : রুটি তৈয়ারী হইতেছে।

কয়েক দিন খুব বৃষ্টি নামল। আমরা খড় গাদা দিতে ব্যস্ত, বৃদ্ধ পিওার শীতকালের জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে রোজ পাহাড়ের ওপর গিয়ে বার্চ্চ গাছ কাটে। অথচ আশী বছর তার বয়েস। গাছ কেটে গাছের পাতাশুদ্ধ ডাল সে আঁটি বেঁধে আনতে লাগল—শীতকালে পশুখাদ্য হিসেবে তা ব্যবহৃত হবে।

সংসারে এদের যা কিছু খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক, সব জমি থেকে উৎপন্ন করা হয়। যব, রাই, ওট্ ক্ষেতেই হয়। বাগানে হয় কপি, আলু ও ফরাসী বিন্। গ্রামের পেছনে যে পাহাড়, তাতে নানা প্রকার বন্য বেরি জন্মায়, গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রচুর তুলে আনে, পল্লী-গৃহিণীরা তার আচার ও মোরব্বা ইত্যাদি তৈরী করে শীতকালের জন্য রেখে দেন। গ্রামের বাইরে পথের ধারে ঝোপে রাশি রাশি ষ্ট্রবেরি ও র‍্যাম্পবেরি ফলে। বুনো কিউরাণ্ট ফলের মিষ্ট মদ তৈরী হয়। সুপ ও পুডিং তৈরীর জন্যে বন্য চেরি ফলের রস বোতলে পুরে রাখা হয়। পাহাড়ের মাথায় শীতের প্রারম্ভে ক্লাউডবেরি ফলে, তা থেকে অতি উৎকৃষ্ট জ্যাম প্রস্তুত হয়।

একদিন পাশের গ্রামে একটা উৎসব হ'ল। দু-তিন খানা গ্রামের তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় সবাই জুটে সারা রাত নাচলে। অবিবাহিতা মেয়েরা সুন্দর সেজে এসেছে। একটী মেয়ে খুব লম্বা একটা লাঠির আগায় একটা হ্যাট তুলে ধরে রেখেছে, গানের তালে তালে নাচতে নাচতে যে লাফিয়ে উঠে হ্যাটটা লাঠি থেকে ফেলে দিতে পারবে, সে ছেলেটি ঐ মেয়েটির সঙ্গে নাচতে পাবে। অনেকগুলি ছেলে চেষ্টা করলে, হ্যাট কেউ ফেলতে পারে না। অবশেষে খুব সুশ্রী একটী ছেলে এক লাফে ঠেলে উঠে হ্যাট ছুঁড়ে ফেললে। আমার যেন মনে হ'ল ওই ছেলেটী যখন এল,

মেয়েটী তখন লাঠিগাছটা একটু নীচু করে ধরেছিল। কিংবা হয়তো আমার চোখের ভুল। যাই হোক, ছেলেটীর সঙ্গে মেয়েটী সারা রাত নাচলে।

নাচ আর গান থামবার নাম নেই। হলের মধ্যে বেজায় গরম। আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম, দুপুর রাত পার হয়ে গিয়েছে, উত্তর দিকের পাহাড়ের আড়ালে তখনও সূর্য্যাস্তের রঙীন আভা মেলায় নি, ঘণ্টা দুই পরেই আবার সূর্য্যোদয় হবে।

রাত সাড়ে তিনটার সময় আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। রাসনার স্বামী বললে—চল আমরা সব যাই। আবার সকালে উঠেই মাঠের কাজে বেরুতে হবে।

আমরা যখন পথে বেরিয়েছি, তখন তরুণ তপনের সোণালী আলোয় পর্ব্বতশিখর রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। ভোরের বাতাসে শিশির ও বনফুলের গন্ধ। আমি বাড়ী ফিরে এসে পালক-ভরা গদির বিছানায় যখন ক্লান্ত দেহ প্রসারিত করে দিয়েছি, আমার শয়ন-গৃহের জানালার বাহিরে চেরি গাছে পাখীরা তখন কলধ্বনি করে উঠল।

নরওয়ে কৃষাণ-জীবন: পিতামাতার সহিত শিশুরাও শস্য-ক্ষেত্রে কাজ করে।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি রাসনা নিজে আমার জন্য কফি আর কেক্ এনেছে। রোজই এ রকম হয়। হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক পরে ব্রেকফাষ্ট খেতে যাই। তখন আরও কফি দেয়, তার সঙ্গে থাকে রুটী, মাখন, মাছ, সসেজ ও ছাগলের দুধের পনির। ব্রেকফাষ্ট খাওয়ার পরে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত ক্ষেত-খামার ও ঘর-গৃহস্থালীর কাজ হয়। তারপর আবার ঠিক সকালের মত গুরুভোজন। বেলা দেড়টার সময় মধ্যাহ্ন-ভোজন অন্তে সবাই একটু ঘুমিয়ে নেয়। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে আর একবার কফি ও কেক্ খেয়ে যে যার কাজে বেরুবে। রাত আটটা বা নটায় এদের নৈশ-ভোজন। সে সময়ে শুধু বড় এক বাটী ভাজা যবসিদ্ধ ছাড়া আর কিছু খাওয়ার নিয়ম নেই।

নৈশভোজন শেষ করে আমরা সেলাই করি বা বুনি। সংসারে ব্যবহৃত মোজা, দস্তানা, সোয়েটার ইত্যাদি সবই বাড়ীতে বোনা ও রিপু করা হয়। রাসনার মেয়ে টেবিলে বসে দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা আমাদের কাছে বসে গল্প বলে।

এখানে শীতকালের শোভা অবর্ণনীয়। পর্ব্বতের উপত্যকারাজি শুভ্র তুষারে আবৃত হয়, দিনে হরিদ্রাভ সূর্য্য কিরণে তাদের নানারকম রং দেখা যায়। কিন্তু শীতের সুদীর্ঘ রাত্রির জ্যোৎস্নালোকে তুষার মণ্ডিত পর্ব্বত শিখর, উপত্যকা ও নিষ্পত্র বৃক্ষরাজির যে শোভা হয়, তা যেন সম্পূর্ণ অপার্থিব ও অবাস্তব। চোখে না দেখলে তা বুঝবার উপায় নেই।

উত্তর-আমেরিকা হইতে দক্ষিণ-আমেরিকা

(আকাশ পথে)

ফ্রেড্‌রিক সিম্‌পিক উড়ো-জাহাজে ওয়াশিংটন ডি, সি, থেকে বুয়োনস্ এরিস্ পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন কারিব সাগরের পথ দিয়ে। পথে কারিব সাগরের মনোরম দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করেন, তারপর ওরিনাকো ও আমাজন্ নদীর ব-দ্বীপ, তার পর ব্রেজিলের শ্যামল উপকূল।

তাঁর লিখিত বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করা গেল:—

'হাভানা বন্দর পার হয়েছি মিনিট চল্লিশ হবে, এমন সময় দূরে সমুদ্রবক্ষে ঘন কালো ঝোড়ো মেঘের নীচে একটা প্রকাণ্ড জলস্তম্ভ দেখা গেল। আমরা তার চারিধারে চক্রাকারে উড়লাম, এবং উড়ো-জাহাজ থেকে জলস্তম্ভের ফটো নিলাম। ঠিক একটা কৃষ্ণসর্পের মত সেটা প্রথমে মেঘের কোল থেকে নাম্‌ল—ক্রমে সেটা মোটা হ'তে হ'তে ৬০০ ফুট দীর্ঘ চিম্‌নীর আকার ধারণ করলে। যেখানে তার সঙ্গে সমুদ্রের জলের মিলন ঘটল, জলস্তম্ভের শুঁড়টা সমুদ্রের সেই অংশটা যেন মন্থন করছে। তার পর জলস্তম্ভটা একটু বেঁকে গেল এবং এদিক-ওদিক দুলতে লাগল, যেন কোনো অতিকায় অশ্ব তার পুচ্ছ আন্দোলন করছে—এই পুচ্ছটা ক্রমে ক্রমে বেঁকে আকাশের দিকে উঠে যেতে যেতে ঘন বৃষ্টির ধারার মধ্যে মিলিয়ে গেল।
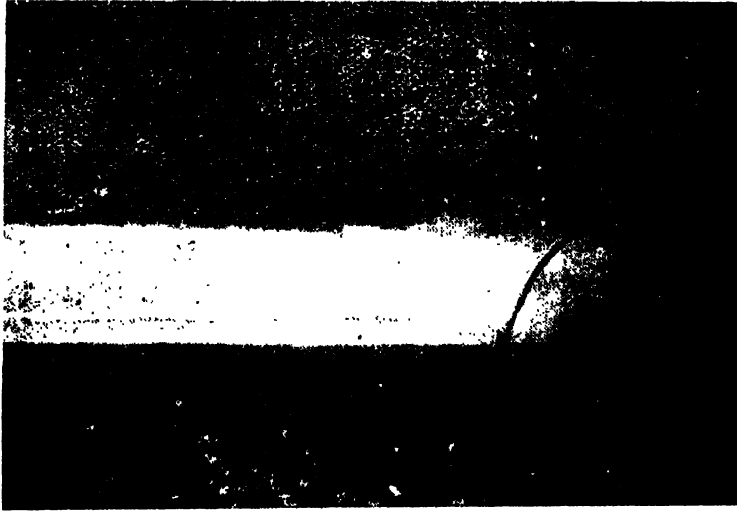
জলস্তম্ভ: প্রায় সাত মিনিট কাল স্থায়ী হইয়াছিল। [উড়ো-জাহাজ হইতে ফটো তোলা]

আমাদের ভাগ্য ছিল ভাল। জল-স্তম্ভের এ-ধরণের ফটো নেওয়া বড় একটা ঘটে না।

আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল শুধু দৃশ্যাবলীর ফটো নেওয়া নয়, পথে যে সকল স্থান পড়বে, তাদের লোকজন, আচার-ব্যবহার সভ্যতা, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করা ছিল আমাদের প্রধান কার্য্য। আর মনে ভাবুন, আমরা কোথা দিয়ে যাচ্ছি। কিউবা, হেইটি, পোর্টো রিকো, ভার্জ্জিন দ্বীপপুঞ্জ—তারপর আণ্ডিজ পর্ব্বতমালা অতিক্রম ক'রে চিলি এবং পেরু—কত ধরণের মানুষ, কত ধরণের ভাষা, ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, স্থাপত্যরীতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য!

মে মাসের চমৎকার সকাল বেলাটিতে ওয়াশিংটন থেকে আমরা আকাশে উড়লাম—নিউইয়র্ক ও বুয়োনস্ এরিস্ সহরদ্বয়ের মধ্যে যে যাত্রী ও ডাকবাহী উড়ো-জাহাজের সারি যাতায়াত করে, তাদের মধ্যে বৃহত্তম উড়ো-জাহাজে আমরা যাচ্ছিলাম। আমাদের জাহাজের নাম "আরজেন্টিনা"—নিউইয়র্ক, রিয়ো, বুয়োনস এরিস, সংক্ষেপে "নিরবা" লাইনের; প্যান আমেরিকান্ এয়ারওয়েজ কোম্পানী এর পর এই জাহাজ খানাকে কিনে নিয়েছিল।

নীচে চেয়ে দেখি পটোমাক নদীতীরের তরুশ্রেণীর উপর দিয়ে উড়ে চলেছি—মাউণ্ট ভার্ণন্, হ্যাম্পটন রোডস-এ নঙ্গরকরা আমাদের রণতরীর সারি, নরফোক্ সব ছাড়িয়ে আমরা সমুদ্রের উপর অনেকটা চলে গেলুন—পশ্চিমে বিখ্যাত 'বিষণ্ণ জলা'-(dismal swamp)-র নীল কৃষ্ণ, অস্পষ্ট সীমারেখা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

সান্টিয়াগো ডি কিউবা বন্দর : পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই বন্দরের মুখে স্পেন আর আমেরিকার যুদ্ধ মারাত্মক হইয়া উঠে।

মিয়ামির দক্ষিণে ফ্লোরিডার নিম্ন উপকূলভূমি দেখা দিল। কর্দ্দমময় জনহীন ও ম্যান্‌গ্রোভ গাছের জঙ্গলে ভরা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাল ও লোনাজলের খাড়ি। সমুদ্রে নানা ধরণের সিন্ধু-শকুন উড়ছে, শুশুকের দল জলের উপর ভেসে উঠে খেলা করছে। স্বচ্ছ জলের মধ্যে প্রবালের বাঁধের উপর সন্তরণশীল মৎস্যের ঝাঁক চোখে পড়ছে।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রতীরে কি-ওয়েষ্ট্ সহর। আমরা এর উপরে অনেকক্ষণ চক্রাকারে ঘুরে এই সহর ও চারি পাশের দৃশ্যাবলীর ফটো নিলাম। তার পরে যেমন আবার আমরা সমুদ্রে পড়েছি—একেবারে উষ্ণমণ্ডলের ঝড় ও জলস্তম্ভ আমাদের সাম্‌নে! এই জলস্তম্ভের কথা প্রবন্ধের প্রথমেই বলেছি। বিশ বছর পূর্ব্বে প্রথম যৌবনে মনে আছে একবার চীনসমুদ্রে এক জলস্তম্ভের সান্নিধ্য এড়াবার জন্যে আমাদের ষ্টীমার অনেক দূর দিয়ে ঘুরে গিয়েছিল, আর আজ উড়ো-জাহাজ থেকে আমরা তাকে গ্রাহ্যও করলাম না—উপরন্তু তার ফটো নিলাম।

হাভানা বন্দরে যখন পৌঁছেছি তখন ভয়ানক বৃষ্টি নেমেছে। সমুদ্রের ধারে উত্তেজিত জনতা গাছতলায় দাঁড়িয়ে তখনও ঝড় ও জলস্তম্ভের বিষয় আলোচনা করছিল, কারণ জলস্তম্ভটা বন্দর থেকে বেশ দেখা গিয়েছিল। কিউবার রাজধানীতে সর্ব্বত্র বেশ একটা সজীবতা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের বেশীক্ষণ সেখানে বিলম্ব করবার উপায় ছিল না। আমরা তখনই উড়লাম এবং এই ফলশস্যপূর্ণ শ্যামল দ্বীপটি আড়াআড়ি ভাবে পার হয়ে খাড়া দক্ষিণমুখে রওনা হ'লাম।
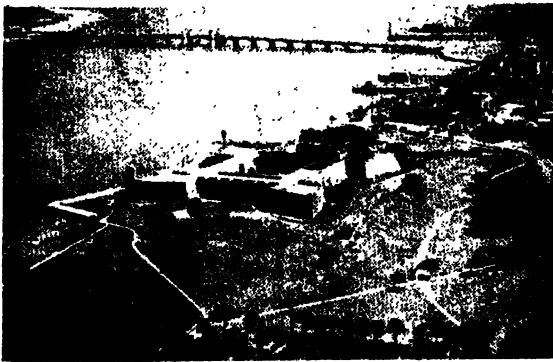
ফ্লোরিডা : সেণ্ট আগষ্টিনের প্রাচীন দুর্গ ফোর্ট মেরিয়ন। চারি পার্শ্বের সংরক্ষণী-ব্যবস্থা—খাল, সচল সেতু, বন্দুক রাখিবার স্থান ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

তার পরে কতকগুলি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান পথে পড়ল সিয়েন্‌ফিউয়েগো নামক ছোট একটি সহরে আমাদের উড়ো-জাহাজে গ্যাস ভরে নেওয়া হ'ল। তার পরে আমরা সান্টিয়াগো বন্দরে ঢুকলাম। ত্রিশ বছর আগে লেফ্‌টেনাণ্ট হবসন মেরিমাক্ জাহাজ এই বন্দরের মুখে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, কারভেরার রণতরীদলকে বন্দরের মধ্যে আটকাবার জন্যে!

বন্দর থেকে একটু দূরে সান্‌জুয়ান পাহাড় স্পেনীয় আমেরিকান্ যুদ্ধের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

ঐ পাহাড়ের শান্ত শ্যামল সানুদেশে সেই বিখ্যাত 'শান্তিবৃক্ষ'টি এখনও বর্ত্তমান, যার তলায় জেনারেল শ্যাফ্‌টার স্পেনীয় সেনাপতির আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সানজুয়ানের সানুদেশে শান্তিবৃক্ষ : নীচের প্রস্তরফলকগুলি স্পেনের সহিত যুদ্ধে পতিত আমেরিকার বীরদের স্মৃতি-চিহ্ন।

সান্টিয়াগোর হোটেলে আমরা রাত্রি কাটালাম। আমেরিকান্ ভাইস্-কনসাল্ ও একজন তামাকের ব্যবসায়ী ছাড়া আর কোনো নিজের দেশের লোকের দেখা পেলাম না। এ সব অঞ্চলের সহরগুলি আমেরিকার ছাঁচে তৈয়ারী। বাড়ী-ঘরের স্থাপত্য রীতি, লোকজনের বেশ-ভূষা, হোটেলের ব্যবস্থা, সিনেমা ইত্যাদি—যুক্তরাজ্যের যে কোন সহরের মত।

তবে যুক্তরাজ্যের লোক এসে এখানে কিউবার সাধারণ লোকের সঙ্গে চাকুরীতে বা কুলীগিরির প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না। কিউবার লোক যত কম মাইনে নিয়ে খাটবে, কোনো আমেরিকান্ তত কম খরচে চালাতে পারবে না।

আমেরিকা ও প্রাচীন সান্টিয়াগো বন্দর অতীত স্মৃতির বন্ধনে আবদ্ধ। কতকগুলি বন্ধন বেশ প্রাচীন, যেমন এই সহরের মেয়র হার্ণেণ্ডো কর্টেজ জাহাজ ভাসিয়ে একদিন এখান থেকে রওনা হয়েছিলেন মেক্সিকো-বিজয়ের জন্যে। চারটি শতাব্দীর বহু ঝড়ঝঞ্ঝা, মহামারী, ভূমিকম্প, জলদস্যুর উপদ্রব ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই সহর স্পেনের প্রধান ঘাঁটি ছিল।

এই ঘাটি স্পেনের শেষ ঘাটিও বটে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই বন্দরেরই অনতিদূরে সানজুয়ান পাহাড়ের সানুদেশে একটা বড় সিবা (ceiba) গাছের তলে শ্যাফ্‌টার, রুজভেল্ট ও উড্ মিলিত হয়ে পশ্চিম মহাদেশে স্পেনীয় আধিপত্যের শেষ দিন ঘোষণা করেন।

সানজুয়ান পাহাড় এখন একটা পার্ক। সকালে বিকালে সহরের অনেক লোক সেখানে বেড়ায়। সান্-জুয়ানের যুদ্ধে যে সকল আমেরিকান, স্পেনীয় ও কিউবা দ্বীপের যোদ্ধা মারা পড়েছিল, তাদের উদ্দেশে এই পাহা-ড়ের গায়ে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়েছে।

কিউবা দ্বীপ আজ স্বাধীন। অনেক স্কুল কলেজ এখানে স্থাপিত হয়েছে। আজ শিক্ষার প্রতি এদের খুব ঝোঁক। চিনি ও তামাকের ব্যবসায়ে কিউবা বিত্তশালী। এখানে যে চুরুট তৈরী হয়, তার পৃথিবী জুড়ে নাম।

সান্টিয়াগো ডি কউবা উপসাগরের উপরিবর্ত্তী মরো দুর্গ আমেরিকার ইতিহাসে অমর।

বেলা পড়ে এসেছে। সহরবাসীরা দলে দলে চলেছে সিনেমাতে। একটা সিনেমা 'টম কাকার কুটীর'

(Uncle Tom's Cabin)-এর বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কাছেই ফুটপাথের উপর একটা জীর্ণ বস্ত্র পরা ছোক্‌রা—সে আমার জুতো পালিশ করতে ছুটে এল। আমি বললাম—রাখ জুতো, পালিশ করবার দরকার নেই।

সে বললে, আমায় দয়া করে পঞ্চাশ সেণ্টই দেবেন। আমি ঐ নতুন ফিল্‌মটা না দেখলে আজ মরে যাব। সবাই যাচ্ছে। মুখের উপর ছোকরাকে 'না' বলতে বাধল।

তার পর আরও কত দ্বীপ, নদী সহর আমাদের বেগবান উড়ো-জাহাজের তলায় উড়ে গেল। বড় বড় পর্ব্বত যেন ধীরে ধীরে নিকটে এগিয়ে আসছে। একবার আমি ঘুমিয়ে উঠে দেখি, নীচে হেইটি দ্বীপ ও তার রাজধানী পোর্টো-আ-প্রিন্স, আমাদের জাহাজ তার উপরে চক্রাকারে ঘুরছে।

সারবন্দী সবুজ গাছপালার মধ্যে হেইটি দ্বীপের সাদা সাদা বাড়ীগুলো কি চমৎকার দেখাচ্ছে! কত ইতিহাস জড়ানো রয়েছে হেইটি দ্বীপের সঙ্গে! লাক্লার্ক (Leclerk), যে নেপোলিয়নের ভগ্নীকে বিবাহ করেছিল,···নিগ্রো রাজা ক্রিষ্টোফ্,······হেইটিতে প্রজাতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হবার সময়ের সেই সব নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড!

যখন এদেশে স্পেনীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিশ লক্ষ ইণ্ডিয়ান বাস করত এখানে! তাদের বংশধর একজনও এখন বেঁচে নেই। বর্ত্তমানে হেইটির শ্যামল উপত্যকাগুলিতে ও পাহাড়ের ধারের গ্রামে যে সব লোক বাস করে, তারা আফ্রিকা থেকে আনীত ক্রীতদাসগণের বংশধর।

হেইটি দ্বীপের উপকূল: এখনও প্রাচীন ব্যবস্থার বহু পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

হেইটির লোক যে ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে, তা কোন ফরাসী বুঝতে পারবে না। এ এখানকারই ভাষা, বহু শতাব্দী ধরে আফ্রিকার নিগ্রোদের মুখে মুখে ফরাসী ভাষা পরিবর্ত্তিত হয়ে তার এখন এই রূপ দাঁড়িয়েছে। আমেরিকার প্রভাব এখানেও বড় কম নয়। আমেরিকান মিশনরীরা এখানে স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছে, এদের উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্য শিখিয়েছে।

সহর ছেড়ে কিছুদূর যাও, মনে হবে আফ্রিকার অপরিচিত অরণ্য-জীবনের মধ্যে এসে পড়েছ। ছাতার মত গোল চালা-ঘর, তার নীচে বসে নীগ্রো মেয়েরা কাফিফল গুঁড়ো করছে, রাখালেরা গরুর পাল চরাচ্ছে পাহাড়ের নীচে। ক্যামেরা দেখলেই তারা ঘরের মধ্যে ছুটে পালাবে, নয় তো হেসেই খুন হবে।

হেইটিতে ফলের বাগান যথেষ্ট। বড় বড় উপত্যকাগুলি আম, পেঁপে, কমলালেবু, রুটীফল, নারিকেল প্রভৃতি ফলবৃক্ষে পরিপূর্ণ। বাজারে এসব ফল খুব সস্তা। এক ধরণের অদ্ভুত গাছ দেখলাম, তার ডালে যেন বড় বড় সবুজ ফুটবল ঝুলছে। এই ফলের ভিতরটা নাকি ফাঁপা, শাঁস নেই। স্থানীয় অধিবাসীরা এগুলিকে জলপাত্ররূপে ব্যবহার করে থাকে।

হেইটির অরণ্য অঞ্চলে বন্য কাফি হয়। আবার কতক চাষও করা হয়। কাফি এখানকার প্রধান ফসল। কাফি চূর্ণের উপর তপ্ত ইক্ষুরস ঢেলে সবটা ঘুঁটে কাদার মত করে ফেলে। এই জিনিস এদেশের একটা প্রিয় খাদ্য।

গাছতলায় ছোট একটা গ্রাম্য বাজার। দোকানে মাটীর পাইপ, ক্রুশ, সাবান, কাসাভার রুটী, আদা ইত্যাদি

বিক্রী হচ্ছে। জিনিসপত্র খুব সস্তা। দুজনে খেয়ে শেষ করা যায় না—এমন একটা রুটীফলের দাম মাত্র এক সেণ্ট। খাদ্যদ্রব্য এত সস্তা বলে' হেইটি দ্বীপের মজুরেরা দৈনিক ২৫ সেণ্ট মজুরীতে খাটতে পারে।

রবিবারের সকাল বেলা আমরা পোর্টো প্রিন্স ছেড়ে আকাশে উড়লাম। আমাদের নীচে শস্যশ্যামল উপত্যকা, দূরে এনরিকিলো হ্রদ, হ্রদের উত্তরে দশ হাজার ফুট উচ্চ পর্ব্বতমালা। হ্রদের কর্দ্দমময় তীরে কুমীরের দল রোদ পোহাচ্ছে. উড়ো-জাহাজের শব্দ শুনে জলের মধ্যে ঢুকে গেল।

হ্রদের পূর্ব্বে অনেক দূর পর্য্যন্ত লোকালয় দেখা গেল না। কেবল মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে, পাহাড়ের নীচে, বনের ধারে বন্য অশ্বের দল বিচরণ করছে। তার পরেই আবার সমুদ্র, কতকগুলো ছোট ছোট খড়ের ঘর সমুদ্রতীরে। লোকে সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরী করছে।

সমুদ্রের একটা ছোট খাড়ি পার হয়ে সাণ্টা ডোমিঙ্গো সহর। আমেরিকান ক্রুজার 'মেম্ফিস্' এখানে ঝড়ে প্রবালের বাঁধে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গিয়েছিল, এখনও তার ভগ্নাবশেষ আছে। এই সহরের গির্জ্জায় কলম্বসের অস্থি রক্ষিত আছে।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সাণ্টা ডোমিঙ্গো সহর শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং তার ফলে সার ফ্রান্সিস্ ড্রেকের হাতে অধিবাসীরা অত্যন্ত নির্য্যাতিত হয়। ড্রেক সহরের অধিবাসীদের কাছে যে টাকা চেয়েছিলেন, তা দেওয়া তাদের পক্ষে সহজ ছিল না। তখন ড্রেক সহরের বড় বড় বাড়ী ভাঙতে হুকুম দিলেন। পুরানো আমলের অধিকাংশ ভাল বাড়ী এই ভাবে নষ্ট হয়। অতি কষ্টে সহরের লোকে তাঁকে ত্রিশ হাজার ডলার চাঁদা তুলে দিয়েছিল।

মণ্ট পিলির অগ্ন্যুৎপাত: পর্ব্বতশীর্ষ হইতে বিগলমান লাভা-স্রোতের দৃশ্য।

এখানকার বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য চিনি। সহরের চারিধারে আখের ক্ষেত। উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আখ মড়াই করা ও রস জ্বাল দেওয়া হয়।

সাণ্টা ডোমিঙ্গো ও হেইটির মধ্যে ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করবার বিষয়। সাণ্টা ডোমিঙ্গোর লোকে যে ভাষা ব্যবহার করে তা স্প্যানিশ বটে, কিন্তু আসল স্প্যানিশ থেকে এত স্বতন্ত্র যে, ইউরোপ থেকে নবাগত কোনো স্পেনীয় ভদ্রলোক এখানকার ভাষা আদৌ বুঝতে পারবেন না। কিন্তু হেইটির ভাষা ফরাসী—যদিও ফ্রান্সের ফরাসী ভাষার সঙ্গে তার সাদৃশ্য বড় কম।

সমুদ্রের দিক থেকে বড় ঝড় উঠল। আমরা বাত্যাবিক্ষুব্ধ মোনা-প্যাসেজের উপর দিয়ে উড়ে পোর্টো-রিকো পৌছুলাম। পোর্টো-রিকো প্রাচীন বন্দর, এর দেওয়ালে কত শতাব্দীর শৈবাল পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, এর রাজপথের পাথর কত জলদস্যু, বিদ্রোহী ও শত্রুসৈন্যের ঘোড়ার ক্ষুরের ঘায়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, এর বড় ক্যাথিড্রালের সংলগ্ন সমাধি-ভূমিতে দাঁড়িয়ে সেই সব প্রাচীন দিনের কথা আমাদের মনে এল, কলম্বসের কথা মনে এল—যিনি প্রথমে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, প্রথম এই অঞ্চল শাসন করেন।

পোর্টো-রিকোর অদূরে সান্-জেরিনিমো দুর্গ। বহু অর্থ ব্যয়ে এ দুর্গ তৈরী হয়েছিল। এর পুরু পাথরের দেওয়ালের গায়ে এখনও সার ফ্রান্সিস্ ড্রেকের কামানের গোলার দাগ আছে।

কিন্তু কলম্বসের আমলের পোর্টো-রিকো এখন নবীন যুগের সভ্যতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়েছে। এখানেও আমেরিকান সিনেমা, মুষ্টিযুদ্ধের স্থান, খবরের কাগজের ক্যামেরাওয়ালাদের ভিড়, রিপোর্টারদের ভিড়—যুক্তরাজ্যের যে কোনো সহরের সব উৎপাতই আছে। দুঃখ হয় এই যে, জাতিটা এক ছাঁচে ঢালাই করা হচ্ছে, এর প্রাচীনত্ব আর রইল না।

কৃষি এখানকার লোকের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায়। সাধারণতঃ আনারস, আম ও তামাকের চাষই বেশী। এদেশে ধান হয় না, কিন্তু চাউলই এখানকার প্রধান খাদ্য। মাংস অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। বিদেশ থেকে আমদানী শুষ্ক কড্ মাছ বাজারে যথেষ্ট পাওয়া যায়। চাউলও বিদেশ থেকে আসে। এজন্য খাদ্য এখানে সস্তা নয়, অথচ মজুরীর হার সস্তা। পোর্টো-রিকোর প্রধান সমস্যাই এখন দাঁড়িয়েছে এই।

প্রাতঃকালের মেঘরাশি ভেদ করে আমাদের জাহাজ উড়ল। পাশাপাশি তিনটি দ্বীপ, সেণ্ট টমাস, সেণ্ট জন্, সেণ্ট ক্রোয়া—ভার্জ্জিন দ্বীপপুঞ্জের তিনটি শস্যশ্যামল স্থান। সেণ্ট ক্রোয়া বিখ্যাত স্থান, আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন্ এখানে বাল্যকাল কাটিয়েছিলেন এবং বন্দরের জেটিতে প্রথম যৌবনে কেরাণীগিরি করতেন।

সারাদিনই মেঘ ও ঝড়, মাঝে মাঝে বৃষ্টি। মার্টিনিক দ্বীপের কাছাকাছি যেতে ছিন্ন-ভিন্ন মেঘপুঞ্জের মধ্যে সান্ধ্য সূর্য্য দেখা দিলে এবং রামধনু আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগল।

দূরে মণ্ট্ পিলি আগ্নেয়গিরির চূড়া দৃষ্টিগোচর হ'ল। যেন এক হিংস্র দৈত্য চক্রবালরেখায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মণ্ট্ পিলির শীতল ও জমাট লাভাস্রোতের নীচে সেণ্ট্ দিয়ের সহর চাপা পড়ে আছে।

১৯০২ সালে মণ্ট্ পিলির অগ্ন্যুৎপাতে এই সহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং ত্রিশ হাজার লোক মারা পড়ে, একথা অবশ্য পুরাতন ইতিহাস। কিন্তু মণ্ট্ পিলির শিখরদেশস্থ অগ্নিকটাহের ভীম ভৈরব মূর্ত্তি সেই পুরাতন দুর্দ্দৈবের কাহিনী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলে। পাইলট হকিন্সের পরিচালনায় উড়ো-জাহাজ মণ্ট্ পিলির শিখরের উপরে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল এবং সেই সময় আমরা তার ফটো নিলাম।

ট্রিনিডাডের প্রসিদ্ধ পিচ্-হ্রদ : তিন বিঘা জমির অধিক স্থান বিস্তৃত এই হ্রদ ট্রিনিডাডের সরকারের বিশেষ লাভের ব্যবসায়।

পরদিন আমরা সেণ্ট্ লুসিয়া সহরে গভর্ণরের বাড়ীতে যখন চা পান করছি, তখন বহুদূর পশ্চিমে মণ্ট্ পিলির শিখর অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি মণ্ট্ পিলির আগ্নেয় গহ্বর আবার জেগেছে, রাত্রে প্রায়ই ধোঁয়া বার হতে দেখা যায়। ট্রিনিডাডের পথে রওনা হবার সময় মণ্ট্ পিলির এই ঈষৎ অস্পষ্ট ও সম্ভবতঃ ধূমায়মান শিখর রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি ও পম্পেয়াই-এর ধ্বংসের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলে।

ট্রিনিডাড বন্দরে পৃথিবীর সকল জাতি এসে ব্যবসা বাণিজ্য করছে। হিন্দু, চীনাম্যান, আমেরিকান্, ইংরেজ, নিগ্রো, ইণ্ডিয়ান ট্রিনিডাডের রাজপথে এরা প্রতিদিনের পথিক। সহরের বাইরে কোকো আর কাফির বড় বড় ক্ষেত। বড় বড় তাল জাতীয় গাছ, বাতাসে তাদের পাতা খড়্খড়্ শব্দ করছে। তার নীচে চীনা মেয়েরা হকি খেলছে,

সাইকেলে চেপে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, কোথাও হিন্দু মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে, কোথাও খৃষ্টানদের গীর্জ্জা, মুসলমানদের মস্‌জিদ। পথের পাশে ছোট বড় বাংলা, নানা ধরণের পুষ্পিত লতা ছাদের উপর উঠেছে, দোদুল্যমান কাঠের গায়ে দুষ্প্রাপ্য অর্কিড্।

এক সময়ে দাস-ব্যবসায় এখানকার প্রধান ব্যবসা ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় আইনের দ্বারা ঐ কুপ্রথা রহিত করা হয়। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে কুলী আমদানীর প্রথা প্রবর্ত্তিত হ'ল। বর্ত্তমানে ট্রিনিডাডের অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ এই ভারতবর্ষীয় হিন্দু কুলীদিগের বংশধর।

ট্রিনিডাডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিখ্যাত পিচ্ হ্রদ। এখানকার পিচ অফুরন্ত। যত তোলা যায়, নীচে থেকে সেই পরিমাণ জমাট পিচ ঠেলে উঠে শূন্য স্থান পূরণ করে দেয়। ৪০ বছর ধরে এই হ্রদ পৃথিবীর সকল বড় সহরের রাস্তা পিচ দিয়ে মুড়ে দিয়েছে—কিন্তু দেখতে ৪০ বছর আগে যা ছিল এখনও তাই আছে। এর অস্তিত্ব সেকালেও অজানা ছিল না, কারণ স্যর ওয়ালটার র‍্যালে এই হ্রদের পিচ দিয়ে তাঁর জাহাজের চেরা ও ভাঙা জায়গাগুলো মেরামত করেছিলেন।

হাওয়াই হইতে স্যানফ্রান্সিস্‌কো

(আকাশ পথে)

মিস্ এমেলিয়া ইয়ারহার্ট একজন তরুণী মার্কিণ মহিলা। সম্প্রতি তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপ থেকে এরোপ্লেনে একা কালিফোর্নিয়ার স্যানফ্রান্সিসকো বন্দর পর্য্যন্ত উড়ে গেছেন। তাঁর আকাশ-ভ্রমণের বৃত্তান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হল :—

২২শে ডিসেম্বর আমি লস্ এঞ্জেলস্ থেকে জাহাজে হনোলুলু আসি। আমার এরোপ্লেনখানা আমার সঙ্গে এসেছিল জাহাজের টেনিস-ডেকে প্যাক্ করা অবস্থায়। হনোলুলু এসে আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ দেখে মনটা কিছু দমে গেল। দিন কয়েক অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে হল। আমার এরোপ্লেনের মোটর খুব ভাল অবস্থায় ছিল। সমুদ্রে যে কয়দিন এসেছিলাম, পাছে নোনা জলের হাওয়ায় মোটর খারাপ হয়ে যায়, এই ভয়ে রোজ চালিয়ে দেখে পরীক্ষা করতাম। এরোপ্লেনের রেডিও সেট্‌টাও পরীক্ষা করে দেখে নিতাম ঐ সঙ্গে। স্যানফ্রান্সিসকো বন্দর থেকে যখন আমরা হাজার মাইল এসেছি, তখন এরোপ্লেনের অনেকগুলি বড় আড্ডার বেতারবার্ত্তা আমার রেডিওর সাহায্যে শোনা গেল।

এমেলিয়া ইয়ারহার্ট : হনোলুলু হইতে ওকল্যাণ্ড পর্য্যন্ত ২৪০০ মাইল ব্যাপী ১৮ ঘণ্টা বিমান-যাত্রার পর।

আবহাওয়ার জন্যে যে ক'দিন হনোলুলুতে ছিলাম, এরোপ্লেনের কলকব্জা প্রত্যহ পরীক্ষা করা হ'ত। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে, কখনও এ বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখাতে নেই। এরোপ্লেন যখন উড়ছে না, তখনই কলকব্জা পরীক্ষার সুবিধা, সুতরাং সে অবস্থায় দুবেলা যদি তা করা যায়, খুবই ভাল। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সামরিক উড়ো-জাহাজ-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, এজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

১১ই জানুয়ারী আবহাওয়া-বিভাগের রিপোর্ট যা পাওয়া গেল, তাতে সেইদিনই রওনা হওয়া উচিত মনে হ'ল। ঐদিন বিকাল ২টার সময় ওড়বার ঠিক করেছিলাম, কিন্তু সকাল থেকেই সুরু হল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। দুপুরের পর রীতিমত ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামল। বাতাস ঘুরে গিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে বইতে সুরু করল।

মাটী ভিজে নরম হয়ে গিয়েছে বৃষ্টিতে, আমার এরোপ্লেনে বোঝাই অনেক, পাঁচশ' গ্যালন গ্যাসোলিন ত আছেই, তা ছাড়া আরও অনেক জিনিস তাতে চাপান। সুবিধের মধ্যে যেখান থেকে এরোপ্লেন উড়বে, সেই জমিটা ছয় হাজার ফুট লম্বা। তিন হাজার ফুট লম্বা পথ পেলেই এরোপ্লেন বেশ জমি থেকে উঠতে পারে, সুতরাং আমি ঠিক করলাম, আবহাওয়ার অবস্থা যাই হ'ক, আমাকে উড়তেই হবে।

সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীরা সেই কর্দ্দমাক্ত জমি চেঁছে আমার জন্যে একটা পথ তৈরী করে সেই পথের ধারে ধারে সাদা নিশান পুঁতে দিলেন। আমি যেখানে ছিলাম, কিছু সময় অন্তর অন্তর সেখানে তাঁরা টেলিফোনে আবহাওয়া সংক্রান্ত খবর পাঠাচ্ছিলেন।

আমি দুপুরের পর একটু ঘুমিয়ে নিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি বৃষ্টি সমান জোরেই পড়ছে, বেলা তখন প্রায় আড়াইটা। সাড়ে তিনটার সময় বৃষ্টি একটু কমল। বাতাস নেমে গেল, মেঘ কেটে যাবে মনে হ'ল। আর দেরী করা উচিত নয়, রওনা যদি হতে হয়, তবে এই বেলা। আমি তখনই এরোড্রোমে গিয়ে ওড়বার পূর্ব্বে সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললাম। অনেকে বারণ করলে, কিন্তু আমি দেখলাম এখন না উড়লে, অনির্দ্দিষ্ট কাল আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে।

এরোড্রোমে পৌছে দেখি জমি অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত, এরোপ্লেনখানা ভিজে সপ সপ করছে, মনটা আবার দমে গেল। বন্ধু-বান্ধবদেরও দেখি তেমন উৎসাহ নেই। কারো ইচ্ছে নয় যে আমি এখন রওনা হই। আমি আমার জিনিষপত্র এরোপ্লেনে তুলতে বললাম। মোটর গরম করবার আদেশ দিলাম। সাড়ে চারটার সময় এরোপ্লেনে চড়ে বসলাম, আর একবার মোটর পরীক্ষা করে দেখলাম।

লেক বন্দর : টেলেমার্ক।

প্রায় দুশো লোক ওড়বার মাঠে জমা হয়েছে। বৃষ্টির দরুণ বেশী লোক আসতে পারে নি। সকলেরই মুখে চোখে একটা উদ্বেগ ও আশঙ্কার চিহ্ন। একটা দুর্ঘটনা আসন্ন, সকলেরই মনে যেন এই ভাব।

সামনের দিকে চেয়ে দেখি যেখান পর্য্যন্ত এরোপ্লেন মাটীর ওপর দিয়ে গিয়ে তারপর আকাশে উঠবে, মাঠের সেই দূর প্রান্তে আগুন নেবানোর জন্যে তিনখানা দমকল রাখা হয়েছে। সামরিক বিভাগের প্রত্যেক লোকের হাতে একটা করে আগুন নেবানোর যন্ত্র।

এ রকম ব্যবস্থার প্রয়োজন যে আদৌ ছিল না তা নয়। আমার মত অত জিনিষপত্র বোঝাই এরোপ্লেন মাটী থেকে আকাশে উঠবার মুখেই প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটায়। অনেক বৈমানিক প্রাণ হারিয়েছে ঐ রকম দুর্ঘটনায়। এরোপ্লেন উল্টে সব শুদ্ধ জলে ওঠে। আমার এরোপ্লেনে বোঝাই ছিল ৬০০০ পাউণ্ড, তার ওপর ঘোর বৃষ্টিতে মাটীর অবস্থা খুব খারাপ, সুতরাং দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা খুবই বেশী ছিল।

৪-৪৫ মিনিটের সময় এরোপ্লেন মাটীর ওপর দিয়ে ছুটতে সুরু করলে। অনেকে চলন্ত এরোপ্লেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসতে লাগল, আমার এরোপ্লেনের পুচ্ছ ভিজেমাটী চেঁছে একটা গোলাকার ঘাস ও কাদার বল তৈরী করে টেনে আনছিল, একজন সেটা ছাড়িয়ে এরোপ্লেনের পুচ্ছটাকে হালকা করে দিলে।

আমি সামনে চেয়ে ভাবছি, যেখান পর্য্যন্ত ছুটে গিয়ে এরোপ্লেনের মাটী ছেড়ে আকাশে উঠবার কথা, সেখানে গিয়েও যদি এরোপ্লেন না ওঠে, তবে মোটর থামিয়ে দেব, না আরও তিন হাজার ফুট এগিয়ে যাব। এমন সময় এরোপ্লেনের পুচ্ছ মাটী ছেড়ে জমির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে উঠে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেন হালকা হয়ে গেল। তারপরেই গোটা এরোপ্লেনটা মাটী থেকে যেন একটা লাফ দিল, হঠাৎ চেয়ে দেখি আমি শূন্যে উড়ছি।

একবার চার্ট মিলিয়ে নিয়ে এরোপ্লেনের মুখ হনোলুলু ও ডায়মণ্ডহেডের দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। হনোলুলু সহরের ওপর দিয়ে চলেছি, বৃষ্টিতে দূরের সমুদ্র, হনোলুলু সহরের বাড়ীঘর সব ঝাপসা। মাকালুলু দ্বীপ হনোলুলু থেকে অনেক দূর সমুদ্রের মধ্যে, তাও ছাড়িয়ে চলেছি। আমার বাঁয়ে মোলোকাই দ্বীপ, বৃষ্টির ঝাপটার মধ্যে দিয়ে একটু একটু চোখে পড়ছে।

আমার চারিদিকে ঘন মেঘপুঞ্জ, তাদের ওপরে যাওয়ার জন্যে আমি ৬০০০ ফুট ওপরে উঠলাম। একটা কথা এখানে বলি। এর আগে এবং পরে আমি মহাসমুদ্র বার কয়েক বিমানযোগে পার হয়েছি, কিন্তু সবশুদ্ধ এক হাজার মাইল বিস্তীর্ণ জল আমার চোখে পড়েছে কি না সন্দেহ। এর কারণ আমার আর সমুদ্রের মধ্যে সব সময়ই ছিল ঘন মেঘস্তরের ব্যবধান।

প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে সে রাত্রে যখন উড়ে চলেছি, তখন মাথার উপরকার আকাশ নক্ষত্রে ভরা। মনে হচ্ছিল নক্ষত্রের দল আমার 'ককপিটে'র যে জানালা, তার ঠিক বাইরে, হাত বাড়ালেই যেন ধরা যাবে। দুপুর রাত্রির পরে একটা নক্ষত্র দেখলাম। সেটা অন্য সব নক্ষত্র থেকে ভিন্ন। সেটা অত্যন্ত লাল, তার জ্যোতি নক্ষত্রের জ্যোতির চেয়ে অনেক বেশী।

কি ওটা? লাইট হাউসের আলো?

তারপরেই বুঝলাম সমুদ্রের বিস্তীর্ণ বক্ষ ভেদ করে কোন বড় জাহাজ যেতে যেতে বেতারে আমার ওড়ার খবর পেয়েছে এবং তার সার্চ্চলাইট ওপরের দিকে তুলে আমায় পথ দেখতে সাহায্য করছে। আমি এরোপ্লেনের গ্যাসের সার্চ্চলাইট তাদের দিকে ফেলে প্রত্যভিবাদন করলাম।

আমার কাণে বেতারের হেডফোণ পরান ছিল। তার মধ্যে দিয়ে শোনা গেল, নীচের জাহাজ থেকে চারিদিকে বেতার-সংবাদ পাঠান হচ্ছে যে, আমার এরোপ্লেন দেখা গিয়েছে, অর্থাৎ আমি এখনও নিরাপদে আছি। জাহাজের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলবার যন্ত্র আমার ছিল না, তবুও সেই মহাশূন্যে মানুষের অতি দূর সংস্পর্শেও মনটা খুসি হয়ে উঠল। পরে আমি দেখেছিলাম সেখানা ম্যাটসন কোম্পানীর জাহাজ 'ম্যালিকো'। হনোলুলু থেকে ৯০০ মাইল দূরে সমুদ্র-বক্ষে আমরা পরস্পরকে দেখি।

আমার চোখের সামনে একটা নক্সা টাঙানো ছিল, তাতে হনোলুলু থেকে স্যানফ্রান্সিসকো পর্য্যন্ত সমুদ্র-পথ ও ওই সমুদ্র-বক্ষে কোন্ জাহাজ কোথায় আছে, তাদের সঙ্গে কোথায় আমার দেখা হবে এ সব আঁকা ছিল। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, এত বড় সমুদ্রে দুটি ক্ষুদ্র বিন্দুর সঙ্গে পরস্পর দেখাশোনার সম্ভাবনা খুবই কম, বিশেষ করে যখন একটা বিন্দু আর একটার কয়েক হাজার ফুট উপরে।

ভোরের দিকে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের নৌবহরের একখানা ছোট জাহাজ আমার এরোপ্লেন দেখতে পেয়েছে বলে সংবাদ দিয়েছিল চারিদিকে, কিন্তু এ জাহাজখানা আমার চোখে পড়ে নি।

এর আগে আমি যখন আটলান্টিক পার হয়েছিলাম, তখন সূর্য্যাস্ত দেখা ভাগ্যে ঘটে নি, এবার কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে সূর্য্যোদয় দেখলাম। একটু দক্ষিণ দিক ঘেঁসে সূর্য্য উঠল, আমার পক্ষে সেটা খুব ভালই বলতে হবে, কারণ সোজাসুজি সূর্য্যের কিরণ চোখে পড়লে মোটা কাঁচের পরকলাওয়ালা চশমা পরা সত্ত্বেও কষ্ট হ'ত।

এতক্ষণ আমি ৮০০০ ফুটের উপর দিয়ে চলে এসেছি, কারণ আবহাওয়া আফিসে বলে দিয়েছিল, অত উঁচু দিয়ে না গেলে অনুকূল বায়ু পাওয়া যাবে না। সকাল থেকে বেলা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত কি ভয়ানক কুয়াসা চারিদিকে! যে দিকে চাই আকাশ দেখা যায় না, সমুদ্র দেখা যায় না, আমার এরোপ্লেনের ডানার দূর প্রান্তটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না—শুধু আমি, আর ককৃপিট। আর আমার চালানোর যন্ত্রখানিও সামনে।

পনের ঘণ্টা অনবরত চালানোর পরে কুয়াসা একটু একটু কাটতে আরম্ভ করল। ঘন কুয়াসার দেওয়ালের মধ্যে জায়গায় জায়গায় বড় বড় গর্ত্ত দেখা দিল। যে কুয়াসা প্রাচীরে আমার এই পনের ঘণ্টা আবদ্ধ করে রেখেছিল, ওগুলো যেন তার গায়ে ফোটানো জানালা।

সেই মুক্ত বাতায়নপথে আমি চেয়ে দেখলাম নিম্নের নীল সমুদ্র, প্রভাতের সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত অগণিত উর্ম্মিমালা।

আমার বাঁ দিকের প্রাচীরগাত্রে একটা বড় জানালা খুলে গেল। সেই দিকে চেয়ে দেখি সমুদ্র-বক্ষে খুব বড় একখানা জাহাজ। আমার ভয় কেটে গেল, তা হ'লে কুয়াসায় আমি পথ হারিয়ে ভুল পথে যাই নি, জাহাজ যাতায়াতের পথ ধরেই চলেছি।

আমি নেমে এলাম, মাত্র ১৫০০ ফুট ওপর থেকে জাহাজ খানার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে জাহাজের গতি ও গমনপথের সঙ্গে এরোপ্লেনের গতি মিলিয়ে দেখলাম। সেখানা বিখ্যাত ডলার লাইনের নতুন তৈরী জাহাজ 'প্রেসিডেন্ট পিয়ার্স'। জাহাজ থেকে বেতারে আমায় জানালে স্যানফ্রান্সিস্‌কো বন্দর আর ৩০০ মাইল দূরে। আমি অত উঁচুতে আর না উঠে বাকী পথটুকু ১৫০০ ফুট উপর দিয়ে চললাম।

এরোপ্লেনে কোন জায়গা পৌঁছবার শেষ দু ঘণ্টা সকলের চেয়ে কষ্টকর। এখানেই দিগ্‌ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। মেঘে ও দূরবর্ত্তী উপকূলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। কোন্‌টা মেঘ কোন্‌টা বা জমি তা বুঝে নেবার উপায় নেই।

দিক ভুলের সম্ভাবনা যেমন এখানে বেশী, তেমনি এখানেই আবার অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত পরীক্ষা-ক্ষেত্র। যন্ত্রপাতি ও কম্পাস যেটা ঠিক দিক বলে নির্দ্দেশ করছে, মানুষের মন বলে সেটা ঠিক দিক নয়। অনভিজ্ঞ লোক এখানে চোখের বশে চলতে চাইবে, যন্ত্রকে অবিশ্বাস করে। কিন্তু অভিজ্ঞ লোক জানে যে, যখন চোখ ও যন্ত্রের মধ্যে বিবাদ বেধে যাবে, তখন যন্ত্রকে বিশ্বাস করবে, চোখকে নয়।

প্রথম জমি দেখা গেল কালিফোর্ণিয়ায় পিলার পয়েন্ট। কিন্তু এত ঝাপসা দেখা গেল যে, আমার মনে হ'ল কালিফোর্ণিয়ার উপকূলে খুব মেঘ কি কুয়াসা হয়েছে। আমার অনুমান ঠিক—আর একটু এগিয়ে দেখি খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ডাইনে একটু ঘুরে গেলাম—একটা উঁচু পাহাড় যেন আমার দিকে ছুটে আসছে—তারপরেই আমার এরোপ্লেনের নীচে জমি দেখা গেল।

হনোলুলু থেকে আমেরিকা মহাদেশে পৌঁছে গিয়েছি! ঠিক আঠার ঘণ্টা লাগল।

সেবার যখন একা আটলান্টিক মহাসাগর পার হই, তখন নামি গিয়ে আয়ারল্যাণ্ডে এক কৃষকের আলুর ক্ষেতে। এরোপ্লেনের এঞ্জিনের শব্দ শুনে তিনটি আইরিশ কৃষক ব্যাপার কি দেখতে এল। তাদের যখন বললাম আমি আমেরিকা থেকে আসছি, তারা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। অর্থাৎ মুখের উপর 'মিথ্যাবাদী' বললে না।

এবার ওক্‌ল্যাণ্ড এরোড্রোমে যে হাজার লোক জড় হয়েছিল, তাদের বলবার প্রয়োজন হল না, আমি কোথা থেকে আসছি। আমি ককৃপিট খোলবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ক্যামেরার খুটখাট শব্দ শোনা গেল, মাইক্রোফোন নিয়ে লোক এগিয়ে এল আমি কি কথা বলি তাই বেতারে ধরবার জন্যে।

সমুদ্রে আমার এরোপ্লেন যদি পড়ে যেত, কয়েকদিন জলের উপর ভেসে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করেই হনোলুলু থেকে রওনা হই। এরোপ্লেনের পুচ্ছের দিকে যেখানে পেট্রোল ট্যাঙ্ক বসানো তার পেছনে একটা রবারের ভেলা আটকানো ছিল। কার্ব্বণ ডায়োক্সাইড গ্যাসভরা টিউবের সাহায্যে ভেলাটা এক মিনিটের মধ্যে ফোলান যেত। ভেলার মধ্যে একটা মুখআঁটা থলির মধ্যে টোমাটোর রস, চকোলেট, জমাট দুধের বড়ি, স্যাণ্ডউইচ ও জল ছিল।

সমুদ্রে পড়লে এরোপ্লেন যদি না ডুবে যেত, এই রবারের ভেলায় চড়ে সমুদ্রে আমায় ভাসতে হ'ত। অন্য এরোপ্লেন বা জাহাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করবার জন্যে আমার কাছে লাল ও সবুজ হাউই ছিল। এ ছাড়া অনেকগুলো ছোট বেলুনে লাল রেশমের নিশান বাঁধা ছিল, শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে এগুলো অনেক উঁচুতে উঠিয়ে দিলে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার সম্ভাবনা।

আমি জানি অকূল সমুদ্রে এসবেও কিছু হয় না। বিপদ যখন আসবার হয়, সহস্র উপকরণেও তাকে এড়ানো যায় না। মানুষ জল না খেয়ে কতদিন বেঁচে থাকতে পারে আর আমার ছোট রবারের ভেলাতে কতটুকু জলই বা ধরে! দু' তিন দিনের মধ্যে কারো মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম না হলে মৃত্যু ছিল অনিবার্য্য।

আকাশপথে এই আঠার ঘণ্টার মধ্যে আমি কি খেয়েছিলাম এ প্রশ্ন আমায় অনেকে করেছেন। এইখানে প্রথমেই একটা কথা বলি। যে কোনও দায়িত্বপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য কাজ করবার সময় বেশী কিছু খাওয়া উচিত নয়, একথা যদি সত্যি হয়, আকাশপথে বহুদূরে উড়ে যাওয়ার সময় যে খুব কিছু খাওয়া উচিত নয়, এটা আরও বেশী সত্যি।

আমি খেয়েছিলাম সামান্য একটু টোমাটোর রস, একটা ডিমসিদ্ধ এবং থার্ম্মোবোতলে আনীত এক পেয়ালা গরম কোকো। পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে ৮০০০ ফুট উর্দ্ধে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ওপর ঘনীভূত মেঘ ও কুয়াসার মধ্যে বসে এক পেয়ালা গরম কোকো খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত বলে মনে হয়েছে।

এ সব আয়াসসাধ্য কাজের সময় প্রকৃতই খাদ্যের বিশেষ কোন দরকার হয় না। খাওয়ার কথা মনেই থাকে না, মন সম্পূর্ণ অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। অতিরিক্ত আহারে এ অবস্থায় চিন্তাশক্তির জড়তা আসে।

আমার এরোপ্লেনখানা তিন বছরের পুরানো। এর মধ্যে দুজন যাত্রীর বসবার স্থান ছিল, কিন্তু দূর ভ্রমণের জন্যে ঐ যাত্রীদের আসনের বদলে সেখানে পেট্রোলের ট্যাঙ্ক বসিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তিন বছর আগে এই এরোপ্লেনেই আমি আটলাণ্টিক পার হই। কুড়ি ঘণ্টা চলবার উপযুক্ত পেট্রোল ভরে নেওয়ার যায়গা আছে এতে। এই এরোপ্লেনেই এক বার সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করবার ইচ্ছা করেছি, যদিও জানি না সেটা কতদূর সম্ভব হয়ে উঠবে।

প্যারিস হইতে স্থলপথে কাশ্মীর

১৯৩১ সালে ইউরোপ হইতে একদল বৈজ্ঞানিক স্থলপথে মোটরযোগে সিরিয়া, ইরাক, পারস্য ও আফগানিস্থান হইয়া কাশ্মীর আসেন। ডাঃ মেনার্ড উইলিয়াম্‌স্ এই দলের রিপোর্টার ও জর্জ্জেস্ হার্ড দলপতি ছিলেন। ইঁহারা ভ্রমণ করেন অবশ্য মোটরযোগে, মাঝে মাঝে যেখানে জল আছে, মোটরশুদ্ধ ষ্টীমারে পার হন। স্থলপথে মোটরে আসবার সুবিধা অসুবিধা কি রকম, মিঃ উইলিয়াম্‌স্ এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর সেই প্রবন্ধ থেকে নীচে কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

"আমরা যাত্রা সুরু করি প্যারিস্ থেকে। অনেক বড় বড় খবরের কাগজের প্রতিনিধিরা এসে আমাদের তুলে দিয়ে গেল Gare de Lyon ষ্টেশনে। রুমাল ওড়াতে লাগল, গাড়ী ছাড়লে, ফটো নেওয়া হোল, বক্তৃতা হোল—সে এক হৈ হৈ ব্যাপার। ইউরোপের কথা বেশী বলবো না, ভূমধ্য সাগর পার হয়ে আমাদের প্রকৃত যাত্রা আরম্ভ হোল বাইরুৎ থেকে। এখানে আমাদের এবারকার এই ভ্রমণের উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী করা ছ'খানা সিট্রয়েন্ গাড়ী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। দু-খানাতে মালপত্র, তাঁবু ইত্যাদি বোঝাই। সিরিয়া ও ইরাকের মরুভূমি পার হতে হবে বলে একখানা মোটর গাড়ীতে ছিল শুধু পানীয় জলের ট্যাঙ্ক—বাকী চারখানাতে আমাদের থাকবার, রাঁধবার, শোবার ব্যবস্থা ছিল।

পারস্যের পথ: পাশাপাশি মোটর গাড়ী ও গর্দ্দভচালিত শকটবাহিনী এ পথের সর্ব্বত্র দেখা যায়।

আমাদের দলের নায়ক মিঃ হার্ড এর আগে একবার মোটরে সাহারা মরুভূমি পার হয়ে, আফ্রিকার ঘনজঙ্গল পার হয়ে কায়রো থেকে কেপটাউনে গিয়েছিলেন ১৯২৪ সালে। এ ধরণের ভ্রমণ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট, সব বিষয়েই তিনি আমাদের নায়ক হবার উপযুক্ত।

লেবানন পর্ব্বতের উপর দিয়ে আমাদের মোটরের পথ চলেছে। পাশে কোনো কোনো স্থানে গভীর খড্, মাঝে মাঝে লেবাননের বিখ্যাত সিডার বৃক্ষের বন। পথ খুব ভাল, কেবল একটু মুস্কিল হয়ে পড়ে যখন সামনের দিক থেকে আর একখানা মোটর এসে পড়ে—সে সরু রাস্তার পাশাপাশি দুখানা মোটর যাওয়া এক রকম অসম্ভব। মাথার ওপরে তুর্কী গবর্ণমেন্টের এরোপ্লেন উড়ছিল—তারা সঙ্কেতে তাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলে।

এন্টিলেবাননে নেমে এসে বারাডা নদীর ধারে আমরা তাঁবু ফেললাম। বারাডা নদী খুব বড় নয়, তবে স্রোত অত্যন্ত প্রখর। এখানে গরম নেই, বড় বড় ওক আর সিডার গাছের শীতল ছায়া নদীর ধারে! রাত্রে ঘুমিয়ে আরাম হল। সকালে উঠে বাজারে বেড়ালাম—যথেষ্ট তরমুজ, আঙ্গুর বিক্রী হচ্ছে, আরও নানা ধরণের প্রাচ্যদেশীয় ফলমূল, সব চিনি নে। এখানে বিখ্যাত বীর সালেউদ্দীনের সমাধি আছে, অনেক ভেঙে চুরে গিয়েছে।

৮ই এপ্রিল আমরা আবার রওনা হলাম। স্পাহী সৈন্যদল যুদ্ধের পোষাক পরে বাজনা বাজাতে বাজাতে আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল নগরের বাইরে অনেকটা পর্য্যন্ত। ফরাসী দুর্গাধ্যক্ষ আমাদের শুভেচ্ছা জানালেন। রাস্তায়

বেজায় ধূলো—গাধার পিঠে তরিতরকারি বোঝাই দিয়ে কৃষকেরা জেডের বাজারে বিক্রী করতে চলেছে। রঙীন্ পোষাকে সুন্দরী সারকেশীয় তরুণীরা গাধার পিঠে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, কেউ কেউ কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমাদের অদ্ভুতদর্শন মোটরগাড়ীর সারির দিকে। মাথার ওপর আবার একখানা এরোপ্লেন উড়ছে—সেখানে খুব নামতে সুরু করলে, মাথায় পড়ে আর কি!...এরোপ্লেন থেকে একগোছা কাগজ পড়ল। এরোপ্লেনে আছেন আমাদের ঐতিহাসিক বন্ধু পিয়ের পোয়াদেবার, তিনি অনেক দিন থেকে এই অঞ্চলে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর রোমান প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। তাঁর বাণী আমাদের মনের আনন্দ ও উৎসাহ আরও বাড়িয়ে তুললে।

মরুময় পথ। গাছপালা কোথাও নেই। কি রোদই চড়েছে! অনাবৃত পাহাড় চারিধারে খাঁ খাঁ করছে। সিরিয়ায় মরুভূমি সুরু হল। রাস্তাও ভাল নয়, বালিতে চাকা বসে যাচ্ছে।

পামিরা। খর্জ্জুরকুঞ্জবেষ্টিত সুন্দর ছোট্ট সহর, শুভ্র দীর্ঘ গম্বুজ ও মিনারেট নীল আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আরব্য উপন্যাসের সহরই হত যদি না হোটেল জেনোবিয়ার সদর দরজায় বেদুইন শেখেরা দামী দামী মোটর গাড়ী করে না নামত, খেজুরতলায় বসে আমেরিকান সিগারেট ও আইস্ক্রিম না খেত, আর যদি তাদের চোখে এক একজোড়া রঙীন্ ভারী চশমা না থাকত। নাঃ, রোমান জিনিষটা পৃথিবীতে আর কোথাও রইল না। কেবল মেয়েদের পোষাক এখনও পুরোনো-কালের মতই আছে বটে। আর পথে ছাগলের চামড়ার পোষাক পরা ভিস্তিদের দেখে মনে হল বাইবেলের যুগ এখনও এই সব প্রাচ্য সহরের অন্ধকার কোণে লুকিয়ে আছে। তবে খুঁজে না দেখলে মেলে না। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট পামিরাতে নতুন সহর তৈরী করছেন। জলকষ্ট দূর করবার জন্যে অনেক বড় বড় কূপ খনন করা হয়েছে। কিন্তু মিষ্ট জল পাওয়া দুষ্কর। অধিকাংশ কূপের জল বিকট তেতো। এখানে বহু প্রাচীন একটি মসজিদ আছে। সহরের উত্তরে একটা দুর্গ তৈরী হচ্ছে।
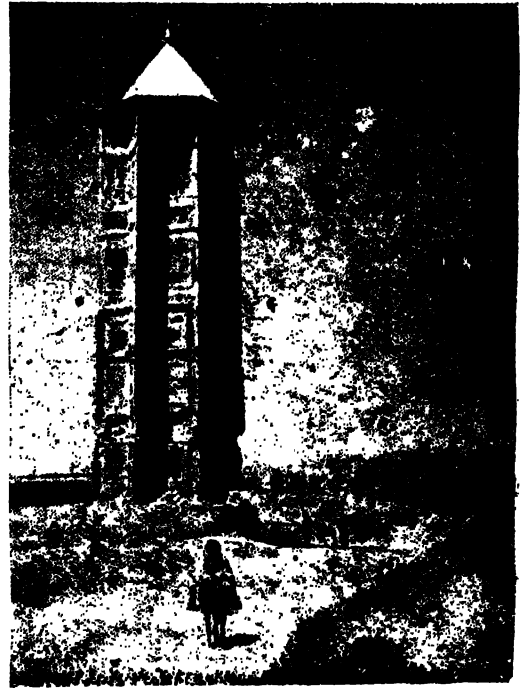
গজনী: সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বিজয়-স্তম্ভ।

দুদিন পরে আমরা রুৎবা পৌছুলাম। রুৎবাতে একটা বড় দুর্গ আছে, অনেক সৈন্য থাকে। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত ঘেরা। ইরাকী প্রহরী সৈন্য রাইফেল ঘাড়ে করে দুর্গপ্রাচীরের ওপর পায়চারী করছে। বেতারের উঁচু মাস্তুলের তলাতেই দুর্গের কফিখানা। সামনেটা এরোপ্লেন নামবার উঠবার মাঠ। যাত্রীদের জন্যে ছোট একটা হোটেল।

তার পরে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে বাগদাদের দিকে যাত্রা সুরু হল। এই মরুভূমি অত্যন্ত ভীষণ, জল কোথাও নেই, গাছপালার চিহ্ন ত নেই-ই। কোনোদিকে মাঝে মাঝে রুক্ষদর্শন পাহাড়। এই পথে তৃষ্ণায় ও রৌদ্রের উত্তাপে প্রতিবৎসর অনেক লোক মারা যায়।

মরুভূমির আবহাওয়া অতি অদ্ভুত। দিনের গরম কল্পনার অতীত, কিন্তু রাত্রে খুব শীত। শেষ রাত্রে মনে

হয় যে তাঁবুর বাইরে বোধ হয় বরফ পড়ছে। দিনের উত্তাপে পাঁউরুটী শুকিয়ে এমন কঠিন হয়ে যায় যে ছুরি দিয়ে কাটা শক্ত। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ে। আর্দ্রতার লেশমাত্র নেই বাতাসে। আর ধুলো, ধুলো, সর্ব্বত্র ধুলো আর বালি।

দুপুর বেলা দিগন্তের রুদ্ররূপ দেখলে ভয় হয়।

মরুভূমি পার হয়ে ইউফ্রেটিস নদীর শীতল বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। ইউফ্রেটিসের শ্যামল তীরভূমিতে ফলের বাগানে শস্যক্ষেত্রে কেমন একটা নারীসুলভ কমনীয়তা আছে। ইরাকের মরুভূমি বর্ব্বর মরুদস্যু পুরুষ। ইউফ্রেটিসের উপত্যকা সুন্দরী লজ্জাবতী সারকেশীয় তরুণী। পিচের ফুল ফুটেছে, ছোট ছোট খালের দুধারে ছোট ছোট বনফুলের গাছ, পাখীর ডাকে মুখর সকাল সন্ধ্যা।

কালাৎ-এল্-হুসন্ দুর্গ : মধ্যযুগের ক্রুজেদ যুদ্ধের সময় এই দুর্গ অধিকার করিতে মুসলমানদের একশত বৎসর লাগিয়াছিল। প্রায় ২০ মাইল বিস্তৃত সমতলভূমি ইহার উত্তরে দেখা যাইতেছে।

১৬ই এপ্রিল ইউফ্রেটিস পার হয়ে আমরা মেসোপোটেমিয়ার মাটীতে পা দিলাম। তাল খেজুরের প্রাচুর্য্য সর্ব্বত্র। মেসোপোটেমিয়াতে মোটর গাড়ীর সংখ্যা বেশী। রাস্তায় মোটরের ভিড় খুব! ইরাকী বয়স্কাউট বোঝাই দুখানা বাস নিশান উড়িয়ে যাচ্ছে। ভেড়াবোঝাই একখানা লরী চলে গেল।

বাগদাদ দেখে হতাশ হতে হল। আরব্য উপন্যাসের বাগদাদ কি এই! বড় বড় হোটেল ফরাসী ও আমেরিকান কায়দায় সাজানো। পথে মোটরের ছড়াছড়ি, ট্রাফিক পুলিশ মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, রেডিওতে গান হচ্ছে পূর্ব্ব ইউরোপের যে কোনো সহরের মত। কাজিমাই মসজিদের ধারে সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে পুরানো কালের বাগদাদের যা একটু আভাস পাওয়া গিয়েছিল, রাত্রে ফরাসী কন্‌সালের বাড়ীতে ডিনার খেতে গিয়ে সেটুকুও নষ্ট

হয়ে গেল। রাজা ফৈজুল আমাদের সঙ্গে দেখা করে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলেন, আমাদের মোটরগাড়ী দেখতে চাইলেন, মিঃ হার্ডকে আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে সাগ্রহে অনেক প্রশ্ন করলেন।

পারস্যের দিকে রওনা হওয়া গেল। পথে দু' একটা নদী পার হোতে হল। ঘোলাজলে মেয়েরা কাপড় কাচছে। হাড়গিলে পাখীর দল বসে আছে জলের ধারে, মাঝে মাঝে বাদাম গাছ। তক্ষশীলা ও কাশ্মীর! কত দূরে—অনন্ত বালির সমুদ্রের কোন্ পারে? আমাদের মনে হচ্ছিল দিগ্বিজয়ী আলেক্জাণ্ডারের পরে আমরাই যেন প্রথম চলেছি এপথে।

পারস্য সীমান্তে পারস্য গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী কর্ণেল এস্‌ফেনদিয়ারী আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। পারস্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের যাবার সময় তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এ পথে দস্যুর উপদ্রব খুব, এজন্যে তাঁর সঙ্গে লরীবোঝাই রাইফেলধারী রক্ষীসৈন্য আছে।

বিহিস্তান শৈলগাত্রে খোদিত দারায়ুসের শিলালিপি। ব্যাবিলন ও এসিরিয়ার ভাষা এই লেখ হইতে আবিষ্কৃত হয়।

শাহান্‌শাহ সিংহাসন: ১৭৩৮ সনে ভারতবর্ষ হইতে নাদির শাহ এই সিংহাসন পারস্যে লইয়া যান বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

পারস্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। সত্যিই সুন্দর দেশ। দিগন্তের রং অপূর্ব্ব, শৈলমালার কি শোভা! বিশেষ করে এই বসন্তকালে আকাশের রং, পাহাড়ের রং, তৃণভূমির রং সবই সুন্দর হয়েছে। এলবুর্জ্জ পর্ব্বতমালা থেকে ছোট ছোট নদী বেরিয়ে দেশটাকে শস্যশ্যামল করে রেখেছে—এদিকে আবার গবর্ণমেন্টের তরফ থেকে কৃষি-ক্ষেত্রে জলসেচনের জন্যে বড় বড় খালকাটা আরম্ভ হয়েছে। এদেশের লোকে বোধ হয় কেবল আমোদ প্রমোদ ও বনভোজন করেই দিন কাটায়। এ দেশে সর্ব্বত্রই বনভোজনের জায়গা, সর্ব্বত্রই শ্যামল তৃণভূমি, ছায়াতরু, পার্ব্বত্য নদীর মৃদু কল্লোল। পথে বিহিস্তানের শৈলগাত্রে উৎকীর্ণ বিখ্যাত লেখ ও মূর্ত্তি দেখলাম।

তারপর শুধুই আফিমের ক্ষেত। পথে যথেষ্ট পেট্রোলের দোকান আছে, মোটরযাত্রীর কোনো অসুবিধা

হওয়ার কথা নয়। গ্যারেজ ও মোটরের কারখানাও অনেক। এক সময়ে পারস্যে ত্রিশ হাজার সরাইখানা ছিল পথিকের সুবিধার জন্য। এখন সরাইখানার সংখ্যা কমে গিয়েছে, মোটর গাড়ীতেই লোকচলাচল করে বেশী—সরাই-এর বদলে এখানে পথের ধারে পড়ছে মোটরের কারখানা ও পেট্রোলের দোকান। এদের ব্যবসা খুব জোর চলছে। সরাইএর মালিকেরা দেউলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মোটর বাসের সংখ্যা নেই—এক এক লাইনে বাস দু তিন শো মাইল গিয়ে তবে গন্তব্য স্থানে পৌছায়। বাসের মধ্যে গোটা মানুষ বড় একটা দেখা যায় না—চোখে পড়ে কেবল কতকগুলো মানুষের মুণ্ড, হাত, পা, দাড়ি, বোঁচকা, জলের কুঁজো—ঠাসাঠাসি বোঝাই। মোটরবাসের ব্যবসায়ে পারস্যে উন্নতি আছে।

ওমর খৈয়ামের নিশাপুরের মধ্যে দিয়ে আমরা চলে গেলাম, থেমে দেখবার সময় ছিল না। তারপরে মেশেদ।
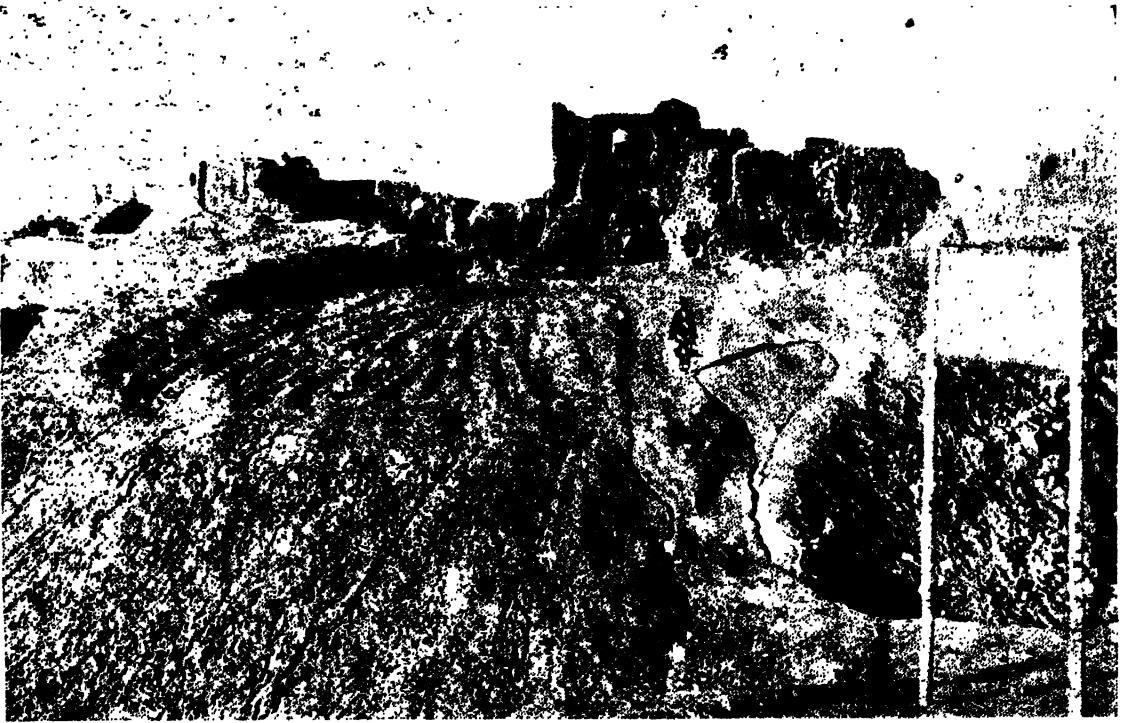
শেবুজেওয়ার মাটির প্রাচীর: মোটরের পথ-নির্দ্দেশক দেখা যাইতেছে। পারস্যে একদিন ৩০ হাজার উষ্ট্রবাহিনীর আড্ডা ছিল। এখন মোটরের প্রচলনে উষ্ট্রবাহিনীর সংখ্যা কমিতেছে।

এখানে পেট্রোলের জন্যে আমাদের দাঁড়াতে হোল। কৃষ্ণবসনা অবগুণ্ঠনবতী পারস্য মহিলারা দলে দলে চলেছে হজরৎ ইমাম রেজার মস্‌জিদে। মস্‌জিদ অবশ্য আমরা দূর থেকেই দেখলাম, কারণ কোনো বিধর্ম্মী মস্‌জিদের মধ্যে ঢুকতে পারে না।

তারপর আমরা পারস্যের বর্ত্তমান যুগের একজন প্রধান পণ্ডিত হাজি মালেকের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর লাইব্রেরীতে ৪৬,০০০ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে। এমন অনেক পুঁথি আছে, যা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

হাজি মালেক দুঃখ করে বল্লেন, "আপনাদের আমেরিকাতে ওমর খৈয়ামের খুব নাম কিন্তু হাফেজ কি ফার্দৌসির নাম অনেকে জানেই না হয়তো। অথচ এদেরই ঠিক পারস্যের জাতীয় কবি বলা যেতে পারে।" কথায়

কথায় আমরা তাঁকে বল্লাম—আপনার লাইব্রেরীতে তো আগুন লেগে এত দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এবিষয়ে আপনার সাবধান হওয়া উচিত।

পারস্তের সীমান্ত পার হলাম। মরুভূমি চারিদিকে, ছোট ছোট নদীর ওপর লবণের পাৎলা স্তর জমেছে। খররৌদ্রে দিগন্তে মরীচিকা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার মাঝে মাঝে ছোট বড় টিলা—টিলার ওপরে প্রাচীনকালের দুর্গের ধ্বংসস্তূপ। আমরা ইস্‌লামকালে পৌঁছুলাম—এই প্রথম আফগান ঘাঁটি। এর পর থেকে সুরু হল আফগানিস্থান। এখানে শুনলাম এক বৎসরের মধ্যে এপথে পাঁচজন সাহেব গিয়েছেন মোটরে আফগানিস্থানে ও ভারতবর্ষে, তার মধ্যে দুজন আমেরিকান। এখানে দুখানা মোটরলরিবোঝাই চেয়ার টেবিল আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আফগান গবর্ণমেণ্ট আমাদের ব্যবহারের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন হিরাট থেকে—কিন্তু চেয়ার টেবিল আমাদের সঙ্গে যা ছিল, তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সুতরাং আমরা সেগুলো হিরাটেই ফেরৎ পাঠালাম।

কৃষ্ণবসনা অবগুণ্ঠনবতী পারস্য-সুন্দরী।

আফগানের অতিথিপরায়ণতা বাস্তবিকই আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। হিরাট, কান্দাহার, গজনী, কাবুল যেখানে আমরা গিয়েছি, সর্ব্বত্রই রাজার মত খাতির পেয়েছি। নদী পারের জন্য সব জায়গাতেই আমাদের জন্যে নৌকা মজুত থাকত, আগে থেকে পথের ধারে মাঝে মাঝে তাঁবু খাটানো হয়েছিল গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে, মোটর থামিয়ে সেখানে গরম চা ও দারুচিনি-সুবাসিত দুধ না পান করে গেলে তাঁবুর ভারগ্রস্ত কর্ম্মচারীরা ক্ষুণ্ণ হত।
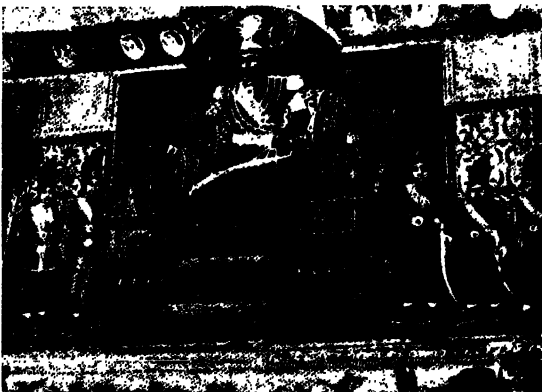
গুলিস্তাঁ প্রাসাদ: বর্ত্তমানে রেস্টরাঁ। প্রাচীর গাত্রের ফ্রেস্কোতে সম্রাট নাসিরুদ্দিন শাহ।

দূর থেকে হিরাটের মিনার দেখা গেল কলের চিম্‌নির মত উঁচু হয়ে আছে। হিরাটের চারিদিকে মাটীর প্রাচীর, সদর ফটক দিয়ে আমাদের মোটরের সারি সহরে ঢুকল। রাজপথের দুধারে নরনারী কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের দেখবার জন্যে; তাদের চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টি, মুখে হাসি। আমরা খুব ধীরে ধীরে মোটর চালাচ্ছিলাম, দর্শকের ভিড় এত বেশী যে জোরে চালানো অসম্ভব। আমরা যেন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব সার্কাসের দল, হিরাট সহরে খেলা দেখাতে ঢুকছি। হিরাটের বাজার খুব বড়, সদর ফটক থেকে সহরের পেছনের ফটক পর্য্যন্ত একটা চওড়া সোজা রাজপথের দুধারে দোকান পসার, ফলের দোকান, পিতল

কাঁসার বাসনের দোকান, কাপড়ের দোকান, কফিখানা, তামাকের দোকান। আমাদের ফটোগ্রাফের যন্ত্রপাতি দেখে বাজারশুদ্ধ লোক হাঁ করে চেয়ে রইল।

বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ। অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিলে ইহাদের সহিত আমেরিকার কোনও স্কুলের ছাত্রীদের পার্থক্য বোঝা কঠিন।

বাজারে লোকের ভিড়ের ফটো নেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। অবশেষে আমি মাটীর ওপর একটা দাগ টেনে তাদের দাগের ওদিকে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে অনুরোধ করলাম। হিরাটের লোক বাস্তবিক খুব ভদ্র, তারা আমাদের অনুরোধ রাখলে, আমরাও ফটো নিলাম। আমাদের ক্যামেরার মধ্যে কি আছে, দু-একজন তা জানবার কৌতূহল প্রকাশ করলে। আমরা তাদের নিয়ে এসে দেখালাম। আফগানদের ভদ্রতায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি, যখনই যার ফটো নিতে চেয়েছি, কি পুরুষ কি নারী, কেউ কখনো আমাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে নি। একবার ছ' সাত বছরের একদল ছোটছেলের ফটো নেবার জন্যে বলাতে তারা নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করে ভালমানুষের মত সবাই ক্যামেরার সামনে এসে র‍্যাফেলের আঁকা দেবদূতের মত শান্ত অবাক চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল—যতক্ষণ আমরা না বল্লাম যে তোমরা এবার যেতে পারো, ততক্ষণ তারা একটুও নড়ল না।

আফগানেরা বালকের মত সরল। এদিকে বন্দুক এবং আধমণ ওজনের টোটার কোমরবন্ধ সঙ্গে না থাকলে তাদের মন ভাল থাকে না, পৃথিবী অন্ধকার দেখে, ওদিকে আবার হিরাট সহরের পাঁচীলের বাইরে মাঠে দীর্ঘকায় জোয়ান আফগান যোদ্ধা পোষা তিত্তির পাখীর সঙ্গে দৌড়বাজি খেলছে—সে একটা দেখবার জিনিস! পাখীও ছুটছে, সেও ছুটছে, মাঝে মাঝে আবার পাথরের আড়ালে হঠাৎ লুকিয়ে পড়ে পাখীকে কাছে আনবার জন্যে শিস্ দিয়ে ডাকছে। কেউ নেই হয়তো কোথায়, শুধু পঁয়তাল্লিশ বছরের দীর্ঘশ্মশ্রু আফগান জোয়ান ও তার পোষা ছোট্ট পাখীটি!

কাস্পিয়ান তীরে দুষ্ট হাসিমুখ।

হিরাট ও কান্দাহারের মধ্যে মোটরের পথে দুটো তিনটে খরস্রোতা নদী পড়ে। গ্রীষ্মকালে অবশ্য জল কম থাকার দরুণ মোটর নদীতে নেমে অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে। সারাদিন রৌদ্রদগ্ধ মরুপথের মধ্যে দিয়ে মোটর চালিয়ে এসে ঠাণ্ডা নদীর জলে অবগাহন করে শরীর আমাদের জুড়িয়ে গেল। আমাদের বড় গাড়ীগুলো থেকে জিনিষপত্র নামিয়ে ফেলে দড়ি বেঁধে টেনে পার করানো হল, নইলে বালিতে চাকা পুঁতে যায়। নদীর

দুপারে দু'হাজার লোক জড় হয়েছে আমাদের নদী পার হওয়া দেখবার জন্যে। অনেকে আবার ঘোড়ায় চড়ে বহুদূর থেকে এসেছে।

নদীপার হয়ে ওপারে একটা এপ্রিকট বাগানের ছায়ায় আমাদের জন্যে তাঁবু পাতা হয়েছে, চা পানের বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে। একটি ছোট ছেলে বড় গুড়গুড়িতে তামাক সেজে আমাদের জন্যে নিয়ে এল। গুড়-গুড়িতে তামাক খাওয়া এই আমাদের জীবনে প্রথম। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা একজন প্রৌঢ় আফগান, তিনি বড় ঘোড়ায় চেপে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, যথেষ্ট আপ্যায়িত করলেন। আফগানিস্থান আমরা কেমন দেখছি? পথে আমাদের অসুবিধা হয়নি তো? দশ বারো জন কৃষ্ণকায় ভৃত্য পেতলের থালা ভরে আমাদের জন্যে নানারকম মেওয়া ফল নিয়ে এল শাসনকর্ত্তার নিজের বাগান থেকে।

কান্দাহারে মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে আমাদের অভ্যর্থনা করা হল। একটি সুন্দর এপ্রিকট-বাগানের ছায়ায় বড় সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, তারই নীচে সভা। পুশ্‌তু ভাষায় অভিনন্দন পাঠ করা হল, আমরা তার কিছুই বুঝলাম না। বাগানটির সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব, আমাদের মনে হচ্ছিল আরব্য উপন্যাসের দেশ আজকালকার যুগে বাগদাদ থেকে অনেক পূবদিকে সরে এসেছে। আরব্য উপন্যাসের স্বপ্ন আমরা সার্থক হতে দেখেছি কান্দাহারের এই অপূর্ব্ব উদ্যানে। শ্যামল তৃণরাজি পায়ের নীচে, বহুদূরবিস্তৃত ছায়াতরুবীথি, পুষ্পিত এপ্রিকটের সুবাস, মাঝে স্বচ্ছ জলাশয়, লরেল্ ঝোপ, বুল্‌বুলের ডাক, জলের ধারে হরিণ চরে বেড়াচ্ছে—সবটাই যেন একটা স্বপ্ন। গজনীতে সুলতান মামুদের সমাধি আছে। বহুকালের পুরানো সমাধি-মন্দির, দীর্ঘ পপলার গাছের সারির ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে। সহরের প্রান্তে একটি নিভৃত স্থানে সমাধি-মন্দির অবস্থিত, চারিধারে গোলাপের বাগান। সামনের উঠানে একজোড়া মার্ব্বেল পাথরের সিংহমূর্ত্তি, তার ওদিকে বিধর্ম্মীদের যেতে দেওয়া হয় না, আমরা গোলাপ বাগানে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম। গজনীতে আসবার পথে একটা নদী পার হওয়ার সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়েছিল।

আমাদের বিশ্বাস ছিল আফগানিস্থান পার্ব্বত্য দেশ সুতরাং অনুর্ব্বর ও রুক্ষ। গজনী থেকে কাবুলের পথে আসতে আমাদের মনে হল ইউফ্রেটিস্ নদীর তীর ছাড়া এমন তরুচ্ছায়াশ্যামল, ফলফুলে পরিপূর্ণ দেশ আমরা আর দেখিনি। কাবুল সহর থেকে মোটরে আমরা বামিয়ান গেলাম। এখানকার অতিকায় বুদ্ধমূর্ত্তি দেখবার জিনিস, তবে দুটি মূর্ত্তির কোনটির মুখই অক্ষত অবস্থায় নেই। গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এখানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাজ চলছে। বামিয়ান উপত্যকা সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। সমুদ্রবক্ষ থেকে এর উচ্চতা নয় হাজার ফুট, এর পেছনে বিখ্যাত কেশ-ই-বাবা পর্ব্বত, প্রায় সতেরো হাজার ফুট উঁচু। অতিথিশালার বারান্দা থেকে পূবদিকে চেয়ে থাকলে যে দৃশ্য চোখে পড়ে, আমরা এই সুদীর্ঘ ভ্রমণপথের মধ্যে কোথাও তা দেখিনি। বহু প্রাচীন কালের মরুযাত্রীদের চলাচলের পথ বামিয়ান উপত্যকা ভেদ করে চলে গিয়েছে, বহু পথিকের পদচিহ্ন আঁকা, আলেকজাণ্ডারের বিজয়বাহিনী এই পথে এসেছিল, হিউয়েন্‌সাং এই পথে ভারতে তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন—বর্ত্তমানে বেলুচি কৃষকেরা পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে নিজের দেশ ছেড়ে আফগানিস্থানে বসবাস করতে আসছে এই পথে। একটা ছোট মেয়ে গাধার পিঠে চড়ে মনের আনন্দে বাঁশি বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে।

খাইবারের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গিরিবর্ত্ম পার হয়ে জামরুদ দুর্গে আশ্রয় নিলাম। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে এখানে বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছে। শিখ ও গুর্খা সৈন্যদল ব্রোঞ্জের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সামরিক কায়দায় অভিবাদনের জন্য প্রস্তুত হয়ে। গর্ডন হাইল্যাণ্ডার দল ব্যাগ-পাইপ বাজাচ্ছে। আমরা ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েছি।

তারপর তক্ষশিলা ও রাওয়ালপিণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরুৎ থেকে রওনা হবার একাশি দিনের দিন আমরা শ্রীনগরে পৌছুলাম।

বোম্বেটেদের সহর সেণ্ট ম্যালো

ব্রিটানির উপকূলে সেণ্ট ম্যালো একটি প্রাচীন বন্দর। এখানে পূর্ব্বে দুর্দ্ধর্ষ বোম্বেটেদের বাসভূমি ছিল, এই দ্বীপের সুরক্ষিত দুর্গের আশ্রয়ে বাস করিয়া ইহারা বহুদূরের সমুদ্রে লুটপাট করিতে যাইত। এমন এক সময় ছিল যখন ইংলণ্ড সেণ্ট ম্যালোর বোম্বেটেদের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল—ইংলণ্ডের বাণিজ্যতরী ইংলিশ প্রণালীর ভিতর আসিলেই ইহারা লুঠ করিত। চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জের কাছ ঘেঁসিয়া যাইতে কোনো জাহাজের কাপ্তেন সাহস করিত না।

সেণ্ট ম্যালো: কবি শাতোব্রিঁয়ার এই বাড়ীতে বর্ত্তমানে হোটেল খোলা হইয়াছে।

বলা বাহুল্য এখন আর সে কাল নাই। সেণ্ট ম্যালোর বোম্বেটেদের বংশধরেরা এখন সমুদ্রে মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু এই মাছধরার ব্যাপারে তাহারা যে সাহস, নৌচালন-দক্ষতা ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তাহাতে একথা স্বতঃই যে কোনো লোকের মনে হইবে যে, ইহারা দুর্দ্দান্ত ও নির্ভীক জলদস্যু-দিগের উপযুক্ত বংশধর বটে।

ব্রিটানির উপকূলে প্রাচীনকালের নিদর্শনস্বরূপ এই সহরটি দেখিতে দেশ-বিদেশ হইতে অনেক ভ্রমণকারী আসে। সেণ্ট ম্যালো সহরের হোটেল, কাফিখানা ও দোকানগুলির প্রধান আয় হইতেছে এই ভ্রমণকারীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ। এখন সেণ্ট ম্যালোর অলিতে-গলিতে জুয়াড়ীর আড্ডায় বাজী রাখিয়া জুয়া খেলা হয়, সকালে-বিকালে দলে দলে ভ্রমণকারীদের নৌকা সমুদ্রে খানিকটা বেড়াইবার জন্য বাহির হয়—এখন আধুনিক সভ্যতা সেণ্ট ম্যালোকে নিরীহ করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু এই সেণ্ট ম্যালোরই জনৈক বীরসন্তান একদিন কানাডা ফ্রান্সের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল, আর একজন রিও দে জেনিরো অধিকার করিয়াছিল। এক সময়ে সুদূর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপে ইহাদের নাম ভয়সঞ্চার করিত। ইংলণ্ডের সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮২ খানি রণতরী ও ৪৫১০ খানি সওদাগরী জাহাজ সেণ্ট ম্যালোর বোম্বেটেরা লুট করিয়াছিল।

সুতরাং দেখা যাইবে যে, বিলাসী ও খেয়ালী ভ্রমণকারীদের কাফি ও আইসক্রিম পরিবেশন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবার মত নরম ধাত ইহাদের নয়—তবে কালে কালে কি না হয়?

এই সহরে বিখ্যাত ফরাসী কবি ও দার্শনিক শাতোব্রিঁয়ার আবাসস্থান ছিল। যে অট্টালিকায় শাতোব্রিঁয়া বাস করিতেন এখন তাহা একটি হোটেল—প্রবেশদ্বারের উপরে কবির কৌলিক চিহ্ন ও তাঁহার প্রিয় মটো উৎকীর্ণ—"আমার রক্ত ফ্রান্সের পতাকা রঞ্জিত করিবে।"

সেণ্ট ম্যালো উপসাগর: কার্ত্তিয়ে এই পথে কানাডা গিয়াছিল। জল এখানে অত্যন্ত গভীর, ফরাসী নৌবাহিনীর ধাত্রীভূমি হিসাবে এস্থান প্রসিদ্ধ।

শৈশবে কবি যখন এ পথে নগ্নপদে ছুটাছুটি করিয়াছেন—তখন এই রাস্তার নাম ছিল দি ষ্ট্রীট অফ দি জুস্, এখন কবির নামানুসারে এই রাস্তার নামকরণ হইয়াছে। কাছেই একটি
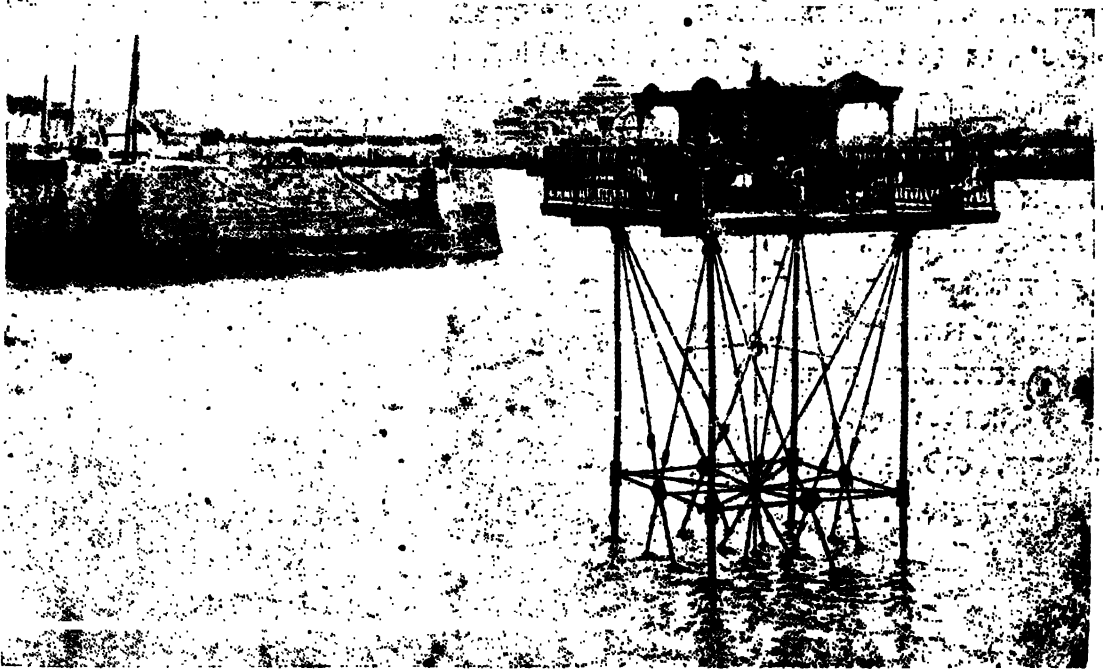
সেণ্ট ম্যালো ও সেণ্ট সেরভানের মধ্যবর্ত্তী অদ্ভুত খেয়া: জলের তলে লাইন পাতা আছে। পরের ছবিতে সে লাইন দেখা যাইতেছে।

স্কোয়ার, পূর্ব্বে এটি ছিল পরিখা। এই স্কোয়ারে পূর্ব্বে শাতোব্রিঁয়ার একটি ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি ছিল—এখন সেটি এখান হইতে সরানো হইয়াছে। ক্যাসিনো হোটেলের দেওয়ালের বাইরে এই ব্রোঞ্জ মূর্ত্তিটি বর্ত্তমানে স্থাপিত আছে।

কোন মহিলা ভ্রমণকারী তাঁহার দলের পণ্ডিতম্মন্য একটি পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শাতোব্রিঁয়া কে হে?
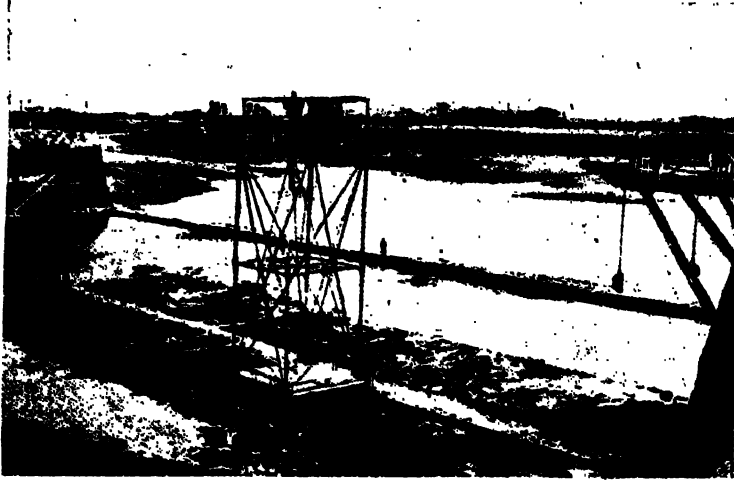
জোয়ারের সময় এই সেতুর অধিকাংশই জলের তলে ডুবিয়া যায়।

কবি তাঁহার পৈতৃক প্রাসাদের যে ঘরে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাহারই বহির্দ্দেশে গাইড-বই হাতে দাঁড়াইয়া, জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিয়া মহিলা এই প্রশ্ন করেন।

সঙ্গের রসিক পুরুষটি উত্তরে বলেন, কেউ কেউ তাঁকে লোক হিসাবে জানে, আবার কেউ কেউ জানে বিফ-ষ্টিক কাটিবার একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি হিসাবে।

লোকটি ভুল করিয়াছিল। বিফ-ষ্টিক কাটিবার পদ্ধতি কবি শাতোব্রিঁয়ার নামানুসারে হয় নাই—হইয়াছিল আর একজন শাতোব্রিঁয়ার নামে। কবির ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি জীবিত ছিলেন—তাঁহার নামের বানান ছিল—Chateaubriant তখনও ঐ শব্দটি 'd' দিয়া বানান করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

রুদেমুর সাধক-শিল্পী খোদিত পর্ব্বতগাত্রের অদ্ভুত মূর্ত্তি।

ফ্রান্সের অনেক সুসন্তান এই ক্ষুদ্র শহরটির অধিবাসী ছিলেন, তন্মধ্যে সেণ্ট লরেন্স নদীর আবিষ্কারক জ্যাক্‌স্ কার্ত্তিয়ে ও বিবর্ত্তনবাদী ডাক্তার ব্রুসাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ক্যাথারিন স্ত মেদিচি এখানে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন ছিলেন, সেণ্ট বার্থোলোমিউ হত্যাকাণ্ডের দুই বৎসর আগে।

জ্যাক্‌স্ কার্ত্তিয়ে এই শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না—তবে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের সমুদ্রপথ আবিষ্কারের চেষ্টায় তিনি প্রথম ফ্রান্সিস কর্ত্তৃক প্রেরিত হন, সঙ্গে মাত্র ৬০ টনের দুখানি জাহাজ ছিল এবং ১২২ জন নাবিক ছিল। সেণ্ট লরেন্স উপসাগর ঘুরিয়া ইঁহারা সেণ্ট লরেন্স নদীর মুখে প্রবেশ করেন—কানাডাতে ফরাসী অধিকারের পত্তন করেন।

১৯০৫ সালে কার্ত্তিয়ের একটি ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি এখানে স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন নাবিকের পোষাকে ফ্রান্সের এই বীরসন্তান জাহাজের হাইলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া অনন্ত জলরাশির ওপারে কানাডার দিকেই যেন চাহিয়া আছেন—যে কানাডা ফ্রান্স পরবর্ত্তী কালে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

বিখ্যাত জলদস্যু ডুগুয়ে এই শহরেই ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করে—যে বাড়ীতে সে ভূমিষ্ঠ হয়, সে বাড়ীটি এখনও আছে। ১৮ বছর বয়সেই ডুগুয়ে একদল বোম্বেটের দলপতি হইয়াছিল– ডুগুয়ে সত্যকার ব্রিটন ছিল, ব্রিটন জাতির দুর্দ্ধর্ষ সাহস, সমুদ্রের উপর গভীর টান, স্বদেশপ্রিয়তা তাহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অতি-বিখ্যাত জলদস্যু করিয়া তুলিয়াছিল। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা তাহাকে উপাধিতে ভূষিত করেন, ইতিমধ্যে সে কুড়িখানি যুদ্ধ-জাহাজ ও তিনশত সওদাগরী-জাহাজ লুঠের দ্রব্যস্বরূপ ফ্রান্সকে উপহার দিয়াছিল।

১৭১১ খৃষ্টাব্দে ডুগুয়ে ব্রেজিলের রাজধানী রিও দে-জেনিরো আক্রমণ ও অধিকার করিয়া সেখান হইতে অনেক লুণ্ঠন-দ্রব্য লইয়া আসে। সেখান হইতে একটা সুবৃহৎ ঘণ্টা আনা হয়, একশত বৎসর ধরিয়া সেণ্ট ম্যালো শহরের প্রধান ফটকের ঘড়িঘর হইতে সেটি প্রহর ঘোষণা করিত। ফরাসী-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা এই ঘড়িঘর ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে, সেণ্ট ক্রিষ্টোফারের নাক ভাঙিয়া দেয় ও কুমারী মেরীর মূর্ত্তি পরিখার জলে টান মারিয়া ফেলে। বিদ্রোহের উত্তেজনা কাটিয়া যাওয়ার পরে মেরীর মূর্ত্তিকে জল হইতে তুলিয়া আবার সদর ফটকের উপরে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ঘণ্টাটিও এখন স্থানীয় একটি গির্জ্জার মাথায় প্রাচীন দিনের মতই প্রহর ঘোষণা করে।

ব্রিটানির এই সাহসী, দুর্দ্ধর্ষ সন্তানের প্রতিমূর্ত্তি সেণ্ট ম্যালোর পথের ধারে এখনও দণ্ডায়মান আছে।

ব্রিটানির জলদস্যুরা ইংরেজদের ভাল চক্ষে দেখিত না। ইংরেজেরাও তাহাদের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করিত, তাহাকে ব্যক্ত করার উপযুক্ত শব্দ ইংরেজী ভাষাতে নাই। গল্প প্রচলিত আছে, একবার জনৈক বন্দী ব্রিটনকে একটি ইংরেজ জাহাজের মাস্তলে বাঁধিয়া চারিদিক হইতে তীর, ছুরি, গরম সাঁড়াশী প্রভৃতির খোঁচায় ধীরে ধীরে মারিয়া ফেলা হইতেছিল।

হঠাৎ জাহাজের কাপ্তেন ব্যঙ্গের সুরে বলিল—শোন, তোমরা লড়াই কর টাকার জন্য, আমরা লড়াই করি ইজ্জতের জন্য।

মুমুর্ষু বন্দী ব্রিটন বলিল, তবেই দেখুন, আমরা প্রত্যেকেই এমন একটা জিনিষের জন্য লড়াই করি, যা আমাদের আসলে নাই।

সেণ্ট ম্যালোর সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি পাহাড়ের উপর কতকগুলি অদ্ভুত মূর্ত্তি আছে—এইগুলি 'রদেনুর সন্ন্যাসী' নামক একজন স্থানীয় শিল্পী পাহাড় কাটিয়া তৈয়ার করিয়াছিল। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে খ্রীষ্টান সাধু ও সাপ, পশুপক্ষী, গৃহস্থালীর দৃশ্য—নানা রকম আছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই শিল্পীর মৃত্যু হইয়াছে।

সাণ্টা ফি

সাণ্টা ফি বর্ত্তমানে ইউনাইটেড ষ্টেট্সের অন্তর্ব্বর্ত্তী নিউ মেক্সিকো প্রদেশের একটি শহর। এমন একদিন ছিল যখন আমেরিকার এই অংশে সভ্য মানুষে দলে দলে অসভ্য রেড ইণ্ডিয়ানদের হাতে নিহত হইয়াছে—এই পথে বসতি স্থাপন ও অধিকার বিস্তার করিতে তাহাদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল।

সাণ্টা ফি'র পথ : সান ইসাবেল ন্যাশনাল ফরেষ্টের এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত এই বৃহৎ পর্ব্বত বিস্তৃত।

এপথে প্রথমে যাহারা আসিয়া রাজ্য বিস্তার করে, কিট কার্সন তাহাদিগের অন্যতম। মার্কিন যুক্তরাজ্যের অধিকার বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসে এই নিরক্ষর, অসমসাহসী মানুষটির কথা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৮২৬ সালে একদিন 'মিসৌরী ইণ্টেলিজেন্সার' নামক এক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি বাহির হয়। "ফ্রাঙ্কলিন শহরে আমার ঘোড়ার জিনের দোকান হইতে কিট কার্সন নামে একটী শিক্ষানবীশ বালক কোথায় পলাইয়া

সাণ্টা ফি'র পথে একাকী শকট।

গিয়াছে। তাহার বয়স ১৬ বৎসর, বয়সের তুলনায় দেখিতে বেঁটে, মাথার চুলের রং কটা। কেহ সন্ধান দিতে পারিলে এক সেণ্ট পুরস্কার পাইবে।"

এই পুরাতন কাগজের বিজ্ঞাপনী পড়িয়া যে কথাটি আমাদের সর্ব্বপ্রথম মনে জাগে সেটি হইতেছে এই যে,

যে আমেরিকার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা একদিন স্বর্ণডলারের পাহাড়ের উপর বসিয়া থাকিবে ইহাই বিধির বিধান, তাহাদেরই এক পূর্ব্বপুরুষ একদিন খবরের কাগজে প্রকাশ্য ভাবে এক সেণ্ট পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল!

যাহা হউক, কিট কার্সন আর ফেরে নাই। অজানা নিউ মেক্সিকোর পথে তখন দলে দলে ঘোড়ায়-টানা ছই-বসানো বড় বড় গাড়ী (সাম্রাজ্যবিস্তারের যুগে ইয়াঙ্কি ইংরাজিতে ইহাদের নাম ছিল ওয়াগন) চলিয়াছে—দুঃসাহসিক অভিযানের নেশায় তরুণ কিট কার্সন তখন মাতিয়া উঠিয়াছে, সেও এই দলে যোগদান করিয়া নিরুদ্দেশের যাত্রী হইল।

মেক্সিকো তখন সবে স্পেনের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে—সেখানে তখন যুক্তরাজ্যের মালের চাহিদা বেশী—তাই দুঃসাহসী সওদাগরেরা পথের শত বাধা-বিপদ তুচ্ছ করিয়া দলে দলে চলিয়াছিল সাণ্টা ফি অভিমুখে বাণিজ্য ব্যপদেশে। বাণিজ্যের পথ ক্রমে রাজ্যবিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল, যেমন সবদেশে হয়।

পথ রীতিমত দুর্গম—সেণ্ট লুইস হইতে সাণ্টা ফি প্রায় ১৬০০ মাইল। এই ১৬০০ মাইলের মধ্যে সভ্যলোকের উপযোগী খাদ্যও মিলিত না। মহিষের মাংস খাইয়া সওদাগরেরা দিন যাপন করিত, মহিষের চামড়া হইতে শক্ত জুতা প্রস্তুত করিয়া লইত। দিনে ১২ মাইলের বেশী চলার নিয়ম ছিল না।

কিট কার্সেনের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি: ট্রিনিদাদে অবস্থিত। সাণ্টা ফি'র পথ আবিষ্কারের সহিত জুতার দোকান হইতে পলায়িত এই শিক্ষানবিশের নাম চিরকাল জড়িত থাকিবে।

চারখানা ওয়াগন পাশাপাশি চলিত এবং এই ওয়াগনের সারি এক এক সময়ে কয়েক মাইল পর্য্যন্ত লম্বা হইত। পশ্চিমকে জয় করিবার কি বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা! এক বৎসর বড় মরসুমের সময় ৩০০০ ওয়াগন ও ৫০,০০০ জোড়া বলদ ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ফ্রাঙ্কলিন তখন ছিল সভ্যজগতের শেষ সীমা—মিসৌরি প্রদেশে আর একটি মাত্র বড় শহর ছিল সেণ্ট লুইস, হাজার চারেক লোক সেখানে বাস করিত। সেণ্ট লুইস হইতে নৌকাযোগে বালির চড়া ও নদীর ঘূর্ণাবর্ত্তের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে এবং নদীতীরের বনে হরিণ ও বন্য টার্কি শিকার করিতে করিতে লোকে আসিয়া পৌছিত ফ্রাঙ্কলিন শহরে এবং সেখান হইতে সাণ্টা ফি'র পথে রওনা হইত। সবাই ভাবিত সাণ্টা ফি একবার যাইতে পারিলেই হইল

—সাণ্টা ফি রূপকথার এল্ ডোরেডো, সোনার দেশ, সোনা সেখানে ছড়ানো আছে যত্র তত্র—যে যত কুড়াইয়া লইতে পারে।

সাণ্টা ফি হইতে প্রত্যাগত লোকেরা এই সব গল্প রটাইয়া বেড়াইত। গল্পের মূলে খানিকটা সত্যও ছিল। একবার সাণ্টা ফি হইতে বাণিজ্য করিয়া ফিরিয়া আসিয়া লোকে বড় মানুষ হইয়া গিয়াছে, এ উদাহরণ নিতান্ত বিরল ছিল না। কাপ্তেন বেকনেল নামে একজন লোক ওয়াগন বোঝাই দিয়া ছুরি কাঁচি লইয়া গিয়াছিল সাণ্টা ফি'তে। একদিন সে সাণ্টা ফি হইতে ফিরিল, সঙ্গে সুদীর্ঘ অশ্বতরের সারি, তাদের পিঠে বোঝাই রৌপ্য মুদ্রা। ফ্রাঙ্কলিন সহরের একটা গুদামে টাকার থলিগুলি আনিয়া ফেলিলে সেগুলি ছিঁড়িয়া টাকাগুলি ঘরের মেজেতে ছড়াইয়া মেজে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিল। এত টাকা লোকে কখনও দেখে নাই।

তুষারাবৃত এই পথ দিয়া এককালে সাণ্টা ফি'র অভিযানকারীরা পদব্রজে অগ্রসর হইয়াছিল। এখন রেল হইয়াছে। ছবিতে বুঝা যায় রেলেরও এপথে দুর্গতির সীমা নাই।

এই সব কথা যত প্রচার হইতে লাগিল ততই লোকে নিজেদের যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও দলে দলে সাণ্টা ফি রওনা হইতে লাগিল। এই পথে যে সকল লোক সর্ব্বদা যাতায়াত করিত, তাহারা যে সব নূতন অপরিচিত স্থানের নাম মুখে মুখে উচ্চারণ করিত—পূর্ব্ব-প্রদেশের লোকে সে সব নাম তখন কোনোদিন শোনেও নাই—যদিও বর্ত্তমানে যুক্তরাজ্যের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী সে অঞ্চলে বড় বড় শহর স্থাপন করিয়া বাস করে, দীর্ঘ সড়ক বাহিয়া দামী মোটর গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে যায়—তাহাদের ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই। ইয়েলোস্টোন, সল্ট লেক সিটি, ডেনভার—এ সব স্থান বর্ত্তমানে কার না পরিচিত!

কে জানিত তখন যে আরিজোনা, নেভাডা ও কালিফোর্ণিয়াতে অত সোনা, রূপা ও তামার খনি অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রহিয়াছে!

পৃথিবীর মধ্যে কোনো স্থানেরই এত দ্রুত পরিবর্ত্তন হয় নাই—জনহীন মরুভূমি ও অরণ্য হইতে একেবারে সমৃদ্ধ জনপদ—পৃথিবীর ইতিহাসে এ রকম উদাহরণ বেশী নাই।

তরুণ কিট কার্সন যে দোকানে বসিয়া ঘোড়ার জিন সেলাই করিত, এখন তাহার নিকটেই মিসৌরী নদীর উপর প্রকাণ্ড সেতু। সে-সেতু প্রতিদিন হাজার হাজার মোটরকার বোঝাই করিয়া সৌখীন টুরিষ্টদের এখন সাণ্টা ফি'র পথে লইয়া চলিয়াছে—কিট কার্সনের চামড়ার দোকানের কাছে এখন টুরিষ্টরা পেট্রোল কিনিবার জন্য দাঁড়ায়।

সাণ্টা ফি'র পথের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে!

সুবৃহৎ সাণ্টা ফি রেলরোড এখন মোটররোডের সহিত সমান্তরাল ভাবে চলিয়াছে, ট্রেন মোটরের বিরাম নাই। যেখানে পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ বন্য মহিষ ক্ষুরের ধূলি উড়াইয়া চরিয়া ফিরিত এবং ইণ্ডিয়ানদের তীর ও সভ্য মানুষদের রাইফেলের গুলিতে হত হইত, এখন সেখানে বেড়ায় ঘেরা গোচারণভূমিতে গৃহপালিত গরু ঘোড়া চরিয়া বেড়ায় ও ধাবমান মোটর ও ট্রেনের দিকে কৌতূহলের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখে।

ওয়াশিংটন আরভিং-এর সময়ে যে সব প্রেইরী প্রান্তরে বন্য মুরগী চরিত, এখন সেখানে বড় শস্যক্ষেত্র ও পোষা লেগহর্ণ জাতীয় মুরগীর খোঁয়াড়।

সাণ্টা ফি রেলপথের ধারে ধারে অনেক বিখ্যাত স্বাস্থ্য-নিবাস আছে। সহরের কোলাহলপূর্ণ কর্ম্মব্যস্ত জীবনের পরে অনেকে নির্জ্জন-বাসের জন্যও এসব স্থান পছন্দ করে। এজন্য এই পথে টুরিষ্টদের ভিড় অত্যন্ত বেশী।

সাণ্টা ফি'র পথে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিশ্রাম-গৃহ: কিট কার্সন স্বহস্তে প্রস্তুত কফির রাত্রিভোজ সাঙ্গ করিয়া পরবর্ত্তী প্রাতঃকালের প্রতীক্ষা করিয়া গিয়াছে।

মাঝে মাঝে দেখা যাইবে একজন দীর্ঘকেশ রেড ইণ্ডিয়ান ঢিলাঢালা পোষাক পরিয়া ব্যস্তভাবে কোথায় চলিয়াছে। ইহারই পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে বিষাক্ত রস মাখান তীর দিয়া শ্বেতকায় ব্যবসাদার কিংবা শিকারীকে হত্যা করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ লোকটি একজন শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ নাগরিক—খুব সম্ভবতঃ সে একজন তৈল-ব্যবসায়ী লক্ষপতি—ওকলাহোমা সহরে নূতন মডেলের মোটর গাড়ী কিনিতে চলিয়াছে।

সাণ্টা ফি'র পথের এক জায়গায় একটা পাহাড় আছে, ইহার নাম সনি রক। প্রাচীন দিনে এই স্থান অতীব বিপজ্জনক ছিল। এই পাহাড়ের নীচে দিয়া পথ, আর পাহাড়ের উপরিস্থিত শিলাখণ্ডের আড়ালে বসিয়া ওয়ালনাট,

এ্যাশ ও আর্কানসাস উপত্যকার অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। অসভ্য রেড ইণ্ডিয়ানেরা এইখানে লুকাইয়া থাকিয়া উপর হইতে তীর ছুঁড়িয়া মানুষ মারিত।

এই পাহাড়ের গায়ে প্রাচীন কালের পথিকদের নাম খোদা আছে। পাহাড়ের চূড়া হইতে দূরের অতি সুন্দর ও শস্যশ্যামল প্রান্তর, আঁকাবাঁকা ওয়ালনাট নদীর দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়। বহু পথিক বুকের রক্ত দিয়া এই পথে যুক্তরাজ্যের অধিকার বিস্তৃত করিয়া গিয়াছে।

জ্যামেকা

জন অলিভার লা গর্গের জ্যামেকা ভ্রমণের বিবরণ অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ। ১৯২৭ সালে তিনি আমেরিকার একখানা বিখ্যাত সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে জ্যামেকা যান। তাঁর ভ্রমণকাহিনী ঐ কাগজে বার হয়েছিল। নিম্নে তার কিছু উদ্ধৃত করা গেল :—

জ্যামেকা কারিবিয়ান সমুদ্রের এমন স্থানে অবস্থিত যে বড় বড় জাহাজের লাইনগুলো তাকে ছুঁয়ে যাবেই। সেই জন্যেই জ্যামেকার ইতিহাস খুব বৈচিত্র্যময়—চিরকাল এর আশেপাশে ছিল যত বোম্বেটের আড্ডা। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বোম্বেটে মর্গ্যাণ, কিড্, ব্ল্যাক বিয়ার্ড—এদের নামের সঙ্গে জ্যামেকার নাম বিশেষভাবে জড়িত। এরা সবাই ফাঁসীকাঠের আসামী।

জ্যামেকার একটী নিগ্রো পরিবার।

উত্তর দিক থেকে জ্যামেকার দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়! প্রথমে পড়ে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ওয়াটলিং দ্বীপ। আমেরিকা আবিষ্কার কররার পথে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস এই দ্বীপ একদিন প্রত্যুষে দেখতে পান। ওয়াটলিং দ্বীপের উপকূল অসমতল ও প্রস্তরময়, ভাল পোতাশ্রয় একটাও নেই, শুধুই দেখা যাবে বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়চে পাষাণময় তীরে।

বৈকালের দিকে চোখে পড়বে কিউবা দ্বীপের মাইসি অন্তরীপের উচ্চ পর্ব্বত। ভারী চমৎকার এই পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরটা দেখতে হয় অস্তরাগরঞ্জিত আকাশের তলায়। কিউবা দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলের এত কাছ ঘেঁসে জাহাজ যায় যে তুমি জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে মৎস্যশিকারনিরত জেলেদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে পারো।

বাঁয়ে বহুদূরে ধোঁয়ার মত দেখা যাবে হেইটি দ্বীপের পর্ব্বতমালা, ওদেরই পাদমূলে স্পেনীয়-আমেরিকার যুদ্ধের বিখ্যাত শান্তিয়াগো বন্দর, স্পেনীয় সেনাপতি কারভেরা যেখানে বোতলের মুখে ছিপি-আঁটা মত হয়ে আটকে পড়েছিলেন মার্কিণ নৌবহরের দ্বারা। এসব সমুদ্রে স্পেন যুদ্ধের ব্যাপারে কখনও সুবিধা করতে পারেনি।

জ্যামেকার রাজধানী কিংষ্টন খুব বড় বন্দর। এ অঞ্চলের মধ্যে তো বটেই। কিংষ্টন বন্দরে যেতে হবে। অথৈ সাগরজলের মাঝখানে ডুবে আছে সে কালের আর একটা বিখ্যাত ঐতিহাসিক বন্দর—পোর্ট রয়্যাল। বড় বড় জলদস্যুদের প্রধান আড্ডা যে পোর্ট রয়্যাল, যেখানে দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে কত খুন, জখম, যুদ্ধ, বিগ্রহ, গোলাবর্ষণ হয়ে গিয়েচে, তার তুমি কোনো চিহ্নও দেখতে পাবে না আজ।

নেলসনের স্মৃতি-ফলক।—ফোর্ট চার্লস।

কিংষ্টন বন্দরের অল্প দূরে ফোর্ট চার্লস। নেলসন প্রথম যৌবনে এখানে বহুদিন কাটিয়েছিলেন। দুর্গের প্রাচীরে একখানা প্রস্তরফলকে লেখা আছে—এখানে হোরেসিও নেলসন একদিন পায়চারী করতেন। তুমি যখন এখানে পায়চারী করবে, তখন তাঁর গৌরবের কথা স্মরণ কোরো।

পোর্ট রয়্যালের ইতিহাস বড় কৌতুহলজনক। পোর্ট রয়্যাল বড় হয়েছিল ডাকাতির পয়সায়। সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে এখানকার সবাই ছিল বোম্বেটে। পরস্পর পরস্পরের ওপর ডাকাতি করতো। আইন ছিল না, শৃঙ্খলা ছিল না। স্পেন ইংরাজের জাহাজ লুঠতো, ইংরেজ স্পেনের জাহাজ লুঠতো। সোনা-বোঝাই স্পেনীয় জাহাজ লুঠ করবার জন্যে ইংরেজ বোম্বেটের দল ওৎ পেতে বসে থাকতো।

ঐতিহাসিক হেণ্ডারসন লিখেচেন :—

—১৬৯২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পোর্ট রয়্যালকে বলতো 'সোনার সহর'। দাড়িওয়ালা, ঝুনো নাবিকের দল বন্দরের পানশালা ও নাচঘরে রেশমী পোষাক ও সোনার অলঙ্কার পরে দিনরাত আমোদ প্রমোদ করতো ও সোনার মোহর বাজী রেখে জুয়া খেলতো। পোর্ট রয়্যাল সহরে তখন সোনাকে সোনা বলে কেউ ভাবতো না। পানশালার পানপাত্র ছিল সোনার, রূপোর। সাধারণ জাহাজের খালাসীর কোমরের ছোরার বাঁটে দামী মুক্তা বসানো থাকতো। তাদের কানে দুলতো ভারী ভারী সোনার ইয়ারিং।

স্বর্ণময় নরক ছিল পোর্ট রয়্যাল। স্বর্ণ ও সুরা এই ছিল ওখানকার উপাস্য দেবতা। সোনা মুক্তো সুলভ ছিল তো বটেই কিন্তু তার চেয়েও সস্তা ছিল মানুষের জীবন। ছোরা মারলেই হোল। পানশালায় মত্ত নাবিকের ও বোম্বেটের দল তো কথায় কথায়ই ছোরা মারতো। নাচঘরেও তাই। আবার নিয়ম ছিল নাচ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হত ব্যক্তির লাস ঘরেই পড়ে থাকবে। বোম্বেটেরা মদে ও জুয়ায় ২০০০ থেকে ৩০০০ মোহর খরচ করতো এক রাত্রে। ব্রডওয়ে লজ্জার মুখ লুকোবে।
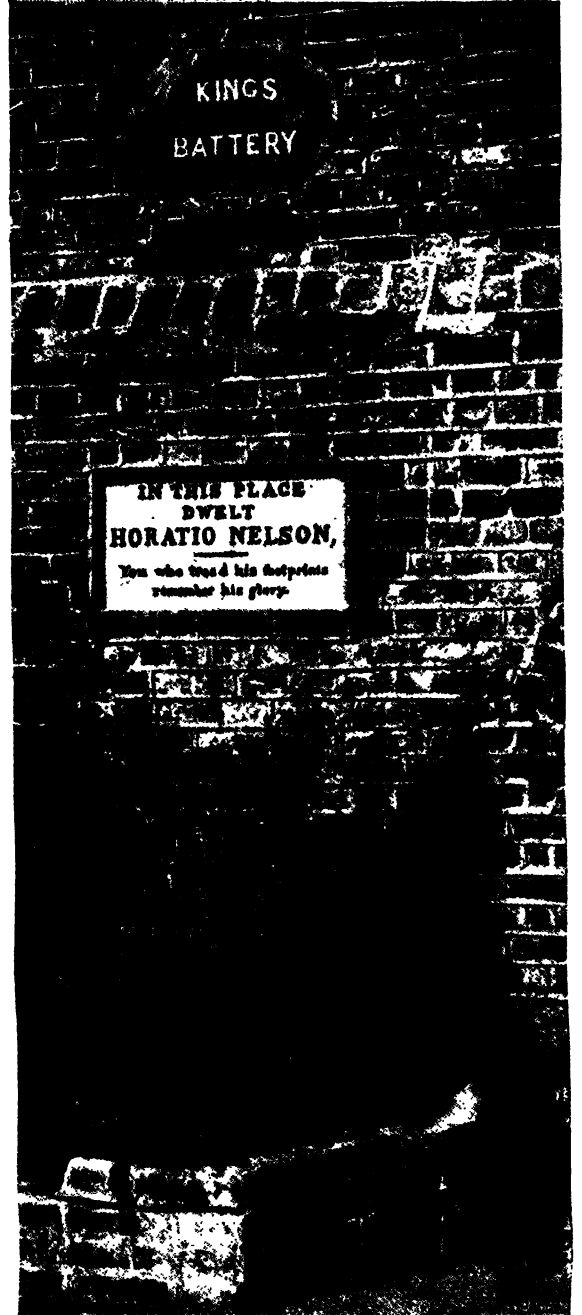
এই গেল হেণ্ডারসনের বিবরণ।

এ ছাড়া পোর্ট রয়্যালের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা গবর্ণর মোডিফোর্ডের ডায়েরীতে এই নারকীয় জীবনের বিশদ বর্ণনা আছে। মানুষ যে কতদূর পশুত্বে নামতে পারে, মোডিফোর্ডের ডায়েরী পড়লে তা বোঝা যায়। কিন্তু বেশীদিন

মন্টেগ, নারিকেল ও কোকোর বাগান, জ্যামেকা।

টিক্‌লো না পোর্ট রয়াল। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন বন্দরের কাউন্সিলের অধিবেশন চলচে, এমন সময় এক ভীষণ ভুমিকম্পে প্রাসাদের চূড়া থেকে ভিত্তিপ্রস্তর পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌ল।

কাউন্সিলের খাতাপত্রে এর বর্ণনা আছে :—

—দু মিনিট সময়ের মধ্যে দ্বীপস্থ সমুদয় গির্জ্জা, বসতবাটী ও চিনির কারখানা ভুমিসাৎ হোল। পোর্ট রয়্যাল

সমুদ্রকুক্ষিগত পোর্ট রয়াল সহর। ছবির সম্মুখস্থ জলরাশির নিকট পোর্ট রয়্যাল ডুবে আছে।

সহরের বারো আনা সমুদ্রগর্ভে ডুবে গেল। দুর্গ ভেঙে চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মানুষ যে কত মারা গেল, তার ঠিকানা নেই।

তারপর অনেকদিন পর্য্যন্ত পোর্ট রয়্যালের বাড়ীঘর জলের তলায় দেখা যেতো। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এ্যাডমিরাল স্যর চার্লস হ্যামিন্টন লিখেচেন—নিথর সমুদ্রের স্বচ্ছ জলরাশির তলদেশে পোর্ট রয়্যালের ঘরবাড়ী নিমজ্জিত আট্‌লান্টিক মহাদেশের ছবি মনে এনে দেয়।

বিদায়, পোর্ট রয়্যাল!

কিংষ্টন্ বন্দরে নামবার সময় কাষ্টমের কর্ম্মচারীদের উৎপাত তত নেই।

আমরা জাহাজ থেকে নেমে অল্প সময়ের মধ্যেই সহরে ঢুকলাম।

সহরটা এমন কিছু নয়, বড় বড় বাড়ীঘর চোখে তেমন পড়বে না। এখানকার লোকে অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝেচে যে আমেরিকার অনুকরণে গগনস্পর্শী সৌধ তুললে দেখায় ভাল বটে, কিন্তু বাসের পক্ষে সে সব নিরাপদ নয়, কবে যে রাত দুপুরে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে তার ঠিক ঠিকানা নেই। ভূমিকম্প জ্যামেকাতে লেগেই আছে ফি বছর।

পোর্ট মেরিয়া, জ্যামেকার আর একটী প্রসিদ্ধ বন্দর।

কিন্তু অন্য সব দিক থেকে কিংষ্টন্ বাস কররার পক্ষে ভাল জায়গা। রাস্তাঘাট খুব চওড়া ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিস দাঁড়িয়ে। মোটর-দুর্ঘটনা এ সহরে নাকি খুবই কম। বড় বড় তাল জাতীয় গাছ বড় বড় রাস্তার দুধারে। বাঁধানো ফুটপথ। সারি সারি দোকান চমৎকার সাজানো, তাতে দেশী বিদেশী সব রকম জিনিস বিক্রী হচ্চে।

বড় বড় দোকানে বাঁধা ধরা দর, দরদস্তুর করবার নিয়ম নেই। কিন্তু ছোট দোকানে দোকানদার যে দাম বলবে, তার অর্দ্ধেক হচ্চে আসল দাম। সেখানে যে যত বকতে পারবে, তারই জিত তত।

ফুটপথেই বাজার বসেচে। আর কত ধরণের জিনিসই সাজিয়ে রেখেচে! কত রকমের ফল, সিম, রুটীফল, মরিচ, কাঁচা মশলা, সাদেয় পাতা, আম, লেবু, আনারস, মিষ্টি আলু, পেয়ারা। হাঙরের ডানা, বেত, নানাজাতীয় ফার্ণ পাতার অ্যালবাম্, সমুদ্রের বড় বড় কড়ি ও ঝিনুক। এখানকার জঙ্গলে এক জাতীয় শক্ত কাঠ প্রচুর পাওয়া যায়।

এখানকার কারিগরেরা ঐ কাঠ দিয়ে চমৎকার খোদাইকরা শিল্পদ্রব্য গড়ে। টুরিষ্টরা সেগুলো খুব কেনে। দেশ বিদেশে চালান দেবার জন্যে ব্যবসাদারেও কিনে রাখে। কিন্তু আজকাল আমেরিকা থেকে সস্তা জিনিস আমদানীর ফলে স্থানীয় কাঠের খোদাই শিল্প নষ্ট হতে বসেচে।

পোর্ট এণ্টনিও। দক্ষিণ জ্যামেকার একটা বন্দর।

জ্যামেকা ইনষ্টিটিউট একটা খুব বড় বাড়ী। কিংষ্টন সহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে এটা অবস্থিত। বাড়ীটা অর্দ্ধেক লাইব্রেরী, অর্দ্ধেক মিউজিয়ম। পোর্ট রয়্যাল বন্দরের গির্জ্জার ঘণ্টা পুরানো জিনিসগুলোর মধ্যে একটা প্রধান দর্শনীয় বস্তু। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্পের পর এই ঘণ্টাটা সমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়।

জ্যামেকা দ্বীপের নয় লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র পনেরো হাজার শ্বেতকায়, বাকী সকলে কৃষ্ণকায় নিগ্রো।

ল্যাকোভিয়া, জ্যামেকা রাজপথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী বাঁশবন।

নিগ্রো দু'শ্রেণীর আছে। সম্পূর্ণ কালো আর 'কলার্ড'। 'কলার্ড' নিগ্রোদের দেহে শ্বেতরক্তের সংমিশ্রণ ঘটেচে, সম্পূর্ণ কালোর দল খাঁটী নিগ্রো।

'কলার্ড' অধিবাসীদের অবস্থা সম্পূর্ণ কালোদের চেয়ে ভাল। কারণ তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষিত এবং তাদের চেহারাও ভালো। অনেক বড় বড় চাকুরী পায় তারা।

গবর্ণমেণ্টের আইন সভায় নিগ্রোরা প্রতিনিধি পাঠাতে পারে কিন্তু সে প্রতিনিধিদের বিশেষ কোনো ক্ষমতা নেই।

১৮৩৪ সালে দাসপ্রথা এখানে আইন দ্বারা উচ্ছেদ করা হয়।

দাসপ্রথা উচ্ছেদের ফল প্রথমটা বড়ই খারাপ হোল। অতগুলো লোক হঠাৎ স্বাধীনতা পেয়ে কি করবে ঠিক করতে পারলে না। হাতে তাদের কোনো কাজকর্ম্মও নেই। স্রেফ শুয়ে বসে কুঁড়েমি করে তারা দিন কাটাতে লাগলো। জ্যামেকার বড় বড় আখের ক্ষেতগুলোর মালিক প্রায় সবাই ইংরেজ, তাদের আখের ক্ষেতেই এরা ছিল চাকর—এখন এদের অভাবে আখের ক্ষেতের কাজ বন্ধ হবার যোগাড় হোল। অনেকে আধাদরে

জ্যামেকায় পার্ব্বত্য অঞ্চলে কফির বাগান ও পায়খানা।
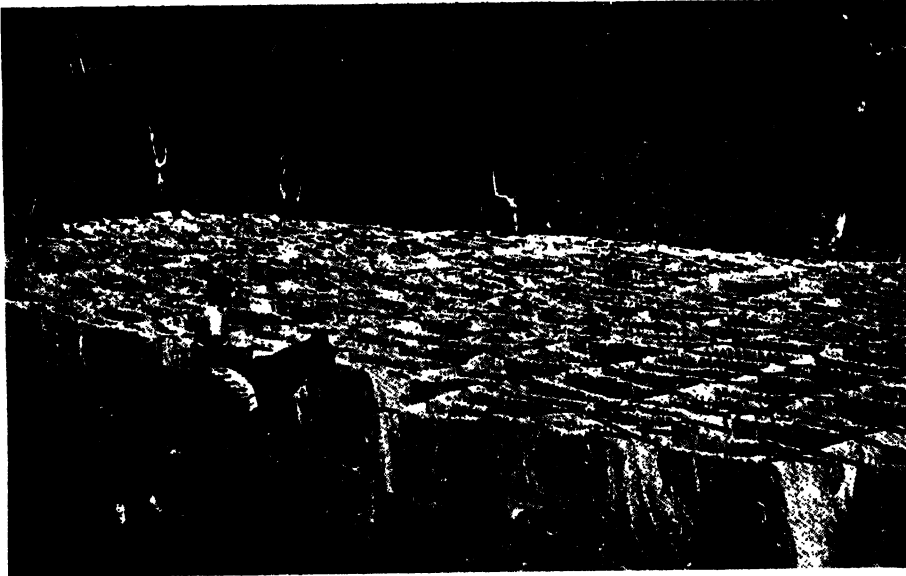
সিসল ছাল রৌদ্রে শুকানো হইতেছে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট দড়ি প্রস্তুত করা হয়। ।কায় সিসল গাছের যথেষ্ট চাষ আছে।

নিজেদের ক্ষেতখামার বিক্রি করে স্বদেশে চলে গেল। কৃষিকার্য্যের এই দুরবস্থা দেখে গবর্ণমেণ্টকে এসিয়া বিশেষ করে ভারতবর্ষ থেকে কুলী আমদানীর ব্যবস্থা করতে হোল। অল্পদিনের মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার চীনা ও

সাত হাজার ভারতীয় কুলি এসে পড়লো। দেখা গেল নিগ্রোদের চেয়ে তারা বুদ্ধিমান, তাছাড়া তাদের আর একটা গুণ, মদ্যপান তারা পাপ বলে বিবেচনা করে। এদের দিয়ে ভালই কাজ চলতে লাগলো।

জ্যামেকার নিগ্রো অধিবাসীরা দায়ে না পড়লে কাজ করতে চায় না। অভাববোধ বলে পদার্থ নেই এদের শরীরে। নিজেরাই নিজেদের বাসগৃহ তৈরী করে নেয়, তার জন্যে মিস্ত্রির কাছে ছুটতে হয় না। কলার পাতার ছাউনি, বাঁশের খুঁটি ও মাটীর দেওয়াল এই হোল বাসগৃহ। তাতে জানালার বালাই নেই। একটু যাদের অবস্থা ভালো, তারা প্যাকিং বাক্সের কাঠ দিয়ে ঘরের দেওয়াল তৈরী করে। কেরোসিনের টিন কেটে ঘরের ছাদ করে। ছাদের ওপরে পুষ্পিত লতা উঠিয়ে দৈন্যের সব চিহ্ন বেমালুম লুপ্ত করে দেয়।

বংশবীথি।

আমরা একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে জ্যামেকার পল্লী-অঞ্চল দেখতে বেরুলাম।

পথের দুধারে নতুন ধরণের গাছপালা, ছোট ছোট গ্রাম, ফার্ণবন, বাঁশবন। বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে মোটরের রাস্তা। কিংষ্টন থেকে ৪০ মাইল দূরে সেণ্ট টমাস বলে একটা ছোট সহর। এখানে গন্ধকের জলের কয়েকটা প্রস্রবণ আছে। এই প্রস্রবণে স্নানের ফলে দুরারোগ্য চর্ম্মরোগ আরাম হয়। অনেক দূর থেকে রোগীরা এসে এখানে স্নান করে। এদের জন্যে থাকবার হোটেল আছে। সস্তায় বাড়ী ভাড়া পাওয়াও যায়।

সেণ্ট টমাস ছাড়িয়ে জিম্ ক্রো পর্ব্বতমালা—এর দক্ষিণ পাশে পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা করা হয়েচে। প্রায় আড়াই হাজার ফুট ওপরে যান ওঠে, সেখান থেকে চতুর্দ্দিকের নীল শৈলরাজি, দূরের সমুদ্র ও ক্ষুদ্র পোর্ট এণ্টনিও সহরের দৃশ্যে মন মুগ্ধ হয়। এখানে পথের ধারে বড় বড় কলা বাগান দেখা গেল। সামনে সেণ্ট এ্যান উপসাগর।

আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে মানসচক্ষুতে দেখলাম বহুদূর সমুদ্র-বক্ষে অনেকদিন আগের দুখানা পাল ছেঁড়া, মাস্তুল ভাঙা ক্ষুদ্র জাহাজ আটলাণ্টিকের উত্তাল তরঙ্গরাশির সঙ্গে সাহসের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে আসচে, তাদের নাম 'ক্যাপিটানা' ও 'সান্তিয়াগো'; কলম্বসের পতাকা উড়চে তাদের ভাঙা মাস্তুলে।

সেণ্ট এ্যান উপসাগর বাঁয়ে রেখে কিছুদূর এগিয়ে গেলে রানাওয়ে উপসাগর; স্পেনীয় সেনাপতি সাসি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে এখানে লুকিয়েছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত একটা দেশী ডোঙ্গাতে পালিয়ে তিনি স্পেনে চলে যান এবং নিরুপদ্রবে ও শান্তিতে শেষ জীবন একটা মঠে অতিবাহিত করেন।

জ্যামেকার পার্ব্বত্য পথে মোটরে ভ্রমণ না করলে বোঝা যাবে না জ্যামেকা কত সুন্দর দ্বীপ। পাহাড়ের ধারে ঘন বাঁশবনের মধ্য দিয়ে রাস্তা, বাঁশ পাতার ফাঁক দিয়ে দূরের নীল সমুদ্র দেখে দেখে আমাদের আশ মিটছিল না, সরু সরল এরিকা গাছে পর্ব্বতসানু শ্যামল হয়ে আছে। কাছেই হয়তো কোন গ্রাম্য গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি নিস্তব্ধ বাতাসে ভেসে আসচে, বনের মধ্যে কত কি পাখীর কূজন!

স্পারটি পাহাড়ে চন্দ্র ও গ্রহাদি পর্য্যবেক্ষণ করার জন্যে একটা বৃহৎ মানমন্দির হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়েচে; তার ব্রেঞ্জের ডোম অনেক দূর থেকে রোদে চক্‌চক্ করছিল।

পোর্ট এণ্টনিওর সম্মুখস্থ সমুদ্রে এই শ্যামল দ্বীপটী ভ্রমণকারীদের অত্যন্ত প্রিয়।

অদূরে রিও কোবার নদী—এর উভয় তীরে যেমন ফার্ণ, দীর্ঘ তৃণরাজি, বাঁশবন, নারকেল গাছ, কোকো ও মার্টল গাছের শোভা জ্যামেকার কোন স্থানে এমন দেখা যায় না। এখানে একটা ক্ষুদ্র হোটেল আছে, তার মালিক জনৈক বৃদ্ধ নিগ্রো। টুরিষ্টদের কল্যাণে হোটেলের অবস্থা খুবই ভাল বলে মনে হোল।

রিও কোবার পার হয়ে অল্প দূরে মাউণ্ট ডিয়াবোলো ২৩০০ ফুট উপরে পাহাড়ের ওপর একটা সমতল স্থান আছে, সেখানেও একটা আছে। পরিষ্কার দিনে হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্পাইগ্লাস দিয়ে দেখলে বহুদূরে উত্তরে কিউবা দ্বীপ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, দক্ষিণে পানামা খালের অভিমুখে বিস্তৃত কারিব সাগরের রৌদ্রদীপ্ত বক্ষে ছোট ছোট শ্যামল দ্বীপরাজি কৃষ্ণকায় মুক্তপক্ষ জলচর পাখীর মত দেখায়।

কলোরাডো

কলোরাডো প্রদেশ ধাতুর খনির জন্য বিখ্যাত, কিন্তু সকলের চেয়ে বিখ্যাত তার অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর জন্য। দেশদেশান্তর থেকে প্রতি বৎসর বহু লোক কলোরাডো আসে তার প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে। এখানে যেন সকল রকম মহিমময় দৃশ্যের সম্মেলন ঘটেছে। বিশাল তুষারাবৃত পর্ব্বতরাজি, গভীর নদীখাত, কুলুকুলুনাদী পার্ব্বত্য ঝরণা, বড় বড় হ্রদ, তুষার-নদী, বিবিধ বন-কুসুম ও বন্য হরিণের দল।

রকি পর্ব্বতের বিভিন্ন শাখা এ দেশের সর্ব্বত্র ছড়ান। তুষার-নদীর সংঘর্ষে উৎপন্ন নদীখাতগুলির বয়স নিরূপণ করা কঠিন, হয় তো বা মানুষ-সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই ওদের অস্তিত্ব সুরু হয়েছিল। পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ অপরূপ মালভূমিগুলির উৎপত্তি যে কি ভাবে হয়, তা ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের বিচার্য্য বিষয়।

কলোরাডো : বিশিষ্ট বন্যপুষ্প—'কলোম্বাইন'।

আজকাল এই সব অঞ্চলে বড় বড় মোটরের রাস্তা হয়েছে। মোটরযোগে কলোরাডো পার্ব্বত্য অঞ্চলের যে-কোন জায়গায় যাওয়া যায়। এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র গ্রীষ্মের দিনে অবসর-যাপনের উপযুক্ত স্থান অনেক আছে। গ্রীষ্মের দিনে নানা বন্য ফুল ফোটে, রাত্রে শিশির পড়ে না, বাতাস শুষ্ক, অথচ সব সময়েই শীতল।

বড় বড় পর্ব্বতের মধ্যস্থ উপত্যকায় গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের বিচরণ-ভূমির জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছেন। এই সব উপত্যকার চারিদিকেই উচ্চ পর্ব্বতমালা, শিকারীদল এখানকার বনে হরিণ ও বন্য পাখী শিকার করতে আসে, সহরের লোকে বেড়াতে বা পিক্‌নিক্ করতে আসে, কলেজের ছাত্রেরা স্তরসংস্থান ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করতে আসে, মৎস্য-শিকারীরা মাছ ধরতে আসে।

খুব যখন গ্রীষ্ম, বড় বড় সহরের লোকজন রাত্রে গরমে ঘুমুতে না পেরে পার্কে শুয়ে কাটাচ্ছে, তখন সহর ছেড়ে বহু লোক কলোরাডো অঞ্চলে বেড়াতে আসে। রেলযোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সহর থেকে কলোরাডোর পার্ব্বত্য অঞ্চলে পৌঁছানো আজকাল খুব সহজ। তুষারাবৃত শিখরদেশে উঠবার সোজা রাস্তা আছে, ঘোড়া বা মোটরও ভাড়া পাওয়া যায়। অথচ কিছুকাল আগে দু'চার জন ভ্রমণকারী বা শিকারী ছাড়া এই অঞ্চলের অস্তিত্ব অনেকের কাছে অজ্ঞাত ছিল।

কলোরাডোর বিভিন্ন শিখররাজির দুই-তৃতীয়াংশের উচ্চতা ৬০০০ হাজার ফুট থেকে ১৪০০০ হাজার ফুট। এই অঞ্চলে ১০২৯টি শিখর আছে, যাদের উচ্চতা ১০,০০০ ফুটের বেশী এবং ৫৯টি শিখর আছে, যাদের উচ্চতা ১৪০০০ হাজার ফুটের বেশী।

কলোরাডোর পার্ব্বত্য অঞ্চলের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এর যে কোন দিকে, যে কোন শিখরে বা যে কোন মালভূমিতে অতি সহজে পৌছান যায় বা পৌঁছানর চমৎকার রাস্তা আছে।

দশ হাজার ফুট উচ্চ মালভূমির উপরে দুটি পুরানো আমলের খনি ও খনি-সংক্রান্ত ছোট সহর এখনও বর্ত্তমান, যদিও এখনও আর তাদের সে পূর্ব্ব গৌরব নেই। এই সহর দুটির নাম লেড্‌ভিল্ ও ক্রিপ্‌স্ ক্রিক্। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে এখানে অনেক লোকের বাস ও দোকান-পসার ছিল। এখন যাত্রীদের জন্য কেবল কয়েকটি বড় হোটেল সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে।

আল্পস্ পর্ব্বতমালার সঙ্গে কলোরাডো পার্ব্বত্য অঞ্চলের এইখানেই পার্থক্য। আল্পস্ পর্ব্বতে বেশী উঁচুতে আরোহণ করা বিপজ্জনক, এখানে উঁচুতে অতি সহজেই পৌছান যায়।

মার্কিন যুক্ত-রাজ্যের অনেকগুলি বড় সহর থেকে ট্রেনে মাত্র একটা রাত্রি কাটালেই কলোরাডো অঞ্চলে আসা যায়। আজকাল প্রত্যেক ছুটীতে এত যাত্রীর ভিড় হয় যে, ইউনিয়ন প্যাসিফিক্ রেল কোম্পানী ট্রেনের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

কলোরাডোর আবহাওয়া দ্রুত ও আকস্মিক পরিবর্ত্তনের জন্য বিখ্যাত। গ্রীষ্মের দিনে সারাদিনই রৌদ্র, অথচ সে রোদের তাপ এমন কিছু অসহ্য নয়। রাত্রিকাল খুব ঠাণ্ডা ও আরাম-প্রদ। গ্রীষ্মকালে ৬০° ডিগ্রীর বেশী উত্তাপ কখনও দেখা যায় না।

কলোরাডো: ন্যাশন্যাল পার্ক ও ফরেষ্টে ভ্রমণকারীদের তাঁবু খাটাইয়া বাসের জন্য এইরূপ মনোহর স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

পর্ব্বতের উপর অনেক ক্রীড়াভূমি আছে। সেখানে গল্‌ফ, টেনিস্, স্কেটিং প্রভৃতি খেলা খেলতে প্রতিবার গ্রীষ্ম-কালে বহু লোক আসে। যারা খেলা করতে চায় না, শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে পরিতৃপ্ত হতে চায়, তাদের মোটর-ভ্রমণের জন্য সুদীর্ঘ পথ আছে, মোটরের গদি-আঁটা আসনে বসে তারা জগতের একটি অতি বিশাল পার্ব্বত্য অঞ্চলের সৌন্দর্য্যময় দৃশ্য দেখতে পারে।

রকি পর্ব্বতের ন্যাশন্যাল পার্কের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে 'ফল্ রিভার রোড' নির্ম্মাণের পর আজকাল মোটরযাত্রীদের সুবিধা হয়েছে। এই পথ সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তুত করেছেন,—Corley Scenic Highway এই পথটির নাম। নাম থেকেই বোঝা যাবে, শুধু সৌন্দর্য্যময় অঞ্চলগুলির সুসমতার দিকে লক্ষ্য রেখে এই পথ তৈরী হয়েছে। মাঝে মাঝে এই পথের ধারে হোটেল ও সরাই আছে।

পার্ব্বত্য নদীতে খুব বড় বড় 'ট্রাউট' মাছ পাওয়া যায়। বিশেষ করে হ্রদগুলিতে 'ট্রাউট' মাছের সংখ্যা খুব বেশী। প্রতি বৎসর অনেক 'ট্রাউট' ধরা পড়ে এবং বাক্সবন্দী হয়ে বিদেশে চালান যায়।

এই পার্ব্বত্য হ্রদগুলির সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। এদের চারি ধারে বন, বনে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরণের বন্যপুষ্প বন আলো করে রাখে, একটি গম্ভীর প্রশান্তি ও চারিদিকের সৌন্দর্য্যে দর্শকের মনঃপ্রাণ বিভোর হয়ে ওঠে। যারা

খেলাধুলা ভালবাসে না, শুধু বসে বসে ভাবতে চায় বা কবিতা লিখতে চায়, তারা নৌকা ভাড়া করে আপন মনে আসন্ন সন্ধ্যায় হ্রদের নিস্তরঙ্গ নীল জলে ইচ্ছামত বেড়িয়ে বেড়াতে পারে।

তুষার-নদী অনেক শ্রেণীর আছে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা আসেন এই সব তুষার-নদীর স্রোতের গতি, গঠন ও আকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে। আমেরিকায় বড় বড় ইউনিভার্সিটিগুলি থেকে অনেক পক্ষিতত্ত্বজ্ঞ আসেন এ অঞ্চলের বন্য পক্ষীদের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করতে।

কলোরাডোর পার্ব্বত্য অঞ্চলের বনানীর শোভা বাড়িয়েছে এখানকার বন্যপুষ্পের প্রাচুর্য্য। সে যে কত ধরণের ফুল, আর কত রকম যে তাদের রং!

সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচু পার্ব্বত্য বনানীতেও প্রায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মত ফুলের শোভা। এ দেশের এ একটি অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। তুষার-নদীর সান্নিধ্যবশতঃ যে অঞ্চলগুলি খুব শীতল, সে সব জায়গা ছাড়া আর সমস্ত শিখর ও সমভূমিতে জল সুপ্রচুর।

কলোরাডো: উপত্যকায় মৎস্য-শিকারের নদী।

উদ্ভিত্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, শুধু কলোরাডো ষ্টেটেই ৩০০০ হাজার শ্রেণীর বন্যপুষ্প আছে, তার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ছোট ছোট উপত্যকা ও মালভূমিতে ফোটে। বাকিগুলি পাঁচ হাজার ফুটের ওপরে ফোটে। অনেক ফুলের সুগন্ধ ও সৌন্দর্য্য দুই-ই আছে। ইউরোপে পরিচিত "লিলি-ওফ-দি-ভ্যালি", গোলাপ, ফ্লক্স, ভায়োলেট, ব্লুবেল, জিরেনিয়াম, অর্কিড, লার্ক্‌স্‌পার এগুলিও যথেষ্ট পরিমাণে ফোটে। সুগন্ধ "ফর্গেট মি-নট" ফুল পথের ধারে ও শৈলসানুর সর্ব্বত্র দেখা যায়।

পূর্ব্বে যখন এখানে অবাধ শিকারের স্বাধীনতা ছিল, তখন শিকারীরা অনেক বন্য জন্তু মেরেছে। এখানকার প্রাণীদের বধ করা হ'ত তাদের বহুমূল্য লোমের জন্য। সুদূর হড্‌সন নদী-অঞ্চলে যেমন শিকারীরা ফাঁদ পেতে জন্তু শিকার করে, এখানেও গবর্ণমেন্টের কাছে লাইসেন্স নিয়ে শিকারীরা বন্যজন্তু ধরত। কলোরাডো ষ্টেটের একটি প্রধান আয় ছিল শিকারীদের লাইসেন্সের ট্যাক্স।

কিন্তু আজকাল আইন দ্বারা বন্য জন্তু শিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ দেশে এক প্রকার পার্ব্বত্য লোমশ মেষ আছে, তাদের শিং খুব বড় বড় বলে নাম দেওয়া হয়েছে 'বিগ্‌হর্ণ' মেষ। এরা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ ও দুরারোহ শৃঙ্গ-গুলিতে অবলীলাক্রমে লাফালাফি করে খেলে বেড়ায়। এরা দেখতে ভারি সুশ্রী। কিন্তু মূল্যবান্ লোম গায়ে থাকার অপরাধে এদের বংশ প্রায় নির্ব্বংশ হতে বসেছিল। সম্প্রতি সে বিপদ্ থেকে এরা মুক্তি পেয়েছে।

'বিগ্‌হর্ণ' ভেড়া ছাড়া নানা ধরণের হরিণ, বিবর, বনবিড়াল, পার্ব্বত্য সিংহও দেখা যায়। খরগোস ও মারমট্ নদীর উভয় তীরের মুক্ত প্রান্তরে বাস করে। এক জাতীয় কৃষ্ণসার হরিণ পার্ব্বত্য হ্রদের বনে পাওয়া যায়। কলোরাডো ষ্টেটে যত পাখী দেখা যায়, অন্য কোনও ষ্টেটে এত পাখী তো দূরের কথা, এর অর্দ্ধেকও আছে কি না সন্দেহ।

৪০৫ শ্রেণীর পাখী এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, তবু এখনও উত্তর দিকের পার্ব্বত্য হ্রদগুলির তীরে যে বন আছে, সে-গুলিতে ভাল রকম অনুসন্ধান হয় নি। ডেন্‌ভার হ্রদে এমন তিনটি নতুন শ্রেণীর পাখী দেখা গিয়েছে, যুক্ত-রাজ্যের কোনও স্থানে সে পাখী নেই।

এই সব পাখীর অধিকাংশ থাকে পাহাড়ের গায়ের ফাটলে এবং উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে। অন্ততঃ দুই তিন শ্রেণীর পাখী সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের অনুর্ব্বর ও বায়ু-তাড়িত অঞ্চলে বাসা বাঁধে। অথচ এরা ঈগল বা কন্ডর জাতীয় শিকারী পাখী নয়। অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পাখী থাকে পথের ধারের বনে ও ঝোপঝাড়ে, এদের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীর পাখী চমৎকার শিস্ দেয়। বড় বড় লোমশ পালকযুক্ত এক রকমের কাঠঠোক্‌রা আছে, এরাও বেশী উঁচুতে থাকে না। কয়েক জাতের দুষ্প্রাপ্য পেঁচক দু'হাজার ফুটের উপরের বনে বা পাথরের ফাটলে দেখা যায়।

বড় বড় পর্ব্বতের যত উঁচুতে ওঠা যায়, গাছপালা তত কমে আসে। তারপর এমন এক জায়গায় এসে পৌছানো যায়, যার উপরে গাছপালা আর তেমন জন্মায় না, অন্ততঃ যাদের গুঁড়িতে কাঠ হয় এমন ধরণের গাছপালা জন্মায় না। এই জায়গার উপরে যে গাছ হয়, সেগুলি শৈবাল ও অশ্বকর্ণ জাতীয় উদ্ভিদ্। সাধারণতঃ দশ হাজার ফুট পর্য্যন্ত গাছপালা জন্মায়। এর উপরে এত ঝড় হয় এবং এত শীত পড়ে ও তুষারপাত হয় যে, গাছপালা বেঁকে দুম্‌ড়ে পত্রশূন্য হয়ে পড়ে।

কলোরাডো : রকি পর্ব্বতের 'বিগ্‌হর্ণ' জাতীয় মেষ।

চার পাঁচ হাজার ফুট উপরে যে-সব গাছ সোজা প্রায় দেড় শো ফুট লম্বা হয়, দশ হাজার ফুটের উপরে সেই সব গাছ লতার মত এঁকে বেঁকে চলে,—বড় বড় ওক্ পর্য্যন্ত অশীতিপর বৃদ্ধের মত বেঁকে কুঁজো হয়ে দুম্‌ড়ে যায়। কোন কোন গাছের পত্র-পুষ্প ও ডালপালা বায়ু যে দিকে প্রবাহিত হয়, সে দিকে বেঁকে থাকে, দেখে মনে হয়, যেন ভীম প্রভঞ্জনের হাত এড়াবার জন্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে পাগলের মত ছুটে পালাচ্ছে।
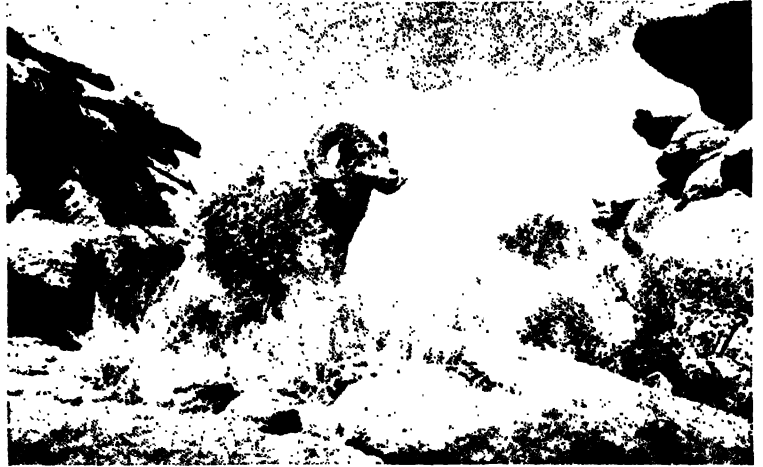
অধিকাংশ গাছ বেঁটে হয়ে যায়। এমন সব গাছ আছে, যা' নীচের পাহাড়ে ৬০।৭০ ফুট বাড়ে, কিন্তু দশ হাজার ফুট ওপরে একশো বছরের গাছ কয়েক ইঞ্চি মাত্র উঁচু হয়।

কলোরাডোর প্রধান সহর ডেন্‌ভার এই পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রবেশদ্বার-স্বরূপ। রকি পর্ব্বতের পাদমূল থেকে ডেন্‌ভার মাত্র ১৩।১৪ মাইল দূরে। ডেন্‌ভার থেকে রওনা হয়ে রকি পর্ব্বতের বিখ্যাত ন্যাশন্যাল পার্কগুলি ভ্রমণ করবার চমৎকার বন্দোবস্ত আছে।

ডেন্‌ভার খুব ছোট সহর নয়, ১৯২৮ সালে এর লোকসংখ্যা ছিল তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার, বর্ত্তমানে লোক-সংখ্যা অনেক বেড়ে প্রায় পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দক্ষিণের ষ্টেটগুলির মধ্যে কলোরাডো খুব উন্নতিশীল, আয়ও অনেক বেশী। এর প্রধান কারণ, নানা দেশ থেকে যাত্রাদল আসে রকি পর্ব্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে, ডেন্‌ভার থেকে তাদের যাত্রা সুরু হয়। ফলে

এই সহরের হোটেল, দোকান, রেল, ট্রাম ও মোটরওয়ালাদের যথেষ্ট আয় হয়। এতে ষ্টেট্ গবর্ণমেণ্টের অংশ আছে, তা' ছাড়া ইন্‌কাম্ ট্যাক্স প্রভৃতি আরও নানাপ্রকার আয়ের উপায় আছে। যাত্রীদের যাতায়াত সুগম করবার জন্য ষ্টেট্ গভর্ণমেণ্টের ত্রুটী নেই। কারণ তাদের আকৃষ্ট করে এখানে আনার উপরে ষ্টেটের সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে। এ জন্য ডেন্‌ভার সহরে মোটরের ভাড়াও খুব সস্তা করে দেওয়া হয়েছে। ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনেও খুব সস্তা ভাড়ায় পর্ব্বতের পাদমূল পর্য্যন্ত যাওয়া যায়।

ডেন্‌ভার সহরে ৪২টি পার্ক আছে। এদের মধ্যে সিটি পার্ক সকলের চেয়ে বড়, এই পার্কের মধ্যে একটি পশু-শালা ও একটি ইলেক্‌ট্রিক্ ফোয়ারা আছে। পরিষ্কার দিনে সিটিপার্ক থেকে রকি পর্ব্বতমালার সম্মুখভাগের সমস্ত অংশটা এক নজরে দেখা যায়।

ডেন্‌ভারে প্রায় ১৫০টি হোটেল ও সস্তাদরের ১০০০ বোর্ডিং আছে। গভর্ণমেণ্ট থেকে এদের রেট্ বেঁধে দেওয়া আছে, যার যা' ইচ্ছা আদায় করবার যো নেই। সহরের একটা বড় রেলষ্টেশনে (এখানে ৩।৪টা রেলষ্টেশন) গভর্ণমেণ্টের খরচে একটা Bureau of information রেখেছেন, ভ্রমণ-সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ এখানে বিনামূল্যে যাত্রীদের সরবরাহ করা হয়।

ডেন্‌ভার সহরের ৭৫ মাইল দূরে বিখ্যাত পাইক্‌স্ পিক্।

এই পর্ব্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ১৪১০৯ ফুট—রেলে ও মোটরে এর উপরে উঠা যায়। পাইক্‌স্ পিকের উপরে ষ্টেট্ গভর্ণমেণ্টের তৈরী একটা বিশ্রামাগার আছে। কলোরাডো অঞ্চলে রকি পর্ব্বতের যতগুলি ছোট বড় শৃঙ্গ আছে, পাইক্‌স্ পিকের উপর উঠলে তার সবগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

যেখান থেকে পাইক্‌স্ পিকে উঠা আরম্ভ হয়, সেটা একটা ছোট সহর। এর কাছেই একটা পার্ব্বত্য ঝরণা আছে, যার জল বাতরোগের পক্ষে মহোপকারী। জলে সোডা, ম্যাগ্‌নেসিয়া, গন্ধক, পটাস্ ও লিথিয়া মিশ্রিত আছে। টাউনটা এক রকম গড়ে উঠেছে বাতরোগীদের ভিড়ে।

ইউরোপীয়দের আগমনের অনেক পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান্ অধিবাসীরা এই ঝরণার জলের গুণ অবগত ছিল। ঝরণার নিকটেই উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা সুন্দর স্থান আছে, সেটা বর্ত্তমানে একটা ন্যাশন্যাল পার্ক। ইণ্ডিয়ান্‌রা তার নাম দিয়াছিল 'ভগবানের বাগান'—এখনও এই নামই প্রচলিত। অনেকটা জায়গা জুড়ে লাল বেলে পাথরের নানা রকম শৃঙ্গ, স্তূপ ইত্যাদি এখানে দেখা যায়। কোথাও যেন অবিকল একটা পাথরের ষাঁড় কি কৃষ্ণসার হরিণ, কোথাও একটা গির্জ্জার চূড়া। ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত ও রৌদ্রের প্রভাবে নরম বেলেপাথর বহুকাল ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ঐ রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাচীনকালে মানুষ এখানে পাহাড়ের গায়ে গর্ত্ত খুঁড়ে বাস করত। এখনও একদল পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ান্ সেই সব গর্ত্তে বাস করে। কিন্তু এরা সত্যিকার গুহাবাসী মানুষ নয়। ভ্রমণকারীদের নয়নের তৃপ্তিদান করবার উদ্দেশ্যেই ষ্টেট্ থেকে এদের এই গর্ত্তে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু কলোরাডো ষ্টেটে সত্যই একটা প্রাচীন স্থান আছে, যেখানে গুহাবাসী মানুষদের আবাস ছিল। সেটাও এখন ন্যাশন্যাল পার্ক, পার্কটির নাম 'মেসা ভার্ড ন্যাশন্যাল পার্ক'।

'মেসা ভার্ড ন্যাশন্যাল পার্ক' প্রাগৈতিহাসিক মানবের অকৃত্রিম আবাসভূমি হিসাবে যুক্তরাজ্যের মধ্যে একটা বিখ্যাত স্থান। অনেক ছাত্র, অধ্যাপক ও ভ্রমণকারীরা প্রতি বৎসর পার্কটি দেখতে আসে। প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি সংরক্ষণের জন্যই আইন দ্বারা স্থানটাকে ন্যাশন্যাল পার্ক করা হয়েছে।

'মেসা' (Mesa) কথাটার অর্থ পাহাড়ে মাথার উপরের সমতল ভূমি। প্রাচীনকালে মানুষ গর্ত্ত কেটে বাস-স্থান তৈরী করেছিল এই মালভূমির নীচে পাহাড়ের সানুর গায়ে। এরা অনেক দিন আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু

এদের অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার ও বাসনপত্র কিছু কিছু মাটী খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। ষ্টেট্ গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এখানে একটা মিউজিয়াম স্থাপন করেছেন।

ডেন্‌ভার থেকে এই স্থানের দূরত্ব ২৫ মাইল।

'মেসা ভার্ড পার্কে'র আট মাইল উত্তরে কলোরাডো ন্যাশন্যাল ফরেষ্ট।

যে সমস্ত স্থান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে রমণীয়, দেশের আইনে সেগুলিকেই করে রাখে ন্যাশন্যাল পার্ক বা ন্যাশন্যাল ফরেষ্ট। এখানকার গাছপালা কেউ কাটতে পারে না, বন্যজন্তু কেউ শিকার করতে পারে না, যেখানে-সেখানে হোটেল বা বৈদ্যুতিক শক্তিসংগ্রহের যন্ত্র বসিয়ে স্থানের প্রাকৃতিক শোভাও নষ্ট করতে পারে না। কলোরাডো ন্যাশন্যাল ফরেষ্ট এই ধরণের একটি পার্ক।

এই অপূর্ব্ব স্থানে বড় বড় পর্ব্বতশিখর, বিরাট ও গভীর নদীখাত, হ্রদ, বিশাল বনানী, ঝরণা ও তুষারনদীর একত্র সমাবেশ ঘটেছে। অথচ ডেন্‌ভার থেকে এর দূরত্বও খুব বেশী নয়, তিন ঘণ্টায় মোটরে ন্যাশন্যাল ফরেষ্টের প্রান্তসীমায় পৌছানো যেতে পারে।

কলোরাডো : গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন, ন্যাশন্যাল পার্ক।

কলোরাডো ন্যাশন্যাল ফরেষ্টে আটটি বড় বড় গ্লেসিয়ার আছে, এদের প্রত্যেকটি প্রায় এক মাইল চওড়া ও কয়েক শো ফুট গভীর। এদের মধ্যে আরাপাহো, ইসাবেল ও সেণ্ট ভ্রেন গ্লেসিয়ার খুব বড়, এদের তুষার-স্রোতের গতি বৎসরে ১৮ থেকে ৩৫ ফুট। আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের তুষারনদীগুলির তুলনায় এদের তুষার-স্রোতের গতি দ্রুততর। আরাপাহো গ্লেসিয়ারের উত্তরে উত্তর-আমেরিকায় আর কোন বড় জীবন্ত গ্লেসিয়ার নেই। জীবন্ত অর্থাৎ সচল।

কলোরাডো ষ্টেটের আর একটা দ্রষ্টব্য স্থান রকি মাউটেন্ ন্যাশন্যাল পার্ক।

এই সুন্দর পার্ক ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছে। একটা ছোট জায়গা আগে গভর্ণমেণ্ট থেকে ন্যাশন্যাল পার্ক করা হয়েছিল, একটা পাহাড়ের গায়ের খানিকটা সমতলভূমি, সেখান থেকে চারিদিকের দৃশ্য বড় চমৎকার। উঠ্‌বার জন্য মোটরের অনেকগুলি রাস্তাও করে দেওয়া হয়েছিল। এর নাম ছিল এষ্টস্ পার্ক; এর চারিধারের সীমানা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বর্ত্তমানে এটা এই বিস্তৃত পার্কে পরিণত হয়েছে!

রকি মাউটেন্ পার্ক ২০ মাইল লম্বা ও মাইল দুই চওড়া।

এর চারিধার ঘিরে বড় বড় পর্ব্বতশিখর, উত্তরে টন্‌সন্ নদী, নদীর ধার থেকে পাহাড়ের কোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ ও পাইন ফারের নিবিড় বন। ১৮৬৫ সাল থেকে ভ্রমণকারীদের দল এখানে বেড়াতে আসে।

এই পার্কের একটা বিশেষত্ব, এখানে বনের ফুল খুব বেশী ফোটে। অনেক হ্রদ আছে, হ্রদের চারিধারেই প্রকৃতির হাতে তৈরী ফুলের বাগান, চার পাঁচটা বড় বড় জলপ্রপাত, মোট জলপ্রপাত অসংখ্য। আর একটি বিশেষত্ব,

এর তুষার-নদী। দুটি বড় তুষার-স্রোত এর দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমানা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। গ্লেসিয়ারের ইতিহাস আলোচনা করার পক্ষে স্থানটি বিশেষ উপযোগী। কারণ কয়েকটি প্রাচীন ও লুপ্ত গ্লেসিয়ারের চিহ্ন শিলাতলে বিদ্যমান।

১৯১৬ সালে দেশের আইন দ্বারা এই ন্যাশন্যাল পার্ক করা হয়। নিয়ম করা হয় যে, পার্কে ঢুকতে হবে এষ্টস্ পার্কের দিক্ থেকে। এখানে এষ্টস্ পার্ক নামে একটি গ্রামও আছে। গ্রামে অনেকগুলি হোটেল ও সরাই, একটা এরোপ্লেন নামবার জমি, একটা সরকারী বেতার ষ্টেশন আছে। ডেন্‌ভার থেকে এষ্টস্ পার্কের দূরত্ব ৭০ মাইল এবং রকি মাউনটেন্ পার্কের পূর্ব্ব সীমানা থেকে এই গ্রামের দূরত্ব ৫ মাইল মাত্র।

কলোরাডো ষ্টেটে রকি পর্ব্বতের অংশ অবস্থিত, তার মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দর অংশ এই রকি মাউনটেন্ পার্ক থেকে দেখা যায়। একটি বড় মালভূমির নাম ফ্ল্যাট টপ্ মাউনটেন্, এর উচ্চতা ১২০০০ ফুট, এষ্টস্ পার্ক গ্রাম থেকে ঘোড়ার পিঠে পূর্ব্বদিকে সাত মাইল গেলে এর পাদমূলে পৌছান যায়।

আর একটা উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গের নাম লঙ্স্ পিক্। উপরে উঠ্‌বার রাস্তা আছে, একদিনেই লঙ্স্ পিকের উপরে বেড়িয়ে লোকে হোটেলে ফিরে আসতে পারে। লঙ্স্ পিক্ থেকে মনে হয় যেন সমগ্র কলোরাডো ষ্টেট্ দর্শকের পায়ের নীচে পড়ে আছে। উত্তর-পশ্চিম কোণে কন্‌টিনেণ্টাল ডিভাইড বলে রকি পর্ব্বতের একটা বড় শাখা, তার বড় বড় তুষারাবৃত শিখর ১৬০০০ হাজার ফুটের উপরে মাথা তুলে আছে। দক্ষিণে প্রকাণ্ড একটা হ্রদ, এর নাম Exquisite Fern Lake, রকি মাউনটেন্ পার্কের মধ্যে এটি একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। এর চারিধারে নির্জ্জন ফারের অরণ্য, নিস্তরঙ্গ জলের নীচে ঝাঁকে ঝাঁকে ট্রাউট্ মাছ খেলে বেড়ায়। হ্রদে মৎস্য-শিকারীরা দলে দলে আসে ট্রাউট্ মাছ ধরতে।

এষ্টস্ পার্ক গ্রাম থেকে এই হ্রদে আসা সুবিধাজনক। মাছ ধরার সময়, অক্টোবর মাস থেকে জুন মাস পর্য্যন্ত। এই সময় এষ্টস্ পার্কের হোটেল ও সরাইগুলি লোকে পূর্ণ থাকে।

যুক্তরাজ্যের কতকগুলি বড় বড় কলেজ ও স্কুলের ছেলেরা গ্রীষ্মকালে এষ্টস্ পার্কে বেড়াতে আসে, খেলাধুলো করে, এখানেই তাদের দু'তিন মাস ক্লাস হয়। এদের জন্য অনেক খানি জায়গা পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকে। তাদের ব্যায়ামাগার, টেনিস্ কোর্ট, ক্লাসরুম, গল্‌ফ্ খেলার জায়গা সব এখানে।

কলেজের ছেলেরা অধ্যাপকের সঙ্গে আসে রকি পর্ব্বতের ভূতত্ত্ব আলোচনা করতে ও গ্লেসিয়ার পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে। গ্লেসিয়ার যেখানে শেষ হয়েছে, সে জায়গাটাকে মোরেন বলে। প্রাচীনকালের দু'টি বড় গ্লেসিয়ার রকি মাউনটেন্ পার্কের পূর্ব্ব-সীমানায় শেষ হয়েছিল, তার চিহ্ন এখনও আছে। একে বলে মোরেন পার্ক। এ গুলির অবস্থা ও প্রাচীন ইতিহাস ভূতত্ত্বের ছাত্রদের নিকট বিশেষ কৌতূহলের বিষয়।

বোর্ণিও দ্বীপ

মিঃ জন্ হাল্‌স্ চাচ্ ইষ্ট্ ইণ্ডিজের বহু স্থান পায়ে হাঁটিয়া ও সাইকেলযোগে ভ্রমণ করিয়াছেন। বোর্ণিও দ্বীপের অভ্যন্তরস্থ গ্রামগুলির অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য ইনি দুর্গম জঙ্গলময় পার্ব্বত্য পথে অনেক সময় নানাপ্রকার বিপদেরও সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বোর্ণিও দ্বীপের ডায়াক জাতির আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে ইনি একজন বিশেষজ্ঞ। বোর্ণিও দ্বীপের পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া মিঃ হাল্‌স্ সম্প্রতি একখানি বিখ্যাত ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল :—

ধরো তোমার পকেটে একটা যায়গায় একখানা ষ্টীমারের টিকিট আছে, অথচ কোনো ম্যাপে বা কোনো ভ্রমণের বইয়ে সে যায়গার কোন উল্লেখ দেখা যায় না, সে একটা নতুন অভিজ্ঞতা বটে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাটা শীঘ্রই একটা দুঃসাহসিক কার্য্যের আকার ধারণ করে, যখন ট্রাভ্‌ল্‌-এজেন্সির কেরাণীরা—যারা দুনিয়ার সকল বিষয়ে একরকম সবজান্তা—মাথা নেড়ে বলে যে, তারা এ জায়গার নামই কখনও শোনে নি।
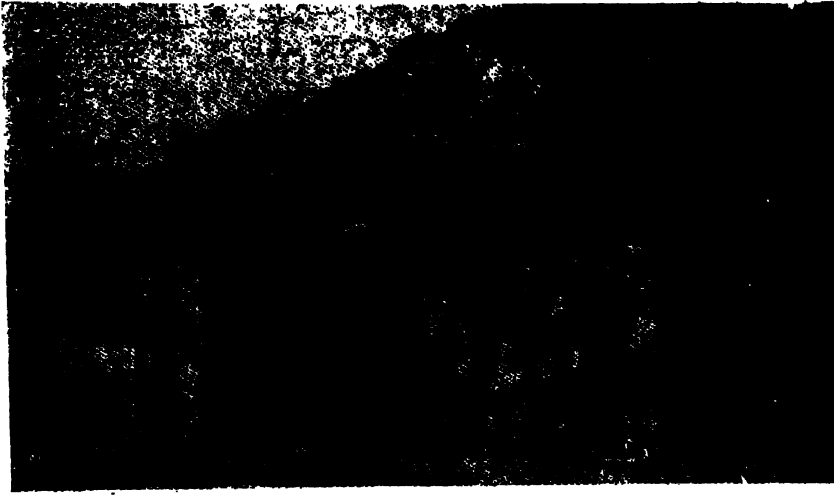
বোর্ণিওর মোটর বাস।

ব্যাপারটা ঘটেছিল সিঙ্গাপুরে। দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে সবে এসে নেমেচি। ওখানকার এক জাহাজ কোম্পানীর ম্যানেজারের নামে একখানা চিঠি এনেছিলাম, সেখানা তাঁর হাতে দিলাম। তাতে লেখা ছিল, মিঃ হাল্‌স্ একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী, ইনি দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন, এঁর জন্যে একটা ভাল ভ্রমণের জায়গা ঠিক করে দিও।

ম্যানেজার আমায় বল্লেন—সময় নেই, টমোহান জাহাজ দুপুরে ছাড়চে। জাহাজে গিয়ে উঠুন, সাম্বাস্ চলে যান। বল্লাম—বেশ কথা। আমি যাচ্চি—কি—সাম্বাস্ জায়গাটা কোথায়? সেখানে কি আছে? ম্যানেজার মাথা চুলকে বল্লেন—সাম্বাস্? ও!···তা ওটা হবে গিয়ে ডাচ্ বোর্ণিওর ওই দিকে কোথাও। চলে যান, বেশ জায়গা।

যাঁরা সোমারসেট মম্ কিংবা এইচ, ডি, ভিয়ার ষ্ট্যাক্‌পুলের উপন্যাস পড়েচেন, তাঁরা অবিশ্যি খুব পুলকিত হয়ে উঠ্‌তেন এমন অজ্ঞাত স্থানে ভ্রমণের আনুষঙ্গিক নানা রোমান্সের আশায়—কিন্তু দুনিয়াময় ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার ফলে আমি জানি, ওরকম জায়গায় বেড়াতে গেলে দুঃখ কষ্ট ও বিপদই সার হয়। উপন্যাসের রোমান্স উপন্যাসের পাতাতেই থেকে যায়।

কে, পি, এম্, কোম্পানীর জাহাজে গিয়ে উঠ্লাম। আমিই সাম্বাসের একমাত্র যাত্রী। ডেকে আর একজন যাত্রী ছিল, কিন্তু সে আমার চেয়ে ভাগ্যবান্, তার টিকিট লাগে নি, কারণ সে মানুষ নয়, ভালুক। যবদ্বীপের বাণ্ডোয়াং জু'তে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্চে সিঙ্গাপুর থেকে।

একটি ডায়াক পরিবার।

সাম্বাস্ বন্দরের জেটিতে গিয়ে জাহাজ লাগলো, সে-দিন পূর্ণিমার রাত। এমন ধরণের রাত, যা কিনা মনে থাকে চিরকাল! কিন্তু জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে নদীজলের পচা কাদার গন্ধ, আমদানী রবারের গাঁটের বিশ্রী দুর্গন্ধ আর মশার ঝাঁক আমায় পাগল করে তুললে। জঙ্গলের মাথায় তখন কি অপূর্ব্ব চাঁদই উঠচে, কিন্তু রবারের দুর্গন্ধ ও মশার উৎপাতে আমায় পালাতে হল কেবিনে। হায়, সোমারসেট মমের রোমান্স!
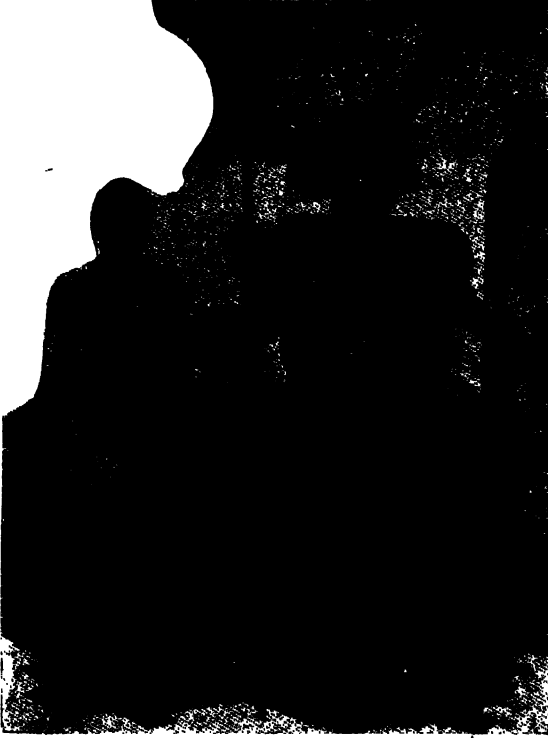
অরণ্যচারী ডুসুন শিকারী।

পরদিন সকালে ছোট ষ্টীমারে রওনা হয়ে সারাদিন ধরে সাম্বাস্ নদী বেয়ে চলেচি, চলেচি। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েচি নতুন দেশের নতুন দৃশ্য দেখতে, নদীর দুধারে কি ভীষণ ঘন জঙ্গল, লোকজনের বসতি চোখে পড়ে না, কর্দ্দমময় তীরে বড় বড় কুমীর রোদ পোয়াচ্চে। জঙ্গলে গাছের ডালে ডালে নানা জাতীয় পাখী ও বাঁদরের দল কিচমিচ করচে। ক্বচিৎ কোথাও বনের ফল ফুটে আছে।

ষ্টীমারের কাপ্তেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। তার কাছে এসব একঘেয়ে পুরানো হয়ে গিয়েছে। আজ এই বিশ বছর ধরে সে এই পথে প্রতিদিন ষ্টীমার চালিয়ে যাচ্চে, নদীর প্রত্যেক বাঁকের খবর সে রাখে। আমার আমোদের জন্যে সে মাঝে মাঝে ষ্টীমারের বাঁশী বাজিয়ে জঙ্গলের বানরদের সন্ত্রস্ত করে তুলছিল।

নদীর মুখ বেয়ে দশ মাইল উজান দিকে যাবার পরে নারিকেল গাছ ক্রমশঃ পাৎলা হয়ে আসতে লাগল। তাদের স্থান অধিকার করলে রবারের বাগান আর বুড়োমানুষের দাড়ির মত দেখতে পরগাছা ঝোলানো বড় বড় গাছ।

এখানে আমরা একটা ছোট গ্রাম দেখতে পেলাম। আমাদের ষ্টীমার দেখে একদল লোক ডোঙ্গা বেয়ে নিকটে এল। ডায়াক জাতি খুব নিরীহ নয়, হয় তো বা ওরা দু'একটা মানুষের মাথা সংগ্রহ করতেই আসচে। কিন্তু কাপ্তেন বল্লে, ওরা ডায়াক নয়, মালয় ছেলেমেয়ে, যাত্রীদের কাছে এক-আধটা সেণ্ট চায় সাঁতারের কসরৎ দেখিয়ে।

আর একটা মোড় ঘুরতেই সাঁতারের আমোদ থেকে একেবারে ট্রাজিডির দিকে মন গেল। সেখানে একটা কাঠের তক্তায় বড় বড় অক্ষরে ডাচ্ ভাষায় লেখা আছে, 'WARK' অর্থাৎ ভগ্ন পোত। ষাট বছর আগে ডাচ্ গভর্ণমেণ্ট সাম্বাসে একটা ছোট কামানবাহী ষ্টীমার পাঠান স্থানীয় সুলতানকে একটু শায়েস্তা করতে এবং শায়েস্তা হবার পরে সুলতানকে রাজকীয় উপাধি দানে সম্মানিত করতে। কামানবাহী ষ্টীমারখানা এইখানে এসে একটা ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জলমগ্ন হয়—যদিও উভয় তীর খুবই নিকট, তবুও ষ্টীমারের একটি প্রাণীও বাঁচে নি।

এই লোক দুটির হাতে যা রয়েচে, তা বাঁশী নয় হুঁকো।

সন্ধ্যার সময় আমরা একটা গ্রামে পৌছ-লাম, সেখানে কয়েকজন ইউরোপীয় থাকেন। তাঁরা আমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করলেন। একজন বৃদ্ধ হাঙ্গেরীয়ান্ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোল, তিনি এ দেশীয় একটি মালয় রমণীকে বিবাহ করে সুখে ঘর-সংসার কর-চেন।

ভদ্রলোকটি রবারের চাষে দু'পয়সা উপার্জ্জন করেচেন। আমাকে পরদিন সকালে তাঁর মোটরে বিশ মাইল দূরবর্ত্তী তাঁর বাংলোতে নিয়ে গেলেন। এখানেই তিনি বহুদিন আছেন। নারিকেল-কুঞ্জ ও বোগেন্‌ভিলিয়া ঝাড়ের আড়ালে বাংলোখানি ভারী চমৎকার দেখতে। খুব নির্জ্জন জায়গা। তাঁর পুকুরে আমরা মাছ ধরতে বসলাম আর তিনি ধূমপান করতে করতে তাঁর গত বিশ বৎসরের বোর্ণিও প্রবাসের নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন।

তিনি বল্লেন, ডাচ্-বোর্ণিওতে এখনও এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে কোনো সভ্য শ্বেতকায় মানুষ কখনও পদার্পণ করে নি। ডাচ্‌দের তৈরী বোর্ণিওর ভাল ম্যাপ পর্য্যন্ত নেই।

ডাচ্-গভর্ণমেণ্ট দেশ-শাসন করেন বটে, কিন্তু চীনারা বোর্ণিও সম্বন্ধে ডাচ্‌দের চেয়ে বেশী জানে। ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে আসবার অনেক আগে থেকে চীনারা এ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেচে, অনেক সময় ডায়াকদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ করতে হয়েচে বাণিজ্যের পথ সুগম করবার জন্যে।

এ দেশে সভ্যতা বিস্তার করতে চীনারা এক সময়ে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। তারা সুদূর পার্ব্বত্য অঞ্চলে নিজে-দের খরচে স্কুল স্থাপন করে ও ডায়াকদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্যে কম যত্ন করে নি। যুদ্ধও তারা অনেক করেচে,

বেশী দিনের কথা নয়, ১৯১৪ সালে চীনাদের সঙ্গে ডায়াকদের ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তখন মহাযুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে ইউরোপ উন্মত্ত, এ যুদ্ধের কথা কোনো খবরের কাগজে ছাপা হয় নি।

আজ সভ্য বোর্ণিওতে ডায়াকদের স্থান নেই। ওরাং ওটাংএর মতই তারা বহুদূরবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করেচে।

সাম্বাস্ ও পন্টিয়ানাকের মধ্যবর্ত্তী মোটর রোড।

ওরাং ওটাংয়ের কথাই যখন উঠ্‌ল, তখন এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, এক সময়ে বোর্ণিওতে এর ব্যবসা খুবই চলতো। ডায়াক শিকারীরা বন থেকে জীবন্ত ওরাং ওটাং ধরে নিয়ে এসে ইউরোপীয় ব্যবসাদারের কাছে বেচতো। আড়াই শিলিং-এ একটা শিশু ওরাং ওটাং কিনতে পাওয়া অসম্ভব ছিল না। ওরাং ওটাং অসাধারণ শক্তিশালী জীব, এমন কি বাল্যকালেও ওরাং ওটাং-এর শক্তি একজন কুস্তিগীর পালোয়ানের চেয়েও বেশী। বর্ত্তমানে ডাচ্ গবর্ণমেণ্ট আইনদ্বারা ওরাং ওটাং রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছেন।

ডায়াকদের বনমানুষ ধরবার কৌশল বেশ চমৎকার। যে গাছে ওরাং ওটাং আছে, তারা সে গাছটা রেখে আশপাশের সব গাছ কেটে ফেলে দেয় আর ঐ গাছের তলায় লাউয়ের খোলে খানিকটা দেশী মদ রাখে। তারপর সবাই মিলে চেষ্টা করে ওরাং ওটাং যাতে কিছুতেই গাছ থেকে নেমে অন্য কোথাও না যেতে পারে। রাত্রে তৃষ্ণায় কাতর ওরাং ওটাং গাছের তলায় নেমে ঐ মদটাকে জল ভেবে খেয়ে ফেলে এবং তখনি ভয়ানক মাতাল হয়ে পড়ে। তার উঠে দাঁড়াবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পায়। সেই সময় সবাই গিয়ে তাকে বন্দী করে।

সাম্বাস্ নদীতীরে নারিকেল বাগান।

পন্টিয়ানাক্ একটা ছোট গ্রাম, সাম্বাস্ থেকে একশো ত্রিশ মাইল দূরে। মোটর বাসে একদিন পন্টিয়ানাক্ গ্রামে বেড়াতে গেলাম। পন্টিয়ানাক্ পর্য্যন্ত ট্যাক্সিও পাওয়া যায়, কিন্তু ভাড়া বড় বেশী। তা ছাড়া ট্যাক্সিতে একা একা যাওয়ার চেয়ে অনেক লোকের সঙ্গে বাসে যাওয়া ভাল, দেশ দেখতেই যখন এসেচি।

আমি দুটো সিটের ভাড়া দিলাম, উদ্দেশ্য পাশে খানিকটা হাত-পা ছড়াবার জায়গা রেখে দেব। কিন্তু পথের মধ্যে একটা গ্রাম থেকে এক চীনা ছোকরা উঠলো, তার সঙ্গে দু-তিনটি মেয়ে, একখানা সাইকেল, তিন ঝুড়ি ম্যাঙ্গোষ্টিন

ফল, এক বোঝা কাপড় এবং একটা ম্যাণ্ডোলিন। বাসে তিল ধরাবার জায়গা নেই, আমাকে বাধ্য হয়ে ভদ্রতার খাতিরে আমার বাড়তি সিটটা ছেড়ে দিতে হোল।

পথের সৌন্দর্য্য একবার দেখলে ভুলবার কথা নয়। দুধারে শ্যামল বনানী, মাঝে মাঝে কুলকুল করে পাহাড়ী নদী বয়ে চলেচে, কত বিচিত্র রংয়ের পাখী, বিচিত্র রংয়ের বন্যপুষ্প। মাঝে মাঝে নারিকেল কি রবারের বাগান। দু' একটা মালয় গ্রাম সব যেন ছবির মত!

কিন্তু রাস্তার অবস্থা বড় খারাপ। ডাচ্ গবর্ণমেণ্ট এই কাদার সমুদ্রে যতটা করা সম্ভব রাস্তা করে দিয়েচে, কিন্তু এত কাদায় বেশী কিছু করা কি সম্ভব? কাদা হোল ডাচ্ ইষ্ট্ বোর্ণিওর অভিশাপ। সমুদ্রতীর থেকে সুরু হয়েচে, আর দেশের অভ্যন্তরে যেখানে এবং যতদূরেই যাওয়া যাক্, কাদা সর্ব্বত্র বিরাজমান।

লেখকের সঙ্গী, সুমাত্রার বনে ধৃত একটি ভালুক।

এই কাদার জন্যে বোর্ণিওতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হোল না। বোর্ণিওর পার্ব্বত্য অঞ্চলে সোনা এবং মূল্যবান্ প্রস্তর পাওয়া যায়। অনেক বার অনেক কোম্পানীও গঠিত হয়েচে সোনার খনি চালাবার উদ্দেশ্যে, অনেক টাকাও অনেক বার উঠেছিল, কিন্তু সেগুলি সব বোর্ণিওর এই ভীষণ কাদায় ডুবেচে।

আর কি গরম! এক গ্লাস বরফ জলের জন্যে আমি এক ডলার দিতে প্রস্তুত ছিলাম। অথচ চীনা ও মালয়দের কি অদ্ভুত ক্ষমতা পিপাসা জয় করবার! সারা পথ কাউকে একবার জল পান করতে দেখি নি। বাসে লোক বোঝাই হয়েচে ঠেসে, তার ওপর মুরগী আছে, দু-একটা শূকর-শাবক আছে, মোট-গাঁটরি আছে। আমার পাশের চীনা ছোক্‌রা এরই মধ্যে আবার ম্যাণ্ডোলিন বাজিয়ে গান সুরু করে দিয়েচে। প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

এক-একটা গ্রামে বাস গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় আর নড়তে চায় না। সে গ্রাম থেকে একজন যাত্রী হয় তো উঠবে, সে তখন খেতে বসেচে। সময়ের কোনো মূল্য নেই ডাচ বোর্ণিওতে।

পণ্টিয়ানাক পৌছান গেল বৈকালে। সে গ্রামটা আবার নদীর ওপারে, খেয়া পার হয়ে যেতে হয়। খেয়া পারের রেট স্থানীয় অধিবাসীদের জন্যে এক রকম, ইউরোপীয়দের জন্যে আর এক রকম, অর্থাৎ কিছু বেশী। কেন যে এ রকম হবে, তার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না।

এখানে কয়েকজন ইউরোপীয় রবার বাগানের মালিক বাস করেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে একটা টেনিস্ কোর্ট করেচেন, একটা ছোট ক্লাবও আছে। এদের মধ্যে একজন আমায় একখানা ডায়াক তরবারি উপহার দিলেন, খুব ভাল ক্রোমিয়াম ইস্পাতের তলোয়ারের মত সেখানা তীক্ষ্ণ ধার। হাতলের গোড়ায় একগোছা মানুষের মাথার চুল। কত মুণ্ড যে এক সময় এতে কাটা পড়েছে, তার কি লেখাজোখা আছে?

ফিজি দ্বীপ

গত শতাব্দীতে ফিজি দ্বীপের আদিম অধিবাসিদের মধ্যে এমন দুজন লোকের আবির্ভাব হয়েছিল যে সারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে তাদের জুড়ি কেউ আর খুঁজে পাবে না। একজন হচ্চেন টোঙ্গা দ্বীপের রাজা প্রথম জর্জ্জ টুবু এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি অল্পকালস্থায়ী ফিজি রাজ্যের রাজা থাক্ওম্ব্। হাওয়াই দ্বীপের সোমারি জাতিদের মত ইঁহারাও বুঝেছিলেন যে খ্রীষ্টান মিশনরীদের সঙ্গে মিলে মিশে না চলতে পারলে ক্ষতি ছাড়া লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। মিশনরীদের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করবার জন্যেই এঁরা সুযোগ বুঝে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মিশনরীরাও বুঝতে পেরেছিল যে ফিজি দ্বীপে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের সাফল্য নির্ভর করচে এঁদের ক্ষমতাবিস্তারের ওপর। তাই এঁদের ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তারাও যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

ফিজি দেশের একটি আনুষ্ঠানিক নৃত্যের মহলা।

মিশনরীদের সাহায্যে এবং সম্মতিক্রমে রাজা থাক্ওম্ব্ ১৮৭১ সালে সমগ্র ফিজি দ্বীপের রাজত্ব গ্রহণ করেন এবং সিংহাসনে আসীন হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের নামে নোট প্রচলন ও কর আদায় আরম্ভ করেছিলেন।

প্রথমতঃ থাক্-অম্বু ছিলেন ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মাবাউ দ্বীপের বংশানুক্রমিক মণ্ডল। তাঁর স্থানীয় উপাধি ছিল 'ভু-নি-ভালু' অর্থাৎ যুদ্ধের দেবতা। মাবাউ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, ফিজি দ্বীপের বর্ত্তমান প্রধান বন্দর ও রাজধানী সুভা থেকে আঠারো মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। 'ভু-নি-ভালু' উপাধিধারী রাজবংশ বহুকাল ধরে এখানে রাজত্ব করে আসছিল। এরা ছিল নরমাংসভোজী মাবাউ জাতির সর্দ্দার এবং নিকটবর্ত্তী কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বীপের সর্দ্দারদের কাছে চিরকাল কর গ্রহণ করে এসেচে। এই মাবাউ দ্বীপ প্রচলিত কথ্যভাষা বর্ত্তমান ফিজি ভাষার মেরুদণ্ড। নরমাংস ভোজনের সুবিধা আজকাল আর না হোলেও মাবাউ জাতি তাদের অনেক পুরাতন আচার ব্যবহার বজায় রেখেচে। মাবাউ দ্বীপের রাজধানী মাবাউ সহর, সহরের (কাজে ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র) পশ্চিমপ্রান্তে বড় একটা পাহাড়ের ওপর

মিশনরীদের বাসস্থান এবং পাহাড়ের তলে, রারা বা সবুজ তৃণভূমিতে যেখানে পূর্ব্বে উৎসব উপলক্ষে নরমাংস ঝলসান হোত, সেখানে এখন ওয়েসলিয়ান মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের গির্জ্জা অবস্থিত। মিশনরীদের কড়া শাসনে এখন বাৎসরিক উৎসবের সময় অবিবাহিত যুবক যুবতীদের যে নাচ হয়, তাতে বাজনার সুর পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান স্তোত্র গানের সুরের অনুকরণে বাঁধা, মেয়েদের পোষাক পরতে হয় লম্বা গাউন যাতে গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে।

উত্তপ্ত পাথরের উপর রাখিয়া মাটি চাপা দিয়া রাঁধিবার পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র হাঙ্গরকে পাতায় মোড়া হইতেছে।

মাবাউ দ্বীপটী ছোট, সমস্ত দ্বীপের বর্গফল মাত্র বাইশ একার, তার আবার অর্দ্ধেক জুড়ে আছে পশ্চিম প্রান্তের বড় পাহাড়টা। পাহাড়ের ওপারে সমুদ্রের যে সংকীর্ণ উপকূল, তাতে ছোট বড় নারিকেল গাছের বন, তার তলায় অধিবাসীদের খড়ে ছাওয়া কুটীর শ্রেণী।

রাজা থাক্-ওম্বর রাজত্বের ইতিহাসটা একটানা সুখসমৃদ্ধির ইতিহাস নয়।

নোট প্রচলন করাতেই যত গোলমাল বাধল। সভ্য গভর্ণমেণ্টের নোট প্রচলনের মূলে যে অর্থবল থাকে রাজা থাক্-ওম্বর তা ছিল না, ফলে নতুন নতুন অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিলে। বিদেশী ব্যবসায়ীরা রাজা থাক্-ওম্বর নোট দিতে চায় না, তাদের দেখাদেখি দ্বীপের আদিম অধিবাসীরাও নোটের ওপর অনাস্থা প্রদর্শন করলে। একটা বিদ্রোহ বা গৃহযুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল।

১৮৭৪ সালে রাজা থাক্-অম্ব্ অর্থসঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে গ্রেটব্রিটেনের সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং উভয়ের মধ্যে একটা রফা হোল, যার ফলে থাক্-অম্ব ব্যক্তিগত সকল প্রকার দাবী দাওয়া ত্যাগ করে মাবু ও ফিজি দ্বীপপুঞ্জ গ্রেটব্রিটেনের হাতে তুলে দিলেন।

ফিজি দেশীয় ডোঙা পাল তুলিয়া যাইতেছে।

মাবাউ দ্বীপের রাজবংশের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীর নাম রাটু পোপি সেনিলোলি। ইনিই বর্ত্তমান 'ভু-নি-ভালু' বা যুদ্ধের দেবতা। বনেদি বংশের মানুষ এ ছাড়া এঁর গৌরব করবার কিছু নেই, নিতান্তই গরীব, প্রজারা প্রথানুযায়ী যে সব উপঢৌকন নিয়ে আসে, তাতেই কায়ক্লেশে চলে। রাটু পোপির চেহারা খুব ভাল। দীর্ঘাকৃতি, মুখশ্রী গর্ব্বব্যঞ্জক, বলিষ্ঠ গঠন। ইংরাজি স্কুলে লেখাপড়া করার দরুণ রাটু পোপি

চমৎকার ইংরাজি বলতে পারেন। যাঁরা একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই রাটু পোপির বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য দুঃখিত। তাঁর স্ত্রী আণ্ডি টোরিকা রাজবংশের উপযুক্ত বধূ বটে।

মাবাউ ছোট দ্বীপ হোলেও এখানে দেখবার অনেক জিনিস আছে। প্রাচীন কালের তৈরি পাথর বাঁধানো পোতাশ্রয় এখানকার একটা প্রধান দর্শনীয় বস্তু। পোতাশ্রয়ের সম্মুখে প্রকাণ্ড বড় পাথরের বাঁধ, বাইরের সমুদ্রের ঊর্ম্মিমালা এই পাথরের বাঁধের গায়ে এসে আছড়ে পড়চে কতকাল ধরে, কিন্তু এখনও আশ্চর্য্যরূপ অটুট রয়েচে গোটা বাঁধটা। অবশ্য এর একটা ভৌগোলিক কারণ এই যে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ ভিটি লেভুর সম্মুখে বিখ্যাত প্রবালের বাঁধ বহিঃসমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত থেকে এ অঞ্চলের সব ছোট বড় দ্বীপের উপকূল ভাগকেই রক্ষা করচে। ইউরোপীয়গণের আগমনের পরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের শিল্প ও সভ্যতার অবনতির যুগ আরম্ভ হয়েচে। এখন সকলেই সস্তা ধরণের ইউরোপীয় বা আমেরিকান্ শিল্পকলার অনুকরণ করতেই ব্যস্ত। মাবাউ দ্বীপের পাথরের বাঁধের মত প্রবাল ও পাথরের চাঁই দিয়ে পোতাশ্রয় নির্ম্মাণ করবার নিপুণতা বর্ত্তমান কালে এরা হারিয়ে ফেলেচে। এই পাথরের বাঁধের ফাঁকে ফাঁকে এ দেশীয় ডোঙা চলাচলের সরু পথ আছে। বড় একটা গাছের মোটা গুঁড়িতে খোল করে এই সব ডোঙা তৈরী হত, এখনও হয়। একদিকে হেলে পড়বার সম্ভাবনা প্রতিরোধ করবার জন্যে বিপরীত দিকে বড় একখানা কাঠ বাঁধা থাকে ডোঙার পাশে, পাল খাটাবার মাস্তুল, মোড় ঘুরোবার সুবিধার জন্যে হাল, সবই এতে থাকে। ইংরাজিতে এ ধরণের ডোঙাকে বলে outrigger canoe—অনেক সময় দুখানা ডোঙা পাশাপাশি বাঁধা থাকে। বেশী মালপত্র বোঝাই দেবার জন্যে এই সকল জোড়া ডোঙা ব্যবহৃত হোত।

মাবাউ-প্রধানগণের অভিষেক প্রস্তর।

মাবাউবাসী জনৈক বৃদ্ধ ফিজিয়ান।

এই শ্রেণীর ডোঙা এখন আর বড় একটা তৈরি হয় না, হোলেও পূর্ব্বের মত মজবুত জিনিষ আর এখন পাওয়া যায় না। ডোঙা তৈরীর শিল্প লোকে ভুলে যাচ্ছে। জোড়া-ডোঙার ব্যবহার তো প্রায় উঠেই গিয়েচে। খুব বড় ডোঙ্গাও গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে প্রায় অন্তর্হিত হয়েচে।

সমুদ্রের যে খাড়ির বাহিরে পাথরের বাঁধ অবস্থিত, তারই উপকূলে অনেকগুলি প্রাচীনদিনের মন্দির এখনও দেখা যায়। মাটি ও পাথরের বড় বড় বেদীর ওপরে এই সব মন্দির তৈরী। সেকালে মন্দিরের দেবতার সম্মুখে নরবলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। তারপর সেই নিহত ব্যক্তির দেহ পুড়িয়ে সকলে মিলে মহা আনন্দে ভক্ষণ করতো।

একটা মন্দিরের এখন ভগ্নাবস্থা, এরই উচ্চবেদীর এক প্রান্তে রাটু রসি তাঁর দরবার গৃহ নির্ম্মাণ করেচেন। রাজ্য শাসন সংক্রান্ত গুরুতর বিষয়ে তিনি এখানে দ্বীপের প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। দরবার-গৃহ বলতে সাধারণতঃ আমাদের মনে যে ছবি জাগে, এ সে ধরণের কিছু নয়। এ ঘরের দেওয়াল চেরা-বাঁশের, চাল আখের পাতায় ছাওয়া। ঘরের মেজেতে মাদুর বিছানো। এখন সেখানে সভা ভঙ্গের পরে কাভা নামক পানীয় অভ্যাগতদের মধ্যে বিতরিত হয় এবং মাঝে মাঝে গান বাজনাও হয়।
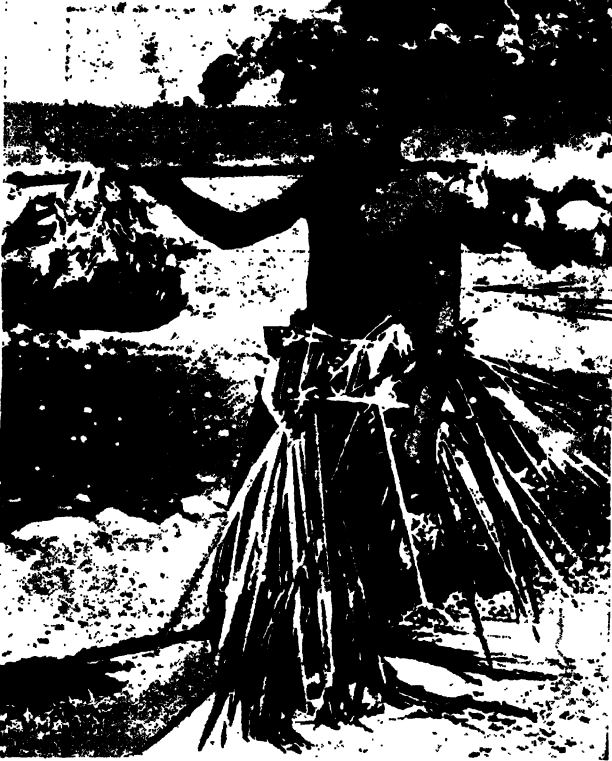
ক্ষেত হইতে নারিকেল ও চুপড়ি আলু লইয়া ফিরিয়াছে।
গাত্রাবরণটি নারিকেল পত্রে রচিত।

প্রাচীন দিনের অনেক প্রথা এখনও পরিবর্ত্তিত আকারে মাবাউ দ্বীপে প্রচলিত আছে, যদিও মিশনরীদের খরদৃষ্টি ও সতর্কতার ফলে ঐ সব প্রাচীন রীতিনীতির ভয়ানকত্ব সম্পূর্ণরূপেই দূর হয়েচে। রীতিনীতি বজায় আছে, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের পর থেকে তাদের ওপর সভ্যতার একটা প্রলেপ পড়েছে। খুব লক্ষ্য করে দেখলে প্রলেপটুকুর ক্ষীণ আবরণ ভেদ করে প্রাচীন কালের প্রথার আদিম রূপটা এখনও বার হয়ে আসে। প্রতি বৎসর একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাবাউ দ্বীপের মিশনরী সম্প্রদায়ের বাৎসরিক সভার অধিবেশন হয় এই দরবার গৃহেই। বহুদূর থেকে গ্রাম্যলোকেরা মাবাউ সহরে এই উপলক্ষে জমা হয় ও কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রার্থনা, ভজনগীত, নৃত্য, ভোজ বাজি পোড়ানো ইত্যাদি চলতে থাকে। খুব বড় মেলা বসে এবং দেশীয় নানাবিধ শিল্পদ্রব্যও প্রদর্শিত হয়। সকলেই মিশনরী ফণ্ডে এই সময়ে কিছু কিছু অর্থ দান করে।

ভোজের মধ্যে বেশী কিছু আড়ম্বর নেই। গ্রাম থেকে আসবার সময়ে প্রত্যেকেই নিজের সাধ্যমত কিছু কিছু মিষ্ট আলু, সাবু, রুটীফল ও কাভা প্রস্তুতের জন্যে ইয়ানসোনা মূল সংগ্রহ করে আনে। যাদের অবস্থা কিছু ভাল, তারা একটা ক'রে শূকর আনে। এই শূকর রন্ধনের ব্যাপারটী সম্পূর্ণ প্রাচীন প্রথানুযায়ী নিষ্পন্ন হয়ে থাকে।

একটী হৃষ্ট পুষ্ট শূকর বেছে নিয়ে তার মাথায় ডাণ্ডা মেরে বধ করা হয়। তারপর তার পেট চিরে পেটের মধ্যে তপ্ত পাথরের নুড়ি পূরে পেট আবার সেলাই করে দেওয়া হয়। ঝিনুক ও প্রবালের খোলা দিয়ে তার গায়ের লোম চেঁচে ফেলা হয়।

এইবার শূকরটী উনুনে ঝলসাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হল। যুদ্ধের দেবতা রাটু রোসীর রাজকীয় রন্ধনশালা ছাড়া এই শূকর অন্য কোথাও রান্না হবার নিয়ম নেই। রাটু রোসির রন্ধনশালার উনুন একটী গোলাকার পাথর বাঁধানো কুণ্ড, তার ব্যাস হবে প্রায় আট ফুট, গভীরত্ব সাড়ে তিন ফুট। এই উনুনের তলায় একরাশ সরু সরু গাছের ডাল জড় করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, এবং ঝুড়ি দুই ছোট ছোট পাথরের নুড়ি ঐ আগুনের মধ্যে রেখে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হয়। পাথরের নুড়িগুলি ঠিকমত উত্তপ্ত হয়ে উঠলে মৃত শূকরটী তার ওপর চাপিয়ে তার চারি পাশের মিষ্ট আলু, টরো মূল, সামুদ্রিক হাঙ্গরের ডানা, বড় কাঁচা ঝিনুক ইত্যাদি স্তূপীকৃত করে সাজিয়ে দেওয়া হয়। সবশুদ্ধ মিলে ঢিমে আঁচে সিদ্ধ হতে থাকে।

কুটীর সম্মুখে উপবিষ্ট বৃদ্ধটি শেষ ফিজিয়ান যে নরমাংসের ভোজে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

নিয়ম এই যে, রন্ধন কার্য্য শেষ হলে 'যুদ্ধের' দেবতা রাটু রোসি সর্ব্বপ্রথম এই খাদ্য আস্বাদ করবেন। একখানা বড় ছুরি দিয়ে শূকরের মাংস তিনি কিছু কেটে নিয়ে মুখে তুলে দেবেন। সকলে সেই সময় জয়ধ্বনি করে উঠবে, মঙ্গলবাদ্য বাজতে থাকবে।

ফিজিবাসীর সাধারণ চুল ছাঁটা যাহা ঐ দেশেরই বৈশিষ্ট্য।

তিনি এইবার সমবেত প্রজাগণকে ভোজে যোগদান করবার অনুমতি দেবেন।

ইউরোপীয়গণ ফিজিদ্বীপে পদার্পণ করবার পূর্ব্বেও এই উৎসব ঠিক এই ভাবে সম্পন্ন হোত, শুধু শূকরের পরিবর্ত্তে তখন জীবন্ত মানুষকে ঠিক ঐ ভাবেই মাথায় ডাণ্ডা মেরে বধ করা হোত, ঐ ভাবেই আগুনে ঝলসানো হোত এবং মহামহিম 'যুদ্ধের দেবতা' ঠিক ঐ ভাবেই ছুরি করে সর্ব্বপ্রথম সেই নরমাংস আস্বাদ করতেন। তখন অবশ্য মিশনরীদের সঙ্গে এই উৎসবের কোন সম্পর্ক ছিল না, এর নাম ছিল 'বোকোলা' অর্থাৎ নরমাংসভক্ষণের উৎসব।

রাজকীয় উনুন থেকে মাংস খাবার ক্ষমতা নেই প্রজাদের। শূকরকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে তবে তার মাংস সকলের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। নারিকেল গাছের শিকড়ে তৈরী বড় বড় ঝুড়ি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভোজের পর মেয়েদের নাচ আরম্ভ হয়।

নাচের পোষাক বড় চমৎকার। গাছের ছালে তৈরী 'তাপা' বা 'মাসি' বলে এক প্রকার পরিচ্ছদ এই উপলক্ষে মেয়েরা পরে। 'মাসি' যেদিন ব্যবহৃত হবে, সেদিনই তৈরী করতে হয়। তাজা না হোলে এই পরিচ্ছদ পরা চলে না।

মেয়েরা গলায় পরে রাঙা হিবিস্‌ঘাস্‌ ও হল্‌দে ফ্রালিপিনী ফুলের মালা, কোমরে জড়ায় কচি সবুজপত্রযুক্ত বন্যলতা, মাথার চুলে গুঁজে রাখে সাদা রঙের পোনো ফুল। সাধারণতঃ ছত্রিশটি নর্ত্তকী দরকার হয় নাচের জন্যে, এরা দুদলে ভাগ হয়ে সামনে পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়ায় এবং বাজনা সুরু হবার পরে তালে তালে নাচতে আরম্ভ করে।

মাবাউ-এর ডকে একটি ডোঙা।

উৎসবের পনেরো ষোল দিন আগে থেকে নাচের তালিম চলে এবং স্বয়ং রাটু রোশি তালিমের সময় উপস্থিত থেকে যাতে নাচ নির্ভুল ও ত্রুটিশূন্য হয় সে বিষয়ে তত্ত্বাবধান করেন।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন প্রথা ও রীতি নীতির বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে অনেকে মাবাউ দ্বীপ গিয়ে থাকেন। রাটু রোসি শিক্ষিত লোক ও উদার আতিথেয়তার জন্যে এ অঞ্চলে বিখ্যাত। নিজের বাড়ীতে তিনি আগন্তুকদের স্থান দেন ও যথেষ্ট সমাদর করেন। কিন্তু কারো শুধু হাতে রাটু রোসির আতিথ্য গ্রহণ করতে যাওয়া উচিত নয়, কারণ প্রাচীন রাজবংশসম্ভূত হোলেও ইনি বর্ত্তমানে দরিদ্র প্রজাদের আনীত উপঢৌকনে কোনোক্রমে দিন গুজরান করেন। অন্ততঃ কিছু সিগারেট ও তামাক সঙ্গে করে নিয়ে গেলেও রাটু রোসিকে যথেষ্ট সাহায্য করা হয় কারণ ফিজি দ্বীপে তাম্রকূট বড়ই দুর্ম্মূল্য।

মাদাগাস্কার দ্বীপ

মার্কিন যুক্তরাজ্যের পক্ষ হইতে কয়েক প্রকার দুষ্প্রাপ্য গাছের অনুসন্ধানে মাদাগাস্কার দ্বীপে একদল অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাঠানো হইয়াছিল। চার্লস সুইঙ্গল্ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করা গেল—

মাদাগাস্কার দ্বীপের পশ্চিম উপকূলের বড় সহর মাজুঙ্গা থেকে আমাদের যেতে হবে দ্বীপের দক্ষিণ দিকে, প্রায় ১৩০০ মাইল ঘুরে বেড়াতে হবে গাছগুলোর খোঁজে। আমার সঙ্গে ছিলেন আলজিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনরি হামবার্ট।

মাজুঙ্গা থেকে যে জাহাজ দক্ষিণদিকের বন্দর টুলেয়ারে যায়, সে জাহাজ আমরা পেলাম না, পনেরো মিনিট আগে সেখানা ছেড়ে চলে গিয়েছে—অগত্যা আমরা এখান থেকে ছদিন নৌকাতে গিয়ে এক জায়গায় নেমে মোটরবাস ধরে এই দ্বীপের রাজধানী আন্তানানারিভোতে গেলাম এবং সেখান থেকে মোটরযোগে ভ্রমণের সব ব্যবস্থা করা গেল।

মাদাগাস্কার দ্বীপবাসী নর ও নারী।

এই মোটরবাসে ভ্রমণ আমাদের অনেককাল মনে থাকবে।

দুধারে পাহাড় পর্ব্বত, প্রায়ই রুক্ষ ও অনাবৃত—আগে এই পাহাড়ের উপর গভীর অরণ্যানী ছিল, এখনও স্থানে স্থানে তার চিহ্ন আছে। মানুষে কাঠের লোভে এই সকল জঙ্গল নষ্ট করেছে।

পাহাড় থেকে অনেক নদী বার হয়ে এসে নীচের সমতল ভূমিকে উর্ব্বরা করেছে। মাদাগাস্কার দ্বীপের এই অংশে প্রচুর পরিমাণে ধান হয়, চাল এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য। সমতল ভূমির এই অংশে আমরা অসংখ্য র‍্যাভেনালা (পান্থপাদপ) দেখলাম।

পান্থপাদপ এদেশের লোকে নানা কাজে লাগায়। তার কলাপাতের মত চওড়া পাত পেতে ভাত খায়। এর কাঠ জ্বালানি কাঠরূপে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের প্রত্যেক চওড়া পাতা যেখানে এসে গুঁড়ির সঙ্গে মিশেছে, সেখানে সুন্দর নির্ম্মল জল পাওয়া যায়—তবে অনেকস্থানে পোকা-মাকড়ে এই জল নষ্ট করে ফেলে।

পথে যেতে যেতে আমরা একদল পঙ্গপাল দেখলাম। কালো মেঘের মত, আকাশ একেবারে আচ্ছন্ন করে উড়ে চলেছে—সমস্ত দলটির উড়ে চলে যেতে কয়েক ঘণ্টা লেগে গেল। এদেশের লোক পঙ্গপাল খায়, আন্তানানারিভোর বাজারে আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি পঙ্গপাল বিক্রয়ার্থ মজুদ দেখেছি।

আন্তানানারিভো সহরে প্রায় সত্তর হাজার লোক বাস করে। কিন্তু বহির্জগতের সঙ্গে এই সহরের সম্পর্ক খুব বেশী নেই। খুব কম বিদেশী লোকই এখানে ভ্রমণ করবার জন্যে এসে থাকে। ১৮৯৫ সালে এই দ্বীপে ফরাসীদের

অধিকার স্থাপনের পরে যদিও এখানে নানাদিক থেকে নানা পরিবর্ত্তন হয়েছে, তবুও সহরের লোকে সেই আগেকার মত সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছে। কেবল মাঝে মাঝে বেতারের উঁচু মাস্তুল মনে করিয়ে দেয় যে, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ঢেউ এখানেও এসে পৌছেছে।

সহরের বাড়ীগুলো কাঁচা ইটের, চারি পাশের অনুচ্চ শৈলমালার গায়ে থাকে থাকে অবস্থিত। মাঝে মাঝে কাঠের তৈরী ঘরও আছে। দুচারখানা দোতালা বাড়ীও চোখে পড়ে। সহরের ঠিক কেন্দ্রস্থানে একটা পাহাড়ের উপর স্থানীয় রাজপ্রাসাদ—এখানে বলে 'রাণীর বাড়ী'। মাদাগাস্কারের শেষ রাণী তৃতীয় রানাভালোনার নির্ব্বাসনের পরে এই রাজপ্রাসাদ এখন জাতীয় মিউজিয়মে পরিণত হয়েছে।

স্থানীয় অধিবাসীদের ঘরে ঢুকতে হলে মাথা খুব নীচু করে ঢুকতে হয়, দোর এত ছোট। এদের ঘরে আসবাবপত্র থাকে খুব কম। মেজেতে একখানা বড় মাদুর বিছানো, কয়েক চাঙ্গারী চাল, রাঁধবার জন্যে একটা বড় লোহার কড়াই, জল রাখবার জন্য দু'টো তিনটে বড় জালা কিম্বা লাউয়ের খোল। ছাদের সর্ব্বত্র কালো কালো মাকড়সার ঝুল ঝুলছে, দেয়ালে দু'একটা কাঠের দেবদেবীর মূর্ত্তি।

মাদাগাস্কারের সহরে পুরাতন ও নূতন ধাঁজের এই সংমিশ্রণ অনেক বসত-বাটিতে দেখা যাইবে। সম্মুখে ধান ভানা হইতেছে। বাংলার পল্লীগ্রামেও এ দৃশ্য অপরিচিত নয়।

মাদাগাস্কারে স্ত্রীলোকেরা সমাজে খুব সম্মানিত। এর একটা কারণ এই যে, ফরাসী অধিকারের পূর্ব্বে রাজার বদলে রাণীরা এখানে অনেক দিন রাজত্ব করেছিলেন। অবশ্য এখানকার মেয়েদের গৃহকর্ম্ম, রান্না, ধানভানা—সবই করতে হয়, সংসারের জন্যে হাট-বাজারও করতে হয়—কিন্তু পুরুষের কাছে নারীদের যথেষ্ট সম্মান।

মাদাগাস্কারে জীবনযাত্রাপ্রণালী খুব দুরূহ ও জটিল নয়। বছরের মধ্যে দিনকতক খেটে ধান্যরোপণ করলেই সারা বছরের কাজ হয়ে গেল। ধান কাটার সময় আরও কয়েক দিনের খাটুনি আছে—তারপর গোলা থেকে ধান বার করা, ধানভানা, আর ভাত রাঁধা। পুরুষদের আর একটা প্রধান কাজ হচ্ছে পশুপালন। এদেশে প্রত্যেক গৃহস্থের যথেষ্ট গরুবাছুর আছে! যার যত গরুবাছুর বেশী, স্থানীয় সমাজে তার সম্মান ও প্রতিপত্তি তত বেশী।

বোধ হয় এই জন্যই এখানকার লোকে প্রাণ গেলেও গরুবাছুর বিক্রী করতে চায় না বা গরুর মাংস খাওয়ার চলন থাকলেও কখনো গোহত্যা করে না। এর কারণ এই যে, যদি তার গোশালায় গরুর সংখ্যা কমে যায়, তবে প্রতিবেশীর চোখে তার পসার কমে যাবে।

গরুচুরি এখানে খুব চলে। প্রায়ই শোনা যায় এ ওর গরু চুরি করে জেল খাটছে। ফরাসী আইনে চুরি মাত্রেই অপরাধ বলে গন্য, এই হয়েছে মুস্কিল, নতুবা গরুচুরি মাদাগাস্কারের দেশী সমাজে অপরাধ বলেই গণ্য নয়। ওটা একটা খেলার মধ্যে ধরা হয়—একথা বলা যেতে পারে, ফুটবল যেমন ইংল্যাণ্ডে জনপ্রিয় স্পোর্ট, মাদাগাস্কারের

গরুচুরি তেমনি একটা স্পোর্ট। ওতে কেউ দোষ ধরে না—তবু ধরা পড়লে চোরকে জেলে যেতে হয় বটে। সে তো ফুটবল খেলতে গিয়েও হরদম হাত পা ভাঙছে—সে জন্য ফুটবল খেলতে ভয় পায় কে?

স্থানীয় বাজার একটা দ্রষ্টব্য বস্তু। রোজ বাজার বসে না—সপ্তাহের মধ্যে একটা দিন এজন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। বাজারের দিন এখানে একটা উৎসবের দিন বলে পরিগণিত। অনেকদূর থেকে লোকে মাথায় করে কিংবা গাধা ও অশ্বতরে বোঝাই দিয়ে মালপত্র, ডিম, ধান, চাল, জীবন্ত মুরগী, হাঁস, মাদুর ইত্যাদি আনে।

বাজারের এক জায়গায় স্তূপীকৃত ইউরোপীয় পরিচ্ছদ বিক্রী হচ্ছে, বহু পুরানো ধরণের পোষাক, যা এখন ইউরোপে সবাই ভুলে গিয়েছে। একজন হাতুড়ে অনেক রকম দেশী গাছগাছড়া ও ওষুধ বিক্রী করতে এনেছে এবং তারস্বরে তার পণ্যরাজির দ্রব্যগুণ ঘোষণা করে বিক্রেতা যোগাড় করছে। তার পাশে একজন বিক্রী করছে কয়েক ঝুড়ি পঙ্গপাল, খালি বোতল ও খালি টিন।

পান্থপাদপ: তৃষ্ণার্ত্ত পান্থের জন্য ইহা সর্ব্বদা শীতল জল সঞ্চিত রাখে। পাতাতে দিব্য খাওয়া দাওয়ার কাজ চলে।

আমাদের দরকারী জিনিস স্থানীয় বাজারে পেতাম না যে তা নয়। খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে আমাদের প্রায়ই বাজারে আসতে হত এখানকার হোটেলে থাকার ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ, খাবার জিনিস যা দেয় তা রান্নার দোষে বিস্বাদ, কাজেই আমরা বাজার থেকে প্রায়ই কলা, আনারস, পেয়ারা, আম, কমলালেবু এবং পেঁপে প্রভৃতি ফল কিনে নিয়ে যেতাম।

আন্তানানারিভো থেকে ট্রেনে আমরা দক্ষিণ দিকে রওনা হলাম, ছোট ছোট গাড়ী, ন্যারোগেজ লাইন, এঞ্জিনে কয়লার পরিবর্ত্তে কাঠ জ্বলে, ঘণ্টা কয়েক গিয়েই রেলপথ শেষ হল, সেটা একটা ছোট সহর নাম অ্যান্টসিরেব—ফরাসী পদ্ধতিতে নির্ম্মিত চওড়া চওড়া রাস্তা, ঘরবাড়ী, পার্ক—এই আধুনিক ধরণের সহর দেখে বিশ্বাস করা শক্ত যে আমরা মাদাগাস্কারেই আছি।

অ্যান্টসিরেব এ অঞ্চলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে কয়েকটি উষ্ণজলের ফোয়ারা আছে—এদেশের ধনী-লোকেরা মাঝে মাঝে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসে।

অ্যান্টসিরেব থেকে আমাদের যেতে হবে মোটরে। প্রায় চারশো মাইল যাবার পরে লক্ষ্য করা গেল, আমরা এমন স্থানে এসে পড়েছি যেখানে গাছপালা খুব কম। অনাবৃত, রুক্ষদর্শন পাহাড় পর্ব্বত, বিস্তৃত সমতলভূমি—জল কোথাও নেই, নদী চোখেই পড়ে না। পান্থপাদপ পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

এ অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিকতর অসভ্য। রাজধানীর কাছাকাছি স্থানের অধিবাসীরা ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বদলে গিয়েছে, কিন্তু এইসব দূরতর অঞ্চলের লোকে এখনও বর্শা হাতে নিয়ে বেড়ায়। কম্বলের মত মোটা একখানা কাপড়ই এদের একমাত্র পরিধেয়—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাপড়চোপড়ের বালাই নেই।

বিচিত্র-জগৎ

এর পরে যে রাস্তা আরম্ভ হল, সেদিকে কোনো সহর পড়ে না। সুতরাং টুলেয়ার বলে একটা ছোট সহর থেকে আমরা পেট্রোল ও খাদ্যদ্রব্য কিনে নিলাম। পথে কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না। কোনো মোটর ওপথে যায় না, গবর্ণমেণ্টের ডাক লোকে কাঁধে ঝুলিয়ে পদব্রজে নিয়ে যায়।

একদিন পথের ধারের একটা খড়ের ঘরে আমরা বিশ্রাম করছি, পথ দিয়ে একদল লোক মৃতদেহের সৎকার করতে যাচ্ছে। তারা এমন অদ্ভুত ধরণের তারস্বরে শোকধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে যাচ্ছিল যে, আমরা ছুটে বাইরে বেরিয়ে দেখতে গেলাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে দেশী গাইড ছিল, সে আমাদের সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে নিষেধ করলে। এ অবস্থায় ওদেশের লোকে নাকি এত বেশী মদ খায় যে, বিদেশী লোকদের পক্ষে কাছে থাকা বিপজ্জনক।

একটা গ্রামে গিয়ে আমরা দুদিন বিশ্রাম করলাম। সেই গ্রামের চারিপাশের বালির পাহাড়ে ইপিয়র্নিস্ বলে এক প্রকার অধুনাবিলুপ্ত বৃহৎকার পাখীর ডিম পাওয়া যায়। বোধ হয় আরব্য উপন্যাসের রক্ পাখীর কল্পনা এই জাতীয় পাখী থেকে হয়ে থাকবে।

আমরা অনেক খুঁজেও তেমনি ভাল ডিম যোগাড় করতে পারিনি। ডিমের কয়েক টুক্‌রো খোলা পাওয়া গিয়েছিল, সকলের চেয়ে বড় টুক্‌রোটা প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা। এর মধ্যে কোন কোনটা বালির মধ্যে তিন চার ফুট পুঁতে ছিল, কোনটা বা বালিয়াড়ির ওপরে পাওয়া গিয়েছিল।

মাদাগাস্কার: সাধারণতঃ এই দ্বীপে স্ত্রীলোকে কঠিন পরিশ্রমের কাজ করে না। এই ছবিতে দেখা যাইতেছে, ইহারা মাঝে মাঝে কঠিন কাজও করে।

এই অঞ্চলে আমরা ফনিমনসা জাতীয় এক প্রকার অদ্ভুত গাছ প্রথম লক্ষ্য করি। এই গাছ পত্রহীন, দীর্ঘ, শাখাগুলি যেদিকে বাতাস বয়, সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। ভারী চমৎকার দেখায় সে সময়।

মাদাগাস্কার দ্বীপের সর্ব্বত্রই নানা মূল্যবান গাছপালা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু টুলেয়ার ও ফোর্ট ডফিনের মধ্যবর্ত্তী মরুভূমিতে এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য রবার গাছ পাওয়া যায়, যার মূল্য সকলের চেয়ে বেশী। এই রবার গাছ আজকাল বেশী দেখতে পাওয়া যায় না এবং এরা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। এই গাছের বৈজ্ঞানিক নাম ইউফোর্বিয়া ইন্টিসি।

এবার আমরা মরুভূমিতে যাবার জন্য তৈরী হয়েছি। এই ছোট গ্রামটা থেকে জল ও খাবার নিতে হল। কুলী ও গাইড প্রথমে মেলে না, মরুভূমির পথের বিপদ কারো অজানা নেই, এখানে কেউ সঙ্গে যেতে রাজি নয়। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে অবশেষে অনেক কষ্টে আটত্রিশ জন লোক যোগাড় হল। আমাদের ছেড়ে মাঝপথে পালিয়ে গেলে তাদের পনেরো দিন করে জেল হবে, পুলিশ এই হুকুম শুনিয়ে দিলে। সঙ্গে একজন দেশী সিপাই দিলে পুলিশে।

পথে কোথাও জল নেই। সঙ্গে অনেক জলের দরকার। চল্লিশটি তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণীর উপযুক্ত জল নেওয়াও এক কঠিন ব্যাপার। অবশেষে ভেবে-চিন্তে মাত্র ষাট গ্যালন জল নিয়ে রওনা হওয়া গেল। অনেকে বললে মরুভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে জল পাওয়া যাবে। ষাট গ্যালন জল ক্যাম্বিসর ব্যাগে পুরে কুলিদের কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া গেল।

মাদাগাস্কারের মরু-পথে চলার দুটো অসুবিধা—রোদ ও কাঁটাবন। শোলার টুপি মাথায় দিয়ে ও ভারী বুট পায়ে আমরা সে দুটো বিপদের বিরুদ্ধে নিজেদের অনেকখানি প্রস্তুত করেছিলাম। পথে ভাত ছিল আমাদের একমাত্র খাদ্য। আমরা প্রতিদিন প্রত্যেক কুলিকে দৈনিক এক সেরের উপর চাল দিতাম। অনেক সময় তারা একসের চাল একবারে খেয়ে ফেলত—এবং হাঁড়িধোয়া জল আকণ্ঠ পান করে তৃপ্তিলাভ করত।

মাদাগাস্কার : হাট। দক্ষিণে ছত্রধারিণীর ইউরোপীয় বেশভূষা দ্রষ্টব্য। এই হাটে এই সব বেশভূষা ক্রীত হয়।

এই হাঁড়িধোয়া জল সমগ্র মাদাগাস্কারের অধিবাসীদের একটি অতি প্রিয় পানীয়। ভাত রাঁধবার সময় কড়াজ্বালে ভাত ধরিয়ে ফেলানো নিয়ম—যাতে হাঁড়ির তলায় পোড়া ও ধরা ভাত কিছু লেগে থাকে। তারপর ভাত রান্না হয়ে গেলে নামিয়ে নিয়ে ওই পোড়া ভাত গুলোতে জল দিয়ে আবার খানিকক্ষণ ফুটানো হয়—সেই গরম জলটাই এখানকার অধিবাসীদের নিকট চা কিংবা কফির স্থান অধিকার করেছে।

মাদাগাস্কার : ইউফোরবিয়া বৃক্ষ

ওদের রাঁধবার পাত্র ওরা সঙ্গে নেয়নি। এখানে নিয়ম আছে যে কোনো গ্রামের যে কোনো অধিবাসী দুচার মুঠো চালের বিনিময়ে তার রাঁধবার হাঁড়ি ধার দেয়—কাজেই ও জিনিষটা কাঁধে ঝুলিয়ে বইবার দরকার হয় না।

খাবার পাত্রেরও দরকার নেই।

দেখা গেল, তারা ছোট ছোট খড়ের ঝুড়ি পেতে ভাত খাচ্ছে। তাতে একটু আশ্চর্য্য হতে হল, কারণ জিনিসপত্র বাঁধবার সময় এত খড়ের ঝুড়ি আমরা তো বেঁধে নিই নি বেশ মনে আছে। কিন্তু খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তারা যখন সেই খড়ের ঝুড়িগুলো ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে নিজের নিজের মাথায় দিলে, তখন বোঝা গেল, এগুলো ওদের মাথার খড়ের টুপি।

মাদাগাস্কারের অধিবাসীদের জীবনযাত্রাপ্রণালী যে খুব জটিল নয়, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

কিছুদূর যেতে না যেতে লক্ষ্য করলাম, সঙ্গে আমরা এত জল নিয়েছি যে, তাতে আমাদের পথচলার বেশ অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু এই ঘোর জলহীন মরুভূমিতে জল ফেলে দেওয়ার মত নির্ব্বুদ্ধিতা আর কিছু নেই, সুতরাং আমরা প্রত্যেক কুলিকে যত ইচ্ছা জল পান করতে অনুরোধ করলাম, বাকী জল ত্রিশটি লাউয়ের খোলার মধ্যে পূরে ত্রিশ জন কুলির কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এর ফলে আমাদের বিপদে পড়তে হয়েছিল।

ইপিয়নিসের ডিম : এমন ডিম বারোটার বেশী পাওয়া যায় নাই। যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই প্রায় প্রস্তরীভূত অবস্থা।

আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, পথের ধারের গ্রাম থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করা যাবে। কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙতে দেরী হল না। পথে গ্রাম প্রথমতঃ খুব বেশী নেই, দ্বিতীয়তঃ সে সব গ্রামে এত জলকষ্ট যে, তাদের মেয়েরা সকালবেলার শিশির সঞ্চয় করে রাখে জলের অভাবে। ঝোপে-ঝোপে যে শিশির পড়ে ভোরের বেলা, মেয়েরা লাঠি দিয়ে সেই ঝোপ ঠ্যাঙায় এবং তলায় জলের পাত্র পেতে রাখে।

এ অবস্থায় তাদের কাছে জল চাওয়া চলে না। সুতরাং দ্বিতীয় দিনের অবসানে দেখা গেল, আমাদের পানীয় জল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উপায় ছিল না, সম্মুখে অগ্রসর হতেই হবে এবং মরুভূমির ভীষণতম অংশ এখনও আমাদের সামনে।

কুলিরা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মাদাগাস্কারের অধিবাসীদের একটা গুণ দেখলাম, যখন তারা বুঝলে চেঁচামেচি করেও কিছু হবে না, তখন তারা চুপ করে সব সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত হল। শীঘ্রই জলের অভাবে একজন কুলি চলতে অশক্ত হয়ে পথের ধারে শুয়ে পড়ল, কি অদ্ভুত ধৈর্য্য এই লোকগুলোর! তবুও তারা আমাদের বিরুদ্ধে একটি তিরস্কার-বাক্য উচ্চারণ করলে না, বা কোনোরকমে অসন্তোষ প্রকাশ করলে না। কলের পুতুলের মত চলতেই লাগল।

সিমানাম্পেৎ সোৎসা হ্রদ : ইহার জল পানের অযোগ্য।

আমাদের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা মাত্র জল অবশিষ্ট ছিল—তাই সেই পথিপার্শ্বে পতিত হতভাগ্যের ঠোঁটে মুখে মাখিয়ে আমরা তাকে সেখানে ফেলে রেখে এগিয়ে চললাম, কারণ তাকে সঙ্গে নেবার কোনো উপায় ছিল না।

শীঘ্রই আর একজনের ওই অবস্থা হল, তার পরে আর একজন—ক্রমে ক্রমে পাঁচজনের এই অবস্থা দেখে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি তখন। তাদের পথের পাশে জনহীন মরুভূমির মধ্যে সে অবস্থায় ফেলে যাওয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর কাজ তা আমরা বুঝি, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায়—জলের অভাবে তারা মরতে বসেছে, আমরা জল পাব কোথায় যে, তাদের প্রাণ বাঁচাব ?

সুতরাং তাদের ফেলে রেখে আবার চললাম। সামনের দিকেই চললাম, কারণ ফিরে যাওয়া আরও অসম্ভব। সামনের দিকেই বা কোথায় কত দূরে জল কে জানে! কি ভয়ানক বেঘোরেই পড়ে গিয়েছি!

পরদিনও কাটল এই ভাবেই।

সন্ধ্যাবেলা ভগবান্ মুখ তুলে চাইলেন।

দূর থেকে আমরা একটা গ্রাম দেখতে পেলাম। অতি কষ্টে সেই গ্রামে পৌঁছে সামান্য পরিমাণ অত্যন্ত অপরিষ্কৃত জল পাওয়া গেল। নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে গ্রামের সমস্ত লোকদের আমরা জল সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম মরুভূমির মধ্যে, যাদের ফেলে এসেছি তাদের নিয়ে আসতে।

দু' একদিনের মধ্যে তারা এসে পৌঁছল—ভগবানকে ধন্যবাদ, তাদের মধ্যে কেউ মারা পড়ে নি।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ

(মাইক্রোনেসিয়া)

প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত দ্বীপপুঞ্জকে মাইক্রোনেসিয়া নামে অভিহিত করা হয়। মাইক্রোনেসিয়ায় এমন অনেক দ্বীপ আছে, যাহাতে ইহার পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয়ান পদার্পণ করেন নাই। লিগ অব নেশন্‌স্ হইতে অনেকগুলি দ্বীপের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য জাপানকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং অনেকের মতে জাপান এই অঞ্চলে রণতরী-বহরের একটী কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় আছে। মেজর বড্‌লের বিবরণ হইতে মাইক্রোনেসিয়া-সংক্রান্ত নিম্নোক্ত ভ্রমণ-কাহিনী উদ্ধৃত করা গেল।

ইয়াপ (সাউথ সি): আদিম অধিবাসীদের মিউনিসিপালিটি-গৃহ (All Men House)

"ভ্রমণের সুবিধা আজকাল এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, এই শতাব্দীর প্রথমে যে সকল স্থান প্রায় অজ্ঞাত ছিল, বর্ত্তমানে সে সকল স্থানে বড় বড় 'লাইনার' যাতায়াত সুরু করিয়াছে, এবং ঐ সকল স্থানের লোকের চোখে শ্বেতকায় মানুষেরা এতই পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেক স্থানেই তাহাদের আগমন নূতন ঘটনা বলিয়া আর গণ্য হয় না।

"আমি চার বৎসর ধরিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে ভ্রমণ করিতেছি এবং সর্ব্বত্রই এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিতেছি। ইউরোপীয়ানেরা যায় নাই এরূপ জায়গা তো বড় একটা দেখি না। মুক্তার ব্যবসায়ী, নারিকেলের শুষ্ক শাঁসের রপ্তানী-কারক, কফি-চাষী, সিনেমার দল প্রায় সর্ব্বত্রই গিয়াছে; ইহাদের অগম্য স্থান নাই দুনিয়ায়। কাজেই চার বৎসর পরে যখন সত্যই এমন দেশের সন্ধান পাইলাম, যাহার কথা টমাস কুকের ভ্রমণ-তালিকার মধ্যে উল্লিখিত নাই, তখন মনে দৃঢ় সংকল্প করিলাম, সে অঞ্চলে একবার যাইতেই হইবে।

"কেন এই অঞ্চলে লোক যায় নাই তাহার কারণ আছে। বড় বড় জাহাজের লাইন হইতে এই দ্বীপপুঞ্জ অনেক দূরে অবস্থিত, নিকটতম বন্দর ইয়োকোহামা দু'হাজার মাইল দূরে। তা ছাড়া এই দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলি বহু-বিস্তৃত মহাসমুদ্রের মধ্যে এরূপভাবে দূরে দূরে অবস্থিত যে, ইহার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তের দূরত্ব প্রায় দুই হাজার চারশো মাইল।

"জাপানী ছোট ছোট মালবাহী জাহাজ ব্যতীত এই অঞ্চলে যাইবার অন্য কোনো উপায় নাই। তাও তারা কখন যাইবে না যাইবে, কেহ বলিতে পারে না, কারণ তারা যাইবে তাদের সুবিধামত, ভ্রমণ-কারীর সুবিধামত নয়। মালবাহী জাপানী জাহাজে আরোহী হওয়া যে কত সুখ, যিনি একবার ইহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াছেন,

তিনি কিছু বুঝিবেন না। এসব ছাড়া আছে সর্ব্বজন-ভীতিপ্রদ টাইফুন—প্রশান্ত মহাসাগরের অতি ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীবাত্যা।

"আমার বন্ধু ওয়ালটার হ্যারিস্ আমাকে এই দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পরামর্শ দেন। জাপানী অধিকারভুক্ত হওয়ার পরে তিনিই প্রথম ইংরেজ, যিনি এখানে আসিয়াছিলেন এবং বোধহয় আমিই প্রথম ইউরোপীয়ান, যে এই ১৪০০ মাইল ব্যাপী দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেকটী দ্বীপ পরিদর্শন করিয়াছে। ইউরোপ বা সিনেমাতে যাহা সাউথ-সি দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা প্রধানতঃ ডাচ-ইণ্ডিজ দ্বীপগুলির অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকান ভ্রমণকারীদের কল্যাণে এসব দিকে এখন বড় বড় লাইনের জাহাজ অনবরত যাতায়াত করে এবং দেশীয় শিল্পদ্রব্য বলিয়া যাহা বিক্রীত হয়—তাহার অধিকাংশই ভ্রমণকারীদের মধ্যেই বেচিবার উদ্দেশ্যে জাপানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। 'কিউরিও'-বেচাকেনা এখন একটা ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

"যখন আমাদের ছোট জাপানী জাহাজ ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জের অদূরে নোঙর করিল এবং ষ্টীমার হইতে নামিয়া লঞ্চে করিয়া আমরা তীরের অভিমুখে রওনা হইলাম, তখনই দেখি জেটিতে দস্তুরমত ভিড় জমিয়া গিয়াছে। তাহারা পূর্ব্বেই জাপানী কোয়ারাণ্টাইন-অফিসারের নিকট শুনিয়াছে যে, এই জাহাজে একজন শ্বেতকায় লোক আছে এবং সে তীরে নামিতেছে। অনেকে বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া ভেলা বা দেশী নৌকায় চাপিয়া আমাদের জাহাজের কাছে আসিয়া কৌতূহল-দৃষ্টিতে জাহাজের ডেক নিরীক্ষণ করিতেছে, শ্বেতকায় লোকটা যদি চোখে পড়ে।

ইয়াপ (সাউথ-সি): এই সকল প্রস্তরচক্র ইয়াপবাসী কর্ত্তৃক মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়। পালাও ইয়াপ হইতে ২৬০ মাইল দূরবর্ত্তী আর একটি দ্বীপ। কোন আদিম কালে পালাও হইতেই যে এই সকল প্রস্তরখণ্ড আনীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিম ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ইয়াপেই এখনও পর্য্যন্ত কোন মিশনারীর পদার্পণ হয় নাই।

"প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, দেশী শিল্পদ্রব্য বা 'কিউরিও' এখানে পাওয়া যায় না। ও সব জিনিসের ব্যবসায় যে চলিতে পারে, তা এই সকল কৃষ্ণকায় লোকগুলির নিকট অজ্ঞাত। সভ্যতার হাওয়া এখনও ইহাদিগকে নষ্ট করে নাই। ক্যারোলিন দ্বীপে কোন জিনিসের কোন ধরাবাঁধা দাম আছে বলিয়া মনে হইল না, কারণ এখানে মুদ্রার প্রচলন নাই। প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিতপালিত এই সব সরল মানুষ মুদ্রার মূল্য আদৌ বুঝে না। তুমি একটা হৃষ্টপুষ্ট ছাগল কিনিতে চাও—ছাগলের মালিককে একবাক্স সিগারেট দিয়া ছাগলটী লও, অভাবে একখানা সাবান, কিংবা একখানা ছুরি।

"তীরের নিকটেই একটা জাপানী দোকান। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া দোকানে মজা দেখিলাম। চামোরো জাতির মেয়ে-পুরুষ জিনিষ কিনিতে আসিয়াছে— সঙ্গে কেহ আনিয়াছে কলার পাতে মোড়া কয়েকটী ডিম, কেহ এক ঝুড়ি পাকা পেঁপে, কেহ বা নাকে দড়ি বাঁধিয়া আনিয়াছে একটী শূকরের বাচ্চা। এগুলির পরিবর্ত্তে তাহারা দোকান হইতে লইয়া যাইতেছে তামাক, রঙীন কাপড়ের ছিট কিংবা চকোলেট বা লজেঞ্চুস।

"ইয়োকোহামা ছাড়াইয়া এ পথে আসিতে প্রথম বন্দর পড়ে সাইপান, মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত। জাপানের খুবই নিকটবর্ত্তী বলিয়া এস্থানের লোকে অপেক্ষাকৃত সভ্য ও চতুর হইয়া পড়িয়াছে—সুতরাং সেদিক হইতে সাইপানে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। এখানকার বড় বড় আখের ক্ষেতগুলি সমুদ্রবক্ষ হইতেই চোখে পড়ে।

জাপানীরা খুব আখের চাষ সুরু করিয়াছে এখানে, এমন কি আখের গুড় হইতে হুইস্কি চোলাই করিবার একটি কারখানাও খুলিয়াছে।

"আখের গুড় হইতে হুইস্কি, কেহ কখনও শুনিয়াছে কি? কিন্তু জাপানীরা হটিবার পাত্র নয়। হুইস্কির বোতলগুলি দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের হুইস্কির বোতলেরই মত—তার গায়ে লেবেল আঁটা আছে—"খাঁটী পুরাতন স্কচ হুইস্কি, সাইপানে প্রস্তুত"—এবং সত্তর হাজার কোয়ার্ট এই হুইস্কি প্রতি বৎসর এখান হইতে টকিওতে রপ্তানী করা হয়। কারখানার ম্যানেজার আমাকে কারখানার সর্ব্বত্র দেখাইয়া লইয়া বেড়াইলেন এবং একটু গর্ব্বের সুরে বলিলেন যে, আগামী বৎসরে তিনি ঐ ঝোলাগুড় হইতে 'পোর্ট ওয়াইন' চোলাই করিবার মতলব করিতেছেন এবং আশা করেন, ইহাতে কৃতকার্য্যও হইবেন।

পোনাপি (সাউথ-সি): রহস্যময় অরণ্যাবৃত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এই দুর্গ কবে কাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইহা যে এই দ্বীপের বর্ব্বর অধিবাসীদের দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

(পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

"সাইপান ছাড়িয়া আমরা খাড়া পূর্ব্বমুখে চলিলাম, তিন দিনের মধ্যে ডাঙা চোখে পড়িল না, শুধু জল আর জল। বাণিজ্যবায়ু প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়া প্রতিপদে আমাদিগকে বাধা-প্রদান করিতেছিল। অবশেষে একদিন আমরা একটি অপরিসর খাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া প্রবাল-বাঁধের মধ্যবর্ত্তী স্থির সমুদ্রে নোঙর করিলাম। এই বন্দরের নাম ট্রাক।

"সাউথ-সি দ্বীপপুঞ্জের অন্য সব গুলির মত ট্রাকেরও এমন একটা অপরূপ সৌন্দর্য্য আছে, যা ঠিকমত বর্ণনা করিতে পারা যায় না, অথচ যা প্রকাশ না করিতে পারিলে মনকে পীড়া দেয়। জাপানের শাসনাধীনে আসার দরুণ এখানে একটা বড় উপকার হইয়াছে এই যে, কোন প্রকারের ট্রপিক্যাল রোগ এখানে নাই। এমন কি ট্রপিক্সের অতি-সাধারণ রোগ ম্যালেরিয়াও না। ম্যালেরিয়ার বীজবাহী মশা এখানে নাই।

"কিন্তু সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া হাওয়াই ও টাইটি দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের যে দুর্দ্দশা সুরু হইয়াছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। অর্থাৎ হাওয়াই ও টাইটি দ্বীপের অধিবাসীদের মত ইহারা মরিয়া উজাড় হইয়া এখনও যায় নাই বটে, কিন্তু চামোরো ও কানাকা জাতিদের মধ্যে বর্ত্তমানে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশী দেখা যাইতেছে।

"ট্রাকের একটী গৌরব করিবার বিষয় এই যে, দ্বীপটী টাইফুনের জন্মস্থান। টাইফুন বা ঘূর্ণীঝড় অনেক সময় পাঁচশ মাইল ব্যাস লইয়া বহিতে থাকে এবং বৎসরে কোন কোন ঋতুতে উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরে প্রলয় বাধাইয়া তোলে। কিন্তু ট্রাক টাইফুনের জন্মস্থান হইলেও বায়ুমণ্ডল এখানে সব সময়ই প্রশান্ত। সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া দূরের তালীবনের সহস্র শাখার মধ্যে বাতাসের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম। বাতাস ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহিতেছে বটে, এখনও কচি শিশুর মতই প্রবাল-সরোবরে ভেলাদের দোল দিতেছে, তাল-নারিকেলের পত্রপুঞ্জ নাড়িয়া খেলা করিতেছে…

"…কিন্তু এখান হইতে একশো মাইল পশ্চিমে যখন গিয়া পড়িবে, তখন ইহার এই শৈশব চলিয়া যাইবে, তখন ইহার সম্মুখস্থ জেলে-ডিঙিগুলি ব্যস্তসমস্ত ভাবে আশ্রয় অভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিবে। আরও একশো মাইল

দূরে গেলে, তখন বেতার-ষ্টেশন হইতে সকল জাহাজকে ঝড়ের গতি সম্বন্ধে সতর্ক করিতে থাকিবে, বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীরা ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে তাহাদের নারিকেল পাতার কুটীরে মাথা গুঁজিয়া ভয়ে কাঁপিবে এবং বড় বড় যাত্রী-জাহাজ পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউয়ের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে।

"টাইফুন কখনো একদিকে ছুটে না। ট্রাক হইতে পশ্চিমদিকে যাত্রা করিয়া বেগ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নানাদিক ছড়াইয়া পড়ে। হয়তো ফিলিপাইনে শুধু খুব ঝড়-বৃষ্টির উপর দিয়াই গেল, হংকংএ আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য জাহাজ-চলাচল বন্ধ থাকিল, কিন্তু হংকংএর নিকটস্থ বন্দর এময়ের (Amoy) সর্ব্বনাশ ঘটিল, অথচ ফরমোসা দ্বীপে শুধু বেতারের মারফৎ ঝড়ের খবর পৌঁছিল মাত্র।

"টাইফুনের খামখেয়ালী গতির বিষয় কেহ কিছু বলিতে পারে না ঠিক বটে, কিন্তু টাইফুনের নির্দ্দয় কবলে পড়িলে জাহাজ, গ্রাম ও কৃষি-ক্ষেত্রের কি দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা কাহারও জানিতে বাকী নাই। আমি দুইবার প্রকৃতির এই রুদ্রলীলার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, পুনরায় টাইফুনের সম্মুখীন হইবার ইচ্ছা আমার নাই।

"ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে পোনাপি নামে একটী দ্বীপ আছে। তাহাতে দুটী আশ্চর্য্য জিনিষ দেখা যায়। প্রথম, প্রায় দুহাজার ফুট উচ্চ একটী পর্ব্বত, এ অঞ্চলের প্রায় কোন দ্বীপেই এত উচ্চ পর্ব্বত নাই, আর দ্বিতীয়টী হইতেছে একটী বহু প্রাচীন যুগের দুর্গ। এই দুর্গ কাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। কিন্তু একথা ঠিক যে, তাহা এই দ্বীপের অধিবাসীদের দ্বারা নির্ম্মিত নয়।

"এই প্রাচীন কীর্ত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কৌতূহলপ্রদ কাহিনী প্রচলিত আছে। অধিবাসীদিগের মধ্যে কোন কোন অতিবৃদ্ধ লোক না কি ইহার গোপনতত্ত্ব অবগত আছে, কিন্তু তাহাদের বিশ্বাস বিদেশীর কাছে তাহা প্রকাশ করিতে নাই। একজন জাপানী স্কুলমাষ্টারের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার মুখে শুনিলাম, একজন বৃদ্ধ লোক তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ভুলিয়া গুপ্ততথ্যটী তাহার কাছে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বলিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ ব্যক্তি মারা যায়। সেই হইতে এই সংস্কার অধিবাসীদিগের মধ্যে আরও বদ্ধমূল হইয়াছে।

পোনাপি (সাউথ-সি): ভূপ্রদক্ষিণকারী ম্যাগেলানের সমসাময়িক (ষোড়শ শতক) স্পেনীয়গণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুর্গ-প্রাকারের প্রবেশ-তোরণ।

"এই দুর্গের ধ্বংসস্তূপ প্রায় পাঁচ বর্গমাইল জমি জুড়িয়া অবস্থিত। বড় বড় চৌরস করিয়া কর্ত্তিত প্রস্তরখণ্ডে ইহা নির্ম্মিত। ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে যে এই সকল প্রস্তর আনীত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম দর্শনে মনে হয়, দুর্গটি যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। আসলে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্রকায় দ্বীপের উপর বাড়ীগুলি নির্ম্মিত। বড় বড় খাল দ্বারা সেগুলি পরস্পর সংযুক্ত। দুর্গের মধ্যস্থলে একটা বড় প্রাসাদ পূর্ব্বে ঘোর জঙ্গলে আবৃত ছিল, এখন জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে। এক সময়ে এই প্রাসাদে বড় বড় কক্ষ ছিল এবং জল হইতে প্রাসাদে উঠিবার সুবৃহৎ সোপানাবলীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। দুর্গের প্রাচীর তিন চার ফুট পুরু এবং ক্রমশঃ পিছনদিকে ঢালু। পিকিং সহরে এই ধরণের গাঁথুনি দেখা যায়।

"সমুদ্রের ধারে একটি প্রাচীন কালের পোতাশ্রয়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। এক সময় পোতাশ্রয়টি খুব গভীর

সোসাইটী দ্বীপপুঞ্জ ও পলিনেসিয়া

একটি ক্ষুদ্র আনাড়ি গ্রাম্য বালক পথ হেঁটে হুইট্‌বি বন্দরে আসচে।

তার চেহারা দেখে মনে হবার কথা নয় যে সে জগতে কোনদিন কিছু করতে পারবে।

আগে যেখানে কাজ করতো, সেখান থেকে চাক্‌রী ছেড়ে পালিয়ে আসচে সে। তার উদ্দেশ্য, সমুদ্রে নাবিকের কাজ নেওয়া এবং দেশে দেশে ভ্রমণ করা।

সবাই ভাবছে, ছোকরার মাথা খারাপ আছে।

বহুকাল আগের হুইট্‌বি। সরু সরু রাস্তা, দুধারে পুরানো বাড়ী। নোংরা ড্রেণ পথের ধারে। মাঝে মাঝে জাহাজী জিনিষপত্রের দোকান—নোঙর, পাল, দড়াদড়ি, কপিকল, শেকল।
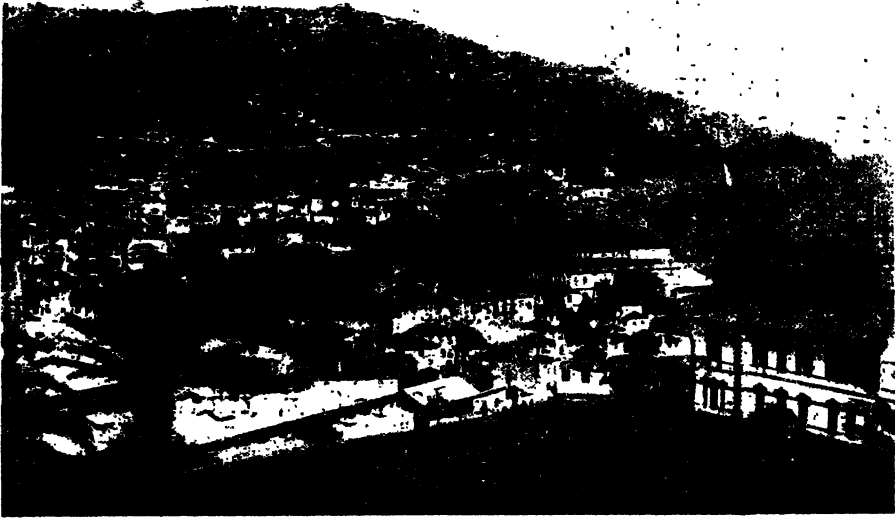
ফুঙ্কল, মদিরা দ্বীপ - যেখানে কুক তাঁর জাহাজগুলিকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দ্বারা গুছিয়ে নিয়েছিলেন। নাবিকগণকে স্কার্ভি রোগ হ'তে মুক্ত রাখবার জন্যে তিনি বহুল পরিমাণে পিঁয়াজ সংগ্রহ করে নিয়ে গেছলেন।

জলের ধারে ছোট বড় পালের জাহাজ, তিমিমাছ ধরা বোট—অমুক জাহাজখানা লোহা ও পাথর বোঝাই করে ব্রিমেন যাবে, ওখানা ড্যান্‌জিগ, আর একখানা ফটকিরি বোঝাই দিয়ে যাচ্চে সেন্ট-পিটার্সবুর্গ।

জেলেরা বন্দরে রোদ পোয়াচ্চে, মুখে লম্বা লম্বা পাইপ।

সারাদিন এরা গল্প করে কাটায়, দেখে মনে হয় এদের বুঝি কোনো কাজ নেই করবার। কিন্তু এদের কাজ আরম্ভ হবে দুপুর রাতের পরে; তার পর থেকে জার্ম্মান সমুদ্রের ঢেউ ও তুষার-শীতল বায়ুর সঙ্গে এদের সংগ্রাম হবে সুরু।

গ্রাম্য বালকটির পিঠে একটা বোঁচ্‌কা, নিতান্ত গ্রাম্য ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ তার পরণে, যা দেখচে তাতেই অবাক হয়ে সেদিকে হাঁ করে চেয়ে আছে।

দু-একজন জেলে তার রকম-সকম দেখে কৌতুকপূর্ণ স্বরে জিগ্যেস করলে—নাম কি ছোকরা ?

ছেলেটি বল্লে—জেম্‌স্‌ কুক্‌।

তারপর ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বল্লে সে কোনো জাহাজে নাবিকের কাজ খুঁজচে। আছে তাদের সন্ধানে এমন কোনো চাকুরী খালি ?

কেউ কেউ তার বাড়ী, বাপ-মার কথা, বয়েস জিগ্যেস্‌ করলে। সবাই তাকে বোঝালে, জাহাজের কাজে বড় কষ্ট। কুকুর বিড়ালের মত জীবন নাবিকদের, জাহাজ যখন সমুদ্রের ওপর থাকে, খাটতে খাটতে প্রাণ যায়, খাওয়া অনেক জাহাজে এত খারাপ যে, আধ-পেটা খেয়ে থাকতে হয়। এত অল্প বয়সে জাহাজে কাজ কেন খুঁজচে সে ?
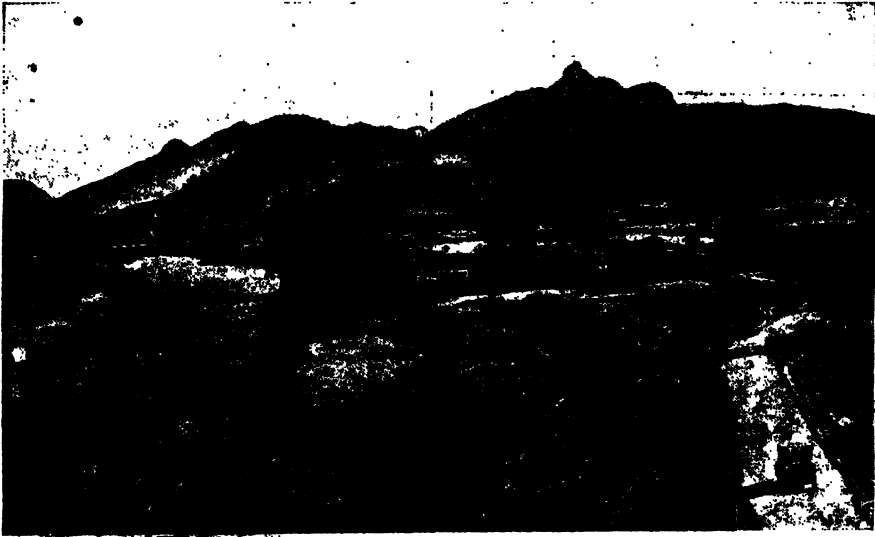
অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের একটি দৃশ্য।

এই দ্বীপ-মহাদেশকে কুক ব্রিটেনের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বামদিকে টুইড্‌ নদী। পশ্চাতে সর্বোচ্চ শিখরটি কুক নামকরণ করেছিলেন মাউণ্ট ওয়ার্ণীং (Mount Warning)। প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপ অথবা অভিযানের ঘটনালক্ষণ নিয়ে কুক তাঁর আবিষ্কৃত স্থানগুলির নামকরণ করতে ভালবাসতেন, যথা Cape Tribulation, Lizard Island, Botany Bay, Providential Channel, Mount Warning ইত্যাদি।

ছেলেটি বল্লে, তার বয়েস আঠারো। তার বাবা মাটিকাটা কাজে দিনমজুরী করে। তাদের গ্রামে একটি দয়ালু মহিলার কাছে ছেলেটি সামান্য লেখাপড়া শিখেচে। তারপর সে মাঠে মজুরের কাজ করেচে ; দিন কতক একটা মুদীর দোকানে খাতা লিখত। কিন্তু এ সব তার ভাল লাগে না। সে সমুদ্রে নাবিকের কাজ করবে।

সবাই অবিশ্যি হেসে উঠল। জাহাজের চাকুরী জোগাড় করা অত সোজা নয়। বহুদিন জলের ধারে ঘোরাঘুরি করতে হবে, তবে যদি কিছু হয়।

কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কেউ জানতো না, সে ছেলেটি যে সাধারণ ছেলে নয়, ভবিষ্যতে সে হবে কাপ্তেন জেম্‌স্‌ কুক, প্রশান্ত মহাসাগরের কলম্বাস্‌।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রের সে সময়ের কোনো নির্ভরযোগ্য ম্যাপ ছিল না। ১৭৬৮ সালের একখানা ঐ অঞ্চলের ম্যাপের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের একখানা ম্যাপের তুলনা করলে এ সকল বোঝা যাবে। দু-চারটা দ্বীপের নাম পুরাণো ম্যাপে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাদের অবস্থিতি স্থান সম্বন্ধে মানচিত্রকারের কোনো ধারণা ছিল না। কাপ্তেন কুক প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকাংশ দ্বীপ আবিষ্কার করেন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

সেক্সপিয়রের জীবনের অনেকখানিই যেমন অজ্ঞাত, কুকেরও তাই। কিছুদিন হুইট্‌বিতে আসার পর কুক একখানা ছোট জাহাজে চাকুরী পেয়ে সমুদ্রে বার হয়েছিলেন। কিন্তু সে জাহাজের দৌড় ছিল ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের উপকূলের বন্দরগুলো পর্য্যন্ত। এই

পপেটোয়াই বে এবং গীর্জ্জা পাহাড়। মুরিয়া, সোসাইটী দ্বীপ।

দৈত্যের বৃদ্ধাঙ্গুলি (Gaint's Thumb), কেপ ফাউলউইণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড।

কুক তাঁর গতিপথে এখানকার বায়ুর দ্বারা অত্যন্ত বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে 'ফাউলউইণ্ড' নামকরণ করেন।

জাহাজে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিয়ে, তিনি তেরো বছর কাটিয়ে দিলেন। এই তেরো বছরের বিশেষ কোন বিবরণ জানা যায় না। তবে উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অতি অপকৃষ্ট খাদ্য খেয়ে, সামান্য একটু জায়গার মধ্যে জড়সড় হয়ে শুয়ে থেকে এবং উত্তর সমুদ্রের ভীষণ শীতবাত্যা সহ্য করে তিনি এমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলে গ্রাহ্য করতেন না।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে শুক্রগ্রহ ও পৃথিবী পরস্পরের খুব নিকটে এসেছিল। তখনকার বৈজ্ঞানিক মহলে এই ব্যাপার নিয়ে খুব একটা সাড়া পড়ে যায়। শুক্রগ্রহ যখন সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে আসবে পৃথিবীর, সেই সময় পৃথিবীর নানাস্থানে ঘাটি স্থাপিত হয়েছিল, শুক্রগ্রহ ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে।

ঐ সালের ৩রা জুন ঐ ঘটনার দিন নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। গ্লাসগো ও আরও দু-একটা বড় সহরে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সহরবাসীদের সন্ধ্যার পরে আগুন জ্বালতে নিষেধ করা হোল। কারণ অতিরিক্ত ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে শুক্রগ্রহ পর্য্যবেক্ষণ করার সুবিধে হবে না।

ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটী রাজা তৃতীয় জর্জ্জের সাহায্যে একখানা জাহাজ পাঠালেন প্রশান্ত মহাসমুদ্রের টাহিটি দ্বীপে, সেখান থেকে এই বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের বেশী সুবিধে হবে বলে। কাপ্তেন কুকের ওপর এই জাহাজ চালানোর ভার পড়ল।

জাহাজে সে-কালের দুজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ছিল। সার জোসেফ ব্যাঙ্কস্ ও প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ লিনিয়াসের ছাত্র ডাঃ সোলানডার।

কুকের জাহাজে ৪১ জন সাধারণ মাল্লা ও ১২ জন জাহাজের কর্ম্মচারী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নাবিকেরা পশুত্বের জন্যে প্রসিদ্ধ, কুকের মনে সন্দেহ ও আশঙ্কা জাগল যে, এই দায়িত্বজ্ঞানহীন, মূর্খ লোকগুলো এত দীর্ঘ দিন সমুদ্রে শান্তভাবে থাকবে কি না।

কুক ষ্ট্রেট, নিউজিল্যাণ্ড। আবিষ্কারকের নাম চিরস্মরণীয় করবার জন্য এই স্থানের এবং আরও ১৪।১৫টি স্থানের নামকরণ কুকের নাম দিয়ে করা হয়েছে।

জাহাজ প্লিমথ সাউণ্ড ছাড়ল আগষ্ট মাসের শেষে, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে ম্যাডিরা দ্বীপে নোঙর করলে। ম্যাডিরাতে লোকে শুনলে জাহাজে দুজন বড় বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁরা প্রকৃতির সব রহস্য অবগত আছেন। বেজায় লোকের ভিড় হোল তাঁদের দেখবার জন্যে। ফ্রান্সিস্‌কান্ সম্প্রদায়ের একটি মঠ এখানে ছিল। মঠের কয়েকটি সন্ন্যাসিনী এসে তাঁদের বল্লেন—একটা উপকার করবেন আমাদের? ভাল জলের ঝরণা কোথায় আছে খুঁজে পাচ্ছি নে। ভালো জলের বড় অভাব হয়েচে। বলে দিন না কোথায় খুঁড়লে ভাল জল পাবো?

বহু বৎসর পরে আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারেরা বুঝেছিলেন যে, পানামা খাল কাটানোর পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া জর ও পীত জরের দমন আবশ্যক, নয়তো মজুর ও কর্ম্মচারীর দল জরে মরে গেলে খাল কাটবে কে? কুক্‌ও তেমনি বুঝেছিলেন, শত সমুদ্র পার হয়ে যদি সুদূর প্রশান্ত মহাসমুদ্রে তাঁকে পৌছতে হয়, তবে প্রথম থেকেই সতর্ক হতে হবে জাহাজে স্কার্ভি রোগ না দেখা দেয়। টাট্‌কা শাকসব্জি বা ফলমূল দীর্ঘকাল না খাওয়ার দরুণ এই রোগ হয় বলে কুক যখন যে বন্দরে জাহাজ থামাতেন, সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে ফল ও তরিতরকারী কিনে নিতেন। কিন্তু জাহাজের মাল্লারা এ-সব খেতে রাজি হোলো না। তারা লবণাক্ত গোমাংসের বড় বড় টুক্‌রা খেতে অভ্যস্ত এবং খোসা-লাগা

ওট মিলের বিস্কুট। কাপ্তেন কুক কড়া হুকুম জারি করলেন, প্রত্যেক মাল্লাকে সপ্তাহে দশ সের পিঁয়াজ খেতেই হবে। একজন মাল্লা আদেশ মানে নি, তাকে বারো ঘা বেত মারবার হুকুম হোল।

কেপ হর্ণ পার হবার পরে আর কোথাও টাটকা শাক সব্জি পাওয়া গেল না। কাপ্তেন কুক জাহাজে রাশীকৃত নারিকেল নিয়েছিলেন বাহামা দ্বীপপুঞ্জ থেকে, এবার সমুদ্রের ধার থেকে বোঝা বোঝা সবুজ ঘাস উঠিয়ে জাহাজের খোল ভর্ত্তি করলেন। হর্ণ পার হবার পরে সবাইকে কাঁচা নারিকেল ও সেই ঘাস একত্রে সিদ্ধ করে তাই খেতে বাধ্য করলেন। জাহাজে হৈ চৈ পড়ে গেল।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জাহাজ টাহিটি দ্বীপে পৌঁছে গেল। নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যবেক্ষণ করে কুক তাদের বিবরণ লিখলেন এবং রয়েল সোসাইটীর সম্মানার্থ এদের নামকরণ করলেন 'সোসাইটী দ্বীপপুঞ্জ'।

পলিনেসিয়ার এই সব দ্বীপবাসীদের সরল আচার ব্যবহার ফিল্মের কল্যাণে আমাদের সকলেরই সুপরিচিত।

কুক ও জাহাজের লোকেরা অধিবাসী-দের এই প্রথম দেখে তো অবাক্। একটা ছোট দ্বীপের রাণীকে ডাঃ সোলানডার একটা পুতুল উপহার দিলেন, তাতে সেই দ্বীপের বাহান্ন বছর বয়সের লম্বাচওড়া জোয়ান রাজা সেই পুতুলটা দেখে এত মুগ্ধ হোল যে উক্ত বৈজ্ঞানিকের কাছে দূত পাঠিয়ে প্রস্তাব করলে, এ দেশের একটি ভাল মেয়ের সঙ্গে সে ডাঃ সোলান্ডারের বিবাহ দিতে রাজি, ঐ রকম আর একটা পুতুলের পরিবর্ত্তে।

নিউ হেব্রাইডস অধিবাসিগণের আনুষ্ঠানিক ঘন্টা। প্রত্যেক গ্রামে একটি করে নৃত্যভূমি আছে। জ্যোৎস্নারাত্রে অধিবাসিগণ সেই সকল ভূমিতে উপস্থিত হয়ে উৎসবাদি করে। ঘন্টাখানির শব্দ কর্ণবধিরকারী।

টাহিটি পরিত্যাগ করবার পূর্ব্বে কুক সে-দ্বীপে কমলালেবু, তরমুজ, লেবু ও আরও অনেক রকম ফলমূলের বীজ বপন করেন। বনে কয়েকটী মুরগী ও কুকুর ছেড়ে দিয়েছিলেন। যে যে দ্বীপে তিনি গিয়েছিলেন, প্রায় সব স্থানেই সর্ব্বাগ্রে তিনি কিছু ফলের বীজ ছড়িয়ে দিতেন। এ থেকে পরবর্ত্তী কালে অনেক দ্বীপের উদ্ভিজ্জ সংস্থানের প্রকৃতি বদলে যায়। টাহিটি দ্বীপে দুজন মাল্লা জাহাজ ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গেল।

কুক তাদের ছেড়ে যেতে রাজি হোলেন না, দ্বীপের সর্দ্দারদের সাহায্যে অনেক অনুসন্ধানের পরে উপকূল থেকে বহুদূরে এক নিভৃত পার্ব্বত্য অঞ্চলে তাদের পাওয়া যায়। তারা এর মধ্যে সে দেশের দুটী মেয়ে বিয়ে করে দিব্যি সংসার পাতিয়ে বসেচে।

তারা বল্লে, কি হবে জাহাজে চাক্‌রী করে? বেশ আছি।

মেয়ে দুটী দেখা গেল বেশ গৃহকর্ম্মনিপুণা। রুটীফলের গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে সেঁকতে পারে, বেশী কথাবার্ত্তা বলে না, গাছের ছাল থেকে কাপড় তৈরী করতে ও নারকেলের ছোবড়া থেকে মাছ ধরবার সুতো পাকাতে তারা একেবারে ওস্তাদ। সুতরাং মাল্লা দুটী সুখেই আছে, কেবল অভাব অনুভব করে তামাকের জন্যে। তামাক জিনিসটা এ-সব দেশে একেবারে অজ্ঞাত। এমন সুখের ঘরকন্না তাদের, কাপ্তেন কুক ভেঙে দিয়ে তাদের ধরে আনলেন জাহাজে। পালাবার শাস্তি বারো ঘা করে বেত। হায় নিষ্ঠুর সংসার!
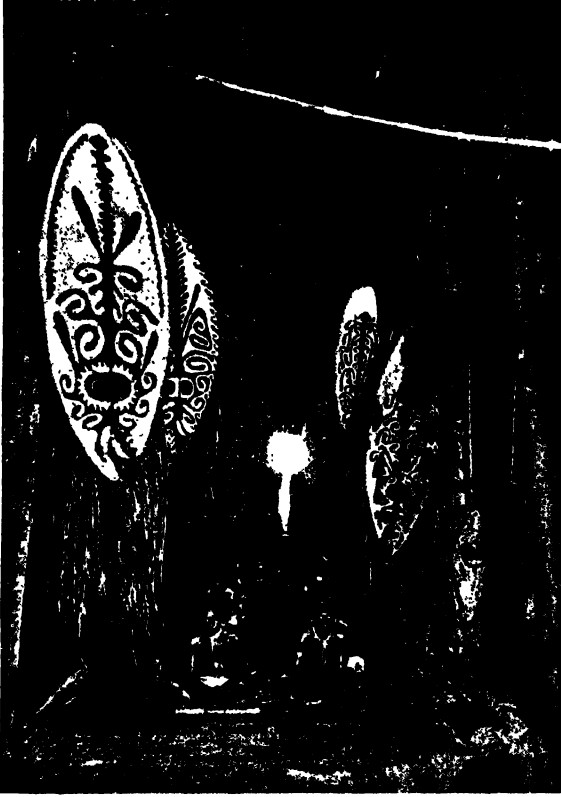
ডুবু অর্থাৎ ক্লাবগৃহের ভিতরকার দৃশ্য।

এই সব ক্লাবগৃহে বহু সংখ্যক বড় বড় মুখস, ঢাল, তরোয়াল এবং অন্যান্য অস্ত্রাদি রক্ষিত থাকে। দুদিকে মাচার উপর বহু সংখ্যক মাথার খুলিও সঞ্চয় করে রাখা হয়।

একদিন একটা লোক ছুটে এসে জানালে, দ্বীপের সর্দ্দার অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েচে হঠাৎ—বোধ হয় আর বাঁচবে না। ডাঃ সোলেনডার রোগী দেখতে গেলেন। সর্দ্দার টুবুরাই খুবই অসুস্থ বটে, রোগ যে কি কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল, জাহাজের এক নাবিকের কাছে খানিকটা তামাকের পাতা চেয়ে নিয়ে, সর্দ্দার সেটা গিলে খেয়ে ফেলেছিল—তারপরই এই অবস্থা। ডাঃ ব্যাঙ্ক রোগীকে খুব বেশী করে ডাবের জল খাওয়াতে বলে চলে এলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে উঠল।

সোসাইটী দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে কুক পশ্চিমমুখে রওনা হয়ে ১৫০০ মাইল সমুদ্র পার হয়ে নিউজিল্যাণ্ডে এসে পৌছুলেন। কুক নিউজিল্যাণ্ডে যাবার পূর্ব্বে ইউরোপের ভূগোলবেত্তাগণের নিকটও ও অঞ্চলের ভূমিসংস্থান সম্বন্ধে ধারণা খুব সুস্পষ্ট ছিল না, অনেকে বিশ্বাস করতো, ইউরোপ বা এসিয়ার মত দক্ষিণ দিকেও একটা মহাদেশ আছে। এই সব ধারণার সত্যতা পরীক্ষা করবার আগ্রহে কুক অনুকূল বাতাস পরিত্যাগ করে দূর অজানা মহাসমুদ্রের বুকে পাড়ি দেন।

প্রথমে তাঁরা নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী মাওরীদের নরমাংসপ্রিয়তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এখন যেখানে পিকবর্ণ সহর, নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর পূর্ব্ব উপকূলে ওই স্থানে কাপ্তেন কুক জাহাজ নোঙর করেন। কিন্তু কোনো মাওরী জাহাজের কাছে আসতে রাজী হয় না। তারা বলে পাঠালে—শ্বেতকায় মানুষেরা যে নরখাদক নয় তার প্রমাণ কি?

ক্রমে মাওরীদের ভয় দূর হল, জাহাজের নাবিকেরা মাওরীদের গ্রামে গিয়ে দেখলে, তারা অপ্রত্যাশিত রূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাদের বড় বড় নৌকা আছে, দূর সমুদ্রপথে এই সব নৌকায় যাওয়া যায়। মাওরীদের গ্রাম অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং তাদের স্বাস্থ্যবিধি এত ভাল যে, স্পেনের রাজার প্রাসাদেও তা দুর্লভ।

কুকের বিবরণ পড়লে জানা যায়, মাওরীদের তিনি খুব অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। একবার জাহাজের এক

নাবিক কি একটা জিনিষ চুরি করে এনেছিল মাওরীদের গ্রাম থেকে। কুক অপরাধীর উপর বারো ঘা বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করেন।

শুধু অজ্ঞাত অঞ্চলের ভৌগলিক সংস্থান নিয়ে ব্যস্ত থাকলে, কাপ্তেন কুককে কেউ দোষ দিতে পারতো না, কারণ প্রকৃতপক্ষে কুকের প্রধান উদ্দেশ্য তাই ছিল বটে।

কিন্তু কুকের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। কুক মাওরীদের সামাজিক ভোজের বর্ণনা করেছেন, পাখীর গানের বিবরণ লিখেছেন, তার মধ্যে এক ধরণের পাখীকে তিনি বলেছেন, 'ঘণ্টা পাখী'—বনের মধ্যে ঠিক যেন রূপোর ঘণ্টা বাজচে মনে হয়, পাখীটি যখন ডাকে। একটা পাহাড়ের ছবি এঁকেচেন এবং নিউজিল্যাণ্ডের সমুদ্র উপকূলের বালিতে কত ভাগ লোহা, কত ভাগ সিলিকন মিশ্রিত আছে, তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেচেন। পৃথিবীর সাহিত্যে কুক একজন শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-লেখক, নতুন দেশের খুঁটিনাটি বর্ণনা খুব কম বইয়ে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি ৪০০ শত প্রকারের গাছপালা ও নানা রকমের সামুদ্রিক মাছ সংগ্রহ করেন।

কুকের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ নাবিক আবেল টাসম্যান এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন কিন্তু জগতের চোখের সামনে তাকে এমন ভাবে তিনি ধরেন নি।

বোয়া নাই

এইখানে ভাষা নিয়ে মিশনারীগণকে ভারী বিপদে পড়তে হয়। পাপুয়ানদের প্রত্যেক গ্রামের ভাষা আলাদা। এমন বহু কথা আছে যার উচ্চারণ এক কিন্তু অর্থ বিভিন্ন। একটি মিশনারী—যিনি নিয়মিত কাছাকাছি দুটি গ্রামে প্রচারকার্য্য করতেন—সর্ব্বদা একটি কথাকে ভ্রমাত্মক অর্থে ব্যবহার করতেন। এক গ্রামে সে কথাটির অর্থ স্বর্গদূত কিন্তু অন্য গ্রামে লাল আলু!

কুক সাড়ে ছ'মাস ধরে সমস্ত নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলভাগে জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে প্রত্যেক স্থানের সমুদ্রজলের গভীরতা, চড়া বা প্রবাল-বাঁধের অবস্থান ইত্যাদি সহ তাদের চার্ট তৈরী করেন। তবুও তো সে সময় আধুনিক কালের অনেক উন্নততর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে একদল ফরাসী ভৌগলিক এই সব অঞ্চল পরিভ্রমণ করে, কাপ্তেন কুকের প্রস্তুত চার্ট ও ম্যাপের সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং তাঁদের দলপতি পরে বলেছিলেন—কাপ্তেন কুকের চার্ট এত নিখুঁত যে, আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত হতে হয়েচে। সেকালে এত নিখুঁতভাবে চার্ট তৈরী করা কিরূপে সম্ভব হয়েছিল।

কুক দেশে ফিরবার সময়ে সোসাইটী দ্বীপের একজন অধিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। লোকটার নাম ওমাই। বিলেতে হৈ চৈ পড়ে গেল। তার আগে বিলেতের লোকে এমন ধরণের মানুষ দেখেনি। কাউপার তার উদ্দেশে কবিতা লিখলেন, সার জোশুয়া রেনল্ডস্ তার ছবি আঁকলেন। ডাঃ জনসন্ তাকে একদিন নিজের বাড়ী

নিমন্ত্রণ করে তার সঙ্গে এক টেবিলে আহার করলেন। প্রশান্ত মহাসাগরীর দ্বীপপুঞ্জের খুব কম অধিবাসীর অদৃষ্টে এমন সম্মান জুটেছে।

বড় বড় লোকের ড্রইংরুমে লণ্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের বড় বড় বাটিতে ওমাই নিমন্ত্রিত হয়ে যেতে লাগল। এমন সম্মান ও সুযোগ পেয়েও ওমাই কিন্তু একটুও বদলালো না। শেখার মধ্যে ওমাই খুব ভালো দাবা খেলতে শিখলে। সে সময়ের অনেক ওস্তাদ দাবা-খেলোয়াড়কে ওমাই খেলায় হারিয়ে দিয়েছিল।

পুনরায় সমুদ্র ভ্রমণে বহির্গত হয়ে কুক ওমাইকে তার নিজের দেশে পৌঁছে দিলেন। তাকে বেশ ভালো একখানা বাড়ী তৈরী করে দেওয়া হল, নাবিক-বন্ধুরা তাকে সভ্য মানুষের ব্যবহার্য্য বাসন পত্র দিলে—কুক তাকে একখানা বাগান করে দিলেন এবং নানারকম ফলমূলের বীজ উপহার দিলেন। লোকটা কিন্তু ঘর-গৃহস্থালীর কাজে আদৌ মন না দিয়ে বাড়ীর সামনে লোক জড় করতো ও দিন রাত তাদের বিশেষতঃ গ্রামের তরুণীদের প্রশংসমান দৃষ্টির সামনে মহা আনন্দে বিলেত থেকে আনা একটা হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইত।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হাওয়াই দ্বীপবাসীদের হাতে কাপ্তেন কুক নিহত হন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ

(লা সিবা)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অনেক দ্বীপেই কলার চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। কলার ব্যবসায়ের জন্য সে সব দেশ টিকিয়া আছে এবং দেশের সমস্ত মূলধন ও পরিশ্রমের বারো আনা অংশ কদলী উৎপাদন ও রপ্তানী কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। জনৈক আমেরিকান ভ্রমণকারীর নিম্নলিখিত বিবরণটী হইতে আমরা ইহার একটি সুন্দর ছবি পাই—

উষার অরুণ রাগ পূর্ব্বাকাশে সবে দেখা দিয়াছে।

আমরা হন্দুরাস দ্বীপের উপকূল বাহিয়া লা সিবা বন্দরের দিকে চলিয়াছি।

উপকূল ভাগ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং বালুময়। তার পিছনে উচ্চ পর্ব্বতমালা, আকাশের রং তখনও নীল হয় নাই, কিন্তু পর্ব্বতের মাথাগুলি রাঙা হইয়া আসিল।

একটু পরেই সূর্য্য উঠিল, এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ও সমুদ্রের রং যেন কোন ইন্দ্রজাল দণ্ডের স্পর্শে বেমালুম বদলাইয়া গেল। আকাশ হইল ঘন নীল, সমুদ্রও ঘন নীল—উপকূলে যা এতক্ষণ ছিল কৃষ্ণবর্ণ জমাট অন্ধকার, এইবার তাহা হইল ঘন সবুজ অরণ্যানী। সকালের কুয়াসাও কাটিয়া গেল।

কলা বহন করে রেলওয়েতে নিয়ে যাওয়া হইতেছে।

উপকূলের বনের রং আরও সবুজ হইল—। কেবল মাঝে মাঝে সাদা বনফুলের রাশি যেখানে বনের মাথা আলো করিয়া রাখিয়াছে, বনের সেই অংশ ছাড়া।

আমাদের চারিপাশে কিন্তু কোনো শব্দ নাই, কাহাকেও নড়িতে চড়িতে দেখা যায় না। এত সকাল, যে বোধ হয় শয্যাত্যাগ করিয়া অনেকেই ওঠে নাই।

উপকূলের এত কাছ ঘেঁসিয়া আমরা চলিয়াছি যেন জঙ্গলের গাছপালার পাতা হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায়। এমন সময় জাহাজের লোকে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'লা সিবা'।

দূরে দিগন্তের কোলে এক পোঁচ কালো কালির মত কি একটা ব্যাপার দেখা যাইতেছিল বটে। উপকূলে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে গ্রাম দেখা যাইতে লাগিল; সবুজ নারিকেল-কুঞ্জের মধ্যে পাতায় ছাওয়া ছোট ছোট কুটীর। দু-একটা কুটীরের ভিতর হইতে সরু ধোঁয়ার রেখা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতেছে।

কলার চাষে জলসেচন করা হইতেছে।

সম্মুখে ক্রমে একটা কাঠ ও লোহার তৈরী জেটি ও জেটিতে বসানো বড় বড় মাল উঠাইবার লৌহযন্ত্র স্পষ্ট হইয়া ফুটিতে লাগিল। উপকূলের এই বন্য সৌন্দর্য্যের পাশে হঠাৎ এই বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র-সভ্যতার প্রকৃষ্ট চিহ্নগুলি যেন বড় বিসদৃশ ও দৃষ্টিকটু ঠেকিল। সুখের বিষয় এই যে তাহারা জঙ্গলকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিতে পারে নাই, জঙ্গলই তাহাদের চাপিয়া রাখিয়াছে। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে এক সারি সাদা রংয়ের ঘর বাড়ী, বোধ হয় বা গুদাম কিংবা জেটি আপিস। নারিকেল বনের নীচে কালো কয়লার স্তূপ।

ইহাদের পিছনে কিন্তু আর কিছু দেখা যায় না, উপকূলের অপেক্ষাকৃত নিম্ন শৈলরাজির পিছনে খুব উঁচু পাহাড়-পর্ব্বত, আর কি ভয়ানক জঙ্গল সেই সব পর্ব্বতের সানুদেশে! দ্বীপের আভ্যন্তরীণ কোনো দৃশ্য কৌতূহলী বৈদেশিক ভ্রমণকারীর চোখে না পড়ে, সেজন্য প্রকৃতি যেন সবুজ যবনিকার আড়ালে ও-দিকটা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। উঃ কি ভীষণ গুমট গরম এই সকাল বেলাতেই! বেলা এখনও আটটা হয় নাই, কিন্তু এরই মধ্যে রাস্তায় চলে কার সাধ্য? উষ্ণদেশের প্রচুর সূর্য্যালোক আমাদের পক্ষে একদিকে যেমন অতি লোভনীয়, এই অসহ্য উত্তাপ তেমনি কষ্টদায়ক। পথের ধারে একটা সৈন্যাবাস, কতকগুলি ছন্নছাড়া মূর্ত্তির সৈন্য তার সামনে প্রাভাতিক কুচকাওয়াজের চেষ্টায় আছে। চারি

ধারেই মাটীর বাড়ী। খড়ে বা নারিকেল পাতায় ছাওয়া। ময়লা কাপড় পরা ছেলে মেয়ে বাড়ীর সামনে রাস্তায় ধূলায় খেলা করিতেছে। লাল টালির ছাত-ওয়ালা বাড়ীগুলি বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের, কারণ এসব অঞ্চলে অনবরত বিদ্রোহের ফলে তাদের দেওয়ালগুলির গায়ে ঝাঁঝরা হইয়া আছে। যেন নদীর পাড়ে পাখীর বাসার গর্ত্ত।

এই হইল 'লা সিবা'র সাধারণ অবস্থা। এই রাজনৈতিক অবস্থায় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব বেশী উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। কলার চাষ না থাকিলে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ দাঁড়াইত।

যে কয়েকটি আমেরিকান ও ইউরোপীয় ধনী এখানে মূলধন ফেলিয়াছে, বর্ত্তমান 'লা সিবা' তাহাদেরই সৃষ্টি।

স্প্যানীশ্ হোণ্ডুরাসে স্থানীয় অধিবাসীদের একটি গ্রাম।

তাহাদেরই অর্থে ও যত্নে এই জঙ্গলের মধ্যে ইলেকটিক আলো জ্বলিতেছে, কংক্রিটের ঘর বাড়ী, গুদাম ও জেটি তৈরী হইয়াছে, রাস্তার উপর পিচ ঢালা হইয়াছে। তাহাদেরই অর্থে এখানে ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছে, ক্লাবে টেনিস খেলা চলে, এবং বড় বড় তাল জাতীয় গাছের তলায় প্রস্ফুটিত বুগেনভিলিয়া ফুলের আড়ালে কাঠের সুদৃশ্য বাংলোগুলি তাহাদেরই।

'লা সিবা'র গৌরব করিবার কিছুই নাই, না আছে ইহার গৌরবময় অতীত, না আছে এখানে কোন প্রাচীন গির্জ্জা, কি রাজপ্রাসাদ। কদলীই এখানকার সকল ঐশ্বর্য্য ও সকল আধুনিকতার মূলে। সুতরাং এখানকার কদলী-ক্ষেত্রগুলি দেখিবার ইচ্ছা আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

জেটির সঙ্গেই ছোট রেল লাইন। এই রেল লাইন বিভিন্ন কলা বাগানে গিয়াছে।

আমরা ট্রেণে উঠিয়া কলাবাগান দেখিতে চলিলাম। দেখিলাম দেশের অভ্যন্তরে সমগ্র ক্ষেত্র, সমগ্র উপত্যকা, নদীতীর জুড়িয়া শুধুই কলাবাগান। না দেখিলে লা সিবার কলা বাগানের বিশালত্ব বুঝিবার উপায় নাই। আমাদের ধারণা ছিল না যে কলাবাগান এত বিস্তৃত, এত বিরাট হইতে পারে।

ছোট রেল লাইন বাহিয়া আমাদের ট্রেণ অগ্রসর হইতে লাগিল। রেল লাইনের ধারে নানা জাতীয় কলার বাগান। কোনো বাগানে কলাগাছ দুই তিন হাতের বেশী লম্বা নয়, কোনো বাগান হয়তো জঙ্গল কাটিয়া সম্প্রতি তৈরী করা হইয়াছে, কোনো বাগানে প্রতিগাছে কলায় কাঁদি পড়িয়াছে, মাইলের পর মাইল শুধুই এই দৃশ্য। কোনো বাগানে প্রত্যেক গাছেই মোঁচা ঝুলিতেছে।

জাহাজে চালান দেওয়ার জন্য কলার কাঁদি কাটা হইতেছে।

কলার কাঁদি গাছে পাকানোর নিয়ম নাই। কাঁদি পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে সব বাগান, সেখানে কৃষ্ণকায় স্ত্রী ও পুরুষ মজুরেরা অস্ত্র দিয়া কাঁদি কাটিয়া গাছ হইতে নামাইতেছে এবং অতি সন্তর্পণের সহিত রেলপথের পার্শ্বস্থ বড় বড় কলার পাতায় ছাওয়া গুদামের মধ্যে রাখিতেছে। মাঝে মাঝে আমাদের ট্রেণ পাশের লাইনে রাখা হইতেছিল, বন্দরগামী কলা বোঝাই মাল-গাড়ীকে রাস্তা দিবার জন্য।

অনেক জায়গায় নূতন কলাবাগানের জমি তৈরী করিবার জন্য জঙ্গল আগুন লাগাইয়া পরিষ্কার করা হইতেছে। বহুদূরব্যাপী দগ্ধ ও অর্দ্ধদগ্ধ গাছের গুঁড়ির মধ্যে দু একটা বৃহৎ বনস্পতি দাঁড়াইয়া আছে, স্বভাবতঃ তাহাদের মূল্যবান কাঠের জন্য তাহাদিগকে নির্ম্মূল করা হয় নাই।

দু একটা কলার বাগান পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখা গেল। চার পাঁচ শত একার জুড়িয়া এক একটা কলার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে। এ সব স্থানের মাটী এমন যে কিছুদিন পড়িয়া থাকিলেই আগাছায় জঙ্গলে ভরিয়া যায়। পরিত্যক্ত বাগানগুলিতে কলার ঝাড়ের তলার নীচু আগাছায় জঙ্গল এত ঘন যে কাটিয়া পরিষ্কার না করিলে তাহাদের মধ্য দিয়া যাতায়াত অসম্ভব।

কিন্তু কলার বাগান যত বড়ই হউক, লা সিবার জঙ্গলকে ইহা তাড়াইতে পারে নাই। জঙ্গল এখানে নিজের

প্রভুত্ব এখনও হারায় নাই। রেল লাইনের দূরে নিকটে ঘন নিস্তব্ধ জঙ্গলের গাছপালা যেন সব সময় মানুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে।

জঙ্গলের এই প্রভুত্ব আরও বাড়িয়াছে এইজন্য, যে, এখানে মানুষের বাস খুবই কম। এখনও বর্ষাকাল সুরু হয় নাই, নদীনালা জলহীন। একটা পাহাড়ী নদীর শুষ্ক খাত বাহিয়া জনৈক দেশী কুলীর সর্দ্দার বাগান পরিদর্শনে চলিয়াছে। আরও অনেক দূর গেলে তবে দেখা গেল হয়তো জনৈক ইণ্ডিয়ান্ বালক একটা গাধা হাঁকাইয়া কোথায় যাইতেছে। তিন চার মাইলের মধ্যে এই দুটী মানুষ দেখা গেল, মধ্যে কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল।

কলাবাগান যেখানে আছে সেখানে, জঙ্গল দূরে সরিয়া গিয়াছে এই পর্য্যন্ত, কিন্তু একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। এদেশে জঙ্গলকে সম্পূর্ণরূপে হঠানো বড় সোজা কথা নয়।

ট্রেণ ছোট একটা ষ্টেশনে দাঁড়াইল। সম্ভবতঃ এঞ্জিনে জল লইবে।

ষ্টেশনের কাছে খানকতক খড়ের ঘর। ঘরের সামনে গুটীকতক কৃষ্ণকায় বালক বালিকা ধূলার উপর বসিয়া খেলা করিতেছিল। খেলা ফেলিয়া তাহারা গাড়ী দেখিতে দৌড়িয়া আসিল এবং আমাদের দেখিয়া কৌতূহলের সহিত আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

জেটির উপর কদলী বহনকারী বিষম বড় বড় যন্ত্র।

কলার বাগানের শ্রমিক ছাড়া এখানে অন্য মানুষের মধ্যে এক ইহাদেরই যা দেখিলাম। এঞ্জিন জল লওয়া শেষ করিয়া আবার চলিল। এবার গাড়ী যেন নীচের দিকে নামিতেছে। পাহাড় কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে। রেলপথের দুধারে এখানে ভীষণ জঙ্গল। লম্বা লম্বা ডাল-পালা প্রায় চোখে মুখে আসিয়া ঠেকে। আমরা জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম, জানালায় কাচের গায়ে ডালপালা ঠেকিয়া খড় খড় শব্দ করিতে লাগিল।

জঙ্গল ছাড়াইয়া আবার একটা খুব বড় কলা বাগান। তার পরেই নদী।
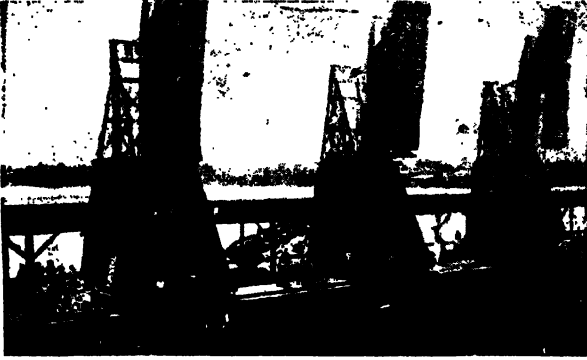
নদীর ধারে জেটির পাশে আসিয়া ট্রেণ দাঁড়াইলে আমরা নামিয়া ছোট একটা বোটে চড়িলাম। জেটির কাছে কলা রাখিবার অনেকগুলি গুদাম। জন কয়েক ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রো কুলী জেটিতে কাজ করিতেছে। আমাদের তো দেখিয়া মনে হইল এখানে কিছুই কাজ করিবার নাই, উহারা শুধু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রোদ পোহাইতেছে। এ যেন ঘুমের দেশ। এই ভীষণ জঙ্গলে এখানে মানুষকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে।

নদীর উজানে আমরা চলিয়াছি। আবার সেই নিস্তব্ধতা, আবার সেই জঙ্গল। এবার যেন আরও বেশী। নদীর দুই তীরে এবার আর মনুষ্যবাসের চিহ্ন নাই। শুধুই জঙ্গল। বড় বড় গাছ জলের ধার পর্য্যন্ত গজাইয়াছে। বড় বড় লতা এডালে ওডালে জড়াজড়ি করিয়া বন আরও দুষ্প্রবেশ্য করিয়া তুলিয়াছে। বনে দু একটা বাঁদর ছাড়া অন্য জানোয়ার দেখা গেল না।

পরদিন আমরা সমুদ্রের ধারে ফিরিলাম।

চার পাঁচখানা কলা বোঝাই মালগাড়ী ইতিমধ্যে জেটির ধারে আসিয়া লাগিয়াছে। অনেকগুলি জাহাজও কলার কাঁদির বোঝা তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। একখানা ট্রেণ আসিয়া জেটির সাইডিং লাইনে

জাহাজের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে দাঁড়াইল। নিগ্রো কুলীরা গাড়ীর দরজা খুলিতেই দেখা গেল স্তূপীকৃত কলার কাঁদি থাকে থাকে মালগাড়ীর ছাদ পর্য্যন্ত ঠাসা রহিয়াছে। কুলীর দল ব্যস্ত সমস্ত ভাবে কলা নামাইতে লাগিল। মাল উঠাইবার কলগুলি ঘড় ঘড় শব্দে জেটির ধার হইতে মাল তুলিয়া জাহাজে ফেলিতে লাগিল। চারিধারে এবার দেখিলাম খুব ব্যস্ততা,—খুব হৈ চৈ।

কুলীরা সকলেই নিগ্রো ও ইণ্ডিয়ান, দু একজন তদারককারী কর্ম্মচারী দেখিলাম তা শিক্ষিত নিগ্রো। ইহারা জেটির মুখে দাঁড়াইয়া নোট বইতে কলার কাঁদির হিসাব রাখিতেছে। মাঝে মাঝে ইহাদের মধ্যে কেহ হয়তো একটা কলার কাঁদি নামাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, কলা পাকিয়াছে কিনা। কাঁদিতে পাকা কলা থাকিতে দিবার নিয়ম নাই। কারণ তাহা হইলে অন্য অন্য কলার ছড়াগুলিও শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া যাইবে। তাই ইহাদের কাজ হইতেছে পাকা কলা বাহির করিয়া সেগুলি কাঁদি হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দেওয়া।

চল্লিশ হাজার কলার কাঁদি বোঝাই হইয়া গেলে আমাদের জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া বাহিরের মুক্ত সমুদ্রের অভিমুখে চলিল।

ভারত-সমুদ্রের দ্বীপ

বিচিত্র পৃথিবীর বিচিত্রতর ইতিহাসের 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'র মধ্যে কত জাতি, কত সভ্যতা সমুদ্রবক্ষে জলবুদ্‌বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়াছে, আবার অদৃশ্য হইয়াছে। এ জাতির সহিত সে জাতির, এ সভ্যতার সহিত সে সভ্যতার—সমগ্র মানবেতিহাস যুগ যুগ ধরিয়া কি ইহারই ঠাসবুনানির আল্পনা আঁকিয়া চলিতেছে? ভারত-সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে ইংরাজ ও ফরাসী ইত্যাদি জাতির ঐতিহ্যে এবং দুর্দ্ধর্ষ বোম্বেটে ও নিগ্রো ক্রীতদাসের বর্ণসঙ্করে রচিত ক্ষুদ্রতর একটি জাতি—ক্রিয়োল; তাহাদের জেলেরা পর্য্যন্ত অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধার্ম্মিক, দয়ালু ও সরল, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে বিলাসিতার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী, অবস্থার অতিরিক্ত তাহারা সাজপোষাক করে, ফরাসী গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করে, সুবাসিত সিগারেটের ধূমপান করে, অথচ কদাচিৎ শ্লীলতা ও শোভনতার সীমা অতিক্রম করে,—এই অর্দ্ধ-সভ্য, অর্দ্ধ-বন্য জাতির একটি কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় এই রচনায় পাওয়া যাইবে।

সেচিলিস: মাহি উপকূলের এক অংশ।

ভারত মহাসমুদ্রের কয়েকটি দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত চমৎকার। কিন্তু সাধারণ জাহাজের চলাচলের পথ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া অনেকেই সেগুলি সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না। যে দু' একখানা ইংরাজি ভ্রমণ-সংক্রান্ত পত্রিকাতে মাঝে মাঝে ইহাদের কথা পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যাও বেশী নয়। সম্প্রতি 'ব্লু পিটার' পত্রিকায় মিঃ ডেনিস পামার এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:—

সমুদ্রের ঢেউ প্রস্তরময় বেলাভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।

সমুদ্রের জল হইতেই বিশাল গ্রানাইটের পর্ব্বত আকাশ-পানে ঠেলিয়া উঠিয়া রাত্রির অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে। সমুদ্র-তীরের কঠিন পাষাণ ভেদ করিয়া একটি মাত্র নারিকেল গাছ কি করিয়া বর্দ্ধিত হইল, কোথা হইতে রস সংগ্রহ করিল, তাহার ইতিহাস সে-ই জানে।

এই সব দ্বীপে প্রাচীন জাতির প্রেতাত্মারা বাস করে না। কোন প্রাচীন দিনের সভ্যতার অস্তিত্ব খুঁজিয়া এখানে পাওয়া যাইবে না। ইহাদের ইতিহাস বড় জোর সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। সে ইতিহাসের নায়ক-নায়িকা রাজা-রাণী বা রাজপুত্র নহেন, তাহারা প্রায়ই সামুদ্রিক দস্যু; এখানে তাহাদের একটা বড় ঘাঁটি ছিল এবং তাহারা লুঠতরাজ, গালাগালি, জুয়াখেলা, হত্যা, মদ্যপান প্রভৃতিতে সর্ব্বদা মত্ত থাকিত।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, এই সকল দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস দুর্দ্ধর্ষ বোম্বেটেদের ইতিহাস মাত্র। জগতে চির-

কাল কিছুই স্থায়ী নয়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসীরা আসিয়া বোম্বেটেদের ধ্বংস করিল। পরে তাহারাও চলিয়া গেল, আসিল ইংরাজ। ইংরাজদের সঙ্গে নিগ্রো ক্রীতদাস আমদানি হইল, পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইল। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, স্থানীয় ক্রিয়োল অধিবাসীরা খুব সুখেই আছে। ভারত-সমুদ্রের ঢেউ ও ঝড় দ্বীপের প্রাচীন অপ্রীতিকর স্মৃতি বেমালুম ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। এখন আছে কেবল সমুদ্রজলের ও পচা নারিকেল-খোলার গন্ধ।

পর্ব্বতের মাথায় নারিকেল গাছের মধ্যে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, দৈত্যের হাতের লণ্ঠনের আলোর মত। নীচে পুকুরের জলের মত স্থির সমুদ্র জ্যোৎস্নায় চিক্ চিক্ করিতেছে। বন্দরের সম্মুখে প্রবালময় তটভূমি যেন হিংস্র দন্তপাটি বিকশিত করিয়া আছে, দন্তপংক্তির ফাঁকে ফাঁকে ফেণ-চিহ্ন।

পাহাড়ে একটি অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানে আমি শুইয়া সমুদ্র দেখিতেছিলাম, প্রবালময় তটভূমিতে জ্যোৎস্নার খেলা দেখিতেছিলাম, পোতাশ্রয়ের বাহিরের সমুদ্রে কয়েকটি ক্রিয়োল জেলে-ডিঙ্গির মাছ ধরা দেখিতেছিলাম।

মাহি বন্দরে আজ আমার শেষ-রজনী। তাই অনেক পুরাতন দিনের কথা শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিলাম। প্রথম যেদিন আসিলাম, সেদিনের কথা বেশ মনে পড়ে। ইউরোপ হইতে ডাক-ষ্টীমারের নিম্নতম শ্রেণীতে মহাকষ্ট ভোগ করিয়া আসিতে আসিতে দূর হইতে মাহি বন্দরের নারিকেল শ্রেণী ও নীল পর্ব্বতমালা চোখে পড়িতেই পথের কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। ডেকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—প্রদোষের অস্পষ্ট অন্ধকারে ত্রিভুজাকৃতি সিলুয়েটে আঁকা ছবির মতই সিলুয়েট দ্বীপটি কি সুন্দর ও রহস্যময় দেখিতে!

মাহি: নারিকেলকুঞ্জের ছায়ায় ক্রিয়োল-কুটীর।

তারপর কতকবার আমি সিলুয়েট দ্বীপের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি, সব সময়েই তাহাকে সুন্দর ও রহস্যময় বলিয়া মনে হইয়াছে। কখনও দ্বীপের সীমারেখা অস্পষ্ট ও ছায়াময়, কখনও তাহার প্রান্তভাগ দিগন্তরেখার সহিত এক হইয়া গিয়াছে, কখনও সূর্য্যালোকে তাহাকে এত স্পষ্ট দেখিয়াছি যে, তীরবর্ত্তী নারিকেল-বনানীর প্রতিটি শাখা যেন গণনা করিতে পারি।

আমাদের ষ্টীমার প্রবালশৈলের ভয়ে দ্বীপ হইতে বহু দূরে মুক্ত সমুদ্রের বক্ষ দিয়া চলিতেছিল, কিন্তু তবুও আমরা লক্ষ্য করিতেছিলাম, শুভ্র বালুময় বেলা ও প্রান্তবর্ত্তী শ্যামল নারিকেল-কুঞ্জ। সিলুয়েট দ্বীপে নামিয়াই বাস-স্থানের সন্ধান করিলাম।

একটি ক্রিয়োল ভদ্রলোকের বাংলো ভাড়া পাওয়া গেল। স্ত্রী ও দুটি মেয়ে লইয়া পাশেই নিজেদের বাড়ীতে তিনি থাকেন। মেয়ে দুটি দেখিতে বেশ সুন্দরী। তাঁহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী বড় অদ্ভুত; তাঁহারা ঠিক সামোয়া দ্বীপের অর্দ্ধ-সভ্য, অর্দ্ধ-বন্য জাতির মত বাস করেন।

মেয়ে দুটির বয়স হইয়াছে। কিন্তু তাহারা এত স্বাধীন, এত মুক্ত যে, প্রশান্ত সাগরের দ্বীপে মেয়েকে নায়িকা

করিয়া যে-সব ফিল্ম তোলা হয়, তাহার মধ্যেও নায়িকাকে এত মুক্ত ও স্বাধীন দেখা যায় কি না সন্দেহ। তাহারা জ্যোৎস্নালোকে হয় তো প্রবাল-বাঁধ ছাড়াইয়া দূরের দ্বীপে নৌকা করিয়া বেড়াইতে যাইতেছে, নয় তো বালুতটে চুপ-চাপ বসিয়া গান গাহিতেছে, কিংবা মাছ ধরিতেছে, নয় তো পাহাড়ের উপর চড়িয়া বসিয়া আছে। তাহারা কোথায় কখন থাকিবে, কেহ বলিতে পারে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহারা বা তাহাদের বাপ-মা পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে বড় একটা যায় না। বোধ হয়, সহরের আকর্ষণ প্রকৃতির লীলাভূমি সিলুয়েট দ্বীপ হইতে তাহাদের লইয়া যাইতে পারে না। এই বন্য জীবনই তাহারা ভালবাসে, দেখিলাম ইহাতেই তাহারা সুখী।

পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে যেদিন প্রথম যাই, সে দিনের কথাও স্পষ্ট মনে আছে।

এখানকার এই সব দ্বীপের রাজধানী পোর্ট ভিক্টোরিয়া।

এক হাজার মাইলের মধ্যে ইহাই একমাত্র সহর ও আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র। এখানকার অধিবাসীরা ভাবে পোর্ট ভিক্টোরিয়ার মত সহর পৃথিবীতে বোধ হয় বেশী নাই। এখানে সিনেমা আছে, নাচঘর আছে, ব্যাঙ্ক আছে, হোটেল আছে, হরেক রকম জিনিসে সাজানো মনিহারী দোকান পর্য্যন্ত আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নয়।

মাহি: ক্রিয়োল-পরিবার; ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ ক্রীতদাস ছিল।

পোর্ট ভিক্টোরিয়া কিন্তু উগ্র ধরণের সহর নয়। এত আধুনিক জিনিসের সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও পোর্ট ভিক্টোরিয়া তাহার বন্য প্রকৃতিকে ঢাকিতে পারে নাই। সহরের যে কোন বড় রাস্তা গিয়া উচ্চ গ্রানাইট পর্ব্বতের পাদদেশে পৌঁছিয়াছে। ব্যাঙ্কের পিছনে, সিনেমা-হলের পিছনে, পর্ব্বত নীল আকাশে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ঘন হরিৎ বর্ণ তাদের বনানী-সমাকীর্ণ সানুদেশ।

পাহাড়ের ঢালুতে, সমতল ভূমিতে, সহরের রাস্তার সাথে ছোট পার্কে বড় বড় রুটীফলের গাছ, নারিকেল গাছ, কলা গাছ! নানা ধরণের অপরিচিত সুগন্ধ বাতাস। সহরের দোকানগুলির মালিক প্রায়ই চীনা, নয় ভারতীয়।

মঁসিও মিকেল যাহাকে হোটেল নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, আমি পোর্ট ভিক্টোরিয়ার রাস্তা বাহিয়া সেই কাঠের জীর্ণ বাড়ীটির অভিমুখে যাইতেছিলাম। আমার চারিধারে যেন রূপকথার দৃশ্য। সাদা ড্রিলের পোষাক পরিয়া হৃষ্টপুষ্ট ফরাসী পোদ্দার চলিয়াছে, ক্রিয়োল মেয়েরা পরস্পর হাতে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে ও সুবাসিত সিগারেটের ধূমপান করিতে করিতে চলিয়াছে।

অনেকে রাস্তার ধারে দোকানে বসিয়া 'বাকা' পান করিতেছে। 'বাকা' একপ্রকার সুরা, আখের রস হইতে

প্রস্তুত হয়। 'বাকা' পান করিয়া অনেকে মাতলামি জুড়িয়া দিয়াছে, কেহ বা হল্লা শুরু করিয়াছে, সম্ভবতঃ এখানে পুলিশের উৎপাত নাই।

ইহাদের মধ্যে অনেক ক্রিয়োল মেয়েও আছে, তাহারা নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে কথা বলিতেছে বা গান করিতেছে বা হাসিতেছে। শ্লীলতা ও শোভনতার সীমা অতিক্রম করিতে ক্রিয়োল মেয়েদের কচিৎ দেখিয়াছি।

তবে এ কথা স্বীকার করি যে, এই মেয়েদের মধ্যে বিলাসিতার প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী। প্রায় সকলকেই দেখিয়াছি অবস্থার অতিরিক্ত সাজপোষাক করে, দামী ফরাসী গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করে। পয়সা ইহারা রাখিতে জানে না, যে-কোন প্রকারে উড়াইয়া দিতে পারিলেই যেন বাঁচে।

আমার সাদা চুণকাম-করা হোটেলের ঘরে মসিঁও মিকেলের সঙ্গে বসিয়া আমি নৈশভোজন সমাপ্ত করিলাম। ভোজনের প্রধান উপকরণ নানারকম সামুদ্রিক মাছ, দিশী ধরণে রান্না করা। ধরণটা ইটালী ও ফরাসী ধরণের মাঝামাঝি। নমুনা হিসাবে কিছু 'বাকা' পান করিয়াও দেখিলাম। আমার সম্মুখের মুক্ত বাতায়নপথে আমি দূরের ক্যাথলিক গির্জ্জা ও তাহার দেওয়ালের গায়ের বোগেনভিলিয়া গাছের দিকে চাহিয়া ছিলাম।

মসিঁও মিকেল বলিতেছেন, দেখুন মিঃ পামার, এসব দ্বীপে খুব বেশী লোক আসে না। কিন্তু যারা আসে, তারা থেকেই যায়। এ জায়গার একটা মোহিনী শক্তি আছে। আপনি যদি চিরকাল পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে থাকতে না চান, তবে খুব বেশীদিন এখানে থাকবেন না।

আমি বলিলাম আপনি কতদিন এখানে আছেন ?

দেখিলাম, আমার সঙ্গী একটু অতিরিক্ত বকিতে ভালবাসেন। আমার কথার বিশেষ কোন উত্তর না দিয়া তিনি নিজের মনেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আমি নানা যায়গায় বেড়িয়েছি মশায়। কত বড় বড় সহরে গিয়েছি, বম্বে, মোম্বাসা। তবে ইউরোপ কখনও যাইনি,

সেচিলিস: নারিকেলের শুক্‌না পাতার বাড়ী।

যাবার ইচ্ছা আছে বটে। আমার এক বাল্যবন্ধু লণ্ডনে থাকেন। তিনি সাইকেল বিক্রী করেন, লোক ভারী ভাল। নামটা ভুলে গেলাম। তবে একদিন না একদিন তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হবেই। আমার সে বন্ধুকে সবাই জানে।

মসিঁও মিকেল বলিয়াই চলিলেন। দ্বীপ সম্বন্ধে নানা কথা, তাঁহার স্ত্রীর দুর্ব্যবহার, প্রাসলিনের বিখ্যাত জোড়া নারিকেল, সমুদ্রে ঝড়ের গল্প ইত্যাদি। প্রথম আমলের ফরাসী ঔপনিবেশিকরা এখানে বড় বড় নারিকেল বাগান তৈরী করিয়াছিলেন, এখন সেই সব বাগান নানা টুক্‌রায় ভাগ হইয়া যাইতেছে। কারণ এখানে নেপোলিয়নের আমলের উত্তরাধিকার-আইন প্রচলিত। উক্ত আইন অনুসারে পরিবারের প্রত্যেকেই সম্পত্তির অংশ পায়। এই সব কথাও মসিঁও মিকেলের মুখে শুনিলাম।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুম হইল না। সারারাত্রি ধরিয়া সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জ্জন শুনিলাম, বড় বড় ঢেউ প্রবালময় তটভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, তাহারই শব্দ। তীরের নারিকেল বৃক্ষের শাখাপ্রশাখার মধ্যে নৈশবায়ুর

চলাচলের শব্দ। যে রাস্তার ধারে আমার হোটেল, সেই রাস্তারই শেষে সমুদ্রবেলা। সমুদ্রের তীরে নারিকেল গাছের বন, সহরের রাস্তার ধারেও। এ যেন ষ্টীভেনসনের লেখা উপন্যাসের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে হাওয়ার অভাব নাই।

পুর্ব্ব বানিজ্য বায়ু কোন সময়েই এ দ্বীপকে পরিত্যাগ করে না। ইহা বাহিরের নারিকেল শাখাকে দোলা দিয়া ক্ষান্ত নহে, পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে গিয়া বাধিতেছে। আমি যে বাড়ীতে রাত্রিতে শুইয়া আছি, মনে হইতেছে বাড়ীটি যেন উড়াইয়া লইয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিবে। দরজা-জানালা খুলিয়া রাখিবার উপায় নাই। ঘরের মধ্যে দেওয়ালের গায়ের জামা-কাপড় উড়াইয়া লইয়া যাইবে।

বাহিরে নানাপ্রকার নৈশ শব্দ। সমুদ্রকূলে তাল রাখিয়া অনন্তের সঙ্গীত গাহিতেছে। উড়ন্ত কীটপতঙ্গের গুঞ্জনধ্বনি, পাখীর কাকলী, বন্দরের স্থির জলের ওপারের গ্রানাইটের তটভূমিতে সমুদ্রজলের এক প্রকার চাপা আর্ত্তনাদের মত শব্দ।

মাহি :- 'পিরোগ'-এ (জেলে-ডিঙ্গিবিশেষ) করিয়া জেলেরা মাছ ধরিয়া ফিরিতেছে।

বোধ হয় ঘুমাইয়াছিলাম, কারণ হঠাৎ শিঙাধ্বনিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়িতে বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। নিশীথ রাত্রে এরূপ বিকট শিঙাধ্বনির অর্থ কি? কোথাও ডাকাত পড়িল, না প্রাচীনকালের বোম্বেটের দল রাত্রির অন্ধকারে এরূপ ভৌতিক শিঙা বাজায়?

শুনিলাম তা নয়। ক্রিয়োল জেলে ডিঙির দল বন্দরের বাহিরের সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া ফিরিয়া আসিলে এ ধরণের শিঙাধ্বনি করে। ইহা এখানকার একটি প্রাচীন প্রথা। জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলাম, জেলেডিঙির গলুইএ একজন লোক নীল ইজের পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোমরের উপর হইতে তাহার শরীর অনাবৃত। জ্যোৎস্নার আলো তাহার কফি রংয়ের সুগঠিত দেহে পড়ায় তাহাকে সমুদ্রের দেবতার মত দেখাইতেছে।

এ দেশের নৌকার নাম 'পিরোগ'। অনেকটা ভেনিসের গণ্ডোলার মত দেখিতে। অগভীর সমুদ্রে সেগুলি নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে যাইতে মজবুত। খুব লম্বা একটা মাস্তুলে বড় পাল লাগানো থাকে। মাছ-ধরা ও জিনিষপত্র বহনের কাজে এখানে পিরোগ জাতীয় নৌকার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। অন্য ধরণের নৌকা যে নাই, তাহা নয়। অনেক ধনী ইউরোপীয় ব্যবসাদার বা নারিকেল বাগানের মালিক 'ইয়াট' বা বার্ক' জাতীয় জলযান আমদানী করিয়াছেন। অনেক মোটর-বোটও আছে।

শিঙাধ্বনিতে সেই যে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল, আর ঘুম আসিল না।

উঠিয়া বাহিরে বারান্দায় গিয়া বসিলাম।

রাত্রির জ্যোৎস্না মিলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র হইতে ঘন কুয়াশা আসিয়া উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে পোর্ট

ভিক্টোরিয়ায় হোটেল-বাড়ী, কফিখানা, মনিহারী দোকান, নারিকেল বন সব ধীরে ধীরে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। আকাশে দু' দশটা তারা, তাহাও দেখা যায় কি যায় না।

আমার মনে হইল এত চমৎকার দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই। স্বপ্নাভিভূতের মত সমুদ্রবেলায় শিলাখণ্ডে গিয়া বসিয়া বালুর উপর কাঁকড়াদের খেলা দেখিতে লাগিলাম। অসংখ্য লাল কাঁকড়া, প্রথমে মনে হইবে, যেন চেপ্টা লাল রঙের কি ফল বুঝি সমুদ্রতীর বিছাইয়া পড়িয়া আছে, মানুষের পায়ের শব্দ পাইলেই তাহারা গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে, এজন্য খুব সন্তর্পণে পা ফেলিয়া উহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে হয়।

আমি সেখানে অনেকক্ষণ থাকার পরে কয়েকটি ক্রিয়োল স্ত্রীলোক সমুদ্রজলে নামিয়া মাছ ধরিতে লাগিল। গলাজলে নামিয়া সারবন্দী দাঁড়াইয়া ইহারা ছিপের সাহায্যে মাছ ধরে। আধ ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলি মাছ পাইল। প্রত্যেকেরই পিঠে একটা ছোট ঝুড়ি বাঁধা ছিল। ঝুড়িটা পূর্ণ হইতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগিল। রোজই না কি তাহারা এভাবে মাছ ধরে।

ক্রিয়োল জেলেরা সহর হইতে দূরে পাহাড়ের নীচে ছোট ছোট কুটীরে বাস করে। তাহারা খুবই গরীব, তাহাদের ঘরে আসবাবপত্র অতীব বিরল, মাত্র একটি করিয়া টেবিল ও একখানা করিয়া শুইবার খাট। কিন্তু তাহারা অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ধার্ম্মিক, দয়ালু ও খুব সরল। তাহারা ভাঙ্গা ফরাসীতে কথা বলে এবং শনিবার রাত্রে প্রায় সকলেই কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় 'বাকা' পান করিয়া থাকে।

প্রাসলিন: জোড়া নারিকেল (coco de mer)

পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে চীনাদের যে বড় দোকান আছে, সেখানে 'বাকা' বিক্রয় হয়, এক বোতলের দাম দুই সেণ্ট মাত্র। 'বাকা' অত্যন্ত ঝাঁঝালো জিনিস, গলা দিয়া যতদূর নামে, মনে হয় যেন পুড়িয়া গেল এবং তখনি গান করিবার ইচ্ছা হঠাৎ জাগিয়া উঠে। শনিবার রাত্রে সহরের সকলেই 'বাকা' পান করিয়া আমোদ করে।

কিছুদিন এখানে থাকিবার পরে আমি সহর হইতে দূরে নির্জ্জনে একটা বাংলো খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু কেহই সঠিক সন্ধান দিতে পারিল না। একদিন জন্‌সন্ নামে জনৈক স্থানীয় ইংরাজ অধিবাসীর সহিত আলাপ হইল। তাহাকে বাংলোর কথা জিজ্ঞাসা করিতে খুব সুন্দর ও সস্তা একটা বাংলোর সন্ধান পাইলাম।

জন্‌সন্ চমৎকার লোক। একদিন রাস্তায় হঠাৎ আমার কাঁধ ধরিয়া বলিল, তোমার নাম সেদিন ক্লাবে শুনলাম বটে। এখানে বেড়াতে এসেছ! বেশ বেশ থাক। চমৎকার জায়গা। মাছ ধরার সখ আছে? তা হ'লে একদিন এস না আমার বাড়ীতে। দুজনে মাছ ধরা যাবে। এই ভাবেই জন্‌সনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

একদিন আমি আমার নূতন বাংলোয় বসিয়া আছি, জন্‌সন্ তাহার নৌকা আনিয়া হাজির। এখনই মাছ

ধরিতে যাইতে হইবে। আমি প্রস্তাব করিলাম সঙ্গে সঙ্গে প্রাস্লিন দ্বীপের জোড়া নারিকেল যে গাছে ফলে, সে গাছও দেখিয়া আসিতে হইবে।

আমরা নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। সিলুয়েট দ্বীপ ও মাহি পাশাপাশি অবস্থিত—ইহাদের তীরভূমির দৃশ্য ধীরে ধীরে আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত হইল। চারিধারেই গ্রানাইটের পাহাড়, পাহাড়ের সানুদেশ সবুজ নারিকেল বনে আবৃত, মাঝে মাঝে সমুদ্রের সরু খাড়ি দ্বীপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপরে পাহাড় ঝুঁকিয়া আছে, পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যে সেখানে চক্চকে সাদা বালুময় বেলাভূমি। পাহাড়ের উপরে নারিকেল বন।

প্রবাল-বাঁধের বাহিরের সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল। বিশাল ঢেউ আসিয়া সজোরে প্রবাল-শৈলে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভিতরের সমুদ্র কিন্তু নদীজলের মত শান্ত, স্থির।

নিকটেই একটা ছোট দ্বীপে জন্সন্ একখানা চমৎকার বাংলোতে বাস করে। একটা অনুচ্চ পাহাড়ের উপর বাংলোতে বাস করে! একটা অনুচ্চ পাহাড়ের উপর বাংলোটা তৈরী, সামনে ধূ ধূ করিতেছে সুবিস্তীর্ণ ভারত-মহাসাগর, একপাশে ঘন নারিকেল বন। একজন ক্রিয়োল ভৃত্য ছাড়া জন্সনের বাংলোতে আর কেউ থাকে না। সে এই নির্জ্জন জীবনই ভালবাসে দেখিলাম। রাত্রে বাংলোর বারান্দাতে বসিয়া জন্সন্ আমাকে নিজের ইতিহাস বলিয়া গেল।

হতাস প্রেমের কাহিনী। আর সে সভ্য জগতে ফিরিতে চায় না। এখানে বেশ আছে। এই জীবনই ভাল। এরূপ গল্প সারাজীবন অনেকের মুখে শুনিয়াছি। তবু প্রাসলিন দ্বীপের গ্রানাইট পাহাড়ের মাথার উপর উদিত চন্দ্র, সম্মুখের জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রজল ও নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া শুনিতে শুনিতে এ সব কাহিনী চিরনূতন ও চিররহস্যময় বলিয়া বোধ হইল।

হাইতুরু দ্বীপ

(পক্ষী-দ্বীপ)

নিউজীল্যাণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী অক্ল্যাণ্ড সহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে হাউরাকি উপসাগরে লিট্‌ল ব্যারিয়ার নামে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই দ্বীপটি এমন পর্ব্বতসঙ্কুল যে, সমুদ্র খুব শান্ত না থাকলে এ দ্বীপের ত্রিসীমানায় ঘেঁসা যায় না।

মাওরী ভাষায় এ দ্বীপকে বলে হাইতুরু। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাদের মধ্যে একটা গল্প প্রচলিত আছে। অনেক কাল আগে একটা বড় মাওরী নৌকা এখানে ঝড়ে ডুবে পাষাণ হয়ে যায়। নৌকার নাম ছিল হাইতুরু, তাই থেকে দ্বীপটির নামকরণ হয়েছে। দূরে সমুদ্র থেকে দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তের পাহাড় দেখতে অনেকটা নৌকার গলুইএর মত—মাওরীদের বিশ্বাস এই পাহাড় যে স্পর্শ করবে, সাত দিনের মধ্যে সে মারা যাবে।

লিট্‌ল ব্যারিয়ার : দ্বীপের একপ্রান্ত।

হাইতুরু দ্বীপের সৌন্দর্য্য এক কথায় বর্ণনা করা যায় না। প্রকৃতি একে সকল সৌন্দর্য্যসম্পদে ভূষিত করেছে—নীল সাগর, ঘন অরণ্যানী, প্রবালমণ্ডিত অন্তরীপ, নির্জ্জনতা এসব তো আছেই—কিন্তু একে আরও সুন্দর করেছে এর বিচিত্রবর্ণের পক্ষিকুল। এত পাখীও আছে এর নির্জ্জন বনের ডালপালায়! বনফল প্রচুর পাওয়া যায় এবং মানুষের সমাগম নেই বলেই বোধ হয় দেশ দেশান্তর থেকে পাখীর দল এখানে এসে বাসা বেঁধেছে।

হাইতুরু দ্বীপে আসতে হলে নিউজিল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। প্রায় ত্রিশ বছর আগে এখানকার মাওরী ভূস্বামীদের কাছ থেকে গবর্ণমেণ্ট হাইতুরু দ্বীপ কিনে নেন, এখানে বন্যপক্ষীদের আশ্রয়স্থান করবার জন্যে। কেউ এখানে পাখী মারতে পারে না। বন্দুক নিয়ে নামবার জো নেই হাইতুরু দ্বীপে—পক্ষিখাদ্যের চাষ করা হয় গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে, এবং মাত্র তিনটি লোক এ দ্বীপের স্থায়ী অধিবাসী, একজন পাখীদের তদারককারী কর্ম্মচারী, তার স্ত্রী ও মেয়ে।

হাইতুরু দ্বীপের অধিবাসী।

এ রকম শান্ত, নিরাপদ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বিহঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মানুষকে তারা চায় না, এখানে তারাই মালিক, তাদেরই এখানে স্বরাজ। বনের পাখী যারা ভালবাসে, এমন কেউ কেউ মাঝে মাঝে এখানে বেড়াতে আসে বটে, এমন কি সুদূর ইউরোপ থেকেও অনেকে আসে—কিন্তু তাদের সংখ্যা স্বভাবতঃ খুব কম। মোটের ওপর পাখীরাই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা, গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত তদারককারী কর্ম্মচারী পাখীদের ভৃত্য মাত্র।

আগে এখানে নাগাতি ওয়াই জাতি বাস করত। মাওরীদের একটা শাখা তারা। সমগ্র নিউজীল্যাণ্ডে যখন ইংরেজদের অধিকার বিস্তৃত হয়েছে—তারও অনেক দিন পর পর্য্যন্ত মাওরী সর্দ্দার টেনেটাহি ও তার স্ত্রী রাহুই এ দ্বীপে

ছিল। অকল্যাণ্ড যখন ক্রমশঃ সহর হয়ে উঠছে, তখন তারা বুঝতে পারলে হাইতুরু দ্বীপের জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সহরে চালান দিলে বেশ দু'পয়সা হয়। এই ব্যবসার সূত্রে বহির্জগতের সঙ্গে এ দ্বীপের প্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হল।

নিউজীল্যাণ্ডের বনভূমিতে কাউরি বলে এক জাতীয় গাছ আছে—এর আঠা ও কাঠ অত্যন্ত মূল্যবান। কাউরি ছোট গাছ নয়—বিরাট বনস্পতি, কালিফোর্ণিয়ার রেড্উড গাছের সমান বিশালকায়। হাইতুরু দ্বীপের বনে অজস্র মূল্যবান প্রাচীন কাউরি গাছ ছিল—অকল্যাণ্ড সহর থেকে দুচারজন 'পাকেহা' (বর্ণসঙ্কর) মাওরী এসে এই গাছের বন জমা নিয়ে আঠা চালান দিতে লাগল—ক্রমে তারা বড় বড় কাউরি গাছ কেটে বন ধ্বংস করে ফেলবার যোগাড় করলে। সেই সময় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হল এবং নামমাত্র মূল্যে দ্বীপটি রাহুই গবর্ণমেণ্টের কাছে বেচলে।

ছোট একটা মাওরী গ্রাম ছিল এখানে, তার অধিবাসীরা ওমাহা দ্বীপে চলে গেল এখানকার বাস উঠিয়ে—গবর্ণমেণ্ট এখানে একজন কর্ম্মচারী পাঠালে পাখীর তদারক করবার জন্যে। নতুন আইন পাশ হল হাইতুরু দ্বীপের পাখী কেউ মারতে পারবে না। মাওরী অধিবাসীদের অনেক তরমুজের ক্ষেত ছিল এখানে, তারা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পেলে যে তরমুজ পাক্‌বার সময় দ্বীপে এসে ফল সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারবে। এ সব অনেক দিনের কথা। এখন কোন মাওরী আর হাইতুরু দ্বীপে আসে না—তরমুজের ক্ষেত জঙ্গল হয়ে গিয়েছে।

হাইতুরু : জালিবোটে এইখানে নামিতে হয়।

হাউরাকি উপসাগরের প্রবেশপথ থেকে হাইতুরু দ্বীপের পশ্চিম-দক্ষিণ তীরের শৈলশ্রেণী দেখায় ঠিক যেন একটা ভাসমান তিমিমাছ। ক্রমে যত কাছে আসা যায়, তীরভূমি স্পষ্টতর হতে থাকে, পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী বালুকাময় উপকূল নজরে আসে। ওপরে নীল পাহাড়, নীচে চকচকে সাদা বালির তীর, পাহাড়ের ঢালুতে সবুজ বনানী, মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ী ঝর্ণা নেমে এসেছে, বনের গায়ে দেখায় যেন চেরা সিঁথির মত। সবটা মিলে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

দ্বীপে নামবার ও জাহাজ বাঁধবার জায়গা এদিকটাতে একেবারেই নেই। অতি দুরারোহ শৈলমালায় এদিকটা ঘেরা। পাহাড়ের খাড়াই এক এক জায়গায় আটশো ফুটেরও বেশী। উত্তর-পশ্চিম দিকে সামান্য একটু খোলা যায়গা আছে, যেখানে নামা চলে। কিন্তু সমুদ্র শান্ত না থাকলে হাইতুরু দ্বীপের কাছেই ঘেঁসা যায় না। উপকূলের অনেক দূর পর্য্যন্ত বড় বড় পাথরের চাঁইএ ভর্ত্তি, জালি বোট নামিয়ে জাহাজ থেকে আসবার সময় অশান্ত সমুদ্রের বিরাট ঢেউয়ে যদি বোট এই পাথরের চাঁইয়ের ওপর আছাড় খায়, তবে যত শক্ত বোটই হোক না কেন, ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

এ অবস্থায় দ্বীপে নামবার চেষ্টা না করে ষোল মাইল দূরবর্ত্তী ওমাহা দ্বীপের উপকূলে আশ্রয় নেওয়া ভাল। ওমাহা দ্বীপে ডাকঘর আছে, ডাকবাহী পিয়ন পনেরো দিন অন্তর একবার হাইতুরু দ্বীপে গিয়ে ওখানকার কর্ম্মচারীর চিঠিপত্র ও খাবার জিনিস দিয়ে আসে। সভ্য জগতের সঙ্গে এইটুকু মাত্র সম্পর্ক হাইতুরু দ্বীপের। কোনও রকমে দ্বীপে একবার পৌঁছে গেলে চারিদিক থেকে বন-বিহগের কাকলী কানে আসবে—পাষাণময় তটভূমিতে বড় বড় ঢেউয়ের আছড়ে পড়বার গম্ভীর ধ্বনিও তার কাছে ক্ষীণ বলে মনে হবে। যত ভাঙ্গনের কাছে যাওয়া যাবে, পাখীর কলরব তত আরও স্পষ্টতর হবে—শেষে কলরব এত বাড়বে, যে, আর কোন শব্দ শোনা কঠিন হয়ে উঠবে। জানুয়ারী মাসের প্রথমে এই দ্বীপে যাওয়া উচিত। পাখীর সংখ্যা ওই সময়ে খুব বেশী থাকে প্রতি বৎসরই।

এ সময় এক রকম ফুল দ্বীপের জঙ্গলে সর্ব্বত্র ফুটে থাকে—মাওরী ভাষায় তাকে বলে 'পুহুটুকোয়া' অর্থাৎ 'রাঙ্গা নক্ষত্র' ফুল। এই ফুলে খুব মধু। হাজার হাজার মৌটুসকি পাখী ঝোপেঝাপে 'রাঙ্গা নক্ষত্র' ফুলের ওপর বসে মধু খাচ্ছে দেখা যাবে। ঘণ্টা-পাখী, পাদ্রী-পাখী, কাকাতুয়া প্রভৃতি অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের পাখীর দল জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি এই দ্বীপে আসে এবং মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত থাকে। ঘণ্টা-পাখী ছোট ছোট, কিন্তু দেখতে বড় সুন্দর। তারা চামচিকের মত নীচু দিকে মুখ করে গাছের ডালে ঝোলে—এদের গান ঠিক যেন রূপোর ঘণ্টার মত শুনতে দূর থেকে।

হাইতুরু দ্বীপের কোথাও এতটুকু সমতল-ভূমি নেই—এর সবটাই উঁচু উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের ঢালু ঘন জঙ্গলে ভর্ত্তি, মাঝে মাঝে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা আছে বটে, কিন্তু তাতে ফার্ণগাছ ও বন্য ক্লিম্যাটিস্ ফুলের জঙ্গল। কোন কোন উপত্যকা বেয়ে পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর ধারা সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। পাহাড়ের ওপর দিকে বিশালকায় কাউরি গাছের বন, মাওরী কাঠুরেদের তৈরী সরু পথ এঁকেবেঁকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওপরে চলে গিয়েছে—ওই একমাত্র পথ পাহাড়ে উঠবার।

হাইতুরু দ্বীপের পাখীর দল মানুষকে ভয় করে না। যে কেউ যাক না কেন, পাখীরা নির্ভয়ে তার কাছে আসে। প্রত্যেক দর্শকই কিছু না কিছু খাবার জিনিষ নিয়ে যায় পাখীদের খাওয়াবার জন্যে। এই জন্যেই বোধহয় এই সব বন্য বিহঙ্গের লোভ বেড়ে গিয়েছে। মানুষ দেখলেই গাছ থেকে নেমে তারা চারিপাশে ভিড় করে—খাবারের প্রত্যাশায়।

এখানে যিনি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী আছেন, তাঁর স্ত্রী শীতকালে প্রতিদিন সকালে পাখীদের খাওয়ান। সে একটা অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য! ঝাঁকে ঝাঁকে বন্য পাখীর দল কোথা থেকে উড়ে এসে তাঁর কাঁধে, মাথায়, হাতে বসছে, চারিপাশে ভিড় করছে, পরস্পর যেন ঠেলাঠেলি করছে—তাঁর হাত থেকে খাবার কেড়ে খাচ্ছে—নিজের চোখে না দেখলে সে দৃশ্যের অপূর্ব্বতা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। তারা এত নির্ভয় যে একগাছা লাঠি এ সময় আড় করে ধরে থাকলে লাঠিগাছটার ওপর এক ঝাঁক পাখী এসে বসে যায়।

টাঙ্গানিয়াকা ও কঙ্গো

(দক্ষিণ আফ্রিকা)

টাঙ্গানিয়াকা ও কঙ্গো আফ্রিকার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিখ্যাত বলেই হোক বা টাঙ্গানিয়াকার বিরাট সমতলভূমি ও বেলজিয়ান্ কঙ্গোর অরণ্য শিকারীর অত্যন্ত প্রিয়স্থান বলেই হোক—এই দুই দেশের কথা আজকাল অধিকাংশ লোকের অজানা নেই। যা একটু আধটু বাকী ছিল, 'ট্রেডার হর্ণ' বা 'আফ্রিকা স্পিক্‌স্' প্রভৃতি ধরণের ফিল্‌মের কল্যাণে তাও আর বাকী নেই—এখন মাসাইল্যাণ্ড্ এবং সেখানকার গাছপালা, পশুপক্ষী, স্কুলের ছেলেরাও বায়স্কোপে দেখেছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা এখনও অনেকেরই অজ্ঞাত—যাঁরা মনে করেন যে, বৃটিশ-পূর্ব্ব আফ্রিকাই আফ্রিকার মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর জায়গা, তাঁরা প্রকাণ্ড ভুল করেন। আমরা নীচে দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়েকটি স্থানের কথা বলব, কোন কোন দিকে তাদের অবস্থান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কঙ্গো বা ইউগাণ্ডার বিখ্যাত অরণ্য, পাহাড় পর্ব্বতের চেয়েও অধিকতর হৃদয়গ্রাহী।

অভিনব গির্জ্জা।

জর্জ্জ

বিখ্যাত লেখক এ্যান্টনি ট্রোলোপ্ গত শতাব্দীর শেষের দিকে এখানে এসে চারিপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, যে, পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দরতম স্থান এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি। সে হল ১৮৭০ সালের কথা। তারপর অনেক বছর চলে গিয়েছে, কত হাজার হাজার ভ্রমণকারী দেশ বিদেশ থেকে এসে জর্জ্জ দেখে গিয়েছে। জর্জ্জ আর এ্যান্টনি ট্রোলোপের আমলের সে ক্ষুদ্র গ্রাম নেই। সেখানে প্রকাণ্ড সহর গড়ে উঠেছে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে—কিন্তু তার সৌন্দর্য্যসম্পদ এখনও অটুট, মানুষে তার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের এক কণাও হরণ করতে পারে নি, বিকৃত করতে পারে নি।

জর্জ্জ সহর বটে কিন্তু ইটপাথরের মরুভূমি নয়। এর চারিধারে উত্তুঙ্গ শৈলমালা, নিবিড় অরণ্য, পাহাড় ও বনের মাঝে মাঝে ঝর্ণা ও ছোটখাটো পার্ব্বত্য নদী—সহরের যে কোন রাস্তা থেকে এই পর্ব্বতমালা ও বনের দৃশ্য চোখে পড়ে। সহরটিও যেন একটি বড় উপবন, রাস্তার দুধারে প্রাচীন বৃক্ষরাজি, প্রত্যেক বাড়ীর সামনে পিছনে বাগান। সারা সহরটি ঝকৃঝকে তকৃতকে, কোথাও এতটুকু আবর্জ্জনা নেই। এখানকার আবহাওয়া খুব ভাল, বেশী

জর্জ্জ: কাইমাস ঘাট।

গরম বা বেশী ঠাণ্ডা নয়। মোজেল উপসাগরের তীর থেকে যদিও মোটে ত্রিশ মাইল দূরে, তবুও এখানে বৃষ্টিপাত মোজেল উপসাগরের তীরবর্ত্তী অন্যান্য সহরের চেয়ে তিন গুণ বেশী।

জর্জ্জ।

জর্জ্জ সহরে যে কোন রাস্তা শেষ হয়েছে গিয়ে দূরের বনপর্ব্বতের কোলে। সহর পেরিয়েই সব রাস্তারই দুধারে ফার্ণের জঙ্গল। বন্যপুষ্পে সমাচ্ছন্ন ঝোপঝাপ,—বেশী মোটরগাড়ীর ভিড় নেই বলে নিস্তব্ধ। সহর ছাড়িয়ে পায়ে হেঁটে কুড়ি মিনিট গেলেই একেবারে আদিম যুগের অরণ্যের মধ্যে পড়তে হবে—সে বন এত ঘন, পথ একবার হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া দায়।

জর্জ্জ সহর উটেনিকা পর্ব্বতমালার দক্ষিণ দিকের ঢালুর একেবারে নীচেই অবস্থিত। এদিকে গিরিসানুর অরণ্য এত ঘন যে, পাহাড়ের ওপর থেকে সহরটা প্রথম হঠাৎ চোখে পড়ে না, সহরের বাড়ীঘর গাছপালায় একেবারে ঢাকা পড়ে। উটেনিকা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম ক্র্যাডক্ পিক্, সমুদ্র থেকে ৪৫০০ ফিট উঁচু। জর্জ্জ থেকে যদি কেউ রেলে বা মোটরে পর্ব্বতের ওপরকার মন্টেগ্ গিরিবর্ত্ম দিয়ে পাহাড় পেরিয়ে ৪৫ মাইল দূরবর্ত্তী উড্‌শূর্ণ সহরে যায়, তবে ভ্রমণ-পথের সে অপ্রত্যাশিত ও অপরূপ সৌন্দর্য্য চিরজীবন তার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।

জর্জ্জ: অরণ্য-পথ।

মোটরের পথ ও রেলপথ প্রায় পাশাপাশি পাহাড়ে উঠেছে। সুতরাং প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার আনন্দ থেকে কিছু মাত্র বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা নেই রেলযাত্রীর। সহর থেকে ন' মাইল গেলেই গাড়ী একেবারে মন্টেগ্ গিরিবর্ত্মের ওপর উঠে যাবে। এখানে মোটরপথ ও রেলপথ প্রায় মিশেছে, রেলগাড়ীর জানালা থেকে নজর পড়বে, প্রায় দু' হাজার ফুট নীচু দিয়ে সাদা অজগর সাপের মত মোটরের পথটা ঘন ফার্ণ-জঙ্গলের নিবিড়তার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে ক্রমশঃ ওপরে উঠে আসছে—দূরে সুনীল মোজেল উপসাগর এবং সেন্ট্ ব্লেজ্ অন্তরীপের প্রস্তরময় নাসা—এবং মধ্যবর্ত্তী স্থানে পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, মাঝে মাঝে শ্যামল উপত্যকা, নদী, হ্রদ, অরণ্য; পশ্চিমে ক্নিস্‌না নদী তীরবর্ত্তী ছোট ছোট গ্রাম, তৃণভূমি ও কমলালেবুর বাগান।

জর্জ্জ সহরে বেড়াতে এসে অনেক ভ্রমণকারী এখানে জমি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করেছে—ফিরে যেতে তাদের মন সরেনি।

ক্নিস্‌না

এমন একদিন ছিল যখন পুর্ট, নোয়েংজি বা ক্নিস্‌না প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শন করা সাধারণ পথিকের দুঃসাধ্য ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই সব দিকে বন ও পাহাড় অত্যন্ত বেশী—পঞ্চাশ বছর আগেও যাতায়াতের কোন পথ ছিল না বললেই হয়—রক্তপিপাসু আদিম অধিবাসীদের উপদ্রবের ভয়ে বিদেশী লোকে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র না নিয়ে পথ হাঁটতে সাহস করত না।

এখন আর সে দিন নেই। জর্জ্জ সহরে টিকিট করে আরামে রেলগাড়ীতে বসলে দু' ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী এসে ক্লিস্‌নাতে পৌছুবে। উটেনিকা পর্ব্বত পার হয়ে কিছু দূর এসেই ক্লিস্‌না নদী পড়বে—পূর্ব্বে ষ্টীমার ছাড়া নদী পার হওয়ার উপায় ছিল না, আজকাল রেলওয়ে সেতু হয়েছে। উটেনিকা পর্ব্বতের এপাশ থেকে নদী পর্য্যন্ত গোটা পথটারই বাঁ দিকে ছোট বড় অসংখ্য হ্রদের মালা, চারিধারে বন, মাঝে মাঝে বনের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। ক্লিস্‌না সহর জর্জ্জের মত বড় নয়, আরও ছোট, আরও নিস্তব্ধ। সহরের একপাশে একটা বড় হ্রদ। এককালে এখানে সমুদ্র ছিল—এখন সমুদ্র দূরে সরে গিয়ে এই বড় হ্রদটার সৃষ্টি করেছে, অর্থাৎ সমুদ্রের গভীরতম অংশের জল এখনও শুকিয়ে যায় নি—কিন্তু চারি পাশে পলি পড়ে উঁচু ডাঙ্গায় পরিণত হয়েছে। এই হ্রদের জল শান্ত অথচ নীল—এর একদিকে মাত্র অনুচ্চ পাহাড়, অন্য তিন দিকে ঘনসবুজ বনানী। ভারত মহাসাগরের সঙ্গে হ্রদের ব্যবধান মাত্র চার মাইল।

ক্লিস্‌না: প্রবেশ-পথ।

ক্লিস্‌না থেকে ২২ মাইল অত্যন্ত ঘন অরণ্য। এই অরণ্যের মাঝে মাঝে পাহাড় ও অসংখ্য গুহা আছে। এখানকার একটা গুহার মধ্যে বহু প্রাচীন যুগের মানুষের করোটী পাওয়া গিয়েছে—নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মতে উক্ত করোটী অন্ততঃ তিন লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের। এখানে বনের সৌন্দর্য্য এমন যে, স্থানীয় লোক এ অঞ্চলের নাম দিয়েছে Garden of Eden, নন্দন-কানন। রোডেসিয়ার গবর্ণমেণ্ট এই বন পাহারা দেবার জন্যে কর্ম্মচারী রেখে দিয়েছে—তাদের অনুমতি না নিয়ে এখানে শিকার করবার উপায় নেই। এক সময়ে বনে অসংখ্য বন্যহস্তী থাকত—এমন সব সুপ্রাচীন ফার্ণগাছ এখনও আছে, যার ডালপালা ভেঙে হাতীর দল একদিন খেয়েছে। বহুকালের ওক্ আছে, নানা ধরণের পুষ্পিত বন্যলতা আছে, গবর্ণমেণ্টের বন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা সে সব গাছের একটা ডালও কাউকে কাটতে দেয় না।

ক্লিস্‌না: নন্দন-কানন।

কাঙ্গো গিরিগুহা

উডশ্‌র্ণ সহর থেকে দু'ধারে বনে ঘেরা পথ দূরের সোয়ার্ত্তবার্গ পর্ব্বতমালা উল্লঙ্ঘন করে রোডেসিয়ায় চলে গিয়েছে। রেলপথ এখানে অন্যদিক দিয়ে ঘুরে গেল বলে সোয়ার্ত্তবার্গ পর্ব্বতের—বিশেষ করে কাঙ্গো গিরিগুহার সৌন্দর্য্য দেখবার জন্যে লোক এই পথে মোটরে যাতায়াত করে।

কাঙ্গো গিরিগুহা অতি অদ্ভুত জিনিষ। এখানে তিনটি গুহা আছে পর পর—একটার মধ্য দিয়ে আর একটাতে যাওয়া যায়। কোন গুহার মধ্যে মনে হবে যেন প্রকাণ্ড একটা রাজপ্রাসাদ, বড় বড় থাম, সিংহাসন সাজানো রয়েছে। কোন গুহাতে অদ্ভুতদর্শন অনাবৃত স্তররাজি, কোনটা সবুজ, কোনটা বেগুণী রঙের। সবই প্রকৃতির হাতে গড়া স্থাপত্য। গুহার ছাদ দিয়ে জল চুঁয়ে পড়ে' যে ক্যাল্‌সিয়াম কার্বোনেট সঞ্চিত হয়েছে, বহুযুগ ধরে' তারই ফলে এই সকল অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে গুহার মধ্যে। এই জায়গাটাতে বন এত ঘন যে বাইরে থেকে এ গুহার অস্তিত্ব একেবারেই জানবার উপায় নেই—গুহার মুখ বুনো লতাপাতায় চাপা থাকে। গুহার অবস্থান-স্থানটি যে ঠিক না জানে, সে এক ঘণ্টা ঘুরলেও গুহার মুখ খুঁজে পাবে না।

কাঙ্গো গুহা : ভ্যানজিলের হল।

১৭৮০ সালে ভ্যান জিল নামে একজন বুয়ার-শিকারী হাতী শিকারের জন্যে এই ঘন জঙ্গলে ঢুকে ঘুরতে ঘুরতে গুহার মুখে এসে পড়ে। কৌতূহলবশতঃ গুহায় ঢুকে সে অনেক দূর চলে যায় এবং গুহার ভিতরকার অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী দেখে আশ্চর্য্য হয়ে দেশে ফিরে সকলকে গল্প করে। সেই থেকে কাঙ্গো গুহার নাম সভ্যজগতে সুপরিচিত হয়।

গুহার মধ্যে ভাল আলোর ব্যবস্থা এতদিন ছিল না। এত অন্ধকার যে পথ হারাবার আশঙ্কা পদে পদে—মধ্যে এত ঘর বাড়ী, বারান্দা, সিঁড়ি, যে খুব বড় রাজপ্রাসাদে তার অর্দ্ধেকও নেই। একবার গোলকধাঁধার মধ্যে অন্ধকারে পথ হারালে প্রাণ নিয়ে দিনের আলোয় প্রত্যাবর্ত্তন করা দুরূহ ছিল। সকলের চেয়ে বড় হল প্রথমে পড়ে—এর নাম ভ্যানজিলের হল, তারপর বোথার হল, স্নানাগার, (এখানে গুহাতলে সব সময় নির্ম্মল জল পাওয়া যায়), রাজার কক্ষ, বাসরকক্ষ, নীল কক্ষ, রাজা সলোমানের খনি—ইত্যাদি নানা ঘর, বারান্দা আছে। আজকাল গুহার মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হয়েছে—পথিকদল নির্ভয়ে গুহার সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারে। কাঙ্গো গুহাতে আদিম যুগের মানুষেরা বাস করত, বহু সহস্র বছর আগে—গুহার গায়ে তাদের আঁকা জন্তু-জানোয়ারের ছবি এখনও স্থানে স্থানে অস্পষ্ট চোখে পড়ে।

যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরি

রবার্ট মুর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভক্ত, নিজে একজন ভাল আর্টিষ্ট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সন্ধানে তিনি পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণ করেছেন। তাঁর জাভা-ভ্রমনের কাহিনী হতে কিছু উদ্ধৃত হ'ল।

আমি সম্প্রতি ক্যামেরাতে রঙীন দৃশ্যের ফটো নিয়ে বেড়াই। সানফ্রান্সিসকোর সমুদ্রতটে, বিখ্যাত জ্যাসপার ন্যাশনাল পার্কে, অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গলের নানাস্থান বেড়িয়ে অনেক ফটো নিয়েছি। কিন্তু জাভায় এসে আমার মনে হ'ল এখানে যে বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখছি, পৃথিবীর অন্য কোথাও এর তুলনা নেই। যতদুর চোখ যায়, সবুজ আখের ক্ষেত, নয়তো পাহাড়ের উপত্যকার এবং আগ্নেয় পর্ব্বতগুলির সানুদেশে থাকে-থাকে ধানের ক্ষেত। ঢেউ-খেলান ধান-ক্ষেতের পাড় রচনা করেছে মাইলের পর মাইলব্যাপী সিন্‌কোনা বাগান। ডাচ গবর্ণমেণ্ট আজকাল কুইনাইন প্রস্তুতের কাজে অনেক পয়সা খরচ করছেন ও সিনকোনা চাষের উন্নতি-কল্পে ইউরোপ থেকে বহু বিশেষজ্ঞ আমদানী করা হয়েছে।

জাভা: পুতুল নাচ; সম্মুখের পর্দ্দার উপরে ছায়া ফেলিয়া দর্শকদিগকে মুগ্ধ করা হইতেছে।

জাভাকে একটা রঙীন ফিল্মের মত মনে হয়। অসংখ্য রঙীন দৃশ্যের দ্রুত যাতায়াত, একটার পরে আর একটা। পুরানো হিন্দু মন্দির, জীবন্ত ও নিবন্ত আগ্নেয় পর্ব্বত, রেশমী 'বাটিক'-শিল্পীদল, রঙীন পোষাকপরা নর্ত্তকীদল, 'গ্যামেলান' বাদকদল; যোজনব্যাপী রবার ও কফির বাগান—যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই শ্যামল ক্ষেত্র ও নীল পর্ব্বতমালা।

নক্ষত্রভরা স্তব্ধ রাত্রি; এক পশলা বৃষ্টি পড়ে বাতাস যেন প্রেয়সীর করস্পর্শের মত মধুর ও মৃদু হয়ে উঠেছে—সে সময় সিঙ্গাপুরের বন্দরের বাইরের সমুদ্রে আমাদের জাহাজ নঙর ফেললে। আমাদের জাহাজ ও দূরবর্ত্তী বন্দরের ক্ষীণ আলোকমালার মধ্যে নানা দেশের জাহাজ নঙর করে আছে, লণ্ডন থেকে সাংহাই লাইনের আলোকজ্জ্বল ষ্টীমারখানা তো আমরা বেশ চিনতে পারলাম। নিউ ইয়র্কের ষ্টীমার আছে, সারা পৃথিবী ঘুরতে বেরিয়েছে; কোবে, আমষ্টার্ডম এবং নেপলস্ থেকে কত জাহাজ এসেছে; এ ছাড়া শত শত চীনা সামপান ও জাঙ্ক মিটমিটে নারিকেল তৈলের আলোয় ভূতের মত দেখাচ্ছে।

আমরা বেশীক্ষণ সেখানে ছিলাম না—সে রাত্রেই আমরা নঙর উঠিয়ে অন্ধকারে সিঙ্গাপুরকে পেছনে ফেলে বাটাভিয়ার দিকে রওনা হই এবং বিষবরেখা পার হয়ে, অয়স্কান্ত মণির মত নীল, শান্ত সমুদ্র পার হয়ে, বাটাভিয়া থেকে মোটরযোগে কুড়ি মিনিটের রাস্তা তান্‌জোন প্রিয়োক বন্দরে পরদিন নঙর ফেলি।

বেলা তখন প্রায় আর নেই, রাত্রে কোথায় যাব, অপরিচিত স্থান। জাহাজের কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাল সকালে তো জিনিসপত্র নিয়ে জাহাজে আসতেই হবে, রাত্রে আমরা জাহাজে থাকতে পারব কি না।

কাপ্তেন বললেন—আমাদের নিয়ম নেই। বন্দরে জাহাজ থামলে যাত্রীকে তীরেই যেতে হবে।

বড় মুস্কিল। হঠাৎ এমন বৃষ্টি সুরু হয়েছে যে নামতে গেলেই কাপড়-চোপড় ভিজে যাবে।

কাপ্তেন আমাদের অবস্থা বুঝে বললেন—আচ্ছা, জাহাজে থাকার ব্যবস্থা আমি করতে পারি, কিন্তু যা খাওয়াব তা খেতে হবে, আর মশা যদি রাত্রে লাগে, তবে কিছু বলতে পারবে না। মশারি আমি দিতে পারব না।

আমরা বললাম—মশা খুব বেশী লাগবে না কি?

—রাত্রে কেবিনের দোর বন্ধ করে রেখ এবং আলো নিবিও না।

মশার কথা বলব না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি বলেই সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বললাম না। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সে রাত্রে ঘুম আদৌ হয় নি। এর চেয়ে বৃষ্টিতে ভিজে তীরে নেমে কোন ভাল হোটেলের মশারিঘেরা শয্যায় আশ্রয় নেওয়াই আমাদের পক্ষে ভাল ছিল।

জাভা: জাতীয় ঐক্যতান গ্যামেলান বাদকদল।

মশার উপদ্রবের কাহিনী বাটাভিয়ার ডাচ ঔপনিবেশিক ইতিহাসের একটী বিখ্যাত অধ্যায়। ডাচেরা যখন প্রথম এদেশে এল, তখন স্বদেশের খাড়িগুলির স্মৃতি তাদের মনে সমুজ্জ্বল রয়েছে। বড় বড় বাড়ী ও কফিক্ষেত্র তৈরী হ'ল এখানকার খাল ও জলাভূমির ধারে। কিছুদিন পরে হাজারে হাজারে লোক মরতে সুরু করলে ম্যালেরিয়ায়। তখন সকলে বুঝলে, ইউরোপে নেদারল্যাণ্ডসে খালের ধারে বাস করা চলে, কিন্তু জাভায় নয়।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন কুক্ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরবার পথে বাটাভিয়ায় তাঁর জীর্ণ জাহাজ মেরামত করবার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন এবং এখানেই তাঁর টাহিটী দ্বীপের দোভাষী বন্ধু টুপিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়েন।

এর পরে বাটাভিয়ার লোকে নিকটবর্ত্তী উচ্চস্থানে তাদের সহর নির্ম্মাণ করে। এই সহরের জল-হাওয়া স্বাস্থ্যকর, এখানে বড় বড় চওড়া রাজপথ ও সুসজ্জিত পার্ক আছে, বাটাভিয়ার সহরের এই অংশের নাম "ভেলটী-ব্রিডেন"। পুরানো বাটাভিয়া সহরে ব্যবসা-বাণিজ্যের অফিস ও গুদামগুলি আছে বটে কিন্তু নূতন বাড়ী, ব্রাঞ্চ-অফিস ও ধনী লোকের বসতি এই অংশে। পুরানো বাটাভিয়া সহরে বড় বড় পাথরের ব্যাঙ্ক ও অফিসের বাড়ীগুলির পাশে চীনাপল্লী। প্রশস্ত রাজপথে আমেরিকান মটরগাড়ীগুলি ছুটাছুটি করে এবং জর্জ্জ ষ্টিফেনসনের প্রাচীন ঐতিহাসিক এঞ্জিন "রকেট"-এর অনুরূপ একখানি ষ্টীমট্রাম প্রাচীন ও নবীন সহরদুটীকে সংযুক্ত করছে।

সমস্ত দুনিয়ার সঙ্গে বাটাভিয়ার কারবার, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুপুর বেলা কোন কাজকর্ম্ম হয় না, বড় বড় অফিস ও ব্যাঙ্কগুলি নিস্তব্ধ ও নীরব, কারণ বাটাভিয়ার লোকে এই সময় দিবানিদ্রা উপভোগ করে থাকে।

বাটাভিয়া থেকে জাহাজ ছেড়ে আমরা চীনের উত্তর উপকূল বেয়ে সুরাবায়া যাত্রা করলাম, পথে জন কয়েক আরোহী নামিয়ে দেবার জন্য সামারাং বন্দরে একটু দাঁড়াতে হল। সামারাং বড় সহর হলেও সামুদ্রিক বাণিজ্যে ও লোকসংখ্যায় বাটাভিয়ার তুলনায় কিছুই নয়। সামারাং বাজারের বর্ণ-বৈচিত্র্য আমাকে মুগ্ধ করলে যে, আমি ক্রয়-বিক্রয়রত শ্যামাঙ্গিনী বালিকাদের ও কয়েকটী লোলচর্ম্ম বৃদ্ধার ফটো নেবার চেষ্টা করলাম। ফলে কিন্তু কিছুই উঠল না, কারণ মেয়েরা সবাই এদিকে ওদিকে পালিয়ে গেল, কিম্বা দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

সুরাবায়া বন্দরে আসবার কিছু পূর্ব্বে প্রভাতের উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে আমরা দূরে নীলবর্ণ টেন্‌গার পর্ব্বতশ্রেণী এবং দক্ষিণ দিকে কুয়াসাচ্ছন্ন আরডেনো আগ্নেয়গিরি দেখতে পেলাম। সুরাবায়া জাহাজ মেরামতের একটা বড় আড্ডা, সিঙ্গাপুর ছাড়া ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে এত বড় জাহাজ নির্ম্মাণের স্থান আর নেই, কিন্তু আমি যে জন্য গিয়েছিলাম, সে উদ্দেশ্য সফল হ'ল না। আধুনিক সুরাবায়া সহর একটী ছোটখাটো আমেরিকান সহরের অনুরূপ। সর্ব্বত্র সেই ধরণেরই চওড়া রাস্তা, রেডিও ও মটর গাড়ীর দোকান, প্রাসাদোপম বড় বড় বাড়ী, রাস্তার মাঝে ফোয়ারা ও বিখ্যাত নাগরিকদের প্রস্তরমূর্ত্তি। এখানে আমরা আমাদের হোটেলের বারান্দায় বসে একদিন আলোচনা করছিলাম যে, আমরা অগ্নিবর্ষী ব্রোমো পর্ব্বত দেখতে যাব কি না।

জনৈক মার্কিন ব্যবসায়ী বললেন, আমি সেখানে কখন যাইনি বটে, কিন্তু সেখানে দেখার উপযুক্ত কিছু পাব কি না বুঝতে পাচ্ছিনে।

আমি বললাম, কিন্তু ব্রোমো পর্ব্বত দেখবার পরামর্শ সকলে দিয়েছে।

সে বললে, এ দেশের লোকের কথায় বিশ্বাস নেই। একবার একজন ডাচম্যান আমাকে সারা দুপুর হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মাত্র দশ ফিট উঁচু একটী জলপ্রপাত দেখবার জন্য।

তা সত্ত্বেও আমরা গেলাম। ট্রেনে এক ঘণ্টার পথ পাসাংগ্রান, সেখান থেকে মটরে চব্বিশ মাইল, দু'হাজার ফুট উঁচু পর্ব্বতগাত্রে আঁকা বাঁকা দুর্গম ও বিপজ্জনক পথ বেয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ ঝাউগাছের জঙ্গল ভেদ করে আমরা মেঘ ও কুয়াসাবৃত তোসারী নামক ক্ষুদ্র শৈল নগরীতে এসে পৌছলাম।

বিকেল কেটে গেল, কুয়াসা থেকে বৃষ্টি ঝরতে সুরু করলে। মোটা কোট গায়ে থাকা সত্ত্বেও আমি হি হি করে কাঁপতে সুরু করলাম। একটা ছোট হোটেলে আশ্রয় নেওয়া গিয়েছিল। রাত তিনটার সময় দুরন্ত ব্রোমো আগ্নেয় পর্ব্বতের উপর সূর্য্যোদয় দেখবার আশায় শয্যাত্যাগ করে উঠে দেখি যে, ঘন কুয়াসায় দিগদিগন্ত আচ্ছন্ন হয়েছে। দু'টী চোদ্দ বছরের ছেলে আমার পথ-প্রদর্শক রূপে অপেক্ষা করছিল, তারা ভারী কম্বলে কচ্ছপের মত আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্রোমো আগ্নেয়গিরি দেখতে যাবার পথ যেমন দুর্গম, তেমনি সুদীর্ঘ। পথও শেষ হয় না, পথের কিছু দেখাও যায় না। মাঝে মাঝে পাহাড়ের উচ্চস্থান পার হবার সময় কুয়াসামিশ্রিত শীতের বাতাসে যেন শরীরের রক্ত জমে যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে আমাদের পথের পাশে সুউচ্চ প্রস্তরস্তূপ যেন প্রাচীর রচনা করেছে—তার ওপাশে রজনীর ঘন অন্ধকার। কখনো কখনো দূরে কোন গ্রামের ক্ষীণ আলোক-রেখা।

আমাদের ঘোড়ার পা ক্রমাগত পিছলে যাচ্ছিল, পথপ্রদর্শক ছোকরা দুটো তো ওদের লেজ ধরে ঝুলছে—আমরা কোন রকমে চোখ বুজে চলেছি দৈবের উপর নির্ভর করে। এ পথ থেকে বেঁচে ফিরতে যদি পারি তবে তো পুনর্জ্জন্ম।

অনেক দূর গিয়ে আমরা গিরিবর্ত্মে পৌঁছলাম—সেখান থেকে রাস্তা হঠাৎ হাজার ফুট নেমে নীচেকার বালুকাময় সমতল ভূমিতে গিয়ে মিশেছে। এই বালুময় সমতল ভূমিকে এখানে 'বালির সমুদ্র' বলে। এটা একটা দেখবার জিনিষ বলে ভ্রমণকারী মাত্রেই নীচের সমতল ভূমিতে একবার নামে। ওখান থেকে চারিপাশের পর্ব্বতমালা ও দূরে ধূমায়মান ব্রোমো পর্ব্বতের দৃশ্য অতি সুন্দর—অন্ততঃ টমাস কুকের গাইডবইতে তাই লেখে।

কুকের গাইড-বইয়ের উপর যত নির্ভর করি আর না করি, এতদুর যখন এসেছি, তখন না নেমে তো ফিরব না। কিন্তু সেই হাজার ফুট নামতে আমাদের যত কষ্ট হ'ল, এতটা পথ চলে আসতে তত কষ্ট হয় নি। কিন্তু আমাদের পরিশ্রম সার্থক হ'ল সূর্য্যোদয়ের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখে—হঠাৎ সূর্য্যের আলোয় রাত্রির কুয়াসা অপসারিত হয়ে যে দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল, তাতে আমাদের মনে হ'ল আমরা চন্দ্রলোকের কোন উপত্যকায় এসে পৌছেছি।

জাভা: নিসর্গ দৃশ্য; পর্ব্বত, অরণ্যানী এবং জলময় ধান্যক্ষেত্র।

এক সময়ে এই বালির সমুদ্র কোন আগ্নেয়গিরির অগ্নিকটাহ ছিল। সমতল ভূমির পূর্ব্বপ্রান্তে বাটক পর্ব্বতের মোচার মত চূড়া সূর্য্যের আলোতে একটা ব্রহ্মদেশের প্যাগোডার চূড়ার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সমগ্র বিরাট পূর্ব্বভারতীয় উপদ্বীপের মধ্যে একমাত্র সেফ্‌টীভাল্‌ভ্‌ ব্রোমো আগ্নেয়গিরির মৃদু গুরু গুরু শব্দ সকালের কন্‌কনে শীতল বাতাসে ভেসে আসছে। এমন জায়গায় আর কখনও আসিনি। ডাচ গবর্ণমেণ্ট ব্রোমো পর্ব্বতের লাভার দেওয়াল কেটে পর্ব্বতচূড়ায় উঠবার প্রায় সাড়ে তিনশো ধাপ এক সিঁড়ি তৈরী করে দেওয়ায় পর্ব্বতে ওঠা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে। এই সোপানশ্রেণী বেয়ে আমরা উপরে উঠলাম এবং ব্রোমোর বিশাল অগ্নিকটাহের দিকে চেয়ে রইলাম, যেখানে পৃথিবীর গভীর গহ্বর থেকে মাঝে মাঝে গন্ধকের ধূম ও অগ্নিশিখা বার হচ্ছে।

সেখানে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া এক কঠিন ব্যাপার—ঘন গন্ধকের বাষ্পে বাতাস ভারী, মাঝে মাঝে ক্রেটার থেকে কুণ্ডলী সাজিয়ে গন্ধকবাষ্প ও ষ্টীম অনেক উপরে উঠে প্রভাতের আলোয় সোনালী পাড় দেওয়া মেঘের মত দেখাচ্ছে।

এ অঞ্চলের লোকে ব্রোমো পর্ব্বতকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। ডাচ অধিকার স্থাপিত হবার পূর্ব্বে তারা প্রতি বৎসর একটী অবিবাহিতা কুমারীকে অগ্নিকটাহের প্রজ্বলন্ত শিখার মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে অগ্নিদেবতাকে সন্তুষ্ট রাখত;

কিন্তু আজকাল নরবলির পরিবর্তে মুরগী ও শস্য দিয়ে দেবতার রোষ প্রশমিত করা হয়—অনেকে আবার অগ্নিকটাহের মধ্যে নেমে উৎসর্গীকৃত দ্রব্যাদি নিজেদের জন্য সংগ্রহ করে আনে।

আমি ক্রেটারের অত্যন্ত ধারে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা খাড়া করে ফটো নেবার চেষ্টা করছি, এমন সময় আমার সঙ্গী লক্ষ্য করলে, ক্যামেরার তেপায়ার চারিপাশের গন্ধকের ছাই ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে—এবং আমাকে সতর্ক করে দিলে যে, এইবার বোধ হয় বলির পালা আমার। পথ-প্রদর্শক ছোকরা দুটী বললে—সাহেব, কিছু পয়সা ফেলে দাও না ওর মধ্যে ?

আমার সাথী বললেন—যদি ফেলে দিই, তোমরা কি ওর মধ্যে গিয়ে তা কুড়িয়ে আনবে ?

তারা হেসে বললে—নিশ্চয়ই। একবার ফেলে দেখই না ?

আমরা পয়সা ফেলবার পূর্ব্বেই ওরা তারাতাড়ি ক্রেটারের গা বেয়ে ভিতরে নামবার উপক্রম করলে। আমরা তাদের ধমক দিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করলাম। অপরের প্রাণের জন্যে আমরা দায়ী হ'তে প্রস্তুত নই বেড়াতে এসে।

বুরোবদর: প্রস্তরোৎকীর্ণ দৃশ্য।

এখন সূর্য্যের আলো আরও ফুটেছে। প্রভাতের বাতাস একটু গরম মনে হচ্ছে রৌদ্র ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে। এখানে সমস্ত পর্ব্বতগুলোর গায়ে ধাপ-কাটা শস্যক্ষেত্র। আগ্নেয় পর্ব্বতের ছাই উড়ে পড়ে জাভার ক্ষেত্র সকল অত্যন্ত উর্ব্বরা করেছে, জাভার কৃষকদের অবস্থা এজন্য খুব ভাল।
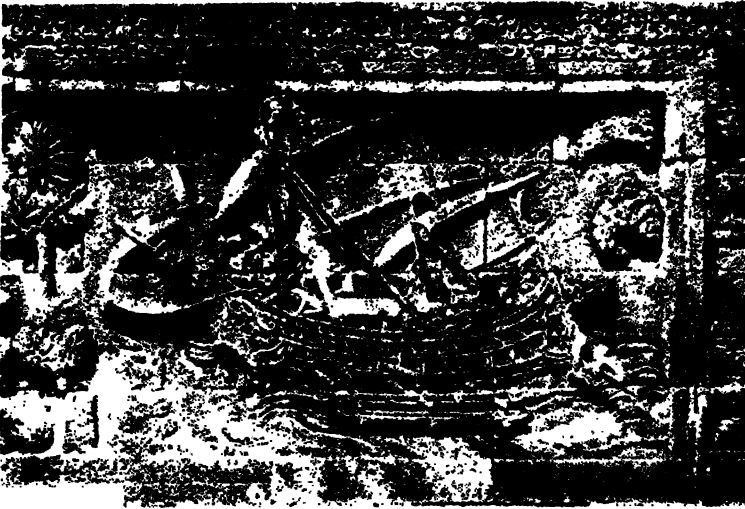
টোসারি ছেড়ে আমরা আবার সুরাবায়া সহরে এলাম। সুরাবায়া সহরে এক ডাচ ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা সর্ব্বপ্রথম এদেশের 'রিজ টাফেল' বা ভাতের ভোজ আস্বাদ করলাম। এই ভোজে ভাত এবং তার আনুষঙ্গিক মাংস ও ব্যঞ্জন এত প্রচুর পরিমাণে খাওয়ায় যে, 'রিজ টাফেল'-এ নিমন্ত্রিত হওয়া বৈদেশিক লোকের পক্ষে একটা ভয়ের ব্যাপার। খাওয়ার টেবিলে দুজন ভৃত্য ঠেলাগাড়ী করে ভাত-তরকারী পরিবেশন করলে। ভাত ও বিশ ত্রিশ রকমের মাংস ও ব্যঞ্জন দুপুরে খেয়ে যে, এখানকার লোকে দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত হবে, এতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নেই।

সুরাবায়া থেকে রওনা হয়ে সমতল ভূমির উপর দিয়ে আমরা পশ্চিম দিকে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম, এদিকে আখের চাষ খুব বেশী। প্রায় চার লক্ষ একর জমিতে আখের চাষ আছে এবং এই আখ কাজে লাগাবার জন্যে এ অঞ্চলে ১৮০টা চিনির কল আছে। ডাচ ইষ্ট-ইণ্ডিজ থেকে যত বাণিজ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়, তার শতকরা বিশ ভাগ চিনি। চিনির রপ্তানী-বাণিজ্যের হিসাবে পৃথিবীতে কিউবার নীচেই জাভার নাম করা যেতে পারে।

এত জায়গায় গেলাম জাভার, কিন্তু এখানকার গ্রাম একটাও চোখে পড়ল না—অথচ শুনেছিলাম, জাভায় লোকসংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ৭২৭ জন। কেবল তো দেখছি বন, পাহাড় আর ফসলের ক্ষেত। কিন্তু জাভায় এত পাখীর খাঁচা কেন, বার বার এ প্রশ্ন আমার মনে উদয় হয়েছে। যেখানে বড় বড় বাঁশ গাছ কি সুপারি গাছ—প্রত্যেক গাছের আগায় সেখানে দশটা বিশটা পাখীর খাঁচা।

একজন ডাচ রাজকর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এত পাখী পোষে কারা? এদেশের গ্রাম কোথায়?

ভদ্রলোক হেসে বললেন—এদেশের গ্রাম ঐ সব বাঁশবন ও সুপারিবনের আড়ালে। বাহির থেকে দেখা যাবে না। গ্রামের লোকেই পাখী পোষে।

—অত উঁচুতে সারাদিন পাখীর খাঁচা ঝুলিয়ে রাখার তাৎপর্য্য কি?

—হাওয়া খাওয়াচ্ছে। সন্ধ্যার পরেই সব নামিয়ে নেবে। এই এ দেশের নিয়ম।

এদের বাড়ী তৈরী করতে কোনও হাঙ্গামা নেই। বাঁশের জাফ্রীর বেড়া আর গোলপাতার ছাউনি প্রায় সব ঘরেই। এত অল্পে সন্তুষ্ট জাতি আর দেখেছি কি না সন্দেহ। একখানা কি দুখানা গোলপাতার ঘর, এক জোড়া মহিষ, সামান্য কিছু ধানের জমি, এদের সকল পার্থিব সম্পদ, এতেই এরা মহা খুসি, এর বেশী যদি কিছু চাইবার থাকে, তবে একটী স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্ম্ম-নিপুণা স্ত্রী ও দু' একটী ছেলেমেয়ে।

জাভায় প্রায় সকলেই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। পূর্ব্ব-জাভায় কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। জাভার নিকটবর্ত্তী বলীদ্বীপে শতকরা আশীজন হিন্দু।

একদিন আমরা সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধকীর্ত্তি বুরোবদর দেখতে গেলাম। মোটরযোগে ছাব্বিশ মাইল রাস্তা। সবুজ আম ও ধানের ক্ষেতের রাস্তা দিয়ে আমরা তালীবনশ্রেণীর আড়ালে অবস্থিত একটা ছোট পাহাড় দূর থেকে দেখলাম এবং শুনলাম, ওই পাহাড়ে খোদাই করে বুরোবদরের মন্দির তৈরী। যত কাছে গেলাম, বুরোবদর ততই বিশাল বলে মনে হতে লাগল এবং একেবারে পাহাড়ের নীচে গিয়ে পৌঁছেছি, এই প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের বিশালতা, কারুকার্য্য ও মহিমায় আমরা বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়লাম। কিন্তু বুরোবদরের সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হয়েছে, তা ছাড়া আমি বৌদ্ধ স্থাপত্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সমালোচক নই—সুতরাং এখানেই এ কথা শেষ করি।

মরুভূমির দেশ আরব

বাইবেলের সময় হইতে হাদ্রামাউৎ প্রদেশ সুগন্ধি দ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ। হাদ্রামাউৎ আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ দিকে, এডেন বন্দরের কিছু পূর্ব্বে অবস্থিত। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫৫০ মাইল, প্রস্থে ১৫০ মাইলেরও বেশী। ইহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বিখ্যাত রুব'আলখালি মরুভূমি, পশ্চিমে ইমেন প্রদেশ।

ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের মধ্যে থিয়োডোর বেণ্ট ও লিও হিরশ্ এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াইয়া অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহারা একটা ম্যাপও খাড়া করেন বটে, কিন্তু সে ম্যাপ খুব ভাল নয়। ১৯৩২ সালে নেদারল্যাণ্ড গভর্ণমেণ্টের কনসাল ভ্যান ডার মিউলেন হাদ্রামাউৎ ও রুব'আলখালি মরুভূমি ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

সাইয়ুন ও তেরিমের মধ্যাবস্থিত মরিয়ামার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ (হিরশের পুস্তকে উল্লিখিত): খ্রীষ্ট জন্মাইবার বহু পূর্ব্বের হিমিয়ারাইটিক সভ্যতার আবাসস্থান। এই সভ্যতার সাক্ষ্যস্বরূপ যে প্রাচীন লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার একটি লাইন বাম হইতে এবং একটি দক্ষিণ হইতে লিখিত।

"আরব দেশের মরুভূমি ও পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্যে আবিষ্কারের অভিযানটা সহজ নয় মোটেই, যদি মরুভূমির অধিবাসী বেদুইনের সাহয্য না পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা বিধর্ম্মীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। দেশের মধ্যে যথেচ্ছা ভ্রমণ করার অনুমতি তাদের কাছ থেকে পাওয়া সহজ নয়। কখন কি অবস্থায় তারা রেগে উঠবে, তা কিছু বলা যায় না। তাদের কোপ-দৃষ্টিতে পড়ে অনেক ভ্রমণকারী ইতি-পূর্ব্বে প্রাণ হারিয়েছে। হাদ্রামাউৎ প্রদেশের অধিকাংশ স্থানই এ জন্য আজও অনাবিষ্কৃত, এই বিস্তীর্ণ রহস্যময় অঞ্চলে কোথায় যে কি আছে, পৃথিবীর লোকের কাছে তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটল, যার দরুণ ডাচ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে হাদ্রামাউৎ প্রদেশটা ভাল করে পরিভ্রমণ করবার ও তার একটা ম্যাপ তৈরী করবার ভার পড়ল আমার উপর। ঘটনা এই। অনেক দিন পূর্ব্বে একজন 'হাদ্রাহামি' জাভায় গিয়েছিল অর্থোপার্জ্জন করবার জন্য।

জাভাতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে লোকটা দু' পয়সা উপার্জ্জন করলে। পরে সে ডাচ নাগরিকের অধিকার প্রাপ্ত হল। কিন্তু সেখানে কিছুকাল আরামে যাপন করবার পরে তার মনে হ'ল, দেশে ফিরে সে বড় একটা কিছু হবে। জাভাতে বড়মানুষি করে লাভ কি? টাকার সার্থকতা কি যদি তার স্বদেশের লোকের চোখে সে বড় না হতে পারলে?

সে দেশে ফিরে সৈন্যদল যোগাড় করলে, বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র কিনলে, তারপর দিগ্বিজয়ে বার হ'ল। প্রথম সে

যে স্থানের অধিবাসীদের উপর উপদ্রব সুরু করলে, সে জায়গাটা মুকাল্লার সুলতানের অধিকারভুক্ত। অধিবাসীরা সুলতানকে জানালে। সুলতানের আদেশে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য ও একটা ছোট কামান দিগ্বিজয়ীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হ'ল—ফলে দিগ্বিজয়ীর সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যে দিকে চোখ যায় সরে পড়ল। দিগ্বিজয়ী নিজে হ'ল বন্দী এবং সুলতান তার মুক্তিপণ স্বরূপ আশী হাজার ফ্লোরিন চাইলেন।

দিগ্বিজয়ী তখন নেদারল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করলে যে, সে একজন ডাচ প্রজা—সুলতান তাকে বন্দী করে প্রকৃত পক্ষে ডাচ গবর্ণমেণ্টেরই অপমান করেছেন, অতএব যত সত্বর হয়, মুকাল্লায় একখানা যুদ্ধের জাহাজ পাঠিয়ে এর প্রতিশোধ নেওয়া হ'ক। ডাচ গবর্ণমেণ্ট অবশ্য যুদ্ধের জাহাজ পাঠান নি, কিন্তু অন্যভাবে এই অদ্ভুত প্রকৃতির হাদ্রাহামির মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। এই ঘটনার পর থেকেই হাদ্রামাউতের অজ্ঞাত স্থান সকল পরিভ্রমণ করিবার অনুমতি পাওয়া যায় মুকাল্লার সুলতানের নিকট থেকে।

১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে আমি ও ডাঃ বিসমান্ এডেন বন্দরে জাহাজ থেকে নামি এবং হাদ্রামাউৎ প্রদেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করবার উদ্যোগ করি।

এডেন থেকে ছোট ষ্টীমারে মুকাল্লা আসি। মুকাল্লা আরব সমুদ্রের একটি বন্দর। এখানে বাহিরের সমুদ্রের ঢেউকে বাধা দেওয়ার জন্যে আধুনিক ধরণের বাঁধ নেই। বড় বড় ঢেউ সমুদ্রতীরবর্তী রাজপথ বিধৌত করে দিচ্ছে। গরম খুব কম। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু যখন প্রবাহিত হয়, তখন সমুদ্রের ঢেউএর গর্জ্জনধ্বনি স্থানীয় বাজারের কোলাহলকে ডুবিয়ে দেয়।

"জোল": মরুভূমির পথে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরাকীর্ণ অঞ্চল উত্তীর্ণ হইবার কষ্টই সমধিক।

মুকাল্লা সুরক্ষিত সহর। মরুভূমিবাসী বেদুইন দল সহরের মধ্যে প্রবেশের সময় পুলিশের কাছে তাদের রাইফেল ও টোটা জিম্মা দিতে বাধ্য হাট-বাজার সেরে বাড়ী ফিরে যাবার সময় আবার ফেরৎ পাবে। বেদুইনরা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ, দস্যুবৃত্তিই অনেকের প্রধান উপজীবিকা—এ ধরণের ব্যবস্থা তাই অতি প্রয়োজনীয়।

মুকাল্লা বাজারে তারা মাসে একবার খাবার জিনিস সংগ্রহ করবার জন্য আসে। সাধারণতঃ তারা কেনে ময়দা, চাল, শুকনো খেজুর ও সুঁটকি মাছ—প্রধানতঃ সামুদ্রিক হাঙ্গরের বাচ্চা। বেদুইনদের মাথায় ঝাঁকড়া চুল, চুলগুলোকে একটা চামড়ার পেটি দিয়ে বেঁধে রাখে। রৌদ্র ও গরম হাওয়ার হলকা থেকে দেহকে রক্ষা করবার জন্য সাধারণতঃ নীল রং গায়ে মাখে। রাত্রে আবার তার উপর চর্ব্বি মাখায়।

মুকাল্লার সুলতান বৎসরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় থাকেন ভারতবর্ষের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদ। সুলতানের প্রধান উজির আমাদের ভ্রমণের বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে একদল পথিক উটের পিঠে হাদ্রামাউতের টেরিম সহরের দিকে রওনা হ'ল—আমরাও তাদের সঙ্গ নিলাম। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, দলবদ্ধ অবস্থায় ছাড়া মরুভূমির মধ্যে ভ্রমণ করা বিপজ্জনক। পথ হারাবার ভয় তো আছেই—তা ছাড়া আছে রাইফেলধারী দুর্দ্দান্ত বেদুইন দস্যুর দল। অনেক সময় এদের হাতে পড়ে গোটা পথিক দলই মারা পড়ে।

মুকাল্লা ছেড়ে পাষাণময় নদীখাতের পথ দিয়ে আমরা উত্তরমুখে চলি। বাতাসের আর্দ্রতা ক্রমে কমে আসছে। দিনের উত্তাপ অসহ্য বটে, কিন্তু রাত্রিতে শীত পড়ে। আরব দেশের এই অঞ্চল পৃথিবীর উষ্ণতম প্রদেশগুলির অন্যতম—শুধু উত্তপ্ত বলেও নয়, এত বন্ধুর পথও খুব কম দেশেই থাকে। রাস্তা বলে কোন জিনিস নেই, শুধু আছে ধূ ধূ মরুভূমি আর কেবল পাথর আর পাহাড়-পর্ব্বত। পথ একবার উঠছে, একবার নামছে এক একস্থানে পাহাড়ের খাড়াই এত বেশী যে, সেখান দিয়ে উটের দল নামাতে ভরসা হয় না—একবার পা পিছলে পড়ে গেলে দু' হাজার ফিট গভীর খডের মধ্যে সবাইকে পড়ে প্রাণ হারাতে হবে।

এই ধরণের নদীখাতের পথ পার হয়ে আমরা এলাম "জোল" বা পর্ব্বতময় মালভূমির মধ্যে। চারিধারে শুধু অন্তহীন উপলাকীর্ণ মরু দূর চক্রবালরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাথরের সঙ্গে সম্ভবতঃ ধাতু মিশ্রিত আছে, কারণ রৌদ্রে তা চক্ চক্ করছে। এই "জোল" অঞ্চলের কোথাও জল নেই, গাছপালা নেই। লোকজনও নেই।

অতিথিপরায়ণ প্রৌঢ় হাদ্রাহামি।

মাঝে মাঝে জমির মধ্যে বড় বড় গর্ত্ত, ছোট বড় পাথরে ভর্ত্তি। দু' একটা এ রকম গর্ত্তের ধারে ধারে সুগন্ধি আরবী গঁদের গাছ। এই জায়গায় একটা পাহাড়ের গুহায় আমরা এক-দল বেদুইনের দেখা পেলাম। আরবদেশের অন্য স্থানের মত এরা উটের লোমের তাঁবুতে বাস করে না।

বেদুইনরা আমাদের দেখে এগিয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল। মেয়েরাও এল। আমার সোনায় বাঁধানো দাঁত দেখে তারা এ ওকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়—সবাই অবাক হয়ে গেল। আমাদের গায়ের রং দেখে তারা তো বিশ্বাস করতেই চায় না যে, আমরা গায়ে কোনো প্রকার সাদা রং মাখিনি। আমাদের প্রতি নানারূপ প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে লাগল। আমরা যখন জন্মেছি, তখন থেকেই কি আমাদের রং সাদা, না, অনবরত সাবান মেখে এরকম হয়েছে। আমরা কি খাই? দুধ আমরা পান করি কি না? আমরা কি মাঝে মাঝে রৌদ্রে বেড়াই, না সব সময়েই ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকি?

সবাই আমাদের রাত্রে থাকতে অনুরোধ করলে। তারা বললে, রাত্রে তারা নাচবে এখন। আমরা অবস্থান করা সম্বন্ধে আমাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করলাম, কারণ আমাদের হাতে সময় অল্প এবং বহুদূর পথে পাড়ি দিতে হবে। ওরা বললে, রাত্রে থাক, তোমাদের প্রত্যেককে একটি স্ত্রী দেব। আমাদের চারি পাশ ঘিরে যে সব কুশ্রী স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিল, তাদের দিকে চেয়ে আমরা বিশেষ উৎসাহিত হলাম না। ওরা তখনি আমাদের মনের ভাব বুঝে বললে—না, এরা নয়। অল্প-বয়সের মেয়েরা পশুদল চরাতে গিয়েছে, সূর্য্য অস্ত যাবার সময়ে ফিরবে।

এখান থেকে রওনা হয়ে আমরা ওয়াদি হাদ্রামাউতের উপনদী ওয়াদি ডুয়ানের দিকে অগ্রসর হই। এখানে আমাদের সৌর তাপক্লিষ্ট চক্ষু সত্যই যেন জুড়িয়ে গেল, ওয়াদি ডুয়ানের তীরস্থ শ্যামল তৃণক্ষেত্র ও বৃক্ষরাজির দিকে চেয়ে।

এখানে গভীর পাষাণতীরের মাঝখান কেটে নদী বয়ে যাচ্ছে চকচকে বালুরাশির উপর দিয়ে। নদীস্রোত থেকে কিছু উর্দ্ধে নদীতটের ঢালুতে সবুজ তালীবন। এই মরুদ্বীপকে কেন্দ্র করে এদেশে ছোট বড় জনপদ গড়ে উঠেচে, কারণ মরুভূমির মধ্যস্থ অন্য সব স্থান মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

এই স্থানের বাড়ীগুলি কাঁচা ইটের তৈরী এবং প্রায়ই চার পাঁচতলা উঁচু। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে এই সহর প্রায় অদৃশ্য থাকে, কারণ ওয়াদি তটের ধূসর ও গৈরিক বর্ণের মাটী পাথর থেকে সহরের বাড়ীগুলোকে পৃথক করে নেওয়া যায় না। উত্তাপের দরুণই বাইরে জনমানবের দেখা নেই, সবাই গৃহমধ্যে বিশ্রামরত।

হাদ্রামাউৎ: প্রাচীন পারস্যের ও রোমের ইতিহাসে সুলতান, বাদশা, সাজার ইত্যাদির গৌরব-কাহিনীর সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট বিশ্ব-বিখ্যাত সুগন্ধি বৃক্ষ (franki scence)।

নিম্নের উপত্যকাভূমিতে এবার নামতে হবে। ছোট সরু পথ এঁকে বেঁকে নেমে গিয়েছে পাহাড়ের গা বেয়ে। সে পাহাড় এত দুরারোহ যে, সেই সংকীর্ণ পথে ভারসমেত উটের দলের নামবার কথা ভাবতেই আমাদের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'ল।

বেদুইন পথপ্রদর্শকেরা উপর থেকে নিম্নভূমি পর্য্যন্ত সারাপথটা নিজেদের ছড়িয়ে রাখলে। দুটি করে উটের ভার নিয়েছে একজন বেদুইন। মনে হল যে, উটেরাও যেন বুঝতে পেরেছে, তাদের সম্মুখে জীবন-মরণ সমস্যা। একবার যদি কোনো কারণে পা পিছলে যায়, তবে নিম্নের পাষাণময় নদীখাতে পড়ে গিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হতে হবে। কিন্তু বেদুইন উষ্ট্রচালকের কৌশল ও কুদর্শন অথচ গুণবান এবং বুদ্ধিমান উষ্ট্রদলের বুদ্ধির দরুণ সকল বিপদ উত্তীর্ণ হওয়া গেল এবং আমরা উৎরাইয়ের পথে নামবার পরিশ্রমের পরে নিম্নের উপত্যকায় তাঁবু খাটিয়ে সে বেলার মত অবস্থান করার উদ্যোগ করলাম।

ওয়াদি ডুয়ানের বৃদ্ধ শাসনকর্ত্তা বেশ ভাল লোক। সম্প্রতি তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর পাঁচতলা কাঁচা ইটের গাঁথুনির বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন ও নানা গল্পগুজব করলেন। লোকটি বড় আমুদে। চারতলার উঁচু ছাদ থেকে আমরা নীচের গ্রামের দিকে চেয়ে তাঁর মুখে আমাদের পূর্ব্বে যে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদ্বয় এসেছিলেন, তাঁদের গল্প শুনছিলাম।

মুক্ত কাফ্রী ক্রীতদাস।

যদিও সে অনেক দিনের কথা, তবুও বৃদ্ধ বা-সুরা সে ঘটনা স্মরণ করে রেখেছেন। এর একটা প্রধান কারণ এই যে, এই সব স্থানে নতুন কিছু বড় একটা ঘটে না। জীবন এখানে পাষাণময়, ওয়াদি প্রাচীরের মতই অটল ও বৈচিত্র্যহীন। এই একঘেয়ে জীবনে হঠাৎ যদি কিছু নতুন দেখা যায়, তা হলে লোকে তা মনে রেখে দেয় চিরকাল।

বা-সুরার আবাসস্থান ঠিক যেন মধ্যযুগের একটি দুর্গ। সেই রকম প্রাচীর, তোরণ, বুরুজ, গম্বুজবিশিষ্ট। আমরা একটা বড় লোহার ফটক পার হয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করি। তারপর বড় একটা হল, তার চারিধারে সশস্ত্র রক্ষী সৈন্যদল। মাঝখানে পুত্রপৌত্রগণ পরিবৃত অন্ধ বা-সুরা। শাসনকর্ত্তার অতিথিস্বরূপ আমাদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শিত

হয়েছিল, সাধারণ লোকের ভাগ্যে তা জুটে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েকদিন মাত্র এখানে যাপন করবার পরে পুনরায় মরুপথে আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল, কারণ সময়ের অভাববশতঃ কোথাও দীর্ঘকাল কাটান আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আবার নির্জ্জন মরুভূমি ও নির্জ্জনতর নদীখাত। আরবী ভাষায় এর নাম ওয়াদি। ওয়াদি এখানে বিস্তৃত বটে, কিন্তু বৃক্ষলতাবিহীন। দুপুরে অত্যন্ত গরম, ১০০° ডিগ্রী থেকে গরম চড়ল ১১৮° ডিগ্রীতে। কম্পমান উত্তাপ-তরঙ্গের মধ্য দিয়ে অনেক দূরে অস্পষ্টভাবে হাজারাইন নামে একটা গ্রাম দেখা গেল।

এই পথের পাশে পুরাকালের কয়েকটি নগরীর ধ্বংসাবশেষ আছে, তার পরে হাজারাইন গ্রাম। আগে এখানে দস্যুর বড়ই উৎপাত ছিল, বর্ত্তমানে স্থানীয় একটি ধনী ও সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারের বিক্রমে স্থানটি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। এইস্থানের অধিবাসীরা পূর্ব্বে কখনো কোন ইউরোপীয়ানকে নগরের প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দেয় নি। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। আমাদের আগমন উপলক্ষে বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে দেখা গেল। রাস্তার দুধারে রঙীন কাগজের লণ্ঠন। গ্রামের মোড়ল এসে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে চললেন। আগে আগে চললেন বিখ্যাত এল্‌-আব্বাস্‌ বংশের জনৈক ভদ্রলোক। কিন্তু গ্রামের ভীষণ জলকষ্ট ও অধিবাসীদের দারিদ্র্য দেখে আমাদের মন যেন নিরানন্দ হয়ে পড়ল।

হাদ্রামাউৎ : শস্যক্ষেত্রে কৃষাণীরা আগাছা পরিষ্কার করিতেছে।

এখানে আমরা কয়েক দিন থাকবার পরে খবর পেলাম, ডাচ গভর্ণমেণ্ট আমাদের জন্যে মোটরগাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে। একদিন সকালে নগরের অধিবাসিগণ এই নতুন দানবের আবির্ভাবে চমকে উঠল—বিকট শব্দ করতে করতে মরুভূমির জিনের মতই সে শান্ত, স্তব্ধ নগরের রাজপথে দেখা দিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দূরে দাঁড়িয়ে এটার দিকে ভয়ে ও সম্ভ্রমে চেয়ে রইল। মেয়েরা তাড়াতাড়ি ছাদের উপর উঠে মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলে। আল্লার তৈরী বাইরের জগৎটাতে না জানি কত আশ্চর্য্য জিনিসই আছে! এটা আবার কি এল দেখ!

এই মরুভূমির পথে মোটরগাড়ী পাঠাবার খরচ অনেক। টেরিম সহরের শাসনকর্ত্তা আবু বক্‌র্‌ সম্প্রতি টেরিম থেকে দক্ষিণ দিকের উপকূল পর্য্যন্ত মোটরগাড়ী চলাচলের রাস্তা তৈরী করবার চেষ্টায় আছেন, কারণ তিনি মোটরগাড়ীর উপকারিতা বুঝেছেন—ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও বটে, যাতায়াতের সুবিধার জন্যও বটে, কিন্তু বিশেষ করে এক জায়গা থেকে অন্য যায়গায় খুব তাড়াতাড়ি সৈন্যদল নিয়ে যেতে পারার সুবিধার জন্য। আবু বক্‌র্‌ নিজের খরচে এই রাস্তা তৈরী করাচ্ছেন।

এক দারুণ উত্তপ্ত গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নে মোটরযোগে আমরা সে নগর ত্যাগ করে আবার বেরিয়ে পড়লাম। মোটরে এত লোক ও মাল বোঝাই করা হয়েছিল যে, তাতে আর তিল মাত্র স্থান ছিল না। নগরের বাইরে ঘোর মরুভূমি,

আগুনের মত হল্‌কা সামনের দিক থেকে এসে আমাদের হাত মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে। উত্তর-ইউরোপের শীতের তুষার-শীতল হাওয়ার মতই তা অসহ্য। মরুভূমির উপরিস্থিত বায়ুস্তর উত্তাপে ভেঙে চুরে বেঁকে বিকৃত হয়ে দূরে দূরে নানারূপ অবাস্তব দৃশ্যের সৃষ্টি করছে।

সিবামের সুলতানের প্রাসাদ : একশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইলেও ইহার নির্ম্মিতশিল্পের অনেক আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্রমে ওয়াদি বিস্তৃততর হয়ে পড়ছে। ওয়াদি আমদ্‌ যেখানে ওয়াদি কাস্‌রে গিয়ে মিশে গেল, সেখানে নদীর উচ্চ পাষাণময় তট এত পিছনে সরে গিয়েছে, আমাদের মনে হচ্ছিল, যেন বিস্তীর্ণ বালুর মহাসমুদ্রের মাঝে জাহাজে চড়ে আমরা চলেছি।

মরুভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে সরু অথচ সুদীর্ঘ বালুর থাম যেন আকাশে গিয়ে ঠেকছে—জলে যেমন জলস্তম্ভ, এগুলো তেমন বালুর সমুদ্রে বালুস্তম্ভ। এক একবার এদের যখন সম্মুখীন হচ্ছি, মুখে তোয়ালে ঢেকে গাড়ীতে মুখ গুঁজে সবাই শুয়ে পড়ছি। একবার এই ধরণের বালুস্তম্ভের সামনে পড়ে মোটরের এঞ্জিন গেল বন্ধ হয়ে। কিছুতেই ষ্টার্ট নিতে চায় না। ঠেলে ঠেলে অতি কষ্টে আবার চালান গেল।

হঠাৎ বালুরাশির মেঘপুঞ্জ ভেদ করে বামদিকে দূরে দিজার্‌ আল্‌-বুক্‌রীর ধূসর বর্ণের উচ্চ দুর্গত্রয় দেখা দিল। বালুর ঝড়ে তখন অবসন্ন হয়ে পড়েছি, গরম গরম কফি পান করার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হয়েছে, একথা স্বীকার করতে কোনো লজ্জা নেই। আমাদের মোটরগাড়ীর হর্ণ শুনে একদল সশস্ত্র রক্ষী-সৈন্য দুর্গপ্রাচীরের উপর আবির্ভূত হল। তাদের চোখে মুখে বিস্ময়ের দৃষ্টি, নিশ্চয়ই মোটর-গাড়ীর প্রথম দর্শনে! আমরা চেঁচিয়ে বললাম—তোমাদের সেনা-পতিকে ডেকে দাও।
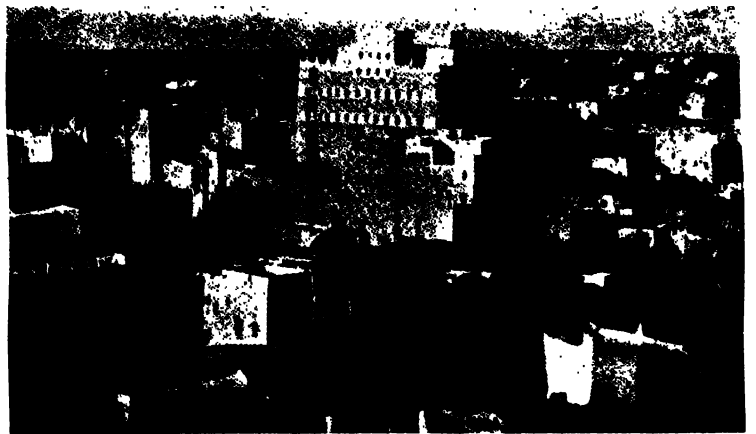
সিবাম-সুলতানের প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্ব। ভারতবর্ষ ও ষ্ট্রেট্‌স সেটলমেণ্টের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া এই সুলতান বহু ধনদৌলতের অধিকারী হইয়াছিলেন।

দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে আমরা অনুমতি পেলাম। সেনাপতি আমাদের জানালেন, সিবাম সহরে সুলতান আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। কফি-পানের পর আমরা বিলম্ব করতে পারলাম না—সেই অপরাহ্ণেই সিবাম অভিমুখে রওনা হই।

হাদ্রামাউৎ প্রদেশের প্রাচীনতম নগরী এই সিবাম। এর স্থাপত্যে সৌন্দর্য্য নেই, আছে দৃঢ়তা ও শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। আমেরিকার মত আট দশ বারো তলা বাড়ী এখানে অনেক। আরবের মরুভূমিতে 'স্কাইস্ক্রেপার' এত বেশী যে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না, অথচ এই সব 'স্কাই-স্ক্রেপার' আগাগোড়াই কাঁচা ইট ও বাজে কাঠে তৈরী।

মরুভূমির বালুরাশির প্রান্তে সিবাম সহরের সাদা মিনার দেখে আমাদের প্রথমে মরীচিকা বলে ভুল হয়েছিল। লোহার ফটকের মধ্যে আমরা সহরে প্রবেশ করলাম। সিবামের সুলতান আমাদের যথেষ্ট সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সুলতানের বৃহৎ প্রাসাদটিও কাঁচা ইটের তৈরী। এদেশে কি রাজপ্রাসাদ, কি মসজিদ, কি দুর্গ—সবই এই উপাদানে নির্ম্মিত। অথচ কি সুন্দর ও দৃঢ়! হাদ্রামাউতের স্থপতিদের প্রশংসা না করে পারলাম না।

স্বাস্থ্যের দিকে অধিবাসীদের দৃষ্টি নেই। পথের দুধারে বড় বড় বাড়ী, প্রত্যেক বাড়ীর রান্নাঘর, স্নানাগার প্রভৃতি থেকে তালের গুঁড়ির খোল বার করা আছে রাস্তার দিকে। বাড়ীর ব্যবহৃত যত নোংরা জল তালের খোল বেয়ে রাস্তার উপরই পড়ে। রাস্তার মাঝখান বেয়ে আবার খোলা পাকা ড্রেন, ময়লা ও আবর্জ্জনায় তা কানায় কানায় ভর্ত্তি। রাস্তায় চলাও এক বিপদ, সব সময় উপরের দিকে চোখ রাখতে হবে, কোনো বাড়ীর নোংরা জল মস্তকে বর্ষিত না হয়।

আমরা যখন সিবামে ছিলাম, বৎসরের মধ্যে সে সময় সর্ব্বাপেক্ষা গরম। দিনমানে একটু রোদ চড়লেই নগর নিস্তব্ধ, পথে লোকজন দেখা যায় না, কেবল মাত্র খর্জ্জুর কুঞ্জের ছায়ায় গভীর কূপ থেকে জলোত্তোলনকারী উটের পদশব্দ ও স্ত্রীলোকদিগের পাখী তাড়াবার উদ্দেশ্যে হাততালি ও চীৎকার ছাড়া অন্য শব্দ শোনা যায় না। দুপুরে যেন নরকাগ্নি জ্বলছে চারিদিকে। কষ্ট ভুলে থাকবার জন্য ঘুমুবার চেষ্টা করাই ভাল। সূর্য্য অস্ত যাবার পরে নগর সজীব হয়ে ওঠে, দোকানে ক্রেতাদের ভিড় হয়, পথে পথিকের ভিড় হয়। ধনী লোকে সহরের বাইরে বাগানবাড়ীতে গিয়ে স্নান ও সান্ধ্য উপাসনা করে, বাড়ীর ছাদে মজলিস বসে, চা ও কফি পান সুরু হয়।

তবুও বার বার এ কথা আমাদের মনে উঠেছে – এ দেশে বাস করে মানুষে কোন্ সুখে?

আরিজোনার মরুভূমি

সম্প্রতি জনৈক মার্কিন মহিলা অশ্বপৃষ্ঠে একাকিনী আরিজোনার মরুভূমি অঞ্চলে প্রায় তিন চার হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন—মরুভূমিবাসী হোপি ও নাভাজো ইণ্ডিয়ান্‌দের রীতি-নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য। তাঁর এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খুব কৌতূহলপ্রদ। রেড্‌-ইণ্ডিয়ানদের-জীবন-যাত্রা প্রণালীর অনেক খুঁটিনাটি আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি।

তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে নিম্নে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করা গেল।

"অনেক দিন থেকে মনে সাধ ছিল আরিজোনার মরুভূমিতে গিয়ে নাভাজো ইণ্ডিয়ান্‌দের দেখব।

একটি ইণ্ডিয়ান্‌ গ্রামের দৃশ্য : পার্শ্বে জনৈক গ্রামবৃদ্ধ।

মোটরগাড়ী চেপে ওখানে যাবার ইচ্ছা আমার কোন দিনই ছিল না। চিরকালই ভাবতাম যদি কোনো দিন যাই, ঘোড়ায় চেপে পুরানো দিনের পথ ধরে যাব—যে পথ ধরে একদিন আমার পূর্ব্বপুরুষরা এসে দক্ষিণপশ্চিমের এই বিরাট মরুভূমি জয় করেন, এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

সভ্যতা-দুষ্ট সহরের জীবনযাত্রা-প্রণালী, সহরের আবহাওয়া আমার বিষের মত ঠেকে। তাই একদিন সত্য সত্যই ঘোড়ায় চেপে অজানার উদ্দেশে একা বেরিয়ে পড়লুম—তারপর যখন মুক্ত প্রান্তরে ঘোড়া ছুটতে লাগ্‌ল, মুক্ত হাওয়ায় তার কেশর ফুলে উঠল—দূরে নীল অনাবৃত গঠিত পর্ব্বতমালা দেখা গেল—তখন আমার মনে হল, জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধনীর সঙ্গেও আমি এখন ভাগ্য বিনিময় কর্ত্তে রাজি নই।

কোল ক্যানিয়ন্‌, মরুভূমির মধ্যস্থ একটি পার্ব্বত্য নদীখাত।

বৈকালে আমি ইণ্ডিয়ানদের একটা গ্রামে পৌঁছুলাম। এখানে অনেক প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ আছে। কিছুক্ষণ এসব দেখে বেড়ানো গেল। হঠাৎ মনে পড়ল, সাম্‌নে বিস্তীর্ণ মরুভূমি, আমার সঙ্গে জল তো বেশী নেই। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে একটা কূপ পাওয়া গেল। জনচারেক নাভাজো ইণ্ডিয়ান্‌ সেখানে ঘোড়াকে জল খাওয়াচ্ছিল—আমায় দেখে তারা খুব খুসি হল, দুটি বালক দড়ি-বাল্‌তি নামিয়ে দিয়ে

জল তুলে আমার ঘোড়াকে জল খাওয়ালে। আমাকেও জল দিতে যাবে এমন সময় একখানা বড় মোটরগাড়ী বোঝাই হয়ে একদল টুরিষ্ট্ এসে পৌছুল—কর্ত্তা, গিন্নি, তিনটি ছেলে-মেয়ে। তারা এসে কোনো কিছু না বলেই বিস্মিত নাভাজো বালকটির হাত থেকে জলপূর্ণ বাল্‌তিটা কেড়ে নিয়ে নিজেরা পেট পুরে জল খেলে বা বাকী জলটুকু মাটীতে ঢেলে ফেলে দিলে। এই জলহীন মরুপ্রান্তে ওইটুকু জলের মূল্য যে কি, তা এই হঠাৎ বড়লোক বর্ব্বরেরা কি জানবে!

জলটল খেয়ে তারা নিকটেই একটা ইণ্ডিয়ানদের কুটীরে ঢুক্‌ল। যেন নিজেদের বাড়ী নিজেদেরই সব। কারুর কাছে অনুমতি নেওয়ার কথাটা পর্য্যন্ত ওদের মনে পড়ল না। বড় মেয়েটা একটা আধ-বোনা কম্বল হাতে নিয়ে সুতো খুলে খুলে দেখতে লাগ্‌ল, জিনিষটা কি ভাবে তৈরী হয়েচে। মা দু' একবার বারণ করলেন, কিন্তু বড়লোকের আদুরে মেয়ে সে কথায় কানও না দিয়ে কম্বলটার সুতো ছিঁড়েই চলেছে। দেখে আমার ভারী রাগ হল—আমি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ঘরের বার করে দিয়ে বল্লুম—যাও, বেরোও এখান থেকে—টাকা হয়ে থাকে অন্য যায়গায় গিয়ে বড়মানুষি দেখাও গিয়ে, গরীবের কুঁড়েতে কেন এসেচ মেজাজ দেখাতে!

ওরা বিদেয় হল। কুটীরের কর্ত্তা আমার দিকে সকৃতজ্ঞ হাসিমুখে চেয়ে বল্লে—অথচ এরাই আমাদের অসভ্য বলে থাকে।"

তুর্কিস্থানের মরুপথ

পশ্চিম মঙ্গোলিয়া ও চীনা তুর্কিস্থান হইতে যে পথ চীনের মধ্যে গিয়াছে, সেই পথের অধিকাংশ স্থানেই এমন সব প্রদেশ আছে যেখানে বর্ত্তমান সভ্যতার আলোক আজও প্রবেশ করে নাই। কিন্তু ওই পথের সঙ্গে বহুকালের প্রাচীন ইতিহাস জড়িত আছে। সাড়ে ছয় শত বৎসর আগে এই পথেই বিখ্যাত পর্য্যটক মার্কোপোলো চীনের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। উটের পিঠে চীন হইতে ব্যবসায়ীরা রেশম ও গালার জিনিষ বোঝাই দিয়া ওই পথে গ্রীস, রোম, পারস্য প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। পূর্ব্ব ও পশ্চিম মহাদেশের সঙ্গে পুরাকালের যোগসূত্র স্থাপিত হয় এই পথের কল্যাণে।

আবার ধ্বংসের বিষাণ বাজাইতে বাজাইতে যাযাবর হূন, শক ও তাতার জাতি ওই পথেই আসিয়া রক্তস্রোতে ভারতবর্ষ ভাসাইয়া দেয়, রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করে।

মঙ্গোলিয়ার বুকে উষ্ট্রবাহিনী। দূরে বালুকাময় পাহাড় দেখা যাইতেছে।

মিঃ ওয়েন্ ল্যাটিমোর এক-জন বিখ্যাত পর্য্যটক, তিনি ১৯২৬ ও ২৭ সালে সস্ত্রীক গোবি মরুভূমি পার হইয়া মধ্য এসিয়া ও চীনা তুর্কিস্থানের নানা স্থান ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণকাহিনী নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। ১৯২৯ সালে চীনা তুর্কিস্থান সম্বন্ধে তাঁহার বই বাহির হয় ও আমেরিকার পাঠকসমাজে অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। মিঃ ল্যাটিমোরের লিখিত বিবরণ হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"সিফিংএ সাত বছর ছিলাম, কিন্তু এই পথের সন্ধান কেউ দিতে পারে নি। সিফিং আজকাল অত্যন্ত হাল ফ্যাসানের সহর, সেখানে সিনেমা, ক্লাব, থিয়েটার, ভোজনশালা ইত্যাদি হালফ্যাসানের আমেরিকান প্রথায় সাজানো, সেখানে সাত বছর থেকে বিরক্ত হয়ে উঠলাম—মনে হ'ল এ তো সেই আমেরিকার সহরে জীবনই যাপন করছি, তবে এখানে কেন এলাম? সঙ্কল্প করলাম, চীনা তুর্কিস্থানের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে যাব। কোয়েইতিং একটা ছোট সহর, এখানকার ব্যবসায়ীরা আজও উটের পিঠে মাল বোঝাই দিয়ে প্রাচীন প্রথায় বাণিজ্য করে। তাদের কাছে অনেক সন্ধান পাওয়া গেল।

দুটি পথের কথা আমায় জানালে। একটি পথ চীনের শেন্‌সি ও কান্‌সু প্রদেশের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম গোবি মরুভূমির প্রান্তসীমায় গিয়ে পৌছেছে এবং সেখান থেকে চীনা তুর্কিস্থান পার হয়ে সোজা চলে গিয়েছে ভারত ও পারস্যের দিকে। আর একটি পথ উত্তর চীন ও উত্তর মঙ্গোলিয়া পার হয়ে পশ্চিম দিক দিয়ে চীনা তুর্কিস্থানে প্রবেশ করেছে।

এমন পথে যাওয়া সমীচীন মনে হ'ল না, সবাই নিষেধ করলে। ও পথে সর্ব্বত্র দস্যুর ভয়, যুদ্ধ, রক্তপাত লেগেই আছে—তা ছাড়া বিদেশীদের প্রতি সেখানকার অধিবাসীরা খুব শ্রদ্ধাবান নয়, যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে

ও-পথে। দ্বিতীয় পথেও যাওয়া অসম্ভব—পশ্চিম মঙ্গোলিয়ার উপজাতিসমূহের মধ্যে আজকাল বল্‌শেভিক রাশিয়ার প্রভাব খুব বেশী, তারা কোন বিদেশীকে তাদের দেশে প্রবেশ করতেই দেবে না।

অনেক সন্ধানের পরে অবশেষে আমি মরুভূমির মধ্যে দিয়ে তুর্কিস্থানে যাবার একটি পথের সংবাদ পেলাম। এ পথ ব্যবসায়ীদেরই দ্বারা আবিষ্কৃত, তারা পশ্চিম মঙ্গোলিয়ার উপজাতিদের, চীনা দস্যুদের কবলেও পড়তে চায় না—সুতরাং তারা মঙ্গোলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা উষর ও নির্জ্জন অঞ্চল দিয়ে তুর্কিস্থানে যাবার একটি পথ বার করেছে—এ পথ যেমনি অজ্ঞাত, তেমনি দুর্গম, খুব কম লোকেই এ পথের খবর রাখে, যাতায়াত করে আরও অনেক কম লোকে।

অবশেষে এই পথেই যাব ঠিক হ'ল। ওই অঞ্চল কখনও দেখিনি, ওখানকার অধিবাসীদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করবারও একটা ইচ্ছা ছিল অনেকদিন ধরে। একদিন ওই পথ ধরেই গিয়েছিল যাযাবর হুন ও শক জাতি তাদের বিরাট দিগ্বিজয়ের অভিযানে। পথের দুর্গমতা আমার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে তুললে।

মরুভূমির মধ্যে উটকে খাওয়ানো—২৪ ঘণ্টার খাদ্য এক মুঠা ছোলা কি বার্লি।

অতি কষ্টে ভ্রমণের উপযোগী উট যোগাড় হ'ল। একটি ব্যবসায়ী দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে রওনা হওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করে সুইয়ান্ যাত্রা করলাম। সে রকম একটা দল মিলেও গেল। আমি তাদেরই একজন হয়ে তাদের মধ্যে বাস করেছি, বেশভূষায়, আহার, ব্যবহারে আমি কখনো দেখাই নি যে আমি বিদেশী।

রাত্রে আমরা চলতাম। দিনে তাঁবু খাটিয়ে নিজেরা রান্নাবান্নার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, উটের দল ছেড়ে দেওয়া হ'ত ইতস্ততঃ চরে বেড়াবার জন্যে—একজন লোক সব সময় সঙ্গে থাকত—উটেরা পালিয়ে না যায় বা কেউ তাদের চুরি করে, তাই পাহারা দিতে। বেলা পড়লে আমাদের যাত্রা সুরু হ'ত, নিশীথরাত্রে আবার তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করতাম—সাত আট ঘণ্টার বেশী উটেরা একাদিক্রমে চলতে পারে না—বিশেষ করে আমাদের উটদলের প্রত্যেকটার পিঠে পাঁচমণ করে ভারী বোঝা ছিল।

সকালে আমাদের চা হ'ত 'চায়ের ইট' থেকে। এই 'চায়ের ইট' একটি অদ্ভুত পদার্থ। এক ধরণের কড়া ও বিস্বাদ চা থেকে এই 'চায়ের ইট' তৈরী হয়—চীনের হ্যান্‌কাউ ও টিয়েন্‌সিন্‌এ 'চায়ের ইট'এর বড় কারখানা আছে। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, সাইবিরিয়া ও তুর্কীস্থানের অনেক স্থানে 'চায়ের ইট' মুদ্রার কাজ করে। বড় বড় ইটের ওজন বাঁধা আছে—কিন্তু অনেক সময় খুচ্‌রো খরিদ-বিক্রয়ের জন্তে বড় ইটের খণ্ড ভেঙে নিয়ে ওজন করে কমদামের জিনিষের পরিবর্ত্তে দেওয়া নেওয়া হয়ে থাকে। এই 'ইট চা' থেকে প্রস্তুত চায়ের রং ঘোর কালো, চিনি এবং উটের দুধ মিশিয়ে খেতে হয়। যাদের অভ্যেস নেই, তারা এ চা মুখে দিতে পারবে না।

মরুভূমিতে জল দুষ্প্রাপ্য বলে আমরা চা খেতাম খুব বেশী। নদী বা ঝর্ণা মরুভূমিতে একেবারেই নেই, মাঝে মাঝে কূপ আছে, তাও সত্তর আশী মাইল অন্তর অন্তর। অনেক সময়েই এই সব কূপের জল অধিক পরিমাণে নুন ও সোডা মিশ্রিত—সুতরাং সুপেয় পানীয় নয়। উটের পিঠে ছ' সাত পিপে বোঝাই জল আমরা নিয়ে পথে

চলতাম, কি জানি যদি কোথাও না পাওয়া যায় বা পানের উপযুক্ত না হয়। অনেক সময় এমনও হয়েছে, একশো মাইলের মধ্যে কূপ পাওয়া যায় নি। একবার একটা ছোট ঝর্ণা পাওয়া গিয়েছিল, জল দেখতে বেশ নির্ম্মল, আস্বাদ কুইনাইনের চেয়েও তেতো। নিরুপায় অবস্থায় সেই জলই আমাদের পান করতে হয়েছিল।
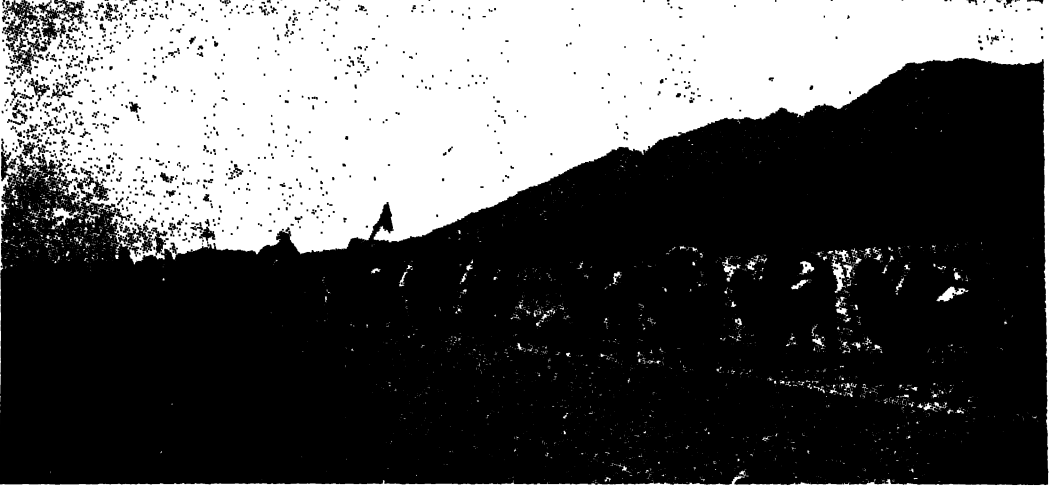
মরুপথে উষ্ট্রবাহিনী। মাঝখানের একটি উটের পিঠে লক্ষ্য করিলে পতাকা দেখা যাইবে। এই পতাকা মরুবাহিনীরা চিরকাল বহন করিয়া আসিতেছে।

পথে অন্যান্য ব্যবসায়ীদলের সঙ্গেও দেখা হয় প্রায়ই। তারা দস্যুদলের ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকে, তাদের মুখে কেবলই শোনা যেত অমুক স্থানে দস্যুরা ব্যবসায়ীদের মেরে ফেলেছে, লুঠপাঠ করেছে ইত্যাদি। বেশীর ভাগ

কুচেন্‌ৎসি : রেল হইতে ১৬০০ মাইল দূরে।

স্থলেই এগুলি গুজব মাত্র। মাঝে মাঝে গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদলের সাক্ষাৎ পেতাম, তাদের কাজ হচ্ছে মরুপথের যাত্রীদেরকে দস্যুদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করা। তবে ক্বচিৎ তাদের এ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হ'ত।

মরুভূমির পথে সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক গিরিবর্ত্মের সন্নিকটে।

এ বিশাল, অজানা মরুদেশে দস্যুর হাতে পড়লে কোথায় বা গবর্ণমেণ্ট, আর কোথায় বা তাদের সৈন্যদল! যে ব্যবসায়ীদলের সঙ্গে উপযুক্ত বন্দুক বা অস্ত্রশস্ত্র থাকে, যারা দলে পুরু থাকে, লড়তে পারে—তারা ছাড়া দস্যুদলের হাত থেকে অন্য নিরীহ নিরস্ত্র ব্যবসায়ীদল বড় একটা পরিত্রাণ পায় না। এখানকার লোকে বিদেশীদের প্রতি আদৌ শ্রদ্ধাবান নয়। কয়েক বছর পূর্ব্বে একটি আমেরিকান্ কোম্পানী মঙ্গোলিয়া থেকে চীনা তুর্কিস্থান পর্য্যন্ত মোটরবাসের লাইন খুলবার সঙ্কল্পে একটি দল পাঠিয়েছিল রাস্তার অবস্থা বুঝবার জন্য, এক ডজন মোটর গাড়ীও তাদের সঙ্গে ছিল। এ দেশের লোকেরা ভাবলে মোটরবাসের লাইন খুললে উষ্ট্রচালকদের ব্যবসা একেবারে তো মাটী হবে! তারা এমন সব দুর্গম অঞ্চল দিয়ে পথ দেখিয়ে তাদের নিয়ে গেল, যে পথে শুধু পাথর আর বালি, বালি কাটিয়ে উঠল তো পাথর, পাথর কাটিয়ে উঠল তো আবার বালি। ফলে যতগুলো মোটরগাড়ী রওনা হয়েছিল, তাদের মধ্যে মাত্র একখানা গাড়ী কায়ক্লেশে তুর্কিস্থানে পৌছতে পেরেছিল—কিন্তু তারপর তার আর কাজ করবার মত অবস্থা ছিল না।

কাজাক বীরের হাতে ঈগল পক্ষী।

মরুভূমিতে মাঝে মাঝে দেখা যায় উটের পিঠে শব বোঝাই হয়ে চলেছে। তুর্কিস্থান-প্রবাসী চীনা ব্যবসায়ীর মৃত্যু ঘটলে প্রবাসী বন্ধুরা তার মৃত দেহ প্রথমে দিনকতক একটা জায়গায় কবর দিয়ে রাখে, যতদিন মাংস ঝরে পড়ে শব হাল্‌কা না হয়। তার পরে উটের পিঠে বোঝাই দিয়ে দেহটাকে পাঠিয়ে দেয় সুদূর চীনে, তার স্বগ্রামে, সেখানে তার পূর্ব্বপুরুষদের কবরের পাশে দেহটা পুনরায় সমাধিস্থ করা হয়।

এক জায়গায় এসে হঠাৎ শোনা গেল যে, সাম্‌নের দিকে আর যাওয়া যাবে না, পাহাড়ের রাস্তা বরফে ঢেকে গিয়েছে। আমরা পাহাড়ের ওদিকে না গিয়ে মরুভূমির মধ্যে দিয়েই চলতে লাগলাম—তার মানে দুশো মাইলের ফের! ডিসেম্বর মাসের সবে সুরু, কিন্তু এবার এত শীত পড়েছে যে খুব প্রাচীন লোকেরাও বল্লে, এমন শীত তারা অন্ততঃ ডিসেম্বর মাসে কখনো দেখে নি। তিন মাস অনবরত চলবার পরে আমার উটের দল একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে প'ড়ল, তার উপরে বিপদ এই যে বড় বড় ব্যবসায়ীদল আগেই চলে গিয়েছিল, সুতরাং আমাদের যেতে হ'ল সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায়, পথে দস্যুর হাতে পড়লে কি অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘট্‌লে সাহায্য করবার কেউ রইল না।

মুজার্ট গিরিবর্ত্মের কিরগিজ সৈনিক পাহাড় খুঁড়িয়া নুনের চাপ বাহির করিতেছে।

পথের ধারে মাঝে মাঝে আমরা চলৎশক্তিবিহীন পরিত্যক্ত উট বহু দেখতে পেলাম। উটের নিয়ম এই, তারা দুর্ব্বলতার একটি বিশেষ অবস্থায় পৌছুলে আর নড়তেও পারে না, উঠতেও পারে না। অনেক সময় বেশীদিন খাদ্য না পেলে এ রকম হয়, কিংবা দুর্গম পথে একটানা কয়েক মাস চলতে চলতেও উট একেবারে নিস্তেজ হয়ে আসে—এ সব ক্ষেত্রে তাকে ছেড়ে চলে যাওয়া আর উপায় থাকে না। পরিত্যক্ত অবস্থাতে কোন খাদ্য না পেয়েও উট অনেক দিন বাঁচে। উষ্ট্রচালকেরা কখনো এ ধরণের অকর্ম্মণ্য উটকে গুলি করে মারে না, তাদের মধ্যে এ প্রথা নেই—আমি এমনও দেখেছি পথের ধারে উট শুয়ে আছে—তার পিঠ ও দু পাশে একহাত পুরু কঠিন বরফের স্তর জমেছে, তবুও হতভাগ্য প্রাণীটা বেঁচে ধুঁক্‌ছে। পথিক দলের প্রতি একবার উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে মাত্র, ঘাড় নাড়তে পারে না, সমস্ত দেহটাই যেন জমে গিয়েছে। মরুভূমির এ দৃশ্য বড় করুণ!

শিয়াংকিয়াং মরুস্থান: কে বলিবে দেড় মাইল দূরে যোজনবিস্তৃত মরুভূমি!

মরুভূমিতে ভীষণ ঝড় উঠল, আমাদের হাঁটু পর্য্যন্ত বরফে ডুবে গেল। সে ঝড় আর থামবার নাম নেই, কুড়িদিন পর্য্যন্ত সমানভাবে চ'লে একদিন শেষরাত্রে আকাশ পরিষ্কার হ'ল। পরদিন সকালটিতে অতি পরিষ্কার

সূর্য্যোদয় দেখে আমরা ভাবলাম আর ভাবনা নেই, বিপদ কেটেছে। দুপুরের পর সামান্য একটু হাওয়া উঠল, দশ মিনিটের মধ্যে আবার এমন ঝড় সুরু হ'ল যে গত কুড়িদিনেও সে রকম উদ্দাম ঝড় ও বরফপাত আমরা দেখিনি। উপরের দিকে চেয়ে দেখি আকাশ তখনও নীল, মেঘের লেশও কোথাও নেই, অথচ আমাদের তাঁবুতে তখন এমন অবস্থা যে পাঁচ হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না, ঝড়ে চূর্ণ তুষার উড়িয়ে এনে চারিধার আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

প্রায় মাইলটাক দূরে আমাদের উটগুলো চরছিল। একজন লোক তখনি তাঁবু থেকে বেরিয়ে গিয়ে অতি কষ্টে সেগুলো তাঁবুতে নিয়ে এল, যদিও এ ধরণের বরফের ঝড়ের সময় ঘর ছেড়ে বাইরে বার হওয়া অত্যন্ত বিপদ্জনক, পথ হারিয়ে গেলে শীতে মৃত্যু নিশ্চিত। আসবার সময় সে লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আসতে পারলে না, হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে অতি কষ্টে তাঁবুতে পৌছালো, ঝড়ের এমন বেগ যে তার সামনে দাঁড়ান যায় না। যখন সে তাঁবুতে এল, তখন তার মুখে, বুকে, গলায় বরফ কঠিন হয়ে জমে গিয়েছে। আমরা বরফের মধ্যে একটা গর্ত্ত করে সেখানে উটগুলাকে রেখে দিলাম। দেখতে দেখতে ঝড়ে তাদের ওপর হাত দুই পুরু বরফ চাপা দিলে তবুও ভয়ানক শীতের হাত থেকে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পেলে তারা। আমাদের তাঁবুর ডবল ক্যানভাসের ছাদ ফুঁড়ে বরফ এসে সুঁচের মত আমাদের নাকে মুখে বিঁধছিল আর সে কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! সন্ধ্যার কিছু পরেই ঝড়টা যেমনি হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎই থেমে গেল। নির্ম্মল আকাশে জ্যোৎস্না উঠল, চারিধারে কেমন একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। সাহস করে সে রাত্রে আমরা ঘুমোতে পারলাম না। সকালে উঠে দেখি যে, তাঁবুতে বরফ জমে এমন অবস্থা হয়েছে যে, সেটাকে গুটিয়ে নেবার উপায় নেই, অগত্যা সেই অবস্থাতেই সেটা উঠিয়ে উটের পিঠে চাপিয়ে রওনা হওয়া গেল।

ইন্দ্রিরকান্দের কম্বলওয়ালা।

মাইল তিন চার গিয়েছি, আবার ঝড় সুরু। কিন্তু এবার ঝড়ের মূর্ত্তি অত উগ্র নয়, আমাদের থামবার আবশ্যক হ'ল না। দিনকতক পরেই আমরা ১৬০০ মাইল ভ্রমণ শেষ করে কুচেংসি সহরে এসে পৌছুলাম। এখান থেকে উরুম্চি ১৫০ মাইল দূরে, ডাকবাহী একটা উটের গাড়ীতে দিনরাত সমানভাবে চলে সাড়ে তিন দিনে আমি সেখানে এলাম।

এ সব স্থান এত দুর্গম যে, বাইরের জগতের সঙ্গে আদানপ্রদান এখান থেকে হওয়া একরকম অসম্ভব। চীনা গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী জনৈক আমেরিকান কর্ম্মচারী এখানকার ডাকবিভাগের কর্ত্তা, কিন্তু সে বেচারী কি করবে—

এখান থেকে ডাক যাবে সাইবেরিয়ায়, সেখান থেকে ট্রেণে চীনে, পিকিংএ চিঠি পৌঁছুতে মাসখানেক লাগে। টেলিগ্রাফ লাইন অবিশ্যি আছে নাম মাত্র, কিন্তু প্রায়ই হয় দস্যুদল, নয় বিদ্রোহীদল লাইনের তার কেটে দিচ্ছে। চীনা তুর্কিস্থান থেকে টেলিগ্রাম পাঠালে তিন মাস থেকে ছ' মাসের মধ্যে সে টেলিগ্রাম বাইরের জগতে পৌঁছায়।

চীনা তুর্কিস্থানের শাসনকর্ত্তা অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ এবং শাসনকার্য্যে অত্যন্ত দক্ষ। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে এখানে কোন সংবাদপত্র ছাপানো হয় নি— দেশের আইন অনুসারে কেউ ছাপাখানা রাখতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের একটি মাত্র ছাপাখানা আছে। তাতে গবর্ণমেণ্টের দপ্তরের কাগজপত্র এবং নোট ছাপানো হয়। শাসনকর্ত্তার বিশ্বাস সংবাদপত্র প্রচার হতে দিলেই দেশের মধ্যে নানা গোলমাল, অশান্তি ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হবে। বল্‌শেভিক রাশিয়াও নিজের প্রভাব বিস্তার করবার সুবিধে পাবে। চীনা তুর্কিস্থান আয়তনে ফ্রান্স, জার্ম্মানি ও স্পেন একত্রে যত বড় —প্রায় তত বড় এবং বহু বিভিন্ন জাতির বাসস্থান। কিন্তু গত ১৯১১ সালের বিদ্রোহের পরে বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার দক্ষতার জন্যে আর কোন উপদ্রব সেখানে হয় নি বা চীনের অন্যান্য প্রদেশের মত গৃহযুদ্ধ ও দস্যুদলের প্রাদুর্ভাবও এখানে নেই।

সাঙ্গু পাহাড়ঃ উচ্চতা ১৬৬৫০ ফিট। ইয়াক ছাড়া আর কোনও জন্তু এই পথে উঠিতে পারে না।

তিয়েনশান্ পর্ব্বতমালা তুর্কিস্থানের মেরুদণ্ড স্বরূপ—পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে বহু দূর পর্য্যন্ত এই পর্ব্বতশ্রেণী চলে গিয়েছে। এই পর্ব্বতমালার এপারে ওপারে অর্থাৎ উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি বড় বাণিজ্যপথ বর্ত্তমান—হাজার বছর ধরে এই পথে ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের ফলে রাশিয়ার সঙ্গে বাইরের জগতের আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছে, মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে এই দুটি বাণিজ্য-পথের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ।

এই প্রদেশের অধিকাংশ মরুময়। তিয়েনশান্ পর্ব্বতমালার দু'পাশে যা কিছু সামান্য বৃষ্টি হয়—দু' দশটা ছোট-খাটো পার্ব্বত্য নদীর জল অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়েছে মরুর মধ্যে, সেই জলে কিছু কিছু কৃষিকার্য্য চলে। প্রায়ই এই সব নদী মরুভূমির মধ্যে লবণাক্ত জলাভূমিতে নিজেদের নিঃশেষ করেছে—সে জায়গার জল-হাওয়া কৃষিকার্য্যের অনুকূল নয়। তিয়েন-শান্ পর্ব্বতের দক্ষিণ সানুদেশে খুব বেশী অরণ্য নেই, কোন কোন স্থানে উট ও ভেড়া চরবার উপযোগী তৃণভূমি থাকার দরুণ

যাযাবর তাতার উপজাতিরা বাস করে। পর্ব্বতের উত্তর দিকে ঢালুতে বৃষ্টিপাত হয় বেশী, সেদিকে শস্য ও ফলমূল বেশী জন্মায়।

কিরঘিজ্ ও কাজাক এই দুটি উপজাতির বাসই এ অঞ্চলে বেশী। উরুমচি যাবার পথে বহুসংখ্যক কাজাক উপনিবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছিল। এদের ঘরবাড়ী নেই, সারা জীবনই কাটিয়ে দেয় চামড়ার তাঁবুতে। কাজাকেরা খুব ভদ্র, অনেক জায়গায় এরা আমাদের উটের দুধ দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে—দুধের দাম দিতে গেলে এরা অপমান বোধ করে। পরিক্রম করবার ক্ষমতা এদের অসাধারণ। দৈহিক শক্তিতে সারা মধ্য-এশিয়ার কাজাকদের তুলনা মেলে না। ডন্ কশাক ছাড়া এদের মত দক্ষ সওয়ার বোধ হয় পৃথিবীতে বেশী নেই। ঈগল পাখীর সাহায্যে শিকারকার্য্যে কাজাকরা অত্যন্ত পটু। শিকারে সুদক্ষ ঈগল পাখীর আদর কাজাকদের মধ্যে এত বেশী যে, শিকারী ঈগল ক্রয়বিক্রয়ের প্রথা নেই এদের মধ্যে। পর্ব্বতশিখরের দুর্গম প্রদেশে ঈগল পাখীর বাসা থেকে পাখীর ছানা সংগ্রহ করা হয়। এ কাজে সাহস ও কৌশল দুইএরই প্রয়োজন আছে—অনেক সময় ধাড়ী ঈগলে সংগ্রহকারীকে আক্রমণ করে, সে অবস্থায় অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করা প্রায় অসম্ভব। দুরারোহ পর্ব্বতশিখরে ধাড়ী ঈগল দ্বারা আক্রান্ত হওয়া অতীব বিপজ্জনক, অনেকে এ অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছে।

দুটি ভাল ঘোড়ার চেয়েও একটা ভাল শিকারী ঈগল মূল্যবান্ বলে গণ্য নয়। শিকারী ঈগল উপঢৌকন দেওয়া সর্ব্বোচ্চ সম্মানের চিহ্ন। ঈগল পাখীদ্বারা সাধারণতঃ কৃষ্ণসার হরিণ শিকার করা হয়—কাজাকরা বলে, অনেক সময় ঈগল-পাখীতে নেকড়ে বাঘ পর্য্যন্ত শিকার করে। নেকড়ে বাঘ শিকার করানোর সময় তিন চার দিন পাখীটাকে কিছু খেতে দেওয়া হয় না, এতে তার রাগ বাড়ে, সাহস দুর্জ্জয় হয়ে ওঠে। তখন সে যে কোন পশুকে আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়। শিকারকার্য্যে সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ পাখীর মালিক পাখীটাকে নিজের হাতে কাঁচা মাংস খেতে দেয়—এতে পাখী খুব বাধ্য থাকে।

উরুম্চি অঞ্চলের ঘোড়া বিখ্যাত। আমরা দেড়শো ডলার দিয়ে দুটি ঘোড়া কিনলাম এবং এখান থেকে উটের গাড়ী ছেড়ে আমরা ঘোড়াতে তুরফান্ ও ইলি প্রদেশের দিকে রওনা হ'লাম। তুরফান্ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অতি প্রিয় স্থান, এই প্রদেশের নানাস্থানে বহু প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়।

এখানকার শাসনকর্ত্তা আমাদের সঙ্গে দু'জন শরীররক্ষী সৈন্য দিলেন, কারণ ইলি অঞ্চলের পার্ব্বত্য জাতিরা খুব দুর্দ্ধর্ষ এবং বিদেশীদের উপর অত্যাচার করতে অভ্যস্ত। এই শরীররক্ষী সৈন্য দুটি সঙ্গে থাকার দরুণ যেখানে আমরা গেলাম, সকলেই যথেষ্ট খাতির যত্ন করলে। যেখানে যাই, সেখানেই ভোজের নিমন্ত্রণ, ভেড়ার আধসিদ্ধ মাংস ও ঘোটকীদুগ্ধের কুমিস্ (এক প্রকার দধি) খেতে খেতে হায়রাণ হয়ে পড়লাম। মাংস ও দুধ এখানে প্রধান খাদ্য, কাজাকে ও টুরবাগাতাই উপজাতিরা চাষ করে না, গ্রীষ্মকালের প্রথমে তুর্কি ও চীনা ব্যবসায়ীগণ মাঝে মাঝে যব এবং গম উটের পিঠে বোঝাই দিয়ে বিক্রয়ের জন্যে আনে এবং শস্যের বদলে পশম ও কুমিস্ নিয়ে যায়।

ইলি নদীর এপারে সর্ব্বত্র স্প্রুস্ গাছের বন, এ অঞ্চলকে শিকারীর স্বর্গ বলা যেতে পারে। স্প্রুসের অরণ্যে দলে দলে কৃষ্ণসার হরিণ চরছে, এক এক দলে ত্রিশ চল্লিশটা থাকে। একদিন বন্দুক হাতে তাঁবু থেকে বেরুলাম, জঙ্গলের মধ্যে দশ পা যেতে না যেতে দুটো বড় হরিণের সাক্ষাৎ মিলল। মাসখানেক পরে আমরা এগারো হাজার ফুট উঁচু মুজার্ট গিরিবর্ত্ম দিয়ে তিয়েন্‌শান্ পর্ব্বতের উত্তর দিকে ঢালু থেকে দক্ষিণ সানুদেশে পৌছুলাম, পথের মধ্যে যেদিকে চাই চারিধারে শুধু শুভ্র তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ শিখররাজি, কতকগুলো শিখর আবার আগাগোড়া সাদা মার্ব্বেল পাথরের।

দক্ষিণ সানুদেশ একেবারে অনাবৃত, বৃক্ষলতাশূন্য, অনেক জায়গায় ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় না, দিনের উত্তাপ প্রায় অসহ্য। দিনে তাঁবুর মধ্যে বিশ্রাম করে এবং রাত্রে ঘোড়া চালিয়ে জুলাই মাসের প্রথমে আমরা কাশগারে পৌছে গেলাম।"

মাঞ্চুকুও (মঙ্গোলিয়া)

জনৈক মার্কিণ পরিব্রাজক লিখিয়াছেন :—

'আমাদের মধ্যে অনেকে সিনেমায় মার্কিন যুক্তরাজ্যের 'কাউবয়'দের ফিল্‌ম্ দেখেছেন।

পশ্চিমদিকের ষ্টেটগুলিতে বড় বড় গোচারণ-ভূমি আছে, সেখানে এক এক দলে দশ হাজার গরু থাকে। 'কাউবয়' মানে, এই গরুর দলের রাখাল। কি, তাদের হাতে পাঁচনবাড়ির বদলে থাকে রিভলভার ও 'ল্যাসো'। তারা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ, জীবনকে তুচ্ছ করে বিপদের মুখে এগিয়ে যেতে তারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তাদের নিয়ে ইংরাজীতে অনেক গল্প ও উপন্যাস লেখা হয়েছে।

কিন্তু, আজকাল যদি কোন লোক পশ্চিম যুক্তরাজ্যে গিয়ে এদের খোঁজ করেন, তবে দেখতে পাবেন, এই শ্রেণীর 'কাউবয়' অনেকদিন অন্তর্হিত হয়েছে।

ওদের দেখা পাওয়া যায় শুধু ফিল্‌মে ও জ্যাক লণ্ডন এবং ও হেন্‌রির গল্পে বা উপন্যাসে।

যখন ভোর পাঁচটার সময় আমি ট্রান্স-সাইবিরিয়ান রেল-পথে হাইলার ষ্টেশনে নামলাম, তখন ভেবেছিলাম, বোধ হয়, হলিউড সহরের কোন সিনেমা-কোম্পানীর ষ্টুডিওতে সাজান 'কাউবয় টাউনে' উপস্থিত হয়েছি।

ঠিক তেমনি ছোট ছোট কাঠের ঘর ও চামড়ার তাঁবু, গরু বাঁধবার খোঁটা, ঘোড়ার দল, দোকানের জানলায় জিন, রেকাব ও লাগাম, অশ্বখুরাঙ্কিত কাঁচা রাস্তা। এত গরু ও ঘোড়া চারিদিকে যে, আমার মনে হল আমি কোন গরু-বিক্রীর হাটে এসে পড়েছি।

মোঙ্গলরা অতিথিবৎসল। অতিথিসৎকারের জন্য পাত্রে চা ঢালা হইতেছে।

হাইলার জাপানের সংরক্ষিত মাঞ্চুকুও রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। ট্রান্স-সাইবিরিয়ান রেলপথে উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেড়াতে বেড়াতে ভাবলাম, নেমে দেখি জায়গাটা কেমন।

সহরে একখানা প্রাচীন মোটরগাড়ী পাওয়া গেল। ১৯০৮ সালের মডেলে তৈরী। তার চীনা মালিকের সঙ্গে দরদস্তুর করে গাড়ীখানা ভাড়া করলাম। সে অঞ্চলের কুত্রাপি আর দ্বিতীয় মোটরগাড়ীর অস্তিত্ব না থাকায় গাড়ীর মালিক তার একচেটে ব্যবসার পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করিতে ছাড়লে না। গাড়ীর ড্রাইভার জনৈক মোঙ্গল যুবক। সে না বোঝে ইংরাজী, না বোঝে চীনা। আমি তাকে হাত পা নেড়ে বোঝালাম যে, মোঙ্গলদের গোচারণ-ভূমি ও পশুপালন দেখতে এসেছি। আমাকে সেই সব জায়গায় সে নিয়ে চলুক।

সহরের বাইরে গিয়ে সে দূর চক্রবালরেখার চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলে, জাহাজের ব্রিজ থেকে কাপ্তেন যেমন চেয়ে দেখে। তারপর হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সে শ্যামল তৃণভূমির উপর দিয়ে দূরবর্ত্তী এক অস্পষ্ট ধূসর বস্তু লক্ষ্য করে ৪০ মাইল বেগে মোটর চালিয়ে দিলে।

কাছাকাছি এসে বোঝা গেল, ধূসর বস্তুটি গরু-মহিষের দল। দু পাঁচ শো নয়, হাজার হাজার—কত হাজার তা দেখে ঠিক করা আমার অসাধ্য। আর একটু দূরে দশ একর জমি জুড়ে শুধুই ঘোড়ার দল। কোথাও এক বর্গ মাইল-ব্যাপী মেষপাল। এ সবের ওপর আছে দু-পাঁচ শো ব্যাক্‌ট্রিয়াদেশীয় উট। অশ্বারোহী মোঙ্গল রাখাল হাতে একটা লম্বা লাঠি নিয়ে এদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, লাঠির আগায় 'ল্যাসো' বাঁধা।

'কাউবয় টাউন' আর কাকে বলে !

তবে, আমেরিকার মত সাদা বাংলোবাড়ী নেই পশুপালন-ভূমিতে, তার বদলে দেখলাম পশমের গোলমত তাঁবু, ছাদটা মোচার মত ক্রমশঃ সরু হয়ে গিয়েছে।

পশুপালক তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই সব তাঁবুতে যাযাবর জিপ্‌সিদের মত বাস করে। আজ এখানে, কাল ওখানে, এক জায়গায় ঘাস ফুরিয়ে গেলে আবার অন্য জায়গায় সরে যাবে।

আমি ড্রাইভারকে বললাম, এ সব পশু কি কোনো ধনী চীনা বা জাপানীর ?

ড্রাইভার বললে, না, এ সব মোঙ্গলদের। এদের মধ্যে অনেকেই খুব ধনী, কিন্তু তবুও পশমের তাঁবু ছাড়া কখনও ইটকাঠের তৈরী ঘরে বাস করে না।

মোঙ্গল-নারীর বেণী লক্ষণীয়, সন্দেহ নাই।

বেলা এগারটা বেজেছে। রোদ চড়েছে খুব। আমি তাঁবু ও পশুপালের ফটো তুলছি এবং মেষরক্ষক হিংস্র কুকুরের দলকে এড়াবার চেষ্টা করছি—এমন সময় আমার ড্রাইভার বললে, খাবার সময় হয়েছে, চলুন হাইলার ফিরে যাই।

বললাম, আমি সারাদিনের জন্যে গাড়ী ভাড়া করেছি যে! এই দাম নিয়েছে আমার কাছে সে কি এখনই ফেরবার জন্যে !

সে আমায় বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলে যে, সারাদিনের জন্যে ভাড়া করলে ওর ডবল দিতে হত। সে আর বলতে রাজী নয়, এখুনি ফিরে যেতেই হবে তাকে। চারিধারে শ্যামল তৃণসমুদ্র, তার কথা শুনে মনে হ'ল, এই অকূল সমুদ্রের বুকে পোতভগ্ন অবস্থায় আমি যেন একটা ভাঙা মাস্তুল ধরে ভাসছি, কম দূর ত নয়, পঞ্চাশ মাইল এসে গিয়েছি হাইলার থেকে।

আমি রেগে বললাম, বেশ, গাড়ী নিয়ে চলে যাও। একটা পয়সা ভাড়া দেব না। আমি আজ রাত্রে এখানে থেকে কাল গরুর গাড়ী কি উটে চেপে হাইলার যাব। আর তোমার মনিবের কাছে গিয়ে তোমার কুব্যবহারের কথা জানাব।

ড্রাইভার বললে, তা করবার জো নেই। মোঙ্গলরা তোমায় জায়গা দেবে না। যদিও জায়গা দেয়, ওদের খাবার খেলে তুমি মরে যাবে। তার ওপর অনেকেই ওদের মধ্যে দস্যু, তোমাকে বন্দী করে দেবে, মুক্তিপণ না দিলে ছাড়বে না।

আমি বললাম, ডাকাত তো দেখছি দুদিকেই। তবে, তোমার চেয়ে আমি মোঙ্গলদের কাছে থাকাই পছন্দ করি। তুমি দূর হও।

গাড়ী দূরে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার পরে আমি একবার চারিদিকে চাইলাম। কাজটা বোধ হয় ভাল করি নি।

ড্রাইভার স্থানীয় লোক, ঠিকই বলেছিল। এই ভীষণ কুকুরের দলের হাত থেকে আপাততঃ সাবধান থাকতে হবে। তারপর আছে সন্দিগ্ধচেতা বর্ব্বর মোঙ্গলের দল। গাড়ীতে ফিরে গেলেই হ'ত।

আমার কাছে যে সব তাঁবু, তার অধিবাসীরা ইতিমধ্যে তাঁবুর বাহিরে এসে অবাক্ হয়ে দূরের ক্রমবিলীয়মান মোটর গাড়ীর দিকে চেয়ে ছিল। ব্যাপার কি, এ বিকৃতমস্তিষ্ক শ্বেতকায় লোকটাকে ফেলে গাড়ীখানাই বা হঠাৎ চলে গেল কেন?

আমি ওদের ভাষা জানি নে। তাদের তাঁবুর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হাতে মাথা রেখে চোখ বুজে নিদ্রার অভিনয় করে বুঝিয়ে দিলাম যে, রাত্রে আমি তাদের তাঁবুতে আশ্রয় চাই। আমার ব্যাপার দেখে তারা হো হো করে হেসে উঠল। জোরে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। একটা বৃদ্ধ নস্যের কৌটা হাতের তালুতে বসিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলে। তাঁবুর মধ্যে মেয়েরা চা তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

একটী ছোট ছেলে ঘোড়ায় চড়ে কোথায় চলে গেল এবং কিছু পরে একজন সুশ্রী মোঙ্গল যুবককে নিয়ে ফিরে এল। বোধ হয় এই যুবকই তাঁবুর মালিক। সে বেশ ইংরাজী জানে। আমায় বললে কেমন আছ? আমি তোমাদের বিলেতে গিয়েছিলাম পশু-চিকিৎসা শিখতে। খাসা দেশ। তবে, অনেক দিন ইংরিজি বলি নি। বিলেত থেকে আমি আর্জ্জেণ্টাইনা যাই পশুপালন শিখতে। তুমি স্পেনিশ জান?

গরুর পায়ে 'নাল' লাগান হইতেছে। অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, মোঙ্গলের গরু নিতান্ত নিরীহ নহে।

জাপানীরা মাঞ্চুকুও রাজ্য অধিকারে আনবার পর থেকে অনেক ছাত্র বিদেশে পাঠিয়ে দেয় নিজেদের খরচে। এ যুবকও জাপান গবর্ণমেণ্টের খরচে বিদেশে গিয়েছিল, পরে জানা গেল। সে বল্লে, জঙ্গিস্ খাঁর বংশে তার জন্ম। একথা বিশ্বাস করা অবিশ্যি খুবই শক্ত, তবুও আমি মেনে নিলুম।

মঙ্গোলিয়া বিশাল দেশ। উত্তর-মঙ্গোলিয়া রাশিয়ার প্রভাবাধীন, পশ্চিম-মঙ্গোলিয়ার কিয়দংশ চীনের অধিকারভুক্ত, বাকী অংশ মাঞ্চুকুও প্রদেশের অন্তর্গত। মোঙ্গলরা বিশ্বাস করে যে, জাপানের সাহায্যে সমগ্র মঙ্গোলিয়া স্বাধীন হবে একদিন এবং সেদিন খুবই নিকটবর্ত্তী। অনেকে বলেন, পরবর্ত্তী মহাযুদ্ধ এই দেশকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হবে। রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ যদি বাধে, তা বাধবে মাঞ্চুকুও নিয়ে নয়, মঙ্গোলিয়া নিয়ে।

মঙ্গোলিয়ার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য প্রচুর। গোবি মরুভূমির নামে সকলেই ভয় পায় বটে, কিন্তু অনেকেই জানে না যে, এই বিশাল মরুভূমি বহুবিধ খনিজ দ্রব্যের আকর এবং জলসেচন করা সম্ভব হলে গোবি মরুভূমির জমি কৃষিকার্য্যের অনুকূল। আর, গোবি মরুই বা সমগ্র মঙ্গোলিয়ার কতটুকু অংশ!

মঙ্গোলিয়ার সর্ব্বত্র হাজার হাজার বর্গ মাইল উৎকৃষ্ট গোচারণ-ভূমি রয়েছে। বর্ত্তমানে সারা এসিয়ার মধ্যে পশু-পালনের জন্যে মঙ্গোলিয়া প্রসিদ্ধ, এখান থেকে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে মাখন ও পনির রপ্তানী হয়, কোন দেশের চেয়ে সে সব জিনিস নিকৃষ্ট নয়।

পশুপালন হিসাবে শীঘ্রই পৃথিবীর মধ্যে এ দেশ বড় হয়ে উঠবে, কারণ মার্কিণ যুক্তরাজ্যে গোচারণের জমি ক্রমশঃ কমে আসছে। সেখানকার লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়ার দরুণ জমি বিনা চাষে ফেলে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠছে।

মঙ্গোলিয়ার লোকসংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ, আয়তনে যুক্তরাজ্যের পশ্চিম ষ্টেটগুলির সম্মিলিত আয়তনের সমান। পশুচারণের পক্ষে এ রকম দেশ পৃথিবীতে আর নেই।

বর্ত্তমানে মঙ্গোলিয়ায় বিশ লক্ষ ঘোড়া, বিশ লক্ষ গরু মহিষ, পাঁচ লক্ষ উট এবং এক কোটী ভেড়া ও ছাগল আছে। তা ছাড়া আছে অগণিত লোমশ পশু, যাদের লোম জগতের বাজারে খুব বেশী দামে কাটে।

তবে, এই লোমশ পশুর মধ্যে ভেড়া বাদ দিলে বাকী সব বন্য। কালে হয় তো এদের সংখ্যা কমে যেতে পারে, যেমন ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও হড্‌সন নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে ঘটেছে. কিন্তু গৃহপালিত জন্তু বাড়বে ছাড়া কমবে না। মাঞ্চুকুও গবর্ণমেণ্ট বুঝেছে যে, দেশের ঐশ্বর্য্য এই গৃহপালিত গরু, ছাগল ভেড়া ও ঘোড়ার ওপর নির্ভর করছে, তাই তারা পশুপালন ও উৎপাদন বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করবার চেষ্টায় আছে।

এ জন্য গবর্ণমেণ্ট অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত নয়। বুনোস্ এরিস্, নিউইয়র্ক, লিভারপুল ও আলজিরিয়া থেকে উৎকৃষ্টজাতীয় পশুর আমদানী করা হচ্ছে। বর্ত্তমান পশুবংশের উন্নতি সাধন করা এর উদ্দেশ্য।

যুবকটী আমায় সঙ্গে নিয়ে তার পশুপাল দেখাতে বার হ'ল।

ছয় সহস্র অশ্বপালের একাংশ। চালকের 'পাঁচনবাড়ি' ও তৎসংশ্লিষ্ট 'ল্যাসো' দ্রষ্টব্য।

এদেশে সকলেই ঘোড়া চড়ে। তাই এদের জুতো পায়ের মাপের চেয়ে অনেক বড় হয়। শীতকালে জুতোর ফাঁকা জায়গা পশম দিয়ে বুঁজিয়ে দেওয়া এদেশের পদ্ধতি। পায়ে হেঁটে এখানে কেউ বড় একটা যায় না, কাজেই জুতো বড় হ'লেও ক্ষতি নেই। চার পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েরাও ঘোড়ায় চড়ে। চামড়ার ষ্ট্রাপ দিয়ে জিনের সঙ্গে এদের বেঁধে দেওয়া হয়।

প্রতি বৎসর বসন্তকালে বালক-বালিকাদের ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়।

চার পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েদের জিনের সঙ্গে বেঁধে ঘোড়াকে পুরো দমে ছুটিয়ে দেওয়া হয় এক মাইল রাস্তা। সাতবছরের ছেলেমেয়েদের জিনের সঙ্গে না-বাঁধা অবস্থায় বিশ মাইল দৌড়ে প্রতিযোগিতা করতে হয়। যে কাজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে করা যায় না, মোঙ্গলরা তেমন কাজ করতে সহজে রাজী হয় না। এই জন্যেই তারা কখনও শস্য বা তরকারীর চাষ করে না—কেন না ঘোড়ার ওপর থেকে কোদাল চালানর সুবিধা নেই।

জেঙ্গিস্ আমায় অনেক দূর নিয়ে গেল তার পশুদল দেখাতে। তার ঘোড়ায় চড়বার ক্ষমতা দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। ছোট রেকাবে দাঁড়িয়ে ঘাড়টা লম্বা করে দিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে ঘোড়দৌড়ের জকির মত। ছোট ছোট পাহাড় পার হবার সময়ে বেগ একটুও কমালে না। তার সঙ্গে খানিকটা ঘোড়া চড়ে গিয়ে আমি হাঁপিয়ে পড়লাম, অমন জকির মত ঘোড়া ছুটানো আমার অভ্যেস নেই।

বহুদূরবিস্তৃত সমতল ভূমিতে পশুদল ছড়ান রয়েছে। দক্ষিণ-আমেরিকার আর্জেণ্টাইনা পশুপালনের জন্যে বিখ্যাত, কিন্তু সেখানেও এত পশু একত্র দেখি নি।

দূরে একটা ক্ষুদ্র হ্রদ, হ্রদের জলে এত মহিষ নেমেছে যে, জল প্রায় দেখা যায় না। এই সুবৃহৎ পশুপাল সবই জেঙ্গিস্ ও তার খুড়োর। ক্রীসাসের মত ধনকুবের হলেও তারা চামড়ার তাঁবুতে বাস করে। তার এক খুড়ো মঙ্গোলিয়ার কোন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা।

জিগ্যেস করলাম, তোমার সে খুড়ো নিশ্চয়ই বাড়ী তৈরী করে বাস করেন ?

জেঙ্গিস বললে, তিনি নিজে তাঁবুতে বাস করেন, তবে উচ্চপদস্থ চীনা ও জাপানী রাজপুরুষদের জন্যে একটা বাড়ী করে রেখে দিয়েছেন। তাঁরা যখন আসেন, বাড়ীতেই থাকেন।

মোঙ্গলেরা মুদ্রার ব্যবহার খুবই কম করে। তাদের ঐশ্বর্য্য পশুপালে। যার যত পশু থাকে, সে তত ধনী। নগদ টাকা কারো বড় একটা নেই। ক্রয়-বিক্রয়েও সাধারণতঃ মুদ্রার ব্যবহার হয় না। পশুপালের বিনিময়ে হয়। জেঙ্গিস্ এত ধনী বটে, কিন্তু ও আমাকে এক পেয়ালা কফি খাওয়ানোর পয়সাও পকেট থেকে ব্যয় করতে পারে না।

আমি বললাম, ধর যদি তোমাদের মধ্যে কারো সহরের কোন জাপানী দোকান থেকে একটা ঘড়ি কেনার দরকার হয়, কি কর তখন ?

ও বললে, আমরা ঘড়ির দামের উপযুক্ত ভেড়ার চামড়া দোকানে নিয়ে যাব এবং তার বদলে ঘড়ি আনব। এদের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি বড় কৌতুকজনক। প্রতি বৎসর হাজার হাজার গরু ভেড়ার কেনা-বেচা হয়, কিন্তু ক্রেতা বা বিক্রেতা মুখে কথা কয়ে দরদস্তুর করে না। দুজনে সামনা-সামনি বসে হাতে হাত দিয়ে আঙ্গুলের সাহায্যে সঙ্কেতে দর ঠিক করে। দর শেষ হয়ে গেলে দুজনেই হো হো করে হেসে উঠে, তারপর দু পেয়ালা কফি আনা হয়। বুঝতে হবে যে, দর উভয় পক্ষের মনঃপূত হয়েছে।

শীতের শেষে প্রতি বৎসর উটের পিঠে ব্যবসায়ীরা কাঁচের বাসন, ছিটের কাপড়, গন্ধদ্রব্য, রেশমী কাপড়, চা, ময়দা এবং মেয়েদের অলঙ্কার নিয়ে এই পশুচারণ-ভুমিতে বিক্রী করতে আনে। তারা এসে এক জায়গায় তাঁবু ফেলে এবং জিনিসপত্র সাজায়। অনেক দূর থেকে মোঙ্গল মেয়েরা আসে দেখতে। তারপর বেচাকেনা আরম্ভ হয়। মুখে কেউ কোন কিছু কথা বলে না। হাতে হাত দিয়ে আঙ্গুলের সাহায্যে দর-দস্তুর ঠিক করে এবং সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসের বদলে ভেড়ার চামড়া, ঘোড়া ও গরু বিনিময় করে নিজের নিজের তাঁবুতে ফিরে যায়।

হাইলারের রাস্তা : পথচারীর মধ্যে অধিকাংশই ছাগল এবং তাহাদের পালক। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও 'ট্রাফিক' নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে।

আজকাল সস্তা জাপানী ও বিলাতী বিলাসদ্রব্যের যথেষ্ট আমদানী করা হয়। অধিকাংশ মোঙ্গলদের তাঁবুতে সস্তা এলার্ম-ঘড়ি, ক্লক্, গ্রামোফোন, টিন-বদ্ধ বিলাতী খাবার, বিস্কুট, চকোলেট্, মোমের পুতুল ও খেলনা প্রভৃতি দেখেছি।

এরা এসব জিনিসের দাম জানে না। এদের কাছে ঠকিয়ে একটা খেলো ঘড়ির বদলে দশ পনরোটা হৃষ্টপুষ্ট ভেড়া কি দুটো ঘোড়া নেওয়া খুব সহজ। ধূর্ত্ত চীনা ব্যবসায়ীরা তাই বুঝে এই সব বিদেশী বিলাসদ্রব্যের আমদানী করে, কারণ পছন্দ হলে মোঙ্গল মেয়েরা যে দামেই হোক্, জিনিস নেবেই।

আমরা একদল ঘোড়ার নিকটবর্ত্তী হবার আগেই দলটা তীরবেগে ছুটে পালাল ; কাছে গিয়ে দেখি, একটা মৃত অশ্বের চারিদিকে কতকগুলি রাখাল জড় হয়েছে। একজন লেজের লোম ছিঁড়ে নিচ্ছে, আর একজন ঘোড়ার দেহের এক অংশ কেটে মাংস সংগ্রহ করছে।

জেঙ্গিস্ বললে—লোম সংগ্রহ করা হচ্ছে আমেরিকায় রপ্তানীর জন্যে—আর মাংস আমরা একটু পরেই খাব।

আমি জানি তোমাদের দেশে লোকে ঘোড়ার মাংস সাধারণতঃ খায় না, কিন্তু খেয়ে দেখলে বুঝতে পারবে, ঘোড়ার মাংস খারাপ জিনিস নয়।

আমি বললাম—এ ঘোড়া কি জবাই করা হয়েছে মাংসের জন্যে ?

জেঙ্গিস্ প্রতিবাদের সুরে বললে—না না, ঘোড়া আমরা কখনই জবাই করি নে। এত বড় দলের মধ্যে দু'চারটে ঘোড়া প্রায়ই কোন না কোন কারণে মারা পড়েছে, আমরা সেই মাংসই খেয়ে উঠতে পারি নে। একটা ঘোড়ার মাংস কি কম ? কত খাব !

—কিন্তু চামড়া বিক্রী করবার জন্যে তো পশুবধ করতেই হয় তোমাদের।

—কখনই না। আমরা বৌদ্ধ, জীবহিংসা আমাদের ধর্ম্মে মহাপাপ। এখান থেকে প্রতি বৎসর অনেক চামড়া বিদেশে পাঠানো হয় বটে, কিন্তু ওই সব পশুদের শতকরা নব্বইটা কোনো না কোনো কারণে আপনা-আপনি মারা পড়েছে। বাকী দশটা পশু বিধর্ম্মীরা কিনে নিয়ে মাংস বা চামড়ার জন্যে বধ করেছে।

মঙ্গোলীয় ঘোড়া অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। শীতকালে বরফের আবরণ সরিয়ে তার তলায় যে সামান্য ঘাস থাকে, তাই খেয়ে বেঁচে থাকে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে যখন তুষারবর্ষী উত্তরবায়ু তাপ নামিয়ে নিয়ে আসে শূন্যাঙ্কের চল্লিশ ডিগ্রি নীচে, তখন তারা এই অনাচ্ছাদিত মুক্ত আকাশের তলায় অবলীলাক্রমে চরে বেড়ায়।

ঘোড়া হল মোঙ্গলদের এক্সপ্রেস-ট্রেন, আর দুই কুঁজওয়ালা ব্যাক্‌ট্রিয়ান্ উট্ এদের মালগাড়ী। একটা সবল উট পিঠে পাঁচশো পাউণ্ড বোঝা নিয়ে দিন সত্তর মাইল পথ অনায়াসে অতিক্রম করবে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরে যদি সন্ধ্যার সময় খাদ্য বা জল না মেলে, তাতেও এরা কাতর হয় না। খাদ্য ও জল না খেয়েও কয়েক দিন কাটিয়ে দেবে। এদের দুই কুঁজে চার পাঁচদিনের উপযোগী খাদ্য সঞ্চিত থাকে, বেশীদিন না খেয়ে থাকলে কুঁজ ক্রমশঃ নেমে ঢিলে হয়ে আসে। তখন বোঝা যায় যে, এবার উটকে খেতে দিতে হবে।

ভেড়ার লোমের আবরণাচ্ছাদিত শকট।

জেঙ্গিসের তাঁবুর কাছে আমি দুটী উট দেখলাম, তাদের কুঁজ একেবারে বসে গিয়েছে। জেঙ্গিস্ বল্‌লে, ওরা বহুদূর থেকে পশমের বোঝা নিয়ে আজ দুপুরের পর এসে পৌঁছেছে। বিশ্রাম করলে তবে খেতে দেওয়া হবে।

এক জায়গায় মেষদল চরছে। মেষপালক ঘোড়ার পিঠে তাদের পাহারা দিচ্ছে, তার হাতে পনেরো ফুট লম্বা লাঠি, লাঠির আগায় দড়ির ফাঁস বাঁধা। জেঙ্গিস্ বল্‌লে, ভেড়ার দলে নেক্‌ড়ে বাঘ পড়লে ঐ দড়ির ফাঁস কৌশলে নেক্‌ড়ে বাঘের গলায় পরিয়ে তাকে ঘোড়ার পেছনে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতেই সে মারা পড়ে।

মোঙ্গলরা নেকড়ে বাঘকে ভয় করে না, রাশিয়ান্ ও চীনারা নেকড়া বাঘের দল দেখলে পালিয়ে যায় এবং অনেক সময় লোকশূন্য ষ্টেপি-তে নেকড়ে বাঘের হাতে প্রাণ দেয়। কিন্তু, মোঙ্গলরা এগিয়ে গিয়ে নেক্‌ড়ে মারবার চেষ্টা করে এবং অনেক সময় জীবন্ত অবস্থায় ধরেও নিয়ে আসে। আমেরিকার বিভিন্ন পশুশালার জন্যে উচ্চমূল্যে এই সব নেকড়ে বাঘ রপ্তানী করা হয়।

বর্ত্তমানে জাপান অষ্ট্রেলিয়া থেকে পশম আমদানী করে, কিন্তু জাপান চায় মাঞ্চুকুও থেকে পশম নিতে। জাপানে ভেড়া চরাবার জমি নেই, লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী, তাই আজ বছর দুই হল এখানে মাঞ্চুকুও মেষপালন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাপানী গবর্ণমেণ্ট অনেক টাকা ফেলেছে এতে। দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে উন্নত ধরণের মেষ আমদানী করা হচ্ছে, কারণ মোঙ্গলীয় ভেড়ার লোম নিকৃষ্টশ্রেণীর। মেরিনো ভেড়ার সাহায্যে উৎকৃষ্ট ভেড়ার বংশ তৈরী করবার চেষ্টা চলছে। কয়েকজন জাপানী বিশেষজ্ঞ একাজে নিযুক্ত আছেন।

পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজন

পা'রী সহরে ছ'জন আমেরিকান ভ্রমণকারী এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা আমাজন নদীর উপত্যকার সমগ্র অংশ ভ্রমণ করে ঐ দেশ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করেছেন। এঁদের অধিনায়ক ডাঃ স্কুর্জ্জ।

এই ভ্রমণ নিছক সখের জন্যে নয়। মার্কিণ যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট অবিশুদ্ধ রবার উৎপাদন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে নিজের খরচে ডাঃ স্কুর্জ্জের অধীনে পাঁচজন রবার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে আমাজনের উপত্যকায় পাঠিয়েছিলেন। দশমাসে তাঁরা বিশ হাজার মাইলের উপর ভ্রমণ করেন এবং আমাজন নদীর শাখা-প্রশাখা নিয়ে সাঁইত্রিশটি নদী বেড়িয়েছেন। ব্রেজিল গবর্ণমেণ্ট একখানি ভাল ষ্টীমার পাঠিয়ে এঁদের সাহায্য করেছিলেন। বলিভিয়া ও পেরুর গবর্ণমেণ্টও তাঁদের দেশে অবস্থানকালে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এই সব সাহায্য না পেলে হয়ত ডাঃ স্কুর্জ্জ ও তাঁর দলের কাজ সহজ হয়ে উঠত না—কারণ আমাজন নদীর উপত্যকা অতি বিষম অরণ্যসঙ্কুল স্থান। দুর্দ্দান্ত অসভ্য ইণ্ডিয়ানদের অত্যাচারে ইতিপূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে অনেক ভ্রমণকারী বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছেন।

হুইটোটা ইণ্ডিয়ান: আমাজন নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলের বহু উপজাতির অন্যতম। ইহাঁদের বিচিত্র অলঙ্কার দ্রষ্টব্য।

ব্রেজিল রাজ্যে ভ্রমণকালীন ব্রেজিল গবর্ণমেণ্টের চারজন প্রতিনিধি সব সময় এদের সঙ্গে বেড়াত। এই চারজন লোকের প্রত্যেকেই আমাজন নদীর ভৌগোলিক তথ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। যেখানে ষ্টীমারে যাওয়া সম্ভব নয়, সেখানে এঁরা ষ্টীমলঞ্চে ভ্রমণ করেছিলেন। ষ্টীমলঞ্চও যেখানে অচল, সেখানে ডোঙায় বা ভেলায়। ৪০০ মাইল যেতে হয়েছিল অশ্ব ও অশ্বতরপৃষ্ঠে, চার পাঁচ শত মাইল হাঁটতে হয়েছিল।

আমাজন নদীর নামের উৎপত্তি একটা আষাঢ়ে গল্প থেকে।

এই গল্পের বক্তা ফ্রান্সিস্কো ওর্লেনা বলে একজন পর্য্যটক, রিওমার নদীর ঘোলাজলে ডোঙা বেয়ে গিয়ে শ্বেতকায় ব্যক্তিদের মতে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ব্রেজিলের দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে রবারের গাছ আবিষ্কার করেন।

১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলের বিখ্যাত রৌপ্যখনি আবিষ্কারের আশায় ঘোর অরণ্যমধ্যে ভ্রাম্যমান বিপদ্‌গ্রস্ত স্পেনীয় সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক সন্‌জালো সিজারো এঁকে প্রেরণ করেন সৈন্যদলের জন্য খাদ্য খুঁজে বার করতে।

ফ্রান্সিস্কো ওর্লেনা একটি মাত্র নদী বেয়েই ভাঁটার দিকে চললেন। নদীটি রিওমার। কয়েক মাস ধরে অনবরত চলতে চলতে তিনি পৌঁছলেন আটলাণ্টিকে। স্পেনে পৌঁছে ইনি গল্প করেছিলেন যে, এই ভ্রমণের সময় তিনি একদল বীর-নারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়ে অতি কষ্টে উদ্ধার পেয়ে এসেছেন।

এই নারীসৈন্য মাথায় খুব লম্বা চুল রাখে। এরা ধনুর্ব্বাণ চালনায় সুনিপুণ। এদের দেহ সুগঠিত, যদিও দেখতে খুব সুশ্রী নয়। ট্রম্বেটা নদীর ধারে এই নারীদলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল।

খুব সম্ভব ওর্লেনার এ গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা। হয় ত দীর্ঘকেশ ইণ্ডিয়ানদের দেখে ওর্লেনা এ কথা বলে থাকবেন। কিংবা হয় তো কথাটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, মুগ্ধ স্বদেশবাসীর চোখে আরও বড় হবার আশায় ওর্লেনা এই গল্প করে থাকবেন। মোটের উপর, সত্য হ'ক, মিথ্যে হ'ক, সেই গল্প থেকেই নদীর নাম হয়ে গেল এই বীরনারীদের নামে। সে বহুকালের কথা হ'ল। ওর্লেনার নদী ভ্রমণের পরে বহু পর্য্যটক আমাজন নদীর আরণ্য অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু সেই নারীদলের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত কারও সাক্ষাৎ হয় নি।

গাট্টাপার্চ্চা বৃক্ষ: রসের জন্য গা কাটা হইয়াছে।

পেরুর ভীষণ গৃহযুদ্ধে কিছুদিন পরে পিজারো ভ্রাতাদ্বয় হত হন এবং লোপ ডি এগুইর আমাজন নদীর আরণ্য ভূমিতে একদল সৈন্যসহ প্রবেশ করেন। এই লোপ ডি এগুইর যে কি ভয়ানক প্রকৃতির লোক ছিলেন, যাঁরা প্রেস্‌কটের পেরুর ইতিহাস পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন। লোপ ডি এগুইর পর পর দুজন সেনাপতিকে হত্যা করে ঐ বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। এঁর উদ্দেশ্য ছিল, আমাজনের গভীর জঙ্গলে কোথায় নাকি ধনরত্নপূর্ণ নগরী লতাপাতার আড়ালে লুকানো আছে, সেই স্থান খুঁজে বার করা। বলা বাহুল্য, এমন কোন প্রাচীন নগরীর সন্ধান তিনি পান নি। অর্দ্ধেকের উপর সৈন্য পথকষ্টে মারা যাওয়ায় পরে বাকী অর্দ্ধেক সৈন্য নিয়ে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় নিজে ফিরে এসেছিলেন।

জনৈক পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক পেড্রো ডি ট্যাক্সিরা পূবদিক থেকে নদী বেয়ে সাও পাওলো পর্য্যন্ত জঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর হন এবং অনেক জায়গায় পর্ত্তুগালের পতাকা উত্তোলিত করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে দুইজন মার্কিণ নৌবিভাগের কর্ম্মচারী আমাজন নদী ও অরণ্যপ্রদেশের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেন। তখন স্পেনীয় অভিযান ও বিজয়ের দিনগুলি প্রাচীন অতীতে পর্য্যবসিত হয়েছে, পিজারোর দলের কাজকর্ম্ম উপকথায় দাঁড়িয়েছে, অরণ্যের মধ্যে লুকান ধনরত্নপূর্ণ প্রাচীন নগরীর কথা আর কেউ চিন্তা করে না, তখন লোকে আমাজনের অরণ্যে উদ্ভিদতত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্বে অধিক উৎসাহী।

এই উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছিলেন জগদ্বিখ্যাত জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক হুমবোল্‌ট ও ফরাসী উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ কাসলনো; ইংরাজ বৈজ্ঞানিক বেট্‌স্‌ ও ওয়ালেস। উপরোক্ত নৌবিভাগের কর্ম্মচারিদ্বয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আন্তিজ পর্ব্বত পর্য্যন্ত অতিক্রম করে আমাজন নদীতে নৌকা ভাসান এবং বেনি ও লা পাজের পথে বহুদূর পর্য্যটন করেন। যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্টের কাছে এঁরা আমাজন নদীর ভৌগোলিক তথ্য বিষয়ক যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, জগতের মধ্যে তা অতি উচ্চদরের ভৌগোলিক বিবরণের মানদণ্ড বলে আজও গণ্য হয়।

অন্যান্য পর্য্যটকের মধ্যে দুজন মহিলা পর্য্যটকের নাম উল্লেখযোগ্য।

একজন হচ্চেন মাদাম কুড্রু। পা'রা ষ্টেটের নদীগুলি ভ্রমণ করে দেখা ছিল এঁর প্রধান কাজ। এঁর স্বামী এই কাজ করতে গিয়ে মারা পড়েন। স্বামীর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্যে ইনি প্রাণপণে চেষ্টা করে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। আর একজন মহিলা পর্য্যটক হচ্ছেন ডাঃ এমিলিয়া স্নেথলেজ; ইনি সুইস বৈজ্ঞানিক, জিঙ্গু ও টাপাজো নদীপথে ইনি যে ভীষণ দুর্গম আরণ্য অঞ্চলে যাত্রা করেছিলেন, স্থানীয় রবার-চাষীরাও সে অঞ্চলের সন্ধান রাখত না।

এ সব বিখ্যাত পর্য্যটকদের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নাম ভুলে গেলে চলবে না। ১৯১৩-১৪ সালে অনেকখানি আরণ্যভূভাগে,—প্রকৃতপক্ষে বিচার করে দেখলে মাতো গ্রাসো থেকে আরাওয়া নদী পর্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে ইনি পর্য্যটন করেন এবং অনেক পূর্ব্বপ্রচলিত ভুল ধারণার খণ্ডন করেন।

রবার বৃক্ষের সন্ধানে যারা আমাজনের অরণ্যে ঢুকেছিল এবং জীবন তুচ্ছ করে বহুদূর অঞ্চল ভ্রমণ করে অনেক নতুন ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিল—এদের দ্বারা আমাজন ভূভাগের অনেক অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। রবারের সন্ধানে বেরিয়ে সুয়ারেজ বলিভিয়াতে প্রায় একটা সাম্রাজ্যই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই দলের মধ্যে এক দল নিরক্ষর পেরুভিয়ান্ রবার-সংগ্রাহক আমাজন জঙ্গলের অত্যন্ত ক্ষতি করেছে। এরা জংলী রবার গাছ অনুসন্ধান করে বেড়াত এবং যেখানেই এরা জঙ্গল দেখত, রবার সংগ্রহের জন্যে নিষ্ঠুরভাবে নির্ম্মূল করে আবার নতুন অঞ্চলে নতুন গাছের সন্ধানে রওনা হত। এদের নির্ম্মম হস্তচিহ্ন দেখা যাবে জিঙ্গু নদীর দূরে ব্রেজিল ও বলিভিয়ায় তাবৎ আরণ্য অঞ্চলে।

আমাজন-বক্ষে ভাসমান কুমীরের দল।

দৈর্ঘ্যে আমাজন খুব বড় নদী না হলেও এর শাখানদী সংখ্যায় এত বেশী এবং আমাজন নদীর অববাহিকা এত বিস্তৃত যে, আমেরিকার মধ্যে ত বটেই, পৃথিবীর মধ্যে এ যে অন্যতম বৃহৎ নদী, এ বিষয়ে ভৌগোলিকগণের মতদ্বৈধ নেই।

পেরুভিয়ান্ আণ্ডিজের এক উচ্চ মালভূমির উপরকার পার্ব্বত্যহ্রদ থেকে বার হয়ে আমাজন নদী এক বিরাট খাতের মধ্যে দিয়ে কিছুদূর সোজা উত্তরে চলে গিয়েছে। তারপর হঠাৎ পূর্ব্বদিকে গতি ফিরিয়ে আণ্ডিজ পর্ব্বতের শেষ হ্রদের মধ্যে দিয়ে কেটে বেরিয়ে আমাজন নদী সমতল উপত্যকাভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই জায়গাটার নাম পঙ্গো। পঙ্গোতে আমাজন নদী প্রায় ৫০ ফুট চওড়া, এর স্রোতও অত্যন্ত খরতর। কিন্তু দু'হাজার মাইল নীচের দিকে আমাজন নদী এত চওড়া যে, এপার থেকে ওপার প্রায় দেখা যায় না।

ব্রেজিলের মধ্যে যখন আমাজন প্রবাহিত, তখন এর খাত একটা নয়, সাধারণতঃ তিন চারটি। মাঝে মাঝে আড়াআড়ি অবস্থায় অন্য নদীও একে কেটে গিয়েছে। কেবল ওবিডোস্ নামক স্থানে আমাজন নদীর খাত একটি মাত্র। এখানে নদী হাজার ফুটেরও কম চওড়া, স্রোতের বেগ ঘণ্টায় দু'মাইলের বেশী নয়। গভীরতা ৩৫০ ফুট।

আমাজন নদীর শাখানদীগুলিও অত্যন্ত বৃহৎ। নামেই তারা শাখা, অনেক সময় আয়তনে ও জলরাশির বিপুলতায় প্রধান নদীখাতের অপেক্ষাও বড়। কোন কোন শাখানদীর আবার বহু শাখা-প্রশাখা আছে, যেমন ম্যাডিরা ও নিগ্রো

নদী। শেষোক্ত নদী দক্ষিণ-পূর্ব্ব কলম্বিয়ার অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ও গভীর অরণ্যাহত ভূভাগের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসছে এবং এই বনের মধ্যে কোথাও ব্রেজিলের অন্যতম বৃহৎ নদী ওরিনাকোর সঙ্গে এর সংযোগ হয়েছে। নিগ্রো নদী অত্যন্ত চওড়া। বয়েম্ নামক স্থানে এর এক দিকের পার থেকে অপর পারের ব্যবধান আট মাইল। শাখানদীগুলির গতিও বিচিত্র ধরণের।

এর কোনটা সমস্ত পথই এঁকে বেঁকে গিয়েছে। কোনটা সোজা চলেছে সারাপথ, যেমন ব্রঙ্কো ও টাপাজোস্ নদী। কোন নদীর জল কালো, যেমন নিগ্রো নদী। জল কালো বলেই নদীর নাম ওই। ব্রঙ্কো নদীর জল আবার কাচের মত নির্ম্মল। দুধের মত সাদা রংয়ের জল, এমন নদীও আছে—গুয়াসোর। কথাটার মানেই 'দুধ'।

কিন্তু অধিকাংশ নদীর জলই গৈরিক, যেমন আমাজন নদীর। এর প্রধান খাতের জল অত্যন্ত ঘোলা।

আমাজনের শাখা নদী সমূহের নামগুলি প্রায়ই ইণ্ডিয়ানদের প্রদত্ত। কতকগুলি তাদের দেবতাদের নামে উৎসর্গীকৃত, যেমন জিঙ্গু, পারো ও জুরুয়া নদী। বৈদেশিক পর্য্যটক ও আবিষ্কারকদের নামেও অনেক নদীর নামকরণ করা হয়েছে, যেমন হিথ্, ওর্টন, রুজভেল্ট নদী।

রিয়ো ব্রঙ্কোর বুকে কচ্ছপকুল।

ম্যাডিরা নদীর ধার দিয়ে রেলপথ প্রস্তুত করা হয়েছে বহুব্যয়ে। পূর্ব্বে বলিভিয়া রাজ্যের রবার নদী ও জঙ্গলের পথে আসতে অনেক দেরী হত। ম্যালেরিয়া ও অসভ্য ইণ্ডিয়ানদের হাতে অনেক লোক পথে মারা পড়ত। নদীর খরস্রোতে অনেক রবার-বোঝাই ডোঙ্গা ডুবে যেত।

১৮৭০ সালে কর্ণেল চার্চ্চ নামে জনৈক মার্কিন এঞ্জিনিয়ার রেলপথের কল্পনা করে বলিভিয়ান্ গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তখন কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নি, কারণ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নি। ১৮৭৮ সালে ফিলাডেলফিয়া সহরের একটি কোম্পানী রেলপথ প্রস্তুতের ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হয়ে কাজ আরম্ভ করে দেয়।

কিন্তু আমাজন নদীর আরণ্য অঞ্চল শ্বেতকায় লোকের পক্ষে যমালয় স্বরূপ। যে বৎসর রেলপথের কাজ সুরু করা হ'ল, বছর শেষ হবার পূর্ব্বেই রেলপথ তৈরীর কল্পনা ত্যাগ করে কোম্পানীর লোকজন যারা তখনও বেঁচে ছিল, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল।

১৯০৩ সালে ব্রেজিলের সঙ্গে বলিভিয়ার যুদ্ধ হয় এবং ঐ বৎসরেই উভয় রাজ্যের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ব্রেজিল গবর্ণমেণ্ট ম্যাডিরা নদীর তীরে রেলপথ বসাতে বাধ্য থাকেন। কারণ বলিভিয়া নিজের রাজ্যের খানিকটা অংশ ব্রেজিলকে ছেড়ে দিয়েছিল সন্ধি অনুসারে। রেলপথ তৈরীর কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয় বিখ্যাত মার্কিন এঞ্জিনিয়ার মিঃ পার্সিভালকে।

রেলপথের কাজ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সমস্যা আবার দেখা দিলে। ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর ও বেরিবেরিতে লোকে হাজারে হাজারে মরতে লাগল। ছ'শো জার্ম্মাণ মজুরের মধ্যে চারশো কয়েক মাসের মধ্যে মারা পড়ল। গ্রীক্ ও স্পেনীয় মজুরেরা অপেক্ষাকৃত কম ভুগল বটে, কিন্তু তাদের কাজ করবার শক্তি অনেক কমে গেল।

রেলপথ যখন ভাসি-পারানা পর্য্যন্ত পৌছেছে, তখন অবস্থা এমন হয়ে উঠেছে যে, কাজ প্রায় অচল, একটা মজুরও

সুস্থ নেই, যারা একটু ভাল আছে, তারা আমাশয়ে ভুগছে। ১৮৭৮ সালের মত এবারও রেল-তৈরীর কল্পনা পরিত্যাগ করতে হবে এমনই দাঁড়াল ব্যাপারটা।

এই বিপুল চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় যাতে ব্যর্থ না হয়, তার জন্যে কোম্পানী উঠে পড়ে লাগল। প্রতি বৎসর দু টন কুইনিন্ আমদানী করার ব্যবস্থা হল এবং প্রত্যেক লোককে দৈনিক আহার্য্যের সঙ্গে কুইনিন্ খেতে দেওয়ার নিয়ম প্রচারিত হল।

আমাজনের বুকে।

মশার উপদ্রব নিবারণের জন্যে সমস্ত তাঁবুর দরজা জানালায় সরু তারের জালির পর্দ্দা টাঙানো হ'ল। বড় হাঁসপাতাল তো ছিলই, তা ছাড়া অনেক জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে ছোট হাঁসপাতাল ও সমগ্র লাইনে হাঁসপাতাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হ'ল।

মার্কিণ যুক্তরাজ্য থেকে ভাল ভাল ডাক্তার আনা হ'ল, তাঁরা মোটর-ট্রলিতে লাইনের সর্ব্বত্র সারাদিন ঘুরে কুলি-মজুরদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন ও চিকিৎসা কাজে ব্যস্ত রইলেন।

ক্যাণ্ডেলেরিয়া নামক স্থানে বড় হাঁসপাতাল বসা'ন হ'ল। লাইনের বিভিন্ন তাঁবুতে যারা সাংঘাতিক অসুস্থ, তাদের এই কেন্দ্রীয় হাঁসপাতালে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হ'ল। ১৯০৮-১১ সালে ক্যাণ্ডেলেরিয়া হাঁসপাতালে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০,৪৩০ রোগী আনীত হয়েছিল।

মানুষের অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তির এত বড় জয় আর হয় নি। লোকালয় থেকে বহু দূরে দক্ষিণ-আমেরিকার এই ঘোর জঙ্গলাবৃত স্থানে প্রকৃতির সঙ্গে, রোগের সঙ্গে, পূর্ত্তবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের এই যে মহাযুদ্ধ, কোন ইতিহাসে এই যুদ্ধের কথা লেখা নেই, এ সব কথা ইতিহাসে লেখা থাকেও না—এই বিরাট যুদ্ধে শেষকালে জয়ী হয়েছিল মানুষ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রেলপথ তৈরীতে এত বিলম্ব হয়ে গেল যে, ও থেকে আর আর্থিক সুবিধা হ'ল না। রবার রপ্তানীর সুবিধার জন্যই রেলপথ করা। কিন্তু ১৯১১ সালের পরে বাজারে রবারের দাম অত্যন্ত নেমে গেল, বলিভিয়া থেকে আনীত রবারের চাহিদা কমে গেল বাজারে; তার উপর এদিকে রেলরাস্তা প্রস্তুত করবার ব্যয়ের অঙ্ক দেখে ব্রেজিল গবর্ণমেণ্টের চক্ষু স্থির হ'ল। রেল তৈরীর মোট ব্যয় পড়েছিল ত্রিশ কোটী ডলার।

আমাজন নদীর একপ্রকার মাছ: নানাটি।

রেলপথে ট্রেন চালানোর কণ্ট্রাক্ট নিয়েছে একটি ব্রিটিশ কোম্পানী।

এ জন্যে ব্রেজিল গবর্ণমেণ্ট খরচ বাদে কিছু কমিশন ঐ কোম্পানীকে দেন।

সপ্তাহে একখানি ট্রেন পোর্টোভেলো ও গুয়াজারা মিরিমের মধ্যবর্ত্তী জঙ্গলের পথে যাত্রা করে। রাত্রে সেখানা আভুনা গ্রামে থাকে। পথিকদের জন্যে এখানে খাবার খুব ভাল বন্দোবস্ত আছে।

গুয়াজারিম একটা ছোট সহর, এখান থেকে আমাজনের বিখ্যাত জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। এ স্থান থেকে ছোট একটা খাল বেয়ে গেলে গুয়াসোর বা 'দুগ্ধ' নদীতে যাওয়া যায়। ১৯১৩ সালে প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট এই সহর থেকে যাত্রা সুরু করেছিলেন।

ক্যাণ্ডেলেরিয়া হাসপাতাল এখনও আছে। অনেক দূর থেকে রোগী এখানে আসে চিকিৎসার জন্যে। ম্যাডিরা নদীর তীরে সবুজ তৃণাবৃত ক্ষেত্রের মধ্যের হাসপাতালের সুদৃশ্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা অনেক দূর থেকে দর্শকের চক্ষুকে আকৃষ্ট করে। এর দরজা জানালা সরু ইস্পাতের জালের পর্দা দিয়ে ঘেরা। হাসপাতালের চারিপাশে মনোরম পুষ্পোদ্যান ও কৃত্রিম ফোয়ারা।

ম্যাডিরা নদীর বিশাল আরণ্য ভূ-ভাগে ডাঃ উইলিয়ম এমরিককে চেনে না বা শ্রদ্ধা করে না, এমন কোন শ্বেতকায় লোক বা অসভ্য ইণ্ডিয়ান নেই। রেলপথ তৈরীর সেই ভীষণ দুর্দ্দিনের সময় থেকে ডাঃ এমরিক এই হাসপাতালের অধ্যক্ষ। তাঁর সুচিকিৎসায় ও সুব্যবস্থায় যে কত রোগীর প্রাণ রক্ষা হ'য়েছে, তা গুণে শেষ করা যায় না। এত বড় নিঃস্বার্থ, উদারচেতা, সেবাব্রতী বীর কদাচ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাইরে ক'জন লোক এঁকে চেনে ?

গাধার পিঠে রবার গাদা হইয়াছে।

জগতে এমনি হয়, কাঞ্চনকে কেউ চেনে না, কাচ নিয়ে লাফালাফি করে।

আমাজন নদীর তীরবর্ত্তী ভূ-ভাগ কর্দ্দমময় জলা-ভূমি নয়। ২,৭০০,০০০ বর্গ মাইল আমাজন নদীর অববাহিকার মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ মাত্র ভূমি বন্যা বিনা ডুবে যায়। বাকী জায়গাটা একটা উঁচু ডাঙ্গা। কোথাও কোথাও দীর্ঘ, অনুচ্চ পাহাড় আছে, কোথাও বড় বড় পাহাড় আছে। সারা বন্দর থেকে নদীর উজানপথে একদিন গেলেই দীর্ঘ পর্ব্বতমালা দেখা যাবে। পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত সেটা চলে গিয়েছে।

দক্ষিণে বড় বড় তৃণাবৃত প্রান্তর, এখানে পশুপাল সারাদিন চরে বেড়ায়, এদিকে নদীর খালসমূহ খুব বেশী, পাহাড় ও উচ্চভূমির সংখ্যা কম। উত্তরে বড় বড় ঘাসেভরা সমতল ক্ষেত্র, অনেকটা পাম্পাস্ জাতীয় ঘাস।

আমাজন নদীর বিখ্যাত জঙ্গলপ্রধান নদী খাতের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে।

উত্তর-পশ্চিম দিকে রিও ব্রঙ্কোর তীরবর্ত্তী মুক্ত তৃণাবৃত প্রান্তর। তার চারিদিকেই বড় বড় পর্ব্বতমালা ব্রিটিশ গায়েনার সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দুধারে ঘন জঙ্গল, মধ্যে সুঁড়ি নদী—দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ বনের পথে চলবার পরে মন যখন অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন রিও ব্রঙ্কোর মুক্ত তীরভূমি পথিকের প্রাণে নতুন আনন্দের সঞ্চার করে। নিবিড় অরণ্যের পরপার থেকে মুক্তিলাভ করে দেহ ও মন দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী থেকে প্রবহমান শীতল বায়ুর স্পর্শে নবজীবন পায়।

আমাজন নদীর জঙ্গলে গাছপালায়, লতাপাতায় খুব জড়াজড়ি ও নিবিড়তা নেই। সে আছে কেবল নদীর ও খালগুলির তীরের জঙ্গলে। প্রথম ষ্টীমার বা ডোঙ্গা থেকে দেখলে মনে হবে যে, জঙ্গল বুঝি সর্ব্বত্রই এমনি নিবিড়,

আসলে নদী থেকে তীরে নেমে কিছুদূর গেলেই পথিকের সে ভুল ভেঙে যাবে। খুব খোলা জঙ্গল, স্থানে স্থানে এত খোলা যে, গাছপালা কেটে পথ তৈরী করার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু নিম্নভূমিতে বাঁশের জঙ্গল বেশী বলে যাতায়াতের কিছু কষ্ট হয়। যেখানে তালজাতীয় গাছের প্রাচুর্য্য, সেখানে টুবাকূল বলে একজাতীয় কাঁটাগাছের বন খুব ঘন। কিন্তু আমাজন জঙ্গলের যে অংশ বন্যার জলে বার মাস ডুবে থাকে, সে অংশ দিয়ে যাতায়াত করা সব সময়ই বিপজ্জনক। উঁচু ডাঙার জঙ্গলে কোন বিপদ নেই, এক পথ হারিয়ে যাওয়ার বিপদ ছাড়া। জঙ্গলে পথ হারিয়ে ভুল পথে ঘোরার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এ অবস্থায় পথভ্রান্ত পথিক ভয়ে ও দুর্ভাবনায় তারও বিবেচনা-বুদ্ধি হারিয়ে ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে গিয়ে পড়ে। আমাজন জঙ্গলে মানুষের খাদ্যের উপযোগী ফলমূলের নিতান্ত অভাব, তবে শিকার করে খেতে পারলে জীবজন্তুর প্রাচুর্য্য যথেষ্ট।

জল পাওয়া কষ্টকর। মাঝে মাঝে সিপো জাতীয় মোটা মোটা বোড়া সাপের মত লতা আছে, তা কাটলে সুপেয় জল পাওয়া যায়। কিন্তু সিপো লতা কাটা যায় না হঠাৎ। তীক্ষ্ণধার দা বা কুঠার সঙ্গে রাখা এজন্য অত্যন্ত আবশ্যক। অনেক পথভ্রান্ত পথিকের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, যারা খাদ্য ও জলাভাবে মৃতপ্রায় অবস্থায় ইণ্ডিয়ান বা বর্ণশঙ্কর রবার-সংগ্রাহকদের দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে।

এই জঙ্গলের প্রধান গাছ ব্রেজিল বাদাম। জঙ্গলের অন্যান্য গাছপালা থেকে ব্রেজিল বাদামের গাছ অনেক উঁচুতে মাথা তুলে থাকে। বড় বড় গাছের গুঁড়ির পরিধি অনেক সময় ৪০ ফুট পর্য্যন্ত হয়। খুব হালকা জাতীয় কাঠ থেকে আরম্ভ করে অত্যন্ত শক্ত কাঠের জঙ্গল আছে এখানে। আমাজন জঙ্গলের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে বিবিধ বিষতরু আছে। ইণ্ডিয়ানরা সে সব গাছ চেনে বা তীরের ফলায় তাদের বিষ মাখিয়ে জীবজন্তু শিকার করে। দরকার হলে মানুষও মারে। এই সব বিষাক্ত রসের মধ্যে একটি সুতীব্র বিষের স্পেনীয় নাম 'মাটা কালাডো'—এর গন্ধ কিছুক্ষণ নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করলে মানুষ মারা যায়। অথচ শব ব্যবচ্ছেদ করলে বিষের প্রক্রিয়ার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ঐ স্পেনীয় কথাটির অর্থ 'নিঃশব্দ মৃত্যু'। অপর পক্ষে এই জঙ্গলে একটি অদ্ভুত লতাজাতীয় উদ্ভিদ্ আছে, অরণ্যবাসী ইণ্ডিয়ানরা একে বলে 'চুচুয়াসকো'। এই লতার রস নিয়মিত পান করলে মানুষের যৌবন বহুদিন পর্য্যন্ত অটুট থাকে। এই জাতীয় লতা অতীব দুষ্প্রাপ্য, কেবল মাত্র ইণ্ডিয়ানরা এর সন্ধান রাখে।

কলোরাডো নদী

কলোরাডো নদীর নাম বিশ্ববিখ্যাত। যুক্তরাজ্যের উয়োমিং প্রদেশে Wind-river পর্ব্বত এই নদীর উৎপত্তিস্থল। উটা ও আরিজোনা প্রদেশের জলহীন শুষ্ক মালভূমি ও মরুর মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অনেক দূর যাইবার পরে ইহা খাড়া দক্ষিণে গিয়া Old Mexico প্রদেশের মধ্যে ঢুকিয়াছে, পরে আবার কিছু বাঁকিয়া কালিফোর্ণিয়া উপসাগরে গিয়া পড়িতেছে। এক হাজার মাইল ধরিয়া এই নদী উচ্চ পাষাণময় তীরভূমির মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে—মাঝে মাঝে উচ্চভূমি হইতে নিম্নে পড়িতেছে। নৌকায় যাতায়াত করা এই নদীতে এতই বিপজ্জনক যে গত ষোল বৎসরের মধ্যে যতগুলি দল নদী-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিল—তন্মধ্যে মাত্র একটি দলের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

এই দলটির অধিনায়ক ছিলেন মিঃ ক্লাইড এডি—ইনি এবং ইঁহার দলের সকলেই তরুণবয়স্ক কলেজের ছাত্র। কি করিয়া একদল অনভিজ্ঞ তরুণ ছাত্র এই বিপদসঙ্কুল দুরূহ নদীটি উত্তীর্ণ হইয়া গন্তব্যস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, সে বিবরণ অতীব কৌতূহলোদ্দীপক।

গ্রীন্ রিভার হইতে জুন মাসের মাঝামাঝি দলটি রওনা হয়। সেখানকার লোক ইহাদিগকে এই দুঃসাহসিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই। জুন মাসের শেষে বন্যা আসিয়া নদীর জল বাড়াইবে বটে, কিন্তু বিপদ এই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। জলের অল্প নিচেই ক্ষুরধার শিলাখণ্ড ইতস্ততঃ বিরাজমান, স্রোতের তোড়ে কুটা পড়িলে দুখানা হইয়া যায়—যদি ডিঙির সঙ্গে ঐ সব নিমজ্জিত শিলাস্তূপের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়—নৌকা তো খান-খান হইয়া যাইবেই, সেই খরস্রোতে পড়িলে একটি প্রাণীও টিকিবে না। পথের এ সমস্ত বিপদ কাহারও অজানা ছিল না, তবুও এই তরুণদল একটুও দমিল না।
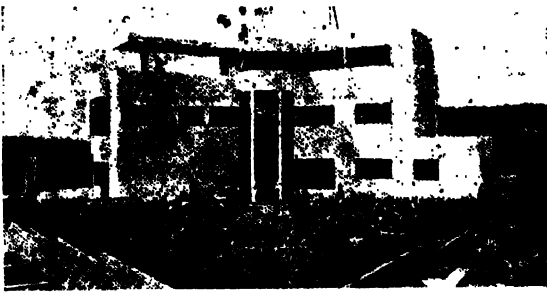
কলোরাডো নদী যুক্তরাজ্যের যে অংশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে—তাহার সবটাই অনুর্ব্বর তৃণগুল্মহীন মালভূমি ও বালুময় মরু। এই নদীর দুইতীর একেবারে জনশূন্য, লোক-বসতিহীন, নদী বহিয়া দুশো পাঁচশো মাইল চলিয়া যাও, কোথাও মানুষের মুখ দেখিতে পাইবে না, আগুনের ধোঁয়া দেখিবে না গৃহপালিত কোন জীবজন্তু দেখিবে না। এই নির্জ্জনতা সকলে সহ্য করিতে পারে না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের ভূতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারী লেফ্‌টেন্যান্ট অইভস্ লিখিয়াছেন—"আমার মনে হয় আমাদের পর আর কোনো সভ্যদেশের মানুষ এই বিজন প্রদেশে পর্য্যটন করিতে আসিবে না। এই অঞ্চলকে মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত করিবার জন্য প্রকৃতি কোনো চেষ্টারই ক্রটী করেন নাই, প্রকৃতির ইচ্ছা বোধ হয় এই যে, কলোরাডো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে মনুষ্য-কীট কোনো দিন বাসা না বাঁধে।"

গ্রীন্ রিভার ও গ্র্যাণ্ড্ রিভার এই ছুটি নদী যেখানে গিয়া মিশিল সেখান হইতেই কলোরাডো নদী প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হইয়াছে। এই অংশে একটিমাত্র রেলপথ নদীর উপরে সেতু বাঁধিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে চলিয়া গিয়াছে—সভ্য মানুষের কীর্ত্তির এই একটিমাত্র চিহ্ন বাদে এখান হইতে সাড়ে সাতশো মাইলের মধ্যে আর কোনো সেতু, ঘরবাড়ী, বাঁধ, কলকারখানা গ্রাম বা সহর কোথাও কিছু নাই। খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে না থাকিলে এই জনহীন মরুপ্রদেশে খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই।

নদীর ধারে এডি-অভিযান-বাহিনীর তাঁবু পড়িয়াছে।

মিঃ এডি ও তাঁহার দলটির উপরোক্ত ছুটি নদীর সঙ্গম-স্থানে পৌঁছিতে লাগিল মাত্র তিন দিন; এই অংশে তত বিপদ নাই, স্রোতও তেমন প্রখর নয়, কাজেই পথের এই ভাগ উত্তীর্ণ হইতে কম সময় লাগিবারই কথা। তাহার পরই কলোরাডো নদীর সুরু এবং নদীর সে অংশ আবার ছুধারের প্রস্তরময় তীর বহিয়া গিয়াছে একটানা একচল্লিশ মাইল। ইহার নাম Cataract Canyon। ভূবিদ্যার ভাষায় এই ধরণের উচ্চ পাষাণময় নদীর পাড়কে Canyon বলে, বাংলায় ইহার কোনো প্রতিশব্দ নাই, সম্ভবতঃ সংস্কৃতেও নাই, কারণ ভারতবর্ষে কোনো নদীরই ভৌগোলিক অবস্থান এমন নহে।

এই Canyon পার হইতে দলটির লাগিয়া গেল সাত আট দিন। গ্রীন্ রিভার হইতে তখন প্রায় ছুইশত মাইলের বেশীও আসা হইয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘপথের মধ্যে কোথাও জনমানবের চিহ্নও মেলে নাই। Cataract Canyon যেখানে শেষ হইয়াছে, একজন বৃদ্ধ সেখানে একা তাঁবু খাটাইয়া অনেকদিন হইতে বাস করিতেছে ও সোনার খনি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ছুইশত মাইলের পরে এই একমাত্র মানুষের মুখ দেখা গেল—এই প্রথম এবং এই শেষ—পরবর্ত্তী দেড়শো মাইলের মধ্যে আর মনুষ্য-বসতি নাই।

রুদ্র সৌন্দর্য্যের একাংশ।

বছর ত্রিশ আগে কলোরাডো নদীতে সোনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। তখন যুক্তরাজ্যের সকল প্রদেশ হইতে দলে দলে লোক সোনার লোভে আসিয়া জুটিতে লাগিল কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গেল যে সোনা এত কম পরিমাণে পাওয়া যায় যে তাহাতে মজুরী পোষায় না। বছর পাঁচেক পরে যে যার নিজের দেশে হতাশ মনে ফিরিয়া গেল—কেবল ঐ একজন ছাড়া।

এই লোকটি আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছর এই নির্জ্জন প্রদেশে একা জীবন কাটাইতেছে। নদীর ধারেই তার কাঠের

কুঁড়েঘর—আশে-পাশে বালুচরে সে দিনরাত সোনার সন্ধানে মাটী খুঁড়িয়া বেড়ায়। এই জনমানবহীন বিজন স্থানে কিসের লোভে সে এতকাল বাস করিতেছে, সেই জানে। অথচ সে যে বিশেষ কোনো ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইয়াছে, তাহা মনে হয় না। পঁচিশ বছর ধরিয়া মানুষে কি করিয়া এই বনবাস স্বেচ্ছায় সহ্য করিতে পারে তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা শক্ত।

তটভূমির দুইপার্শ্বে কঠিন গ্রানিট-স্তর, মধ্যে সঙ্কীর্ণ অথচ খরস্রোতা নদী, আশেপাশে কোথাও শষ্পাগ্রভাগ দৃষ্ট হয় না, প্রখর মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তাপ হইতে রক্ষা পাইবার মত কোথাও সামান্য আশ্রয় পর্য্যন্ত নাই।

বলাবাহুল্য লোকটি বৃদ্ধ হইলেও এখনও খুব কর্ম্মক্ষম ও উদ্যমশীল। ষাট বছর আগে সে Long Islandএর একটি ক্ষুদ্র নগরের রাজপথে তাহার বয়সের অন্য বালক-বালিকাদের সঙ্গে মনের আনন্দে খেলিয়া বেড়াইত—কতকাল সে জন্মভূমি দেখে নাই, নিজের আত্মীয়-স্বজন দেখে নাই—কিন্তু সেজন্য তার মনে এতটুকু দুঃখ নাই।

মিঃ এডি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ জায়গা যদি ছেড়ে দাও, তবে আবার কোথায় যাবে? লোকটি বলিল—এখান থেকে যদি কখনো যাই, তবে মেক্সিকোতে যাবার ইচ্ছে আছে। মেক্সিকোতে সোনার অভাব নাই, কিন্তু সবাই কি আর পায়?

এখান হইতে সাড়ে চারশো মাইল একেবারে জনশূন্য। কলোরাডো নদীর এই অংশ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। দুই তীরের পাথরের পাড় প্রায় এক মাইল উঁচু, এমন ভয়ানক তার খাড়াই যে, নদীতে নৌকা ডুবিয়া গেলে যদি কেহ সাঁতার দিয়া তীরেও ওঠে তবুও এই দুরারোহ পাথরের পাড়ে উঠিবার সাধ্য কাহারও হইবে না—অতএব খাদ্যাভাবে মৃত্যু সুনিশ্চিত। এখানে সূর্য্যের উত্তাপ এত প্রখর যে দুপুরবেলা নদীতে জলের ওপর থাকাও দায়। মাঝে মাঝে এই অংশে লোকবসতির ধ্বংসাবশেষ আছে—যারা ত্রিশ বছর আগে সোনার খনির সন্ধানে আসিয়াছিল, তাদেরই ছোট ছোট কাঠের ঘর, এক আধটা মরিচা-পড়া এঞ্জিন, কোদাল কুড়াল ইত্যাদি। পাষাণময় খাড়া পাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া বন্য পাহাড়ী ভেড়ার দল নীচের নৌকা ও মানুষগুলাকে দেখিতেছিল, এ দৃশ্য তারা কখনও দেখে নাই—মানুষ তাদের কাছে অজ্ঞাত ও অপরিচিত জীব।

কলোরাডো নদীপথে ভ্রমণ করিতে গেলে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। অসতর্ক পথিক যে কোনো মুহূর্ত্তে বিপদে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে পারে। খরস্রোত, চরাবালির চর নিমজ্জিত শিলাখণ্ড এসব আছেই—তা ছাড়া অনেক সময়

প্রচণ্ড কলোরাডো নদীর ক্ষণিক বিশ্রাম-স্থল: সমুদ্র-পথে মহাবেগে ছুটিবার পূর্ব্বে মুহূর্ত্তের এই শান্তশ্রী: পারে সুমহান্ পর্ব্বত শ্রেণী। ইহাকেই কাটারাক্ট কেনিয়ন্ বলা হয়।

তেরোশো ফিট্ উঁচু পাষাণতীর হইতে বড় বড় পাথরের চাঁই খসিয়া পড়ে—অনেক জায়গায় এ ধরণের পাথর পড়িয়া নদীর মাঝখানে স্তূপাকার হইয়া আছে—তার দুপাশে এমন খরস্রোত ও দুরন্ত আবর্ত্ত যে, মাঝি নিতান্ত সুনিপুণ না

ভগ্নতরী মেরামত করা হইতেছে। এই মেরামত ব্যাপারে চারদিন লাগে। শেষ অবধি মেরামতী নৌকাটি কাজে আসে নাই।

হইলে নৌকা সাম্‌লানো একরূপ অসম্ভব। অনেক দূর হইতে ঘূর্ণাবর্ত্তের টানে নৌকা গিয়া পাথরের স্তূপে ধাক্কা খাইয়া উল্টাইয়া যায়—যত বড় সন্তরণপটুই হৌক্ না কেন, এ রকম টানের ও ঘূর্ণাবর্ত্তের মুখে কোনো মানুষই টিকিতে পারে না। তবে নিপুণ ও অভিজ্ঞ মাঝি অনেক দূর হইতেই জলের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া সম্মুখের বিপদ বুঝিতে পারে ও পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হয়।

Cataract Canyonএ একবার হঠাৎ নদীর জল বাড়িয়া দলটি বিপন্ন হইয়াছিল। সারাদিন দাঁড় টানার কঠোর পরিশ্রমের পরে সকলে সন্ধ্যার পরে নৌকা বাঁধিয়া আহারাদি শেষ করিয়া লইল এবং নদীর বালুময় তীরে কম্বল বিছাইয়া যে যেখানে পারিল বিশ্রামের জন্য শুইয়া পড়িল। অনেক রাত্রে একজন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল—তাহার পায়ে জল লাগাতে ঘুমটা ভাঙিয়া গিয়াছে—নদীর দিকে চাহিয়া সভয়ে দেখিল, নদীর জল বাড়িয়া তাহার বিছানা পর্য্যন্ত আসিয়াছে এবং হুহু করিয়া বাড়িতেছে। সে চীৎকার করিয়া সকলকে জাগাইয়া তুলিল—রাতের রান্নার কড়াই, চাটু ইত্যাদি ইতিমধ্যে জলে ভাসিতেছে, জলের তোড়ে নৌকাগুলি সজোরে ডাঙায় আছাড় খাইতেছে, আর একটু বিলম্ব হইলেই একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটিত। সে রাত্রের মধ্যে নদীর জল বাড়িয়া গেল ১৮ ফিট্—সে বছরে অত বড় বন্যা আর হয় নাই।

আর একটা অসুবিধা এই যে, কলোরাডো নদীতে ভ্রমণ করিতে গেলে সবটাই নৌকার উপর চড়িয়া যাওয়া চলে না। মাঝে মাঝে নৌকা ও জিনিষপত্র ঘাড়ে করিয়া পথ হাঁটিতে হয়, কারণ অনেক স্থলে নদীর জল উচ্চস্থান হইতে হঠাৎ এত নিম্নে গিয়া পড়িতেছে যে সে-সব স্থানে কোন মাঝিই নৌকা বাঁচাইতে পারে না। মরুদেশের প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে ভারী নৌকা ও আসবাবপত্র বহিয়া পথ হাঁটা যে কত আরামের, ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না; এই পথ একটু-আধটু নয়, অনেক সময় দশ মাইল বারো মাইল পর্য্যন্ত না হাঁটিলে নিরাপদ অংশে পৌঁছানো যায় না। মিঃ এডির দল এ অসুবিধাও অকাতরে সহ্য করিয়াছিল।

এডি-অভিযানের একটি বিশ্রাম-স্থান।

সাড়ে সাতশো মাইল দীর্ঘ পথের মধ্যে মাত্র পাঁচ ছয়টি স্থানে ভাল পানীয় জল পাওয়া যায়। কলোরাডোর জল অত্যন্ত ঘোলা, পানের অনুপযুক্ত—দু' একটি শাখা নদীর জল ভাল, কিন্তু অধিকাংশই ক্ষারমিশ্রিত ও বিস্বাদ। গ্যালোওয়ে খালের মুখে পরিষ্কার জলের একটা উনুই আছে—এখানকার জল সুপেয়ও বটে, স্বাস্থ্যকরও বটে।

Little Colorado নদী যেখানে আসিয়া কলোরাডো নদীতে মিশিয়াছে, তাহার একটু পরেই Upper Granite Gorge নামে একটি অতীব বিপদসঙ্কুল অংশ অবস্থিত। এখানে দুধারের গ্রানিট্ পাথরের উঁচু পাড়ের মধ্যে নদীর মুখ সঙ্কীর্ণ হইয়া আশী ফিটে দাঁড়াইয়াছে—নদী এখানে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়া উন্মত্ত রোলে কঠিন পাষাণ-তীরে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতেছে—স্রোত যেমন প্রখর, আবর্ত্ত তেমনি ভয়ঙ্কর—ইহার উপর আবার এই স্থানেই নদী এক মাইলের মধ্যে ২৫ ফিট্ নামিয়া গিয়া গভীর বিপদের সৃষ্টি করিয়াছে।

Upper Granite Gorge পার হইয়া অল্পদূরেই জগদ্বিখ্যাত Grand Canyon—ইহার রুদ্র সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই—পৃথিবীর সকল দেশ হইতে পর্য্যটকেরা পথের কষ্ট তুচ্ছ করিয়া প্রকৃতির এই অদৃষ্ট রূপ দেখিতে আসে।

চীনের নদী

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটী এসিয়ার বড় বড় নদীপথগুলির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য মিঃ জোসেফ রকের নেতৃত্বে যে দলটি প্রেরণ করেন, তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত হইল :—

চীনদেশের উত্তর-পশ্চিম ইউনান প্রদেশে ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব তিব্বতের অজানা পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে দৃশ্যাবলী দেখা যায়, সারা পৃথিবীতে উহার তুলনা কোথায় মিলিবে ?

চীনদেশের বিরাট নদীগুলির আশেপাশে যে সকল পর্ব্বতমালা বিদ্যমান, সেগুলি আরোহণ করিবার সৌভাগ্য অনেকেরই ঘটে নাই। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, বহু প্রাচীন কালে এই অঞ্চল সমগ্র মধ্য-এসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমদিগ্‌ব্যাপী এক বিরাট মালভূমির অন্তর্গত ছিল। ঐ উচ্চ মালভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া কালে বড় বড় নদী বাহিয়া চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নদী পৃথিবীর বৃহৎ নদীগুলির অন্যতম।

এই নদীগুলি আদিম যুগের মালভূমিকে শুধু যে এক বিশাল পর্ব্বতময় অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে তাহা নয়, বড় বড় গভীর উপত্যকা ও অন্ধকারময় পাষাণমণ্ডিত নদীখাতেরও সৃষ্টি করিয়াছে। এমন অনেক নদীখাত আছে, যাহার মধ্যে মানুষে কোন দিন প্রবেশ করে নাই।

বিশ হাজার ফুট পর্ব্বতমালার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া স্যালউইন, মেকং ও ইয়াংসি নদী সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে। এই নদীগুলি পশ্চিম চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব তিব্বতে প্রায় সমান্তরাল ভাবে বহিয়া যাইতেছে এবং এক স্থানে পরস্পরের মোহানা পরস্পর হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত।

স্যালউইন : এই সর্পিল পার্ব্বত্য নদী তিব্বতের মধ্য দিয়া আসিয়া বর্ম্মা-শ্যাম সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে।

যখন আমরা আমেরিকা হইতে যাত্রা করি, তখন এই অদ্ভুত নদীখাতগুলির ফটো তুলিয়া আনিব, ইহাই ছিল আমার ইউনান অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই তিনটি নদীই তিব্বতের মালভূমি হইতে বহির্গত বটে, কিন্তু ইহাদের উৎপত্তিস্থান এখনও অজ্ঞাত। স্যালউইন তিব্বত দিয়া বহিয়া আসিয়া বর্ম্মা-শ্যাম সীমান্ত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে এবং মৌলমিনের নিকট ভারতমহাসগরে পড়িতেছে। মেকং নদী অনেকদূর পর্য্যন্ত স্যালউইনের সহিত সমান্তরাল ভাবে চলিয়া আসিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইন্দো-চীনের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে এবং সাইগনের নিকট দক্ষিণ-চীনসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম নদী ইয়াংসি কিছুদূর পর্য্যন্ত মেকং নদীর সহিত সমান্তরালভাবে বহিয়া আসিয়া হঠাৎ বাঁকিয়া উত্তরাভিমুখী হইয়াছে এবং সেই স্থান হইতে পুনরায় দক্ষিণমুখে ফিরিয়া আসিতে একটা খুব জড়িপট্টির সৃষ্টি করিয়া ও দৈর্ঘ্য আরও কয়েকশত মাইল বাড়াইয়া অবশেষে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া সাংহাইয়ের নিকট প্রশান্তমহাসাগরে পড়িতেছে।

ইয়াংসি নদীর বিষয় এখনও বেশী কিছু জানা যায় নাই। মোহানা হইতে ইহা প্রায় ১৫০০ মাইল পর্য্যন্ত ছোট নৌকায় যাওয়া যায়। আরও ছোট নৌকায় তারপর পূর্ব্ব-ইউনান প্রদেশের মাচাং পয্যন্ত যাওয়া চলে। এই নদী সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩০০০ মাইল লম্বা এবং ইহার বহু অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

ইচাং প্রদেশে ইয়াংসি নদী পর্ব্বত কাটিয়া যেঁথানে নিজের রাস্তা করিয়া লইয়াছে, আমেরিকান ভ্রমণকারীদের কৃপায় তাহা এখন বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু ইচাং নদীখাত অপেক্ষাও লিকিয়াং প্রদেশ ইয়াংসি যে খাত নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা আরও অদ্ভুত। এই ভীম নদীখাতে পূর্ব্বে মিঃ বেকো ও ডাঃ হ্যাণ্ডলম্যাজেটি ছাড়া অন্য কোন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী কখনও পদার্পণ করেন নাই। বর্ত্তমান লেখক (জোসেফ রক্, ইয়াংসি অভিযানের দলপতি) পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রমণকারীদের দ্বারা অতিক্রান্ত স্থান ছাড়াইয়া আরও উত্তরে গিয়াছিলেন।

এখানে ইয়াংসি নদী দুইধারে যে পাহাড়ের মধ্য দিয়া বহিতেছে, তাহার উপর ক্যাক্টাস ছাড়া অন্য কোনও গাছ পালা নাই। ক্যাক্টাস (ফণিমনসা জাতীয় গাছ) আমেরিকার গাছ কিন্তু ইউনান প্রদেশের সর্ব্বত্র প্রচুর জন্মায়।
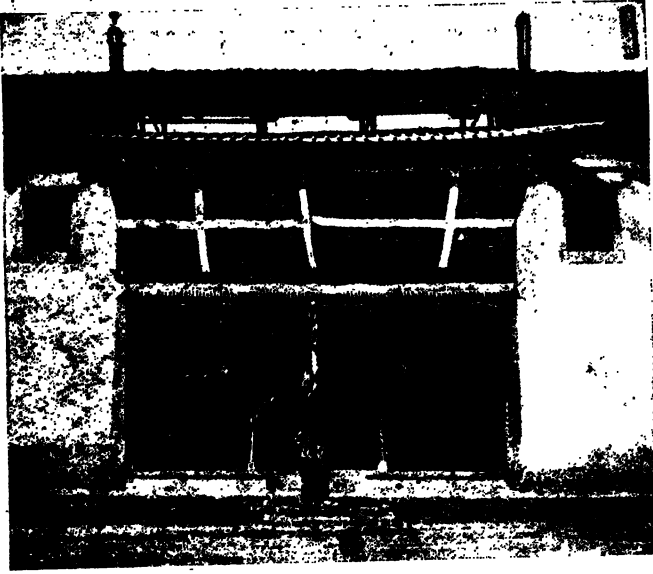
আটুংজি মঠ।

যেখানে দুইটি নদী সমান্তরালভাবে চলিয়াছে, সেখানে তাহাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা, তাহার তুষারাবৃত শিখররাজির সৌন্দর্য্য গভীর নদীখাতের গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া এমন একটি দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা পৃথিবীতে নিতান্ত বিরল। স্যালউইন ও মেকং নদীর মধ্যে অবস্থিত কাকেরপু পর্ব্বতমালা ও তাহার ২৪০০০ ফুট উচ্চ মিয়েটজিমু শৃঙ্গের দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম।

এই পর্ব্বতমালার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ও রহস্যাবৃত নদীখাতগুলির ফটো লইবার উদ্দেশ্যে আমি অক্টোবর মাসে নাশী গ্রাম হইতে (লিকিয়াং পর্ব্বতের পাদমূলে অবস্থিত) বহির্গত হইয়া উত্তরমুখে যাত্রা সুরু করি।

আমার সঙ্গে ১৫ জন কুলী ও অশ্বতর ইত্যাদি ছিল। বর্ষাকাল তখনও শেষ হয় নাই। পথ-ঘাট কর্দ্দমাক্ত, নদী খরস্রোতা। অশ্বতরের পৃষ্ঠে আমি তিন মাসের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া লইলাম। প্রথমদিন বেশীদূর যাইতে না যাইতে এমন বৃষ্টি আসিল যে, টোকে নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া আমাদের তাঁবু ফেলিতে হইল।

আমি গ্রামের একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে রাত্রিযাপন করিলাম। রাত্রিতে ঘুম হইল না। যেমন মশা, তেমনি উকুন। চীনা কুলীরা দিব্য আরামে ঘুমাইতেছিল। পরদিন আমরা লিকিয়াং পর্ব্বতের ১০০০০ ফুট উচ্চ একটি শাখা অতিক্রম করিলাম। এখানে জঙ্গল একটু বেশী ঘন। শোনা গেল এই পথে ডাকাতের উপদ্রব খুব বেশী।

বেলা দুপুরের সময় আমরা শিকু গ্রামে পৌঁছিলাম। সেদিন সেখানে হাটবার, শিকু গ্রামের মধ্য দিয়া একটি মাত্র রাস্তা চলিয়া গিয়াছে এবং হাটবার বলিয়া রাস্তাটি স্ত্রী, পুরুষ, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। চারিধারের পার্ব্বত্য গ্রামগুলি হইতে নাশী, লিসু ও লোলো জাতীয় লোকেরা তরিতরকারী, শূকর, ডিম ইত্যাদি বেচিতে আনিয়াছে।

এই গ্রামের রাস্তার ধারে পাথর কাটিয়া একটি অভিনয়ের স্থান তৈয়ারী করা হইয়াছে। যে ঐ স্থানটি তৈয়ারী করিবার জন্য টাকা দিয়াছে, তাহার নাম ও সে কত টাকা দিয়াছে, তাহা একপার্শ্বে একটি প্রস্তরফলকে খোদিত আছে।

ইউনান প্রদেশের রাস্তাগুলি যতই খারাপ হউক, চলিবার সময় তত কষ্ট হয় না, কিন্তু কষ্টের সুরু হয় তখনই যখন কোন লোকালয়ে প্রবেশ করা যায়। দস্যুসঙ্কুল পার্ব্বত্যস্থানে লোকালয় হইতে দূরে শৈলপাদমূলে অরণ্যের প্রান্তে রাত্রি-যাপন বিদেশী ভ্রমণকারীর পক্ষে আদৌ নিরাপদ নহে, কিন্তু গ্রামে ঢুকিলেই জঞ্জাল, ধূলা, মাছি, উকুন, চণ্ডুর কড়া ধোঁয়া ও গোলমালের দরুণ যে কষ্ট উপস্থিত হয়, দস্যুর হাতে পড়াও তদপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। চীনা গ্রামের সহিত যাঁহাদের পরিচয় নাই, তাঁহাদের এ উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে বিলম্ব হইবে।

তবুও মনে রাখিতে হইবে যে, আমি শিকু গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও পরিষ্কার স্থানে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, অর্থাৎ স্থানীয় মন্দিরে, বুদ্ধমূর্ত্তি যে গৃহে অবস্থিত, সেই গৃহেরই এক পার্শ্বে।

আমার ঘরের পাশেই আস্তাবল, সেখানে মন্দিরের পুরোহিতের অনেকগুলি অশ্ব ও অশ্বতর বাঁধা। উঠানে এত কাদা যে, জুতা পায়ে দিয়া হাঁটিলে জুতার চামড়ার উপর এক পুরু কর্দ্দমের প্রলেপ লাগিয়া যায়। এক পাশে কয়েকটি গ্রাম্য কুকুর বিনা কারণে ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতেছে। ইয়াংসি নদীর বামতীরের পাহাড়ের উপর দিয়া রাস্তা।

ইউনান: মণি-মন্দির। বড় বড় পাথরে 'মণিপদ্মে হুঁ' মন্ত্র লিপিত।

পল্লীগ্রামগুলি খুব শান্ত, নদীর দুধারে উচ্চ পর্ব্বতশিখরে ঘন মেঘপুঞ্জ খেলা করিতেছে। পথের ধারে একটা খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়ের চূড়ায় একটা বৌদ্ধ মন্দির। একটা গ্রামে কেহ মারা গিয়াছে, আত্মীয়-স্বজন শোক প্রকাশ করিতেছে, বাড়ীর উঠানের বেড়ার গায়ে সারি সারি বাঁশের চটা ও কাগজের তৈয়ারী মানুষের মূর্ত্তি, সিডান চেয়ার, বাড়ী, নৌকা, কাগজের ঘোড়া ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, এতগুলি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইয়াছে, পরজগতে ইহারা তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবে।

নদীর ধার দিয়া যে পথ, তার দুই ধারে খুব ঘন জঙ্গল, তবে বড় গাছের চেয়ে ছোট গাছপালা, ঝোপঝাপই বেশী। এক এক জায়গায় দুই দিক্ হইতে জঙ্গল আসিয়া পথকে চাপিয়া ধরিয়াছে। প্রত্যেক গাছের ডালপালায় অসংখ্য মাকড়সার জাল, বড় বড় হল্‌দে রংয়ের মাকড়সা জালের কেন্দ্রস্থানে ওৎ পাতিয়া শিকারের আশায় বসিয়া আছে।

নদীর এক দিক্ খুব উঁচু বেলে পাথরের পাহাড়—ঠিক যেন কেহ পাথরের দেওয়াল গাঁথিয়া রাখিয়াছে, মনে হয়। পাথরের গায়ে জলের দাগ দেখিয়া বুঝা গেল, বর্ষাকালে অনেকদূরে পর্য্যন্ত জল ওঠে।

পথের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। চীন দেশে রাস্তার কখনও সংস্কার করা হয় না। মানুষ পায়ে হাঁটিয়া কোন

ক্রমে হয়ত চলিতে পারে, কিন্তু এসব পথে যানবাহন চলাচল একরূপ অসম্ভব। একটি মন্দিরে আট দশ বৎসরের একটি ক্ষুদ্র বালক একমাত্র সেবাইত। সে মন্দিরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, হয়ত সে তাহার আট বৎসরের জীবনে কোন ইউরোপীয়কে কখনও দেখে নাই।

পাঁচ দিনের দিন আমরা চু-তি-য়েন্ পর্য্যন্ত ভীষণ অন্ধকারময় বনভূমি, বড় বড় বার্চ্চ ও পপ্‌লার, একদিকে বহু নিম্নে খরস্রোতা ইয়াংসি, অন্যদিকে দুরারোহ পর্ব্বত-প্রাচীর। অশ্বতরের পদস্খলন হইলেই ইয়াংসি অভিযানের ছুটি!

চু-তি-য়েন্ গ্রামে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামিল। আশ্রয়স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে একটা ছোট নালার ধারে একটি পাথরের ঘর পাওয়া গেল। ঢুকিয়া দেখি সেটা গ্রামের স্কুল-ঘর। একটিমাত্র চীনা বালক বড় বড় চীনা হরফে বোধ হয়—হস্তলিপি অভ্যাস করিতেছে। কিন্তু কোন গুরুমহাশয়কে দেখিলাম না। লেখাপড়ার প্রতি ছাত্রটির মনোযোগের প্রশংসা না করিয়া উপায় কি?

সেখানেই আশ্রয় লইলাম। বৃষ্টি থামিলে অধ্যবসায়ী ছাত্রটি বিদায় হইল। আমরা ঘরের মেঝেতে বিছানা পাতিলাম। বাতাস চলাচলের কোন অভাব নাই ঘরে, তবে সে বাতাস জানালা দিয়া আসিতেছে না—আসিতেছে মাথার উপরের ছাদ দিয়া। মেঘ-ভরা আকাশে দু' দশটা যা' নক্ষত্র উঠিয়াছিল, তাহাও চোখ উপরের দিকে তুলিয়া দেখিলে বেশ দেখা যায়। গ্রামের লোকের স্কুলের প্রতি যে খুব দৃষ্টি আছে, ঘরের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল না।

কাপু: নাশি লামা।

সন্ধ্যার বাতাসটি অদ্ভুত ধরণের আরামদায়ক, অবশ্য ইহাও দেখিতে হইবে যে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে স্থানটীর উচ্চতা ৯০০০ ফুট। বৃষ্টি থামিয়া গেল; আকাশে এখন বেশ নক্ষত্র উঠিয়াছে, আমরা পথের কষ্ট ভুলিয়া গেলাম।

পাশেই দুইঘর চীনা পরিবার থাকে, তারা আমাদের জল ও কাঠ সরবরাহ করিয়া দিল। তারা এখন তাদের প্রাপ্য অর্থের অংশ লইয়া নিজেদের মধ্যে ঝগড়া সুরু করিয়া দিল—আমরা যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, তাদের ঝগড়া থামে নাই।

ইয়াংসি ও মেকং নদীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত-মালার পাইন ও স্প্রুস্ গাছের অরণ্যের ভিতর দিয়া আমরা চলিলাম। আরও কিছু দূরে গিয়া লিটিশিং পর্ব্বতশ্রেণী, এই পর্ব্বতের উপর দিয়া যে পথ, সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে তাহার উচ্চতা ১১০০০ হাজার ফুট।

বড় বড় গাছের নীচে ঘন বেত-বন, মাঝে মাঝে সমতলভূমিতে জেন্‌সিয়ান্ ফুল ফুটিয়াছে। পর্ব্বতের হাওয়া যেন নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়াছে আমাদের মধ্যে, কি সুন্দর পাখীর ডাক চারিদিকে! এসিয়ার এই সব অঞ্চলে লোক কেন যে বেড়াইতে আসে না, তা'ই ভাবি। রেল নাই, মোটর নাই, হোটেলওয়ালাদের উৎপাত নাই, বর্ত্তমান সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার চিহ্ন হইতে বহুদূরে মধ্য-এসিয়ায় এই অরণ্য ও পর্ব্বতের নিস্তব্ধতা ও গাম্ভীর্য্যের মধ্যে প্রাচীন

চৈনিক জাতির প্রাণশক্তি যেন কোথায় লুকাইয়া আছে,—আজও যে শক্তি অমর, শত বিপদ্‌-বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়াও যাহা চীনদেশ ও চীনা জাতিকে অটুট রাখিয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও রাখিবে।

বৈকালের দিকে আমরা উই-সি গ্রামে পৌছিলাম। সেখানে চারশত ঘর লোকের বাস। মেকং নদীর একটি ক্ষুদ্র শাখার তীরে গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামের চারিদিকে উঁচু মৃন্ময় প্রাচীর, তার তিনদিকে তিনটি প্রবেশ-দ্বার। শুনিলাম এই প্রাচীর বহুকাল পূর্ব্বের তৈয়ারী, দস্যুভয় হইতে নগরের অধিবাসিগণের ধনসম্পত্তি নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যে ইহা গঠিত।

উই-সি গ্রামে একটি ডাকঘর আছে। আমার পত্র ও পার্শেল সেখান হইতে ওয়াশিংটন ডি-সি'তে পাঠাইতে কত ডাকটিকিট লাগিবে, পোষ্ট-মাষ্টার তাহার হিসাব করিতে বসিল এবং ঘণ্টাখানেক ধরিয়া হিসাবের পরে আমাকে জানাইল অত ডাকটিকিট উই-সি ডাকঘরে নাই। আমি বলিলাম, যতগুলা টিকিট পাওয়া যায়, আঁটিয়া পার্শেল পাঠাইয়া দাও।

চীনদেশের ডাক-ব্যবস্থার সপক্ষে একটু বলিতে চাই যে, আমার পত্র ও পার্শেল ঠিক সময়ে ওয়াশিংটনে পৌছিয়াছিল।

উই-সি পরিত্যাগ করিয়া দশ মাইল হাঁটিবার পরে কা-কাটাং গ্রামে পৌছিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রাত্রির আশ্রয়-স্থান খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। গ্রামের বাড়ীগুলিতে কাদার দেওয়াল, পাতায় ছাওয়া। জানালার বালাই নাই। সেগুলি গোহাল কি মানুষ-বাসের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত, তা' চেহারা দেখিয়া নির্ণয় করা শক্ত।

অবশেষে একটা পাহাড়ের ধারে একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়া ভাবিলাম, সেখানেই আশ্রয় লইব। মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া মনে হইল, এখানে বহুকাল মানুষ প্রবেশ করে নাই, মাকড়সার জালে মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগ আচ্ছন্ন। ঘরের সর্ব্বত্র জঞ্জাল।

ইয়াংসি নদীর উপরে সিলিকিয়াং-এ দড়ির ঝোলা।

শীঘ্রই কারণ আবিষ্কার করা গেল। আলো জ্বালিয়া দেখি ঘরের এক পাশে একটা গালার তৈয়ারী শবাধার, তার মধ্যে একটি মৃতদেহ রক্ষিত আছে।

শোনা গেল, এক বৎসর পূর্ব্বে লোকটির মৃত্যু হয় এবং তার পর হইতে তাহার শব এই মন্দিরে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ সমাধিস্থ করিবার শুভদিন এক বৎসরের মধ্যে পাওয়া যায় নাই। নক্ষত্রের ঠিকমত যোগাযোগ ঘটিতেছে না।

বলা বাহুল্য, মন্দির পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের মুক্ত বায়ুতে আসিতে আমাদের মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব হইল না।

এত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে এ সব জায়গায় এত অসুখ-বিসুখ মানুষের কেন যে হয়! আমাদের আসিবার নাম শুনিয়া দলে দলে রোগী আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে ও চিকিৎসিত হইতে আসিল। তাহাদের দেখিয়া কষ্ট হয়, কাহারও শরীরে ক্ষত, গোড়ায় উপযুক্ত ঔষধ না পড়াতে পচিয়া উঠিয়াছে, কাহারও দন্তশূল, কাহারও পেটের

পীড়া—আবার কয়েকটি যক্ষ্মারোগীও তাদের মধ্যে আছে। এ দেশের প্রায় সকলেরই গলায় ছোট বড় গলগণ্ড। অনেকের চোখের অসুখ, বহুদিন ধরিয়া চিকিৎসা না হওয়ার দরুণ তাহারা প্রায় অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের নিকট এসব রোগের ঔষধ কোথায়? আমরা ডাক্তার নই বা সঙ্গে চলন্ত দাওয়াইখানা লইয়াও বেড়াইতেছি না। কিন্তু এ কথা তাহারা শোনে না, তাহাদের বিশ্বাস একদাগ বিলাতী ঔষধ গলাধঃকরণ করিলেই যতদিনের পুরাতন দুরারোগ্য রোগই হউক না কেন, ঠিক সারিয়া যাইবে। বেচারীদের সরল বিশ্বাস ও অসহায় অবস্থা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিল বটে, কিন্তু আমরা সমানই অসহায় এ বিষয়ে। কি করিবার ক্ষমতা আছে আমাদের?

পরদিন আমরা আর একটি গ্রামে পৌছিলাম। এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভুট্টা। গ্রামের আশেপাশের মাঠে, পাহাড়ের ধারে ভুট্টার চাষ খুব।

গ্রামের মণ্ডলের বাড়ী হইতে আমাদের জলযোগের নিমন্ত্রণ আসিল। আমার ক্যামেরা দেখিয়া মণ্ডল তাহার ফটো তুলিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে আমি রাজী হইলাম। সে তখনই তাহার স্ত্রীদিগকে ভাল পোষাক আনিতে বলিল। তারপর ময়লা পোষাকের উপর একটা জমকালো রেশমী আলখাল্লা পরিয়া ভদ্রলোক গম্ভীরমুখে ফটো তোলাইবার জন্য বসিল—যেন সে নিজেই চীন সম্রাট! ইয়েচি নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে আমরা সত্যই এক রাজার বাড়ীতে অতিথি হইলাম। এই রাজার নাম লি—রাজা লি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

১৯০৫ সালে স্যালউইন ও মেকং নদীর মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে নূতন গাছপালার সন্ধান করিতে ইংলণ্ড হইতে একটি বৈজ্ঞানিক অভিযান প্রেরিত হয়—প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ডাঃ জর্জ্জ ফরেষ্ট ছিলেন ইহার নায়ক।

ডাঃ ফরেষ্ট কি কারণে তিব্বতী লামাদের বিরাগভাজন হন এবং তাহারা দলবদ্ধ হইয়া অভিযানকারীদের আক্রমণ করে ও ফাদার ডুবারনার্ড নামক জনৈক ফরাসী পাদ্রি ও আরও কয়েকটি নাশি লামা ও কুলীকে হত্যা করে। দিনের পর দিন ধরিয়া তাহারা ডাঃ ফরেষ্টকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল এবং সে সময়ে ধরা পড়িলে ডাঃ ফরেষ্টের মুণ্ড আটুংজি মঠের সিংদরজা অলঙ্কৃত করিত—সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা লির বন্ধুত্ব ও করুণায় সে যাত্রা ডাঃ ফরেষ্ট বাঁচিয়া যান। রাজা লি এমন এক দুর্গম স্থানে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখেন যে, লামার দল কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।

রাজা লি এখন বৃদ্ধ, অত্যন্ত লাজুক, কিন্তু তাঁর চালচলন, এমন কি বসিবার ধরণটি পর্য্যন্ত আভিজাত্য-মণ্ডিত। তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা বহুকাল ধরিয়া এই পর্ব্বত ও অরণ্যে নাশি ও অন্যান্য জাতির উপর রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন—ইরাবতী নদীর তীর পর্য্যন্ত এক সময়ে এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এমন কি উত্তর-পশ্চিম চীন সীমান্তের দুর্দ্ধর্ষ কুট্‌জু পার্ব্বত্য জাতি পর্য্যন্ত রাজা লিকে রাজস্ব দেয়।

ইয়েচি ছাড়াইয়া জঙ্গলের পথে ১০।১২ দিন যাইবার পরে স্যালউইন নদী পাওয়া যায়। রাজা লির সহায়তায় আমরা ১৩ জন কুলী সংগ্রহ করিয়া দুর্গম জঙ্গলের পথে স্যালউইন নদীর তীরভূমি লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলাম। ভীষণ দুর্গম জঙ্গল, বন্য চেরী, রোডোডেনড্রন বৃক্ষে পূর্ণ, বড় বড় মৌমাছির চাক ডালে ডালে দুলিতেছে—দেখিয়া মনে হইল, ইউরোপীয় ত' দূরের কথা, কোন উপকূল-বাসী সভ্য চীনা লোকও কখনও এ অরণ্যের ধারণা পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না।

স্যালউইন নদীর তীরে পৌছিয়া আমরা বাহাং ফরাসী মিশনে আশ্রয় লইলাম। ফাদার আঁদ্রে বর্ত্তমানে মিশনের অধ্যক্ষ। তাঁহার মধুর আপ্যায়নে ও আতিথেয়তায় আমাদের পথকষ্ট দূর হইল। ফাদার আঁদ্রে সন্ধ্যাবেলা আমাদের কাছে ১৯০৫ সালের লামা-বিদ্রোহের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। এই মিশন-বাড়ীর প্রত্যেক মানুষটিকে তখন উন্মত্ত

লামারা হত্যা করে, কেবল ফাদার জেনৃষ্টিয়ার নামে একজন পাদ্রী রাতারাতি পলাইয়া দূর জঙ্গলের মধ্যে পার্ব্বত্য লিসু জাতিদের গুহার মধ্যে আশ্রয় লওয়াতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

ফাদার আঁদ্রে অবশ্য সে সময় এখানে ছিলেন না, তাঁর বয়স বেশী নয়—কয়েক বৎসর হইল এখানে আসিয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ফাদার আঁদ্রে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ শেষ হইলে সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া এই দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন গ্রহণ করিয়াছেন। এ বড় দুঃখের জীবন, মে হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত সমস্ত পার্ব্বত্য গিরিবর্ত্ম তুষারে ঢাকিয়া যায়, বহির্জগৎ হইতে কোন চিঠিপত্র আসে না—তদুপরি আছে প্রতিমুহূর্ত্তেই—বিশ্বাসঘাতক অসভ্য জাতিদের দ্বারা আক্রমণের আশঙ্কা। দুইবার তারা এই মিশন-বাড়ী পুড়াইয়া দিয়াছে—কি করিয়া কি উদ্দেশ্যে মানুষে এমন স্থানে বাস করে—তরুণ ফাদার আঁদ্রের মনের দুঃখ কি, কে তাহা বলিবে?

পৃথিবীর বিশালতম অরণ্য (আমাজন)

আমাজন নদীর উৎপত্তি-স্থানের জঙ্গলময় অঞ্চল দক্ষিণ-আমেরিকার মধ্যে এখনও অনেকাংশে অজ্ঞাত দেশ। দক্ষিণ-পশ্চিম ব্রেজিলের পারিমা নদী আজ পর্য্যন্ত অনেক শ্বেতকায় সভ্য মানুষ দেখে নাই। ১৯২৫ সালে এলেক্‌জাণ্ডার রাইস্ ও তাঁর দল এরোপ্লেনে এই নদীর উৎপত্তি-স্থান আবিষ্কার করিতে যাত্রা করেন। আকাশ হইতে তাঁরা নিম্নের আরণ্য ভূভাগের অনেকগুলি অতি সুন্দর ফটো লইয়াছিলেন।

জলপথে এই নদী বাহিয়া আসিবার চেষ্টা যে না হইয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু তীরের অজ্ঞাত জঙ্গল ও বনবাসী অসভ্য হিংস্রস্বভাব ইণ্ডিয়ানদের জন্য পূর্ব্বের চেষ্টা প্রায়ই দুর্ঘটনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু ইণ্ডিয়ানদের বিষাক্ত তীর ৫০০০ ফুট উঁচুতে পৌছাইতে পারে না বলিয়া এবং আরও কয়েকটি বিশেষ কারণে ডাঃ রাইস্ আকাশপথে এই অঞ্চল ভ্রমণ করিবার কল্পনা করেন। আমরা ডাঃ রাইসের সেক্রেটারী কাপ্তেন ষ্টিভেন্-সের লিখিত বিবরণ হইতে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

রিয়ো নিগ্রো : দূরে হাইড্রোপ্লেন, সম্মুখে তীরবর্ত্তী তরীর সাহায্যে অভিযাত্রীদল হাইড্রোপ্লেনে যাতায়াত করিতেন।

আমাদের যাত্রা যেদিন আরম্ভ হবে, তার আগের রাত্রে মানাওস্ সহরে একটা ছোটখাট বিদ্রোহ হয়ে গেল। এ কথা কে না জানে যে, দক্ষিণ-আমেরিকার রাজ্যগুলোতে বিদ্রোহ বার মাস লেগেই আছে, কিন্তু আমাদের রওনা হবার পূর্ব্ব রাত্রেই একটা বিদ্রোহ ঘটবে, এটা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

হোটেলের দরজা-জানালা দুম্‌দাম্ শব্দে চারিদিকে বন্ধ হতে লাগল। বাইরে যেন মনে হল বাজি পোড়ানো উৎসব চলছে। প্রথমটা আমরা তাই ভেবেছিলাম বটে, কিন্তু বন্দুকের গুলির শন্ শন্ আওয়াজ তো ভুল হবার নয়, জানালার কাছে যাব এমন সময় একজন হোটেলের ভৃত্য ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে জানালা বন্ধ করতে গেল।

আমরা বললাম, এই রাখ, জানালা খোলা থাক্।

সে এমন কথা কখনও শোনে নি, তার চোখ কপালে উঠল। জানালা খোলা থাক্‌বে কি! বাইরে যে বিদ্রোহ সুরু হয়েছে, গুলি চলছে!

দক্ষিণ-আমেরিকার ছোটখাট রাজ্যগুলির বিদ্রোহের কথা খবরের কাগজে চিরকাল পড়ে আসছি, এই প্রথম আমাদের সে বিদ্রোহ দর্শনের সুযোগ এসেছে। এ আমরা দেখবই। হোটেলের ভৃত্যকে বুঝিয়ে দিলাম।

লোকটা দুর্ব্বোধ্য পর্টুগিজ ভাষায় হাত-পা নেড়ে কি বলতে বলতে বাইরে চলে গেল। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলাম। কলেরার মড়কের সময়ে সহরের রাস্তা-ঘাট যেমন জনশূন্য দেখা যায়, সহরের হয়েছে ঠিক সেই চেহারা।

হঠাৎ দেখি একটা লোক রাস্তা দিয়ে পাগলের মত দিশাহারা ভাবে ছুটছে। দেখে মনে হল, সে কোথাও লুকাবার জায়গা খুঁজছে—কারণ আমাদের জানালার আলো দেখে সে দৌড়ে আমাদের জানালার নীচে এসে দাঁড়াল। কিন্তু আমাদের জানালাটা তার হাতের নাগালের বাইরে। বুল্ ও আমি ঝুঁকে পড়ে তাকে লাফাতে বললাম। সে প্রাণপণে উঁচুদিকে একটা লাফ দিলে, আমরা দু'জনে তাকে টেনে তুললাম। ঘরের মেঝেতে লোকটা শুয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সন্ধ্যার কিছু পরে বাজী পোড়ানো বন্ধ হ'ল। আমরা স্থির করলাম, সহরের অবস্থাটা একবার দেখেই আসা যাক্। রাস্তা-ঘাট তখনও জনশূন্য, একটা রাস্তার মোড়ে একজন সৈনিক পাহারা দিচ্ছে।

আমরা তাকে বললাম—গুলিটা বেশীর ভাগ চলেছে কোথায়?

রিয়ো নিগ্রো ও আমাজন নদীর মিলন-স্থল: আকাশ-যান হইতে ফোটো তোলা হইয়াছে। নিগ্রো নদীর কৃষ্ণ-জল ও আমাজনের গৈরিক-জল গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছে।

সে বললে—বড় স্কোয়ারে। স্কোয়ারের সামনের পুলিশ-ব্যারাক বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে।

স্কোয়ারে হতাহতের সংখ্যা বহু। পুলিশ-ব্যারাক খালি, পুলিশের দল অনেক আগেই পালিয়েছে। দেখে-শুনে হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হ'ল। কারণ গুলি আবার যে কোন মুহূর্ত্তে চলতে পারে।

পরদিন আমাদের ষ্টীমার ও হাইড্রোপ্লেন রিও-নিগ্রোর পথে রওনা হ'ল এবং তারপর ন'মাস ধরে আমরা পৃথিবীর বিশালতম অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করেছি। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ার সুযোগ নেবার জন্য আমি ও হিণ্টন খুব ভোরেই আকাশে উঠলাম ও নদীর উপরে একশো মাইল পর্য্যন্ত উড়ে ফটোগ্রাফ ইত্যাদি নিলাম।

নদীটার নাম নিগ্রো দেওয়া ঠিকই হয়েছে বটে। নদীর জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ। মানাওস সহর থেকে দুশো মাইল পর্য্যন্ত আমরা চললাম, সেখানে রিও ব্র্যাঙ্কা এসে মিশেছে রিও নিগ্রোর সঙ্গে। পূর্ব্বোক্ত নদীর জল দুধের মত শাদা, আমাদের মনে হ'ল কাল কফির পেয়ালায় যেন দুধ ঢালা হচ্ছে।

এইখানে হিণ্টন লক্ষ্য করলে, আমাদের হাইড্রোপ্লেনের অবস্থা ভাল নয়, মেরামত করতে হবে। শিরীষের আঠা, চট, মেহগনির তক্তা ও পেরেক আমাদের সঙ্গেই ছিল। হাইড্রোপ্লেন জলে নামিয়ে আমরা তাকে নদীর ধারের কর্দ্দমাবৃত তীরে ঠেলে তুলে মেরামতের কাজে নিযুক্ত হ'লাম।

কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে কাজ করে কার সাধ্য? ব্রেজিলের জঙ্গলের যত মশা এসে আমাদের ছেঁকে ধরল। উপায় কি? দু'দিন কঠিন পরিশ্রম ও দুঃসহ কষ্টের মধ্য দিয়ে কোনক্রমে কাটল। যেদিন আমরা আবার আকাশে উড়লাম, সেদিনটা বড় মেঘলা। কিন্তু উষ্ণমণ্ডলের অসহ্য রৌদ্রতাপ মেঘে ঢেকে রেখে আমাদের উপকার ছাড়া অপকার কিছু করে নি। নতুবা জুলাই আগষ্ট মাসের গরম সহ্য করা সম্ভব হ'ত না।

রাত্রিগুলি—বিশেষ করে জ্যোৎস্না রাত বড় সুন্দর। মাথার উপরে নক্ষত্ররাশি বিজলী বাতির মত উজ্জ্বল। বৎসরের এই সময় ছায়াপথ ও 'সাদার্ণ ক্রশ' বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় আমাজন নদীর তীরবর্তী অরণ্য সীমাহীন বিশাল পরীরাজ্যে পরিণত হতে দেখেছি, জগতের কোথাও অত সৌন্দর্য্য এক জায়গায় জড় হয় বলে আমার বিশ্বাস নেই।

নদীর কুলুকুলু শব্দ, অরণ্যের সুগন্ধ, বনমধ্যে বানরদলের উচ্চ চীৎকারশব্দ—সবটা মিলিয়ে বনের সৌন্দর্য্যকে বাড়িয়েছে।

এই গভীর জঙ্গলের মাঝে মাঝে যে আবার গ্রাম আছে এবং সেখানে লোক বাস করে, তা কে জান্‌ত? ঐ সব গ্রামের লোক খবর পেয়েছে যে, আমাদের দলের অধ্যক্ষ একজন ডাক্তার। দলে দলে লোক আসতে লাগল, তার মধ্যে ইণ্ডিয়ানই বেশী, পর্টুগিজও আছে। কারো চোখের অসুখ, কারো বা দাঁতের, কারো কাণের, কারো জ্বর—আরও অনেক রকমের।

এ জঙ্গলের মধ্যে ডাক্তার কোথায় যে, এই সব দরিদ্র লোক তার সাহায্য পাবে! দুশো মাইল দূরে মানওস্ সহরে ক'জন গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারে? কিন্তু আমরা সঙ্গে বেশী ঔষধ-পত্র আনি নি, কারণ জঙ্গলের মধ্যে হাঁসপাতাল খুলবার উদ্দেশ্য গোড়ায় আমাদের ছিল না। অনেক রোগী-কেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হ'ল।

আদিম মায়নগঙ্ (Mayongong) ইণ্ডিয়ান্: বিশাল তীর-ধনু রামায়ণ-মহাভারতের যুগের কথা স্মরণে আনে।

খাবার জিনিস বহন করে নিয়ে যাওয়ার ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচবার জন্য আমরা যে স্থান দিয়ে যেতাম, সেখান থেকে খাবার সংগ্রহ করতাম। ওদেশের লোকের সাধারণতঃ খাদ্য—ময়দা, মাংস ও মাছ। নদীর ধারের জঙ্গলে কমলালেবু, আনারস ও কলা বন্য অবস্থায় পাওয়া যায়; লোকালয়ে চাষ করলে ফল যেমন মিষ্ট হয়, প্রায় তেমনি খেতে লাগে।

নানা জাতীয় মাছ নদীতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এক ধরণের মাছ আছে, তারা মানুষের মাংস খায়। এদের জন্য নদীতে সাঁতার দেওয়া বড়ই বিপজ্জনক। মানুষের গায়ের গন্ধ পেলেই তারা ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসবে, এদের দাঁত ক্ষুরের মত ধারালো, অল্পক্ষণের মধ্যে মাংস কেটে হাড় বের করে ফেলবে, এম্‌নি এদের দাঁতের জোর। অনেক সময়ে নৌকা থেকে জলে হাত বাড়ানো মুস্কিল, কুট করে আঙুলটি কেটে নিয়ে যাবে।

শীঘ্রই বিপদ্ এল রোগের মূর্ত্তি ধরে।

ট্রপিক্যাল জঙ্গলে যাওয়ার বিপদ্ আমরা জানতাম; খুব ভাল মশারি, দৈনিক ৫ গ্রেন কুইনিন্ ব্যবহার করা সত্ত্বেও সকলেই ম্যালেরিয়ায় পড়লাম। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে আমাদের দলের অন্যতম নেতা ডাঃ কক্-গ্রুন্‌বার্গ দশ দিনের জ্বরে মারা গেলেন।

তাঁবুতে তখন সকলের জর, এরোপ্লেনের পাইলট্, বেতার-চালক, দুই সার্ভেয়ার, রাঁধুনী ও দু'জন চাকর জরে বেহুঁস। ষ্টীমারের এঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রীও ক্রমে পড়ল জরে। কেউ আর ওঠে না, আমরা জন দুই কেবল ভাল আছি, সেই জঙ্গলের মধ্যে কোথা থেকে বা অত ঔষধ পাই, রোগীর পথ্যই বা আসে কোথা থেকে? আমি নিজে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল ছিলাম, অক্টোবর মাসে আমারও জর হ'ল। জরকে দূর করে দিলাম, মরিয়া হয়ে ১৫০ গ্রেণ কুইনিন্ তিন দিনের মধ্যে খেয়ে ফেলে।

হিণ্টন্ যদি বা সেরে উঠল, তার শরীর এমন দুর্ব্বল ও জরপ্রবণ হয়ে পড়ল যে, এরোপ্লেনে হাজার চারেক ফুট উপরে উঠলেই ওর জর আসবে, যদিও সেখানে ঠাণ্ডা মোটে ৫৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট্। তাকে দিয়ে এরোপ্লেন চালান অসম্ভব হয়ে উঠল, অনেক সময় এরোপ্লেন চালাতে চালাতেই তার জর আসে।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আমরা বোয়া ভিষ্টা বলে একটা ছোট সহরে পৌছুলাম। সহরটায় লোকসংখ্যা চার পাঁচশ'র বেশী নয়, তবে উঁচু জায়গায় অবস্থিত বলে ম্যালেরিয়া জর নেই। সহরের পিছনেই একটা দীর্ঘ শৈল-মালার সুরু, আমাজন ও নিগ্রো নদীর একঘেয়ে সমতল ভূমির জঙ্গলের দৃশ্যে ক্লান্ত চোখ এই শৈলশ্রেণীর প্রথম সন্দর্শনে যেন জুড়িয়ে গেল।

পারিমা নদীর তীরে আদিম অধিবাসীদিগের কুটির। বহু কষ্টে ঘন অরণ্যমধ্যে এই কুটিরের সন্ধান মিলিয়াছিল। আকাশ-যান ব্যতীত ইহার সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল না।

বোয়া ভিষ্টা সহরে আমরা কিছুদিন বিশ্রাম করে জরের পরে বল সঞ্চয় করলাম এবং হাইড্রোপ্লেনটাও মেরামত করে নিলাম।

ওই সহরে পাঁচ জন মিশনারী নিজের হাতে হাঁসপাতাল গড়ছে। এরা সকলেই এসেছে ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ থেকে। বোয়া ভিষ্টা সহরের এই প্রথম হাঁসপাতাল।

তিন মাস আমরা এই ছোট সহরকে কেন্দ্র করে বহু দূর উড়ে বেড়ালাম ও বোয়া এস্পারান্সা থেকে ইউ-রারিসোরা পর্য্যন্ত সমস্ত জঙ্গলটার ফটো নিলাম। বোয়া এস্পারান্সা আর একটা ছোট সহর, বোয়া ভিষ্টা থেকে ১৪০ মাইল দূরে। এর পরে জঙ্গল আরও ঘন, ওপথে সভ্য লোকে বেশী যাতায়াত করে নি, মোটরের তেল ও পেট্রল পাবার কোন উপায় নেই এক বোয়া এস্পারান্সা ছাড়া।

একদিন সকালে সাড়ে ছ'টার সময়ে বোয়া এস্পারান্সা ছেড়ে আমরা জঙ্গলের দিকে উড়লাম—কি ভীষণ জঙ্গল সুরু হয়েছে এর পরে! জঙ্গল আরও ভয়ানক বলে বোধ হতে লাগল এই জন্য যে, নীচের দিকে চেয়ে দেখি, বিপদে পড়লে হাইড্রোপ্লেন নদীর জলে নামানো যাবে না, নদীর জল ক্রমাগত উপর থেকে নীচের দিকে নামছে—এত প্রখর স্রোতে হাইড্রোপ্লেন এক দণ্ডও টিকবে না। নব্বই মাইল ধরে নদী কেবল ধাপে ধাপে নেমে চলেছে, স্থির জল কোথাও চোখে পড়ে না।

আমাদের নীচে সবুজের সমুদ্র, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, আকাশের মত উপর থেকে সত্যই সমুদ্রের মত মনে হয়—বহু দূরে একটা নীলকৃষ্ণ পর্ব্বতমালার অস্পষ্ট উপকূল। জঙ্গলের মধ্যে তালজাতীয় গাছগুলোর মাথা যেন

জলের মধ্যে সন্তরণশীল তারামাছের (starfish) মত দেখাচ্ছিল। নদীর নানা শাখা ও খাড়ি জঙ্গলের এদিকে ওদিকে চলে গিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, লক্ষ্য করে দেখা গেল, এই সব খাড়ির ধারেই তালগাছ বেশী।

এক জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে নদী দু'ভাগে ভাগ হয়ে আবার সামনে এসে মিলেছে, নদীর দুই ধারার মধ্যবর্ত্তী দ্বীপটিতে জঙ্গল অত্যন্ত ঘন, দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে নদীর দুই ধারা আবার জুড়ে এক হয়ে গিয়েছে ও পরবর্ত্তী কয়েক মাইলের মধ্যে তিনবার নেমে গিয়েছে। সব শুদ্ধ এই তিন জায়গায় নেমেছে ৮০ ফুট। এ থেকেই বোঝা যাবে নদীর চেহারা এখানে কি ভীষণ! যেমন স্রোত, তেমনি আবর্ত্ত।

আমরা তো হাইড্রোপ্লেনে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে এর উপর দিয়ে উড়ে গেলাম, আমাদের খাদ্যসম্ভার নিয়ে আস্ছিল যে দু'খানা নৌকা বোয়া ভিষ্টা থেকে—এই জায়গাটুকু পার হতে তাদের লাগল পাঁচ দিন, মারাকা দ্বীপ এবং ঐ তিনটে 'র্যাপিড' (rapid) পার হয়ে নদীর চেহারা সমানই ভয়ঙ্কর। মাঝে মাঝে ছোটখাট প্রস্তরময় দ্বীপ, তাদের মধ্যে খরস্রোতা নদী ভীম মূর্ত্তি ধরে ঘোর আবর্ত্ত সৃষ্টি করে বইছে। সে নদীতে নৌকা চালানো মানে মৃত্যুকে বরণ করা। এমন কি স্থানীয় অসভ্য ইণ্ডিয়ানরা পর্য্যন্ত এই সব জায়গায় ভেলা চালায় না—স্বেচ্ছায় কে এই মৃত্যুর ফাঁদে পা দেবে?

তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিট ধরে অনবরত আকাশপথে উড়ে বেড়ালাম, নীচে কোথাও একটা মানুষ চোখে পড়ল না। আমরা বোয়াভিষ্টা সহরে ফিরে আসতে বাধ্য হ'লাম, কারণ গ্যাসোলিন ও খাবারের ভাণ্ডার ফুরিয়ে এসেছে, তা ছাড়া নদীর যা দৃশ্য দেখেছি, তাতে আকাশপথে উড়ে ও পথে যাওয়াও যে খুব নিরাপদ, তা নয়। যদি এঞ্জিন অচল হয়, তবেই সর্ব্বনাশ! সেই ফেনোচ্ছল আবর্ত্তের মধ্যে হাইড্রোপ্লেন নামালে চোখের নিমেষে সেটা ঘুরপাক খেতে খেতে বানচাল হয়ে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে, ওর এক টুক্‌রো কাঠের সন্ধানও পাওয়া যাবে না।

জানুয়ারী মাসে ইউরারিসোরা নদীর ওপার দিয়ে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে হাইড্রোপ্লেন চালাই। বড় বিপদে পড়তে হয়েছিল এবার। ইণ্ডিয়ান্‌দের সঙ্গে আমরা পূর্ব্বেই ব্যবস্থা করেছিলাম, কুলিকুলিমা বলে একটা ছোট দ্বীপে নেমে সেখানকার একটা অদ্ভুতদর্শন পাহাড়ের ফটো নেব। হিণ্টন হাইড্রোপ্লেনটা নামিয়ে দিলেও ভাল, তার পর সেটাকে জলের উপর দিয়ে দ্বীপের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, হঠাৎ মচ্ করে কি একটা শব্দ হ'ল। তখন হাইড্রোপ্লেন বাঁ কাতে মাতালের মত ঝুঁকে পড়ল।

হিণ্টন্ বলে উঠল—গেল!

আমি বললাম কি হ'ল, দেখ আগে।

সে ভীষণ স্রোতের মধ্যে দেখার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু সুখের বিষয়, হাইড্রোপ্লেন নিজেকে নিজে একটু সামলে নিতেই হিণ্টন্ এঞ্জিন বন্ধ করে দিলে।

একটা মগ্ন শৈলে এসে ঠেকছে আমাদের যন্ত্রটা।

হিণ্টন্ বললে—হাইড্রোপ্লেনের তলা চিরে জল উঠছে, এ অবস্থায় যদি ওকে ডাঙ্গায় নিয়ে যাই, এই নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কয়েক সপ্তাহ। এখানে প্লেন সারান একরকম অসম্ভব। চল এই অবস্থায় উড়ে বোয়া এস্‌পারানসাতে যাওয়া যাক্।

তখনই আমরা জল ছেড়ে আকাশপথে উঠলাম। কিন্তু ভাঙা হাইড্রোপ্লেনে দেড় শো মাইল দূরবর্ত্তী বোয়া এস্‌পারানসা পর্য্যন্ত আমরা নিরাপদে পৌঁছুতে পারব কি না তা গুরুতর সন্দেহের বিষয়। এ দিকে বিকেল হয়ে এসেছে, সূর্য্যাস্তের বিলম্ব নেই বেশী, বেলা থাকতে গন্তব্য স্থানে পৌছান দরকার, নতুবা পথে বিপদ্ আছে।

যা ভয় করা গিয়েছিল, ঘটলও তাই।

মারাকা দ্বীপের উপর দিয়ে যখন আমরা যাচ্ছি, তখন সূর্য্য অস্ত গেল, নদীর উত্তর খাড়ির পথ ধরে হিণ্টন্ পুরোবেগে প্লেন চালালে, কিন্তু এ সব দেশে সূর্য্যাস্তের পরেই অন্ধকার নামে। আমরা শীঘ্রই বুঝলাম, অবিলম্বে প্লেন নীচে না নামালে সম্মুখের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির অন্ধকারে অজানা জঙ্গলের উপর দিয়ে ওড়া যাবে না, কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়ব।

নীচে তিনটি দ্বীপ দেখা গেল। মাঝের দ্বীপটাতে একটা বালির চড়া। আমরা ঠিক করলাম, প্লেন নামাবার পক্ষে এর চেয়ে নিরাপদ স্থান আর মিলবে না। হিণ্টন্ সুকৌশলে ঠিক সেই বালির চড়ার সঙ্গে নদীর জলে প্লেন নামালে। তারপর তাকে চড়ার কাছে নিয়ে আসা গেল।

সেই নির্জ্জন দ্বীপের মধ্যে আমাদের এগার দিন কেটে গেল।

আদিম ইণ্ডিয়ানের শিশু: পারিমা তীরে।

দ্বীপটা ঘন জঙ্গলে ভরা ও সম্পূর্ণ জনহীন। মাইল খানেক লম্বা ও সিকি মাইল চওড়া হবে। একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে দুটো গাছের মধ্যে একটা দড়ি টাঙিয়ে তার উপর এক টুক্‌রা চট্ বিছিয়ে তাঁবু খাটান হ'ল। তারই নীচে আমাদের দোল্‌নার দড়ির শয্যা টাঙিয়ে নিলাম। এ সব জঙ্গলে সকলেই এই দোলনার মত শয্যা করে, মাটীতে কেউ শোয় না।

এ জঙ্গলে মাটীতে শোবার বিপদ্ যে কত ধরণের, তার সংখ্যা হয় না। উঁই, জোঁক, মশা, ডাঁশ তো আছে, তা বাদে আছে হরেক রকমের সাপ—বিষাক্ত ও নির্ব্বিষ, ছোট ও বড় গাছ থেকে সাপ পড়তে পারে, এ জন্য ঝোলান শয্যার উপরে একটা আচ্ছাদন থাকা নিরাপদ।

একদিন একটা ডোঙ্গায় চারজন ইণ্ডিয়ান্ নদী বেয়ে যেতে যেতে আমাদের তাঁবুর ধোঁয়া দেখে সেখানে এল। তারা সকলেই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ব্যবহারও বেশ নম্র। আমরা লক্ষ্য করলাম, তাদের কাছে কোন ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য নেই; জঙ্গলজাত দ্রব্যে তাদের সকল অভাব পূর্ণ করেছে।

আমাদের হাইড্রোপ্লেন দেখে তারা খুব বেশী আশ্চর্য্য হ'ল না। আমরা অসভ্য জাতিদের মধ্যে বহু দিন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলে এটা বুঝতে পেরেছি যে, বিস্ময় জিনিষটা অপরিণত মনের পক্ষে সুলভ নয়। ওরা ভাবলে আমাদের মত শ্বেতকায় মানুষে যে আকাশপথে উড়ে বেড়াবে, এটা আর বেশী কথা কি? যাদের গায়ের চামড়া সাদা, তাদের পক্ষে সবই সম্ভব।

আমরা দেখলাম, ওদের গায়ে ডাঁশ বা মশা কামড়াবার দাগ নেই, বোধ হয় চিনি বা লবণ ব্যবহার না করার দরুণ ওদের রক্ত এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে যে, মশামাছির তা স্বাদু বলে মনে হয় না।

একদিন হিণ্টন্ তার সার্টটা দড়ির উপর ঝুলিয়ে রেখেছিল। সকালে উঠে সার্ট গায়ে দেবার জন্যে দড়ি থেকে যেমন তুলতে গিয়েছে, অমনি টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে খসে পড়ে গেল। রাতারাতি উইয়ে সেটাকে শেষ করে রেখেছে। ব্রেজিলের জঙ্গলের মত এত পোকামাকড়ের দৌরাত্ম্য কোথাও দেখি নি।

পিঁপড়ে আর উই যে কত রকমের তার সংখ্যা হয় না। কালো পিঁপড়ে, লাল পিঁপড়ে, ছোট ছোট পিঁপড়ে, বড় বড় পিঁপড়ে। তাদের সর্ব্বত্র অবাধ গতি এবং সব জিনিস তারা খেয়ে ফেলবে। জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ারের চেয়েও তারা মানুষের বেশী শত্রু। উঁইও নানা জাতীয়, আমাদের হাইড্রোপ্লেনের মেহগনি কাঠের অংশটুকু কোন্ কালে তারা খেয়ে সাবাড় করে ফেলত, কিন্তু ওর উপর রং করা ছিল বলেই শুধু পারে নি।

এগার দিন পরে হাইড্রোপ্লেন মেরামত করে আমরা বোয়া এস্‌পারান্‌সা অভিমুখে উড়লাম। শেষের তিন চার দিন আমাদের তাঁবুতে খাদ্যদ্রব্য ফুরিয়ে গিয়েছিল, চিনি ছিল না, নুন ছিল না। আমি ও হিণ্টন নদীতে মাছ ধরতাম ও তাই পুড়িয়ে, কি সিদ্ধ করে বিনা লবণে খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হ'ত।

পথে যেতে যেতে নীচের দিকে চেয়ে দেখি, আমাদের বিপদ্ অনুমান করে বোয়া এস্‌পারান্‌সা থেকে একটি দল ডোঙায় ও নৌকাতে আমাদের সন্ধানে নদী বেয়ে চলেছে। সহরে পৌছেই আমি ওদের খবর দিতে রওনা হই ডোঙায় চেপে, কারণ ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে কি না বোঝা গেল না। একটু পরে হাইড্রোপ্লেনের মোটরের আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি, হিণ্টন আবার কোথায় চলেছে। হিণ্টন আমাদের দেখে টিনের কৌটার মধ্যে আমাদের কি খবর পাঠালে, সে কৌটা জলে পড়ে খরস্রোতে কোথায় ভেসে গেল, আমি ও আমার ইণ্ডিয়ান কুলীরা খুঁজে বার করতে পারলাম না। পরে শুনলাম, উইলিয়ামসন্ বলে আমাদের দলের একজন ছোক্‌রা আর্টিষ্টকে সঙ্গে নিয়ে হিণ্টন একটু বেড়াতে বার হয়েছিল। সেই বেড়ানোর জের মিটল এক মাস পরে। হাইড্রোপ্লেনের এঞ্জিন খারাপ হয়ে কোথায় কোন্ জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে অচল হয়ে পড়ল। হিণ্টন ও উইলিয়ামসনের কোন পাত্তাই নেই। অনেক কষ্টে তাদের খুঁজে বার করা হ'ল। হাইড্রোপ্লেন সেই জঙ্গলে মেরামত করা হ'ল। তবে এক মাস পরে ওরা ভ্রমণ শেষ করে তাঁবুতে ফেরে।

পানামাখাল ও অরণ্য

পৃথিবীর মানচিত্র কতখানি নৈসর্গিক এবং কতখানি মনুষ্য-রচিত, তাহা কে বলিতে পারে! সহস্র সহস্র বৎসর পরে কে স্মরণে রাখিবে যে, পানামা কি সুয়েজ-খাল মনুষ্য-রচিত! একদিকে পানামা-যোজকের ইঞ্জিনীয়ারিং কৌশল, অন্যদিকে পানামা-জঙ্গলের ঘনসন্নিবেশ, এবং তন্মধ্যবর্ত্তী নদী—এই রোমাঞ্চকর পরিবেষ্টনীর উপর বর্ত্তমান কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। ঘন বনানী যেমন একাংশে মানুষের হাতের সকল চিহ্ন লুপ্ত করিয়া দিয়াছে, অপরাংশে মানুষের হাতের ডিনামাইট ও কলকব্জা ঘন বনানীর, অর্থাৎ প্রকৃতির রূপকে সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া দিয়াছে। এই রহস্যময় অঞ্চলে ব্যারো কলোরাডো; একদিন ছিল শৈলমালা, আজ দ্বীপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই দ্বীপ প্রাচীন পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তুর আবাসস্থল—কোন্ অলৌকিক কারণে ইহা সম্ভব হইল?

পানামা: স্থল।

ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারী জন্ এডউইন হগ্ সম্প্রতি একটি ক্ষুদ্র মোটরবোটে পানামার নদীপথে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। পানামার অরণ্য জগদ্বিখ্যাত, এই অরণ্যের মধ্য দিয়া এই সকল নদী প্রবাহিত। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল:—

পানামা জঙ্গলে বেড়াইবার আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল চৌদ্দ ফুট লম্বা মোটরবোট। সুবৃহৎ মার্কিণ রণতরীর ব্রিজ হইতে ক্ষুদ্র মোটরবোটে নামিয়া প্রথম-প্রথম আমাদের কেমন অদ্ভুত বোধ হইতেছিল। কিন্তু, পানামা জঙ্গল দেখিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতে ছিল, কাজেই এ সামান্য অসুবিধাটুকু মানিয়া লইতে দ্বিধা করিলাম না।

নিজের জিনিসপত্র লইয়া একখানা পুরাণো ফোর্ড মোটরলরীতে চেপো গ্রামে উপস্থিত হইলাম। রাস্তায় ভীষণ কাদা, তার উপর ড্রাইভার একজন হেইতি দ্বীপবাসী নিগ্রো। যখন চেপো গ্রামে আসিয়া নামিলাম, তখন শরীরের প্রত্যেক হাড়ে ব্যথা। শুনিলাম, লরি ইহার বেশী যাইতে পারিবে না, কারণ রাস্তা নাই।

লরি হইতে আমার চৌদ্দ ফুট মোটরবোট ও জিনিষপত্র নামাইবার সময় চেপো গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা আসিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, গ্রামের কুকুরগুলাও বাদ ছিল না। এখান হইতে গরুর গাড়ী যোগে বায়ানো নদীর একটি ক্ষুদ্র শাখার তীরবর্ত্তী অনা লুজ গ্রামে উপস্থিত হইতে হইবে।

ঘোর জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ, সারা দুপুর ও বৈকাল পথ অতিক্রম করিতে কাটিয়া গেল, যখন চেপিলো নদীর ধারে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইয়াছি, তখন জঙ্গলের মাথায় সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে। এখানে পরদিন মোটর-বোট রিও চেপিলোর জলে ভাসাইলাম, অসংখ্য বন্য টিয়াপাখী তীরবর্ত্তী জঙ্গলের ডালপালায় বসিয়া কলরব করিতেছিল, বানরের দল এ ডাল হইতে ও ডালে লাফালাফি করিতেছিল।

পানামার জঙ্গলে শিকার করিবার কোন বাধা নাই। জঙ্গল খুব ঘন, জন্তু-জানোয়ার বড় একটা চোখে পড়ে না, জঙ্গলের নিবিড়তার জন্য।

অনা লুজ গ্রাম ছাড়াইবার দশ মিনিট পরে আমি মোটরবোটে একটি সংকীর্ণ আঁকাবাকা নদীপথে চলিতে-ছিলাম, সে পথের দু'ধারে তীরের নিবিড় অরণ্য লতাপাতায় চন্দ্রাতপ রচনা করিয়াছে। বড় বড় লতা এ তীর হইতে ও তীরে জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে, আমি যেন এক অন্ধকার গাছ-পাতায় ঘেরা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া চলিতেছি, মাঝে মাঝে এরূপ ভ্রম হইতেছিল।

এরূপ জঙ্গল কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

বনটিয়ার ঝাঁক সর্ব্বত্র। পুরাণো কার্পেট ঝাড়িলে যেমন পোকা ওড়ে, ইহারা মোটরবোটের শব্দে তেমনই ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে উড়িয়া পালাইতেছে, এখান হইতে উড়িয়া ওখানে বসিতেছে, বানরেরা গাছের ডালে বসিয়া তারস্বরে জঙ্গলের নিস্তব্ধতা-ভঙ্গের প্রতিবাদ করিতেছে।

চেপিলো নদীর সহিত বায়ানো নদীর সঙ্গম-স্থান অনা লুজ হইতে এক ঘণ্টার বেশী পথ মনে হইল। যখন বায়ানো নদীতে পৌছিলাম, তখন সূর্য্য নামিয়া গিয়াছে। এসব অঞ্চলে গোধুলি নাই বলিলেই চলে, এখনি অন্ধকার হইয়া যাইবে, সুতরাং তীরে কোন একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজিতে লাগিলাম তাঁবু ফেলিবার জন্য। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অন্ততঃ বিশ মাইল পথ উত্তীর্ণ হইলাম, সেরূপ সুবিধাজনক স্থান কিন্তু কোথাও চোখে পড়িল না। জঙ্গলের মধ্যে কোথাও ফাঁক নাই।

আরও খানিক দূর গেলাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়াছে।

সেই অন্ধকারে যেন মানুষের হাতের তৈরী বোট বাঁধার জায়গা একস্থানে রহিয়াছে দেখিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মোটরবোটের গতি সে দিকেই ফিরাইয়া দিলাম।

একটি দেশী স্ত্রীলোক অল্প জলে নামিয়া বড় লাউয়ের খোলে জল ভর্ত্তি করিতেছিল, সে আমাকে দেখিয়া অভিবাদন করিল।

তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় জানিলাম যে, যদিও রিও চেপিলো ও বায়ানো নদীপথে আমি প্রায় কুড়ি মাইল আসিয়াছি, কিন্তু স্থলপথে অনা লুজ হইতে এ স্থান মাত্র চার মাইল।

আমি যখন স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথা বলিতেছি, তখন আরও কয়েকটি গ্রাম্য স্ত্রীলোক সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম তাহাদের পশ্চাতে একটি বৃদ্ধ কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আমি লক্ষ্য করি নাই। তাহাকে দেখিয়াই মনে হইল লোকটি জাতিতে ইংরেজ। তাহাকে ডাকিয়া আলাপ করিলাম। বহুদিন উত্তর-আমেরিকার জঙ্গলময় দেশে থাকিবার দরুণ তাহার আকৃতি-প্রকৃতি এ দেশের লোকের মতই হইয়া গিয়াছে। ইংরেজী ভাষাও সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে কতদিন আছেন?

সে বলিল—বহুকাল, প্রায় চল্লিশ বছর।

যে স্ত্রীলোকটি বড় লাউয়ের খোলে জল ভরিতেছিল, তাহাকে দেখাইয়া বলিল, সে তাহার স্ত্রী।

তাহাদের ছেলেপুলে পিছনে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল, এ দেশের মত লোকের চেহারা। অনেকেই উলঙ্গ। দেখিলাম ইংরেজী বলিতে লোকটির দস্তরমত বেগ পাইতে হইতেছে। তখন দু' জনেই স্পেনিস্ বলিতে লাগিলাম।

লোকটি বলিল—এখানে তাঁবু ফেলিবেন না। এ জায়গাটা ভাল নয়, ভয়ানক মশা, কামড়াইলেই ম্যালেরিয়া ধরিবে।

ম্যালেরিয়ার নামে ভয় হইল। তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

সে বলিল—মোটরবোট ও জিনিসপত্র এখানেই থাক, এদেশে চোর নাই, আসুন আমার সঙ্গে আমার কুটীরে। আপনার ক্যামেরাটা আনুন, আমার একটা করাতের কারখানা আছে, তার ফটোগ্রাফ লইবেন।

নিবিড় জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী সুঁড়িপথ ধরিয়া দুজনে চলিলাম। সমস্ত পথ লোকটি তাহার করাতের কারখানার গল্প করিতে লাগিল। তাহার না কি খুব বড় কারখানা, এ অঞ্চলে এত বড় কারখানা নাই। বড় বড দুটো স্কচ বয়লার বসাইতে তাহার বহু টাকা ব্যয় হইয়াছে, জার্ম্মানি হইতে করাত আনান হইয়াছে—এই সব সংবাদ।

এই সব জঙ্গল দুপুর বেলায় প্রায় নিস্তব্ধ ছিল। কিন্তু এখন বহু প্রকার জীবজন্তুর আওয়াজে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রি প্রায় দশটার কাছাকাছি। জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় লোকটির ঘর। কাঠের দেওয়াল, কাঠের ছাদ। এদেশে সাধারণতঃ এ ধরণের ঘরই বেশী।

হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা কর্কশ ধ্বনি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—ওটা কোন্ জন্তুর রব?

লোকটির কাছে ও সব শব্দ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য। সে তাচ্ছিল্যের সুরে কহিল—ও কিছু না, পুমা কিংবা জাগুয়ার।

তাহার স্ত্রী একটি কুকুট মারিয়া মাংস রাঁধিল। খাইবার সময় দেখিলাম, গৃহকর্ত্রী রন্ধনকার্য্যে বেশ পটু। তবে, ভোজ্যগুলির একটিও মার্কিন বা ইউরোপীয় ধরণে প্রস্তুত নয়। মাংসের ঝোল, ঝোলে নানা প্রকার শাকসব্জি ভাসিতেছে, টাটকা ফল, দুধ, নদীর মাছ, মিষ্টি আলু সিদ্ধ, কালো কাফি।

খুব বড় বড় কয়েকটি পিয়ার খাইলাম, লণ্ডনে যার প্রত্যেকটির দাম পাঁচ শিলিং।

আহারাদি শেষ করিয়া আমরা দুজনে কেরোসিন তৈলের লণ্ঠনের সামনে বসিয়া গল্প-গুজব করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ কেবলই করাতের কারখানার গল্প করিতে চায়, আমি অন্য কথা পাড়িয়া তাহা চাপা দিই। তাহার করাতের কারখানার একঘেয়ে গল্প শুনিতে শুনিতে আমার কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল।

পানামা: জল

পরদিন সকালে উঠিয়াই বৃদ্ধ বলিল—চলুন, আমার কারখানার ফটোগ্রাফ লইতে হইবে।

ঘণ্টাখানেক আবার চলিলাম নিবিড় জঙ্গলের পথে। পরে একটা জায়গায় পৌঁছিলাম, দেখিয়া মনে হইল, একটা লোহার কারখানা এরোপ্লেন হইতে বোমা ফেলিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, এমনি তাহার ছন্নছাড়া মূর্ত্তি।

লোকটি গর্ব্বের সহিত সেই ভাঙ্গাচোরা লোহার রাশি আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই দেখুন আমার করাতের কারখানা। কেমন বলুন—

লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া মনে হইল, ১৯০০ সালে এই স্থানটি নিশ্চয়ই একটি করাতের কারখানা ছিল। তবে এখন তাহার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই—দুটি মরিচা-ধরা বয়লার ছাড়া। আর এক রাশ লোহা।

তারপর কারখানার গল্পটা শুনিলাম।

যখন এই লোকটা বয়সে তরুণ, তখন সে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের মিসিগান ষ্টেটে করাতের কারখানায় কাজ করিত। ঘটনাচক্রে সে এখানে এই করাতের কারখানায় ম্যানেজার হইয়া আসে। এদের পিছনে অনেক টাকা ছিল। আড়াই হাজার একর মেহগণির বন তাহারা কিনিয়াছিল। কিন্তু, মজুর ও কর্ম্মচারীদের স্বাস্থ্য এখানে টিকিল না, ম্যালেরিয়া জ্বরে অর্দ্ধেক মরিয়া গেল। ১৯০৩ সালে লোকের অভাবে কোম্পানী ফেল হইল। ম্যানেজার হিসাবে এই লোকটির তখন অনেক টাকা মাহিনা বাকী। সেই মাহিনার বদলে কারখানার যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইহার দখলে আসিল। এই জঙ্গলে সে কলকব্জা কি কাজে লাগিবে? আজ কত বৎসর মরিচা ধরিয়া পড়িয়া আছে।

পরদিন আমি এই বিকৃতমস্তিষ্ক বৃদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রিও লাগারটো ও বায়ানো নদীর সঙ্গম-স্থানের দিকে বোট চালাইলাম। এই স্থানটি কুমীরের জন্য প্রসিদ্ধ। বৃদ্ধও বলিয়াছিল, অন্যত্রও শুনিয়াছিলাম। এক ঘণ্টা পরে রিও লাগারটোর মুখে পৌঁছিলাম।

সাগ্রে নদীর তীরে স্থানীয় শাসন-কর্ত্তা কর্ত্তৃক দূরে দূরে এই 'সাবধান-বাণী' লটকানো আছে: বাঁধ ভাঙ্গিয়া যে-কোন মুহূর্ত্তে নদীর জল মোটর-বোট কি অপর জল-যানকে ডুবাইতে পারে, সুতরাং সাবধান!

দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম, একটা প্রকাণ্ড কুমীর ডাঙ্গার কাদার উপরে শুইয়া আছে। তাহার ৫০ গজ দূর হইতে বোটের উপর বসিয়া বন্দুক ছুঁড়িলাম।

পরক্ষণেই দেখিলাম, আমার বোটের চারিধারে বহুদূর পর্য্যন্ত জল কুমীরে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, নাকটুকু জাগাইয়া অসংখ্য কুমীর জলে ভাসিতেছে। যে কুমীরটাকে গুলি করিয়াছিলাম, সেটা লেজ সপাটে আছড়াইয়া বাতাসে কাদা ও বালির মেঘের সৃষ্টি করিতেছে। লক্ষ্য স্থির করিয়া আমি আরও তিনবার গুলি ছুঁড়িতেই সেটা পেট উল্টাইয়া নদীর ধারের নরম কাদার উপর চিৎ হইয়া পড়িল।

হঠাৎ সেটার নিকটে যাওয়া উচিত বিবেচনা করিলাম না। দূর হইতেই দেখিতেছি, সত্যই সে মরিয়াছে কি না, এমন সময়ে আর একটা মোটরবোটের শব্দ শুনিলাম। মোটরবোট নদীর বাঁক ঘুরিয়া শীঘ্রই আমার পাশে আসিয়া থামিল এবং আরোহী তাহার পরিচয় দিয়া বলিল, সেও কুমীর-শিকারে বাহির হইয়াছে। তাহার নাম এ্যালফ্রেড ডেভিস, মার্কিণ যুক্তরাজ্যের অধিবাসী।

ডেভিস ও আর কয়েকটি লোকের সাহায্যে আমি কুমীরটাকে ডাঙ্গার উপর তুলিয়া ফটোগ্রাফ লইলাম। চামড়া লইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কুমীরটার ওজন প্রায় এক টনের কাছাকাছি, চামড়া ছাড়াইবার মত অত লোক কোথায় পাইব? কাজেই সে ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইল।

ডেভিস নদীপথে খানিক দূর গিয়া পানামা-খাল ও প্রশান্ত মহাসমুদ্র দিয়া কলোন্ যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। কিন্তু, তাহার মোটরবোট বায়ানো নদীর মুখ হইতে বালবোয়া পর্য্যন্ত সমুদ্রপথে পাড়ি দিবার উপযুক্ত বলিয়া মনে হইল না। আমি তাহাকে সে কথা বলিতেই সে আমার সঙ্গে আমার বোটে আসিতে রাজি হইল। কারণ, আমিও ঐ পথেই যাইতেছি।

ডেভিসের বোট আমার বোটের পিছনে বাঁধিয়া উজানপথে আমরা পুনরায় রিও লাগারটোর মুখে পৌঁছিলাম। সেখানে আমরা জঙ্গলের মধ্যে তাহার বোটখানা লুকাইয়া রাখিয়া তেরপল চাপা দিলাম। পরে সমুদ্রের দিকে দ্রুত গতিতে মোটরবোট ছাড়িলাম।
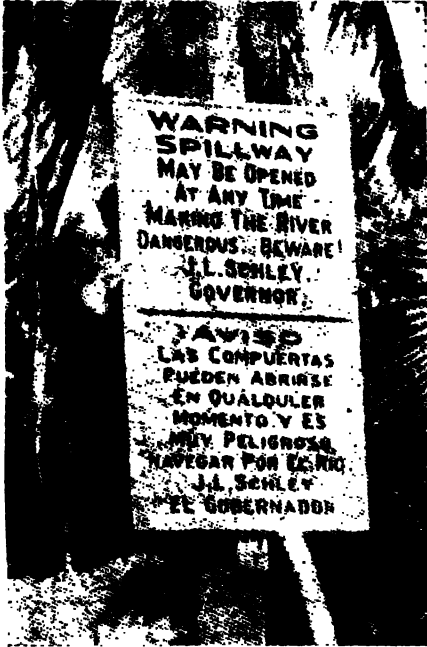
পানামা-যোজকের নদীগুলিতে ছোট নৌকা চালাইবার সময় সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, জোয়ারের সময় নদীর মোহানার নিকটে নৌকা লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক। প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে অনেক সময় সতেরো ফুট হইতে তেইশ ফুট পর্য্যন্ত জল বাড়া কিছু অস্বাভাবিক নয় এবং নদীর মোহানা হইতে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে পর্য্যন্ত জোয়ারের তোড় সমান প্রবল থাকে।

বায়ানো নদীর মোহানা হইতে দশ মাইল যখন দূরে আছি, তখন জোয়ার লাগিল। সে ভীষণ জোয়ারের বেগ ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে আমার ক্ষুদ্র ইঞ্জিন হিমসিম খাইয়া গেল। অতিকষ্টে ঘণ্টায় আড়াই মাইল বেগ ঠেলিয়া সন্ধ্যার সময় আমরা মোহানা হইতে দু' মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্যে চেপিলো দ্বীপের তীরভূমিতে নৌকা নোঙর করিলাম।

চেপিলো দ্বীপে রাত কাটাইবার ব্যবস্থা করিলাম, কারণ এইবার ছাব্বিশ মাইল সমুদ্র পার হইতে হইবে এবং আমার ক্ষুদ্র মোটরবোটে এই রাত্রে তাহা করিতে যাওয়া বিপজ্জনক। আমরা মোটরবোট টানিয়া ডাঙায় তুলিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার নামিতে আরম্ভ করিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে আধ মাইল ব্যাপী প্রবালময় তীরভূমি বাহির হইয়া পড়িল।

চেপিলো দ্বীপে মশার উপদ্রব ছিল না, রাত্রে সুনিদ্রা হইল।

আমাদের অদৃষ্ট ভাল ছিল, পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি, সমুদ্র ধীর, স্থির, আকাশ মেঘাবৃত এবং এক প্রকারের কুয়াসা হওয়ার দরুণ দু' মাইলের বেশী দৃষ্টি চলিবার উপায় নাই—এইটুকু যা' অসুবিধা। হয় তো বেশীক্ষণ আবহাওয়ার এমন অবস্থা স্থায়ী হইবে না ভাবিয়া ডেভিস ও আমি তাঁবু উঠাইয়া বোট ঠেলিতে ঠেলিতে সমুদ্রে নামাইলাম এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে পানামার তালীবনশ্যাম তীর ও ক্ষুদ্র চেপিলো দ্বীপ চক্রবালরেখায় বিলীন হইয়া গেল।

গেইলার্ড কাট: মধ্যে বর্ত্তমান কাহিনীর মোটর-বোট কৃষ্ণবিন্দুবৎ দেখা যাইতেছে।

সম্মুখে বহুদূর পশ্চিমে দুটি ছোট দ্বীপ উঁকি মারিতেছিল। সে দুটি ফ্ল্যামাঙ্কো ও পেরিকো দ্বীপ, প্রশান্ত মহাসাগরের দিক্ হইতে পানামা-খালে প্রবেশপথে প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব্বেই ঠিক করিয়াছিলাম, প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিকে যাইব পানামা-খালের পথে।

দুপুর বেলা বালবোয়া পৌছিয়া কিছু খাইয়া লইলাম, পরে বন্দরের কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা করিয়া খালে মোটরবোট ঢুকাইবার ব্যবস্থা করা গেল। পানামা-খাল জলযানে পার হইতে হইলে যে-শুল্ক দিতে হয়, তাহার রেট টনপিছু এক ডলার পঁচিশ্ সেণ্ট। আমাদের মোটরবোট খুব হাল্কা, সুতরাং খাল পার হইবার জন্য আমাদের মোট শুল্ক দিতে হইল ৮৬ সেণ্ট।

পানামা-খালের প্রথম লক্ পৌঁছিতে ঘণ্টা দুই লাগিল। একখানা বিশ হাজার টনের জার্ম্মান মালবাহী জাহাজ লকের পাশে দাঁড়াইয়া আছে অন্য জাহাজকে পথ দিবার জন্য—সেই প্রকাণ্ড জাহাজখানার পাশ দিয়া যখন যাইতেছি, তখন মনে হইল, আমরা আরিজোনার গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের মধ্য দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে পৃথিবীর যতটুকু চোখে পড়ে, তাহাই দেখিতেছি।

প্রথম লকে ঢুকিবার পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা মিরা ফ্লোরেস্ হ্রদে পৌঁছিলাম। তাহা পার হইয়া যখন দেড় মাইল দুরবর্ত্তী পেড্রো মিগুয়েল লকে চলিয়াছি, তখন সেই বিরাট জার্ম্মান ষ্টীমারখানা প্রায় অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে, দ্বিতীয় লকে বারো হাজার টনের একখানা জাপানী তৈলবাহী জাহাজ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

পেড্রো মিগুয়েল লক্ হইতে গাটুন হ্রদ পর্য্যন্ত অংশটুকুর নাম 'গেইলার্ড কাট'—পানামা-খালের এই অংশে যে ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়জনক। এই অংশের উচ্চ মালভূমি কাটিয়া গাটুন হ্রদের সমতলে আনিতে জমি ৫৩৪ ফুট কাটিতে হইয়াছে প্রায় তিন চারি মাইল। ভাবিতেও মাথা ঘুরিয়া যায়!

ব্যারো কলোরাডো দ্বীপ: মনে হয় প্রকৃতিদেবী স্বহস্তে এই দ্বীপকে নিজের যাবতীয় ধনৈশ্বর্য্যে ভূষিত করিয়াছেন।

কিন্তু 'গেইলার্ড কাট'-এ ঢুকিয়া এখন আর বুঝিবার উপায় নাই যে, ইহা মানুষের হাতের তৈরী। ট্রপিক্সের ঘন বনানী মানুষের হাতের সকল চিহ্ন লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। মানুষ এখানে প্রকৃতির রূপ সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিয়াছে, ডিনামাইট ও কলকব্জার সাহায্যে। কিন্তু, বহুকাল পরে যদি এমন মানুষের দল পৃথিবীতে আসে, যাহারা পানামা-খাল কাটিবার কথা কিছুই জানিবে না, বর্ত্তমান সভ্যজাতিরা পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে যদি লুপ্ত হইয়া যায়—তবে তাহারা বুঝিতে পারিবে না, এক কালে মানুষের ক্ষীণ, দুর্ব্বল হস্ত ভূমিপ্রকৃতির কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল এইখানে!

গেইলার্ড কাট ছাড়াইয়া কিছুদূরে গাটুন হ্রদ, গামবোয়ার কাছে।

এই গাটুন হ্রদ ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানের আর একটি অদ্ভুত কীর্ত্তি! ইহা প্রাকৃতিক হ্রদ নয়, মানুষের হাতে তৈরী। মানুষের হাতে তৈরী এর চেয়ে বৃহত্তর জলময় স্থান আর পৃথিবীতে নাই। সাগ্রে নদীর মোহানা হইতে বার মাইল দূরে নদীর আড়াআড়ি প্রকাণ্ড বাঁধ বাঁধিয়া নদীর জলকে এক শত ছাব্বিশ বর্গমাইল ব্যাপী স্থানে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এই জলময় স্থানেই গাটুন হ্রদ। গাটুন হ্রদের তীরভূমির পরিধি প্রায় হাজার মাইল, এই হ্রদের সৃষ্টি করার দরুণ ছাব্বিশ মাইল খাল কাটিবার ব্যয় বাঁচিয়া গিয়াছে।

এই বাঁধের জলস্রোতের সাহায্যে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে, তাহা পানামা-খালের সর্ব্বত্র ও পানামা অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে বিজলী বাতি জ্বালাইতেছে ও কল চালাইতেছে।

গাটুন হ্রদ মানুষের হাতে তৈরী হইলেও শিকার ও ভ্রমণের দিক্ দিয়া ইহা যে-কোন স্বাভাবিক হ্রদের মত, ইহার দৃশ্যও সেইরূপ। ইহার উপকূল অসমান, জঙ্গলময়, হ্রদের মধ্যে বহু দ্বীপ বর্ত্তমান, দ্বীপগুলির অবস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর।

এই হ্রদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যারো কলোরাডো দ্বীপ অবস্থিত। এক সময়ে সাগ্রে নদীর অববাহিকা অঞ্চলে ইহা ছিল একটি অনুচ্চ শৈলমালা—বাঁধ বাঁধিবার পরে সাগ্রে নদীর জল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ইহাকে মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টন করিয়া দ্বীপে পরিণত করিল। দৈর্ঘ্যে দ্বীপটি প্রায় আট মাইল এবং প্রস্থে পাঁচ মাইল, ঘন জঙ্গলে ভরা, জমি প্রস্তরময়।

ব্যারো কলোরাডো দ্বীপের বিশেষত্ব এই যে, সাগ্রে নদীর দুই তীর বহুদূর পর্য্যন্ত যখন জলমগ্ন হইয়া গেল, তখন ঐ অঞ্চলের অরণ্য হইতে সমস্ত জন্তুজানোয়ার আসিয়া ব্যারো কলোরাডো শৈলমালার উচ্চভূখণ্ডে আশ্রয় লইল এবং যখন সমগ্র পাহাড়টি দ্বীপে পরিণত হইয়া গেল, তখন তাহারা সেখানেই আটকাইয়া গেল, পলাইয়া অন্য কোথাও যাইবার সামর্থ্য রহিল না।

কিছুকাল পরে কয়েকজন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এখানে আসিয়া দেখিতে পান যে, দ্বীপের জঙ্গলে টেপির, নানা প্রকার বানর, বিবিধ সরীসৃপ, হরিণ, জাগুয়ার, বন্যশূকর প্রভৃতি জন্তুতে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের রিপোর্ট অনুসারে মার্কিণ যুক্ত-রাজ্যের গভর্ণমেণ্ট এই দ্বীপ বন্যজন্তুর আশ্রয়স্থল বলিয়া ঘোষণা করেন এবং এখানে প্রাণিশিকার আইন দ্বারা বন্ধ করেন।

যে কোন দেশের সম্ভ্রান্ত অধিবাসী গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া ব্যারো কলোরাডো দ্বীপে আসিয়া বন্য জীবজন্তু পরিদর্শন ও তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। দক্ষিণ-আমেরিকার জঙ্গলের সমস্ত বন্য জন্তু এখানে অল্প স্থানের মধ্যে জড় হইয়াছে। ডেভিস্ ও আমি দ্বীপের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি লইয়া পনের দিন এই দ্বীপের নানা স্থানে বেড়াইয়া বিবিধ বন্য জন্তুর ফটো লইয়াছিলাম। কিন্তু, সে এবার নয়, এবার আমাদের সময় ছিল অত্যন্ত অল্প।

এবার যখন আমরা গাটুন লকে পৌছিলাম, তখন সূর্য্য ডুবিবার বিলম্ব নাই।

ক্রিষ্টোবাল তখনও অনেক দূর, অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে সেখানে পৌছিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং আমরা রাত্রির বিশ্রামের জন্য গাটুন ক্লাবে আশ্রয় লইলাম। মশার ভীষণ উৎপাত বলিয়া ক্লাবঘরের দরজা-জানালা পর্য্যন্ত জাল দিয়া ঢাকা। থাকিবার ব্যবস্থা ভালই রাত্রে সুনিদ্রা হইল।

পরদিন সকালে আমাদের ক্ষুদ্র বোট ডলার লাইনের বিরাট জাহাজ প্রেসিডেণ্ট লিন্‌কল্‌নের পাশাপাশি গাটুন হ্রদের তিনটি লিফ্‌ট্ পার হইয়া ক্রিষ্টোবাল অভিমুখে চলিল।

ডেভিস ও আমি পরমার্শ করিলাম যে, জঙ্গলে এখনও যথেষ্ট বেড়ান হয় নাই। সম্মুখের দিকে কিছুদূর গেলেই ত' খাল ফুরাইয়া যাইবে। অতএব ফরাসীদের পুরাতন কাটা খাল দিয়া গাটুন বাঁধের ওপারে সাগ্রে নদীর তীরস্থ জঙ্গলে যাওয়া যাক। সাগ্রে নদী বাহিয়া কারিব সাগরে পৌছিয়া পুনরায় ক্রিষ্টোবাল আসিলেই হইবে।

আমরা রওনা হইলাম এবার তিনজন। একজন ডাচ ভদ্রলোক আমাদের দলে জুটিয়া গেল। এই ভদ্র-লোকের সঙ্গে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার মাতার আলাপ হইয়াছিল, সেদিন ক্লাবঘরে বসিয়া যখন আমি ও ডেভিস পরামর্শ আঁটিতেছিলাম, তখন ইহাকে হঠাৎ সে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখি। তখন হইতেই আমরা তিনজনে একত্র বেড়াইতেছি। ভদ্রলোক পানামা হইতে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ড হইয়া হল্যাণ্ডে ফিরিবেন।

কলোন্ মোটরবোট ক্লাব হইতে আমরা খাদ্য ও পেট্রোল সংগ্রহ করিয়া গাটুন হ্রদের দক্ষিণ তীর ধরিয়া চলিয়া আমরা ফরাসী খালে পৌছিলাম।

এই ফরাসী খালের ইতিহাস বড়ই কৌতুকপ্রদ।

সুয়েজ-খাল-খননকারী বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপস ও তাঁহার অধীনস্থ ইঞ্জিনিয়ারেরা এই খাল খনন করিতে আরম্ভ করেন। পানামা-যোজক খাল কাটিবার কল্পনা অনেক দিন হইতে তিনি পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু, অদৃষ্ট এবার বড় বাঁকিয়া বসিল, কিছুদূর খাল কাটাইবার পরে ম্যালেরিয়া ও বেরিবেরি রোগে অর্দ্ধেক লোক মরিয়া গেল। কত চেষ্টা করিয়াও পানামা অঞ্চলের স্বাস্থ্য বদলানো গেল না। ফরাসী ইঞ্জিনিয়ারেরা খাল কাটিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিলেন ও সেই সঙ্গে ফ্রান্সের বহু শেয়ার-ক্রেতার সর্ব্বনাশ সাধিত হইল।

পরদিন জঙ্গলে ডাচ ভদ্রলোকটির অনুরোধে জংলী লাউ সংগ্রহ করিতে গেলাম। অনেক দিন হইতে তাহার পানামা জঙ্গলের লাউ সংগ্রহ করিবার সখ। সাগ্রে নদীর বিভিন্ন খাল ও শাখানদীর তীরবর্ত্তী ঘন অরণ্যে সারা দুপুর বেড়াইয়া লাউ সংগ্রহ করা গেল।

আমরা ক্রিষ্টোবালে ফিরিয়া আসিবার জন্ম পুনরায় ফরাসীদের কাটাখালের পথ ধরিলাম। ক্রিষ্টোবাল হইতে গাটুন বাঁধের এক মাইল উপর পর্য্যন্ত এই খাল চলিয়াছে। লেসেপস চলিয়া যাওয়ার পর মার্কিণ যুক্তরাজ্যের গভর্ণমেণ্ট এই শতাব্দীর প্রথমে ইহা ক্রয় করেন। আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারেরা পানামা-খাল কাটিবার সময় ফরাসীদের প্রস্তাবিত পথ পরিত্যাগ করিয়া আরও একটু উত্তর দিকে ঘেঁসিয়া পুনরায় নতুন ভাবে খাল কাটিতে আরম্ভ করেন।

ফরাসীদের কর্ত্তিত খালের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে তাহাকে ট্রপিক্যাল নদী বলিয়া ভুল হয়, তার দুই তীর ছাইয়া ঘন জঙ্গল, অযত্নবর্দ্ধিত নারিকেল গাছ ও মোটা মোটা লতা, সে জঙ্গল এমন ঘন যে এমন একটু ফর্সা জায়গা নাই, যেখানে আমরা মোটরবোটখানা বাঁধি।

আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারেরা ফরাসীদের কাটাখালের দুই তীরে যত রাজ্যের ভাঙাচোরা মেসিন, এঞ্জিন, বয়লার, ষ্টীমার, হাতুড়ি, মোটা মোটা শিকল, ড্রেজার, ক্রেন জড় করিয়া রাখিয়াছিল, এখন সেগুলি ঘোর জঙ্গলের গাছপালা, লতাপাতায় চাপিয়া আছে।

ঐ ইংরেজ ভদ্রলোকের করাতের কারখানার মত।

ভোলা পথ

(ক্যানাডার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল)

পৃথিবীতে এমন সব জায়গা আছে, মানুষে সেদিকে বড় যাতায়াত করে না। অথচ সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে সে সমস্ত জায়গা অতুলনীয়। পরিচিত রেলষ্টীমার লাইন থেকে দূরে, জগতের নানা নিভৃত কোণে এরকম কত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যভূমি অবস্থিত। মানুষে তাহার নামও জানে না। এই রকম কয়েকটি জায়গার কথা এখানে লিখ্‌বো।

কানাডার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি অজ্ঞাত স্থান আছে, সেখানে এখনও প্রাগৈতিহাসিক অধুনালিপ্ত জীব-জন্তু বাস করে, এ বিশ্বাস মানুষের অনেকদিনের পুরাতন। চল্লিশ বছর ধরে এ সম্বন্ধে নানা ধরণের গল্প লোকের মুখে মুখে চলে আসছে কিন্তু কেউ কোনোদিন এ জায়গাটা দেখে নি। এড্‌মণ্টনের উত্তর অঞ্চল থেকে ভ্রমণকারী ও স্বর্ণান্বেষণকারীর দল ফিরে এসে এ ধরণের জায়গার গল্প করেছে কিন্তু কারোর বর্ণনার সঙ্গে কারোর বর্ণনা মেলে নি এবং যারা এই গল্প করেছে তারা কেউ বলে নি যে তারা নিজেরা চোখে দেখে এসেছে এ দেশ। সব সময়ই তারা পরের মুখে শুনেছে। কিন্তু স্বচক্ষে এই রহস্যময় ভূমি যে দেখে এসেছে, এমন কোনো পশুচর্ম্ম-সংগ্রাহক বা স্বর্ণান্বেষী লোকের (তা সে রেড্‌ইণ্ডিয়ানই হোক্ বা ইউরোপীয়ানই হোক্) সন্ধান আজও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি।

দক্ষিণ নেহানী নদীর শিকারীর আড্ডা।

প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে একজন ক্রি ইণ্ডিয়ান একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে গল্প করেছিল যে তার বাবা অনেক কাল আগে লিয়ার্ড নদীর উত্তর পারে বহুদূরে শিকারের সন্ধানে গিয়েছিল এবং সেখানে সে একটা অদ্ভুত ধরণের ইণ্ডিয়ান্ জাতির দেখা পায়। সেই অসভ্য ইণ্ডিয়ানেরা তাকে বন্দী করে রাখে অনেকদিন। সেই সময় তাদের মুখে সে শুনেছিল যে লিয়ার্ড ও টোড্ নদীর সঙ্গমস্থান থেকেও অনেকদূরে চারিধারে পাহাড় ও ফার্ অরণ্যে ঘেরা একটা নিভৃত উপত্যকা আছে, সেখানে খুব বেশী শীতও নয়, খুব বেশী গরমও নয়। এই উপত্যকায় অনেক অদ্ভুত ধরণের জীবজন্তু বাস করে—একখণ্ড হরিণের চামড়ায় তারা এই জানোয়ারের ছবি এঁকে দেয়, ডাইনোসর্ জাতীয় অধুনালুপ্ত অতিকায় জীবের মত দেখ্‌তে ছবিটা।

এই হরিণের চাম্‌ড়াটুকু বাপের কাছ থেকে ঐ ক্রি ইণ্ডিয়ান্ পেয়েছিল এবং বৈজ্ঞানিকেরা তাতে আঁকা ডাইনোসরের ছবিটাও দেখেছিলেন। যদি ইণ্ডিয়ানরা সত্যি সত্যি ডাইনোসর্ না দেখে থাক্‌বে তবে তারা কি করে একটা ডাইনোসর্ আঁক্‌তে পারে? তারা কোনো বিজ্ঞানের বই পড়ে নি কিম্বা ডাইনোসরের পুনর্গঠিত কঙ্কাল কোনো মিউজিয়মে দেখে নি। আর যদি কল্পনা হয়, বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এত নিখুঁত ছবি কি কল্পনার সাহায্যে আঁকা যায়?

এ রহস্যের এখনও পর্য্যন্ত কোনো মীমাংসা হয় নি। এই ইণ্ডিয়ান্ জাতির কোনো লোক কখনও সভ্য মানুষের দেখা পায় নি, হড্‌সান উপসাগরের ধারে ইউরোপীয়গণের যে কুঠী আছে সেখান থেকেও হাজার মাইল দূরে

দুর্গম অরণ্যাবৃত পর্ব্বতময় দেশে এদের বাস। সুতরাং তারা যখন ডাইনোসর্ নিখুঁত ভাবে এঁকেছে তখন এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া নিতান্ত অন্যায় নয়, যে তারা ডাইনোসর্ নিশ্চয়ই দেখে থাক্‌বে।

কানাডার এই অঞ্চল লোক-বসতিশূন্য ও অরণ্যাকীর্ণ, তাছাড়া ভয়ানক শীতের দেশ। দু'দশজন মরীয়া প্রকৃতির ইউরোপীয় বা বর্ণশঙ্কর ইণ্ডিয়ান্ এদেশের এখানে-ওখানে বনে-জঙ্গলে কাঠের ঘর বেঁধে বাস করে ও পশুচর্ম্মের জন্যে ফাঁদ পেতে লোমশ জানোয়ার ধরে, এই তাদের উপজীবিকা। এই বিশাল দেশের কোথায় কি আছে না আছে তা কেউ জানে না। অধিকাংশ স্থান এখনও অনাবিষ্কৃত। তবে বেশীদিন বোধ হয় অনাবিষ্কৃত থাক্‌বে না কারণ এরোপ্লেনে এখন অনেকে বহুদূর উদীচ্য বৃত্তের arctic zone-এর সীমা পর্য্যন্ত উড়ে যাচ্ছে শুধু ব্যবসার নতুন পথ খুঁজবার জন্যে।

ফোর্ট ষ্টেশন।

মিঃ গড্‌সেল এই ধরণের একজন শিকারী। তিনি তেইস বছর এই তুষারময় অরণ্যাবৃত দেশে কাটিয়েছেন, চামড়ার ও পশুলোমের ব্যবসার জন্যে। তিনি বলেন যে ১৯১২ সালে পিস্ নদীর উত্তর অঞ্চলে তাঁকে একবার যেতে হয়েছিল ; তখন পিস্ নদীতে যাওয়া বড় কঠিন ছিল। ঘোড়ার পিঠে অনেকদূর গিয়ে তারপর আথাবাস্কা নদীতে ষ্টীমার পাওয়া যেত, ষ্টীমারে স্লেভ হ্রদ পার হয়ে আবার ঘোড়ার পিঠে কাটাতে হোত এক সপ্তাহ, তবে পৌছানো যেতো পিস্ নদীতে। এখন এই রাস্তা সহজ হয়ে গিয়েছে, এড্‌মণ্টন থেকে এখন দুদিনে ফোর্ট সিম্‌সনে পৌছানো যায়—অবশ্য এরোপ্লেনে।

এই ফোর্ট সিম্‌সনে মিঃ গড্‌সেল কিছুদিন ছিলেন, ব্যবসার খাতিরে এবং হড্‌সন বে কোম্পানীর কুঠী-পরিদর্শনের জন্যে। এখানেও তিনি প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের গল্প শুনে এসেছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি যখন আবার ওখানে যান তখন শুনে আসেন দক্ষিণ নেহানী নদীর ধারে এই জায়গাটা অবস্থিত, ফোর্ট লিয়ার্ডেরও বহু উত্তরে। তখন থেকেই তাঁর জায়গাটা দেখ্‌বার আগ্রহ হোল, কিন্তু স্থান এত দুর্গম যে যাওয়ার কল্পনা করা যায় না।

পোর্ট ভিক্টোরিয়া : বড় রাস্তা।

তারপর ১৯২৭ সালে প্রথম এরোপ্লেন নাম্‌লো স্লেভ হ্রদের জলে, হড্‌সন বে কোম্পানীর কুঠী ফোর্ট রেজিলিউশনে। এরা আশপাশের পর্ব্বত-জঙ্গল দুর্গম অরণ্যভূমিতে এসেছে সোনার খনি খুঁজ্‌তে, নর্দার্ণ এরিয়েল মিনার‍্যাল্‌স্ এক্‌স্‌প্লোরেসন্ কোম্পানীর Northern Æriel Minerals Exploration Companyর পক্ষ থেকে। চার্লস ম্যাকলাউড্ এদের প্রধান পাইলট্—মিঃ ম্যাকলাউডের অন্য দুই ভাই প্রায় ত্রিশ বছর আগে এই অঞ্চলে সোনার সন্ধানে এসে ইণ্ডিয়ানদের হাতে প্রাণ হারায়, অনেক দিন পরে তাদের কঙ্কাল পাওয়া যায় নেহানী নদীর পশ্চিম পারে একটা বনের মধ্যে। সে পুরোনো কথা যাক্। ১৯২৭ সালের এই এরোপ্লেন্-বিহারীদের দলে মিঃ গড্‌সেলও ছিলেন, এবং তাঁরা সামনের গ্রীষ্মকালে কাজ আরম্ভ করবেন ভেবে হ্রদের তীরে তাঁবু ফেলেন, এরোপ্লেন্ ফিরে চলে যায় এবং কথা থাকে যে শীতের প্রারম্ভে আবার এরোপ্লেন্

ফিরে এসে তাঁদের নিয়ে যাবে। কিন্তু সেবার শীতের প্রারম্ভে এরোপ্লেন্ ফিরলো না, তখন তাঁরা ব্যস্ত হয়ে নিজেরাই ডাঙ্গায় চড়ে ফোর্ট সিমসনের দিকে রওনা হলেন। তাঁরা পথ ভুলে অন্য একটা অজানা নদীতে এসে পড়লেন এবং খরস্রোত নদীতে তাঁদের ডোঙ্গা উল্টে গিয়ে পাহাড়ের ধাক্কায় চূর্ণ হয়ে গেল। একদল বন্য ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে সেখানে দেখা। তারা শান্ত প্রকৃতির লোক, এঁদের যত্ন করে একটা জায়গায় নিয়ে গেল, সেখানটা চারিধারে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এবংসেখানে এমন সব গাছপালা, যা কেবল উষ্ণ-মণ্ডলেই দেখা যায়। তখন সকলেরই মনে হোল যে এই সেই অজানা রহস্যময় উপত্যকা যার কথা তাঁরা বহুকাল ধরে শুনে আস্‌ছেন। কিন্তু কোথায়ই বা অতিকায় জানোয়ার, আর কোথায়ই বা সোনার খনি। জায়গাটায় চার পাঁচটা গন্ধকজলের প্রস্রবণ আছে এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে একটা ছোটনদী বার হয়ে নেহানী নদীর সঙ্গে বোধহয় মিলেছে। এতকাল ধরে যা শুনে আস্‌ছেন, আষাঢ়ে গল্প।

সমুদ্র-পথে: মাহি।

ভূস্বর্গ সেচিলিস্

ব্রিটিশ ঈষ্ট আফ্রিকা থেকে হাজার মাইলের মধ্যে ভারত মহাসাগরে সেচিলিস্ দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। সৌন্দর্য্যে এই দ্বীপপুঞ্জ ভারত-সাগরীয় দ্বীপগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ ধরণের কথা পর্য্যটকের মুখে শোনা যায়। সেচিলিস্ দ্বীপ পূর্ব্বে ফরাসীদের অধিকারে ছিল, এখানকার অধিবাসী অধিকাংশই কৃষ্ণকায় নিগ্রো, কিছু ফরাসী, কিছু ক্রিয়োল; তারা সবাই ফরাসী ভাষায় কথা বলে। অনেক কাল আগে একটি ফরাসী বোম্বেটের দল দেশের আইনের শাস্তির ভয়ে পালিয়ে এখানে বাস করেছিল, তাদের ও কৃষ্ণকায় নিগ্রোর সংমিশ্রণে এক ধরণের বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়েছে, তাদের ভাষাও বর্ণসঙ্কর ফরাসী! এ ছাড়া অন্য কোনো জাতি সেচিলিস্ দ্বীপে বাস করে না। তবে আন্দাজ ত্রিশ চল্লিশ জন ইংরেজ মাছের ব্যবসা উপলক্ষে এখানে এসে বছরে আটদশ মাস কাটায়।

বিখ্যাত পর্য্যটক ও সাংবাদিক ডেনিস্ পামার সেচিলিস্ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার কিছু এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

"মোম্বাসা বন্দরে একদিন একটা মদের দোকানে বসে আছি, সন্ধ্যার সময়, হাতে কাজকর্ম্ম নেই—সেখানে একজন লোক সেচিলিস্ দ্বীপের রাজধানী মাহির সম্বন্ধে গল্প তুল্লে। বল্লে ও রকম সুন্দর যায়গা পৃথিবীর কোথাও নেই—কোথায় লাগে হাওয়াই আর টাহিটি।

বক্তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, পরণে তার জীর্ণ পরিচ্ছদ, একমুখ দাড়িগোঁফ, কিন্তু সেচিলিস্ দ্বীপের সম্বন্ধে বল্‌তে বল্‌তে লোকটার মুখের চেহারা যেন বদ্‌লে গেল, চোখ উৎসাহে ও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। শুধু যে যায়গাটা দেখ্‌তে ভাল তা নয়, সেখানকার লোকের কোনো দুঃখকষ্ট নেই, জিনিষপত্র সস্তা, এক পেনিতে এক ডজন ভাল মাছ পাওয়া যায়, খাও দাও সুখে থাকো, কোনো ধরাবাঁধা প্রণালী নেই জীবনযাত্রার, সেখানকার লোকে এখনও অনেকে মোটরগাড়ী দেখেনি, রেলগাড়ী দেখেনি।

সেচিলিস্: ক্রিয়োল কিশোরী।

এর আগে আমি কখনো সেচিলিসের নাম শুনিনি—ঠিক করলাম অবিলম্বে একবার যেতে হবে সেখানে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল মাহি একটা দ্বীপ, রাজধানীর নাম পোর্ট ভিক্টোরিয়া, দেড়মাসে সেখানে একবার একখানা জাহাজ যায়। ম্যাপে সেচিলিস্ দ্বীপ দেখে কিছু বুঝবার যো নেই—সেচিলিস্ একটা নাম মাত্র, ভারত মহাসাগরের নীল রংএর মাঝখানে, তলায় একটু লাল-দাগ দেওয়া, কারণ বর্ত্তমানে ওটা ইংলণ্ডের অধিকার-ভুক্ত।

কে জান্‌তো সেচিলিস্ ও পোর্ট ভিক্টোরিয়া দেখ্‌বার আগে যে ঐ লাল কসিটানা দেশ! ফুটকিটুকু পৃথিবীর মধ্যে একটি অতি অপরূপ সৌন্দর্য্যভূমি, স্বপ্নের রাজ্য, পরীর দেশ! ভারত-সমুদ্রের নীলজলে ডুবে আছে গোটাকতক নগণ্য ছোট ছোট দ্বীপ, নিকটতম বন্দর থেকেও হাজার মাইল দূর, অখ্যাত, অবজ্ঞাত, কেউ কোনদিন নাম শোনে নি—অথচ দেখবার পর মনে হলো স্বর্গ কি আর পোর্ট ভিক্টোরিয়ার চেয়েও সুন্দর? এর চেয়ে সুন্দর কোনো জায়গা হতে পারে?

সত্যই তাই। আমেরিকান্ টুরিষ্টরা যাচ্ছে না কোথায়, কিন্তু তারা কখনো নাম শুনেছে মাহির? বড়

জাহাজ যাবার রাস্তা থেকে এই দ্বীপপুঞ্জ অনেক দূরে, মোম্বাসা থেকে প্রায় হাজার বারশো মাইল হবে। বিষুবরেখার চার ডিগ্রী দক্ষিণে সেচিলিস্ অবস্থিত, সবসুদ্ধ প্রায় নব্বইটি দ্বীপ, ছোটতে বড়োতে। এর মধ্যে মাহি সব চেয়ে বড়, মাহির লোকসংখ্যাও বেশী। মাহি সতেরো মাইল লম্বা, চওড়াও প্রায় সাত মাইল। লোকসংখ্যা আন্দাজ ত্রিশ হাজার।

মোম্বাসা থেকে রওয়ানা হওয়ার পাঁচদিনের দিন ভারত-সমুদ্রের অপার নীলজলরাশির দূর কোলে একটু সবুজাভ কালো বিন্দু ফুটে উঠ্‌লো—ওই হোল মাহি। যত জাহাজ কাছে এল, ডেকে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম দ্বীপের সর্ব্বত্রই পাহাড় পর্ব্বত মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে, তালীবনরাজী, নীল বেলা স্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌লো, ক্রমে দেখা গেল পোর্ট ভিক্টোরিয়ার সাদা সাদা ঘরবাড়ী, রাস্তা, দোকান, হোটেল।

যে মুহূর্ত্তে জাহাজ থেকে মোটর-বোটে উঠে চারি ধারে চাইলাম, তীরের ধূসর পর্ব্বতশিখরের দিকে চাইলাম, চারিপাশে অকূল সুনীল সমুদ্রের দিকে চাইলাম—সে মুহূর্ত্তেই বুঝলাম মনে মনে আমি এই দেশেরই কল্পনা এতদিন করে এসেছি, আমার স্বপ্ন এতদিনে বাস্তবে পরিণত হয়েছে!

চীনা জাঙ্ক।

লোকেরাও কি তেমনি সরল! যে লোকটা মোটর-বোট চালাচ্ছিল, তার চেহারাটা ফ্রান্‌জ্‌ হাল্‌স্‌এর লাফিং ক্যাভালিয়ার, Laughing Cavalier-এর মত—মোটর চালাচ্ছে কি সিনেমা-ষ্টুডিওতে অভিনয় করছে তা বলা শক্ত। কাষ্ট্‌ম্‌স্‌এর কর্ম্মচারীরা ঘিরে দাঁড়ালো আমি বল্লাম—একটু দাঁড়ান, ব্যাগের চাবী খুলে দি।
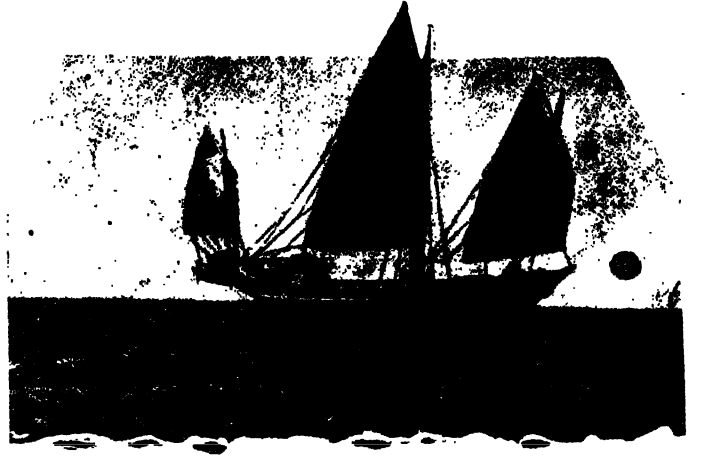
তারা বল্লে—থাক্ থাক্, আর কষ্ট করবেন না। আপনার কাছে কিছু নেই তো? আমি বল্লাম—না কিছু নেই।

ক্রিয়োল কর্ম্মচারীরা হেসে বল্লে—তবে চলে যান। কেন অত হাঙ্গামা কর্ত্তে যাবেন? মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হোল পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তবে সে এই পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে, যেখানে আইনের কড়াকড়ি নেই, নিয়মের বাঁধাবাঁধি নেই, যেখানে সবারই মুখে হাসি, সবাই ভদ্র, সবাই সরল।

তারপর একজন এসে আমাকে ওখানকার হোটেলে নিয়ে যেতে চাইলে। দুধারে কালো কালো পাহাড় যেন দৈত্যপুরীর প্রাচীরের মত দেখাচ্ছিল অন্ধকারে। আমরা সহরের বড় সদর রাস্তা ধরলাম। একটা ছোট ক্লক্-টাওয়ার, একজন পুলিশম্যান দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তার ধারে বড় বড় গাছের সারি।

হোটেল ছোট একটা সাদা বাড়ী, দোতালায় চারিধারে বারান্দা আছে। হোটেলের কর্ত্তা তখন সেখানে ছিল না, আমরা বারান্দাতে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগ্‌লাম। সহরের রাস্তায় খুব বেশী লোক চলাচল করছিল না—একদল নিগ্রো হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেল, দুটি সুন্দরী ক্রিয়োল মেয়ে ফুল বিক্রী করছে, কয়েকজন ফরাসী খালাসী জেটীর দিকে চলেছে। সবাই হাস্‌ছে, সবারই মনে স্ফূর্ত্তি, যেন কি একটা উৎসবের দিন সবারই। একটু পরে হোটেলের কর্ত্তা এল, সে-ও ক্রিয়োল, তবে ফরাসী বলতে পারে ভাল। সগর্ব্বে আমায় জানালে সে একবার ইউরোপ ঘুরে এসেছে—প্যারিসে কিছুদিন ছিল, বিলেতেও গিয়েছে। এজন্য দেখ্‌লাম তার গর্ব্বের অন্ত নেই। এ দ্বীপের অধিকাংশ লোকেই বড় একটা কোথাও যায় নি, যে এত দেশ দেখে বেড়িয়েছে, গর্ব্ব তার কেনই বা না হবে!

ডিনারের টেবিলে সে সেচিলিস্ সম্বন্ধে অনেক গল্প করলে। এখানকার একটা দ্বীপে জগদ্বিখ্যাত জোড়া নারিকেল ফলে, এক একটা নারিকেল সাধারণ ফুটবলের চেয়ে তিনগুণ বড়। পৃথিবীর আর কোথাও এ নারিকেল দেখা যায় না। লা ডিগ্ দ্বীপের বড় কচ্ছপ কি আমি দেখেছি? দেখিনি? দেখ্‌বার জিনিষ, আমি যেন সে কচ্ছপ না দেখে এ-দ্বীপ না ছাড়ি। মাহি? মাহির মত এত সুন্দর জায়গা পৃথিবীর কোথায় আছে? এ জায়গা ছেড়ে সে কোথাও যেতে রাজী নয়।

আমার দিনগুলো কাট্‌তে লাগ্‌ল স্বপ্নের মত। জ্যোৎস্না উঠে, বন্দরের নীলজলে নারিকেলবনের ছায়া পড়ে। সমুদ্রের ধারে শিলাখণ্ডের ওপর বসে কর্কশ নিগ্রোকণ্ঠের গান শুনি, ক্রিয়োল মেয়েরা সাঁতার দেয়—দিন কতক থাক্‌বার পরে মনে হোল আমি এই দ্বীপের একজন হয়ে গিয়েছি, কোথায় যাব এমন সত্যিকার ভূস্বর্গ ছেড়ে! যে জনকয়েক ইংরেজের সাথে আমার আলাপ হয়েছে তারাও ঐকথা বলে। তারা ব্যবসা উপলক্ষে অনেকদিন এসেছে এখানে, কিন্তু এমন জালে জড়িয়ে পড়েছে' আর কোথাও যেতে রাজী নয়, এ দ্বীপ ছেড়ে। সেচিলিসের সৌন্দর্য্য তাদের বন্দী করেছে।

স্বগৃহে প্রবীণ সেলুঙ্গা

তার মধ্যে একজন লোক দু'বছর আগে এখানে এসেছিল একমাসের ছুটি নিয়ে মাছ ধরতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে আছে। এখানে এসে সে আর ফিরে যায় নি। তার স্ত্রী তার অপেক্ষায় এখনও আছে। সে যাই-যাই করছে আজ দু' বছর ধরে, কিন্তু যেতে পারে না।

পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে পচিশ শিলিংএ সপ্তাহ চলে যায়—দু পাউণ্ড যার সপ্তাহে আয়, সে রাজার মত থাক্‌তে পারে।

সেচিলিস্ দ্বীপের উপকূলে অজস্র নারিকল-বন, এক একটা গাছ দুশো ফুটেরও বেশী উঁচু। আর কি অদ্ভুত সূর্য্যাস্ত! সূর্য্যাস্তের রঙে আর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে এই নারিকেল-বনের সারি অবাস্তব বলে মনে হয়, যেন অন্য কোনো জগতে এসে পড়েছি মনে হয়; কতদিন জ্যোৎস্নাশুভ্র সৈকতে একা বসে কাটিয়েছি—একদিকে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর পত্র-মর্ম্মর, সাম্‌নে অন্তহীন ভারত-সমুদ্রের তরঙ্গসঙ্গীত!

তারপর একদিন ষ্টীমারে চেপে মাহি থেকে চলে এলাম। কয়েকবছর হয়ে গিয়েছে। পোর্ট ভিক্টোরিয়া বোধহয় স্বপ্ন। সত্যই কি আমি সেখানে ছিলাম?"

মাগু´ইএর সেলুং জাতি

বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামের উপকূল হইতে কিছুদূরে মাগু´ই দ্বীপপুঞ্জ। এখানে ছোট বড় অনেক দ্বীপ আছে আর মাঝে মাঝে নিস্তরঙ্গ সমুদ্র, সুদূরের মত নিথর। এই সব দ্বীপে সেলুং জাতির বাস। সেলুংরা শান্তিপ্রিয় জাতি, আগে ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে এরা কৃষি ও পশু-পালন করতো, কিন্তু অনবরত যুদ্ধবিবাদে তারা দেশ ছাড়তে বাধ্য হোল। এখন এখানে নৌকাতে বাস করে ও মাছ ধরে—এই তাদের উপজীবিকা।

কিন্তু এখানে তারা নিরাপদ নয়। দুর্দ্ধর্ষ মালয় বোম্বেটেরা অনেক সময় অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করে ছেলেমেয়েদের ধরে বেঁধে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসরূপে বিক্রী করে, যথাসর্ব্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে যায়। সুতরাং সেলুংদের দোষ দেওয়া যায় না, দূরে পালতোলা অপরিচিত জাহাজ দেখামাত্র নিজেদের জিনিষপত্র ও নৌকাসমেত চোখ পালটাতে না পালটাতে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেলুং জাতির লোককে দেখা এজন্য খুব সহজসাধ্য নয়।

এদের নৌকাকে কারাং বলে—একটা মোটা কাঠের গুঁড়িতে খোল করে এরা নৌকা বানায়। ওপরে মাদুর কিংবা কাঠের ছই থাকে, মাদুরের পাল ওড়ায়। নৌকার মাঝখানে পাথর ও কাদার উনুন, দশ বারোখানা নৌকার দশ বারোটা পরিবারের রান্না একত্র এক উনুনে হয়। এই অতি-আদিম রীতিতে তৈরী নৌকায় তারা সচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে এক দ্বীপ থেকে অন্যদ্বীপে ঘুরে বেড়ায়, ঝড় বৃষ্টি তুফান কিছুই গ্রাহ্য করে না। এক একটা দলে দশ বারোটা নৌকা থাকে, আবার ত্রিশ চল্লিশখানাও একত্র দেখা যায়।

মার্ব্বেলের পাহাড়।

মাছধরা তাদের একমাত্র উপজীবিকা। তাদের পুঁজির মধ্যে মাছ ধরার জাল, বর্শা, দড়িদড়া, সামুদ্রিক কচ্ছপ ধরার সরঞ্জাম। কচ্ছপের মাংস খুব ভালবাসে। চীনা সওদাগরী জাঙ্ক থেকে মাছ ও কচ্ছপের বদলে চাল নেয়। ভাত ও মাছ এদের প্রধান খাদ্য। সেলুংরা সাঁতারে ভারী ওস্তাদ। জলে এরা বড় বড় সামুদ্রিক হিংস্র মাছ কি হাঙ্গর কি অক্টোপাস্—সকলকে এড়িয়ে চল্‌বার কৌশল জানে।

মাগু´ই দ্বীপপুঞ্জ প্রায় দুশো দ্বীপের সমষ্টি। এদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। নীল নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে ছোট বড় দ্বীপ, গভীর অরণ্যে ভরা, অধিকাংশ দ্বীপই জনমানব হীন, শুধু বুনো শূয়োর, হরিণ, ও কালো বাঁদর বনের মধ্যে থাকে আর থাকে সমুদ্রের তীরে বড় বড় কচ্ছপ। মানুষ কখনো দেখেনি বলেই হোক বা যে জন্যেই হোক্ এই সব বাঁদরের দল মানুষকে আদৌ ভয় করে না। বনে বনে নানা বিচিত্র বর্ণের পাখী দেখতে পাওয়া যায়।

কোনো কোনো দ্বীপের উপকূল ম্যান্‌গ্রোভের বনে ভর্ত্তি। ছোট ছোট ঘোলা-জলের খাল দ্বীপের মধ্যে চলে গিয়েছে—খাল বেয়ে নৌকা করে দ্বীপের মধ্যে ঢোকা যায়, কিন্তু ডাঙ্গায় নামা বিপজ্জনক, কুমীর ও বিষাক্ত সাপ সর্ব্বত্র।

সেলুংএরা জাতি হিসাবে বৈশিষ্ট্য আর বেশীদিন রাখতে পারবে না। সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তারা বদ্‌লে যাচ্ছে। অনেকে আফিং খেতে অভ্যাস করেছে, আফিং কিন্‌তে হলে টাকা চাই—মাছের বদলে চীনা ব্যবসাদারেরা আফিং দেয় না। তাই আজকাল অনেকে পিনাং ও সিঙ্গাপুরে কুলীগিরি ও মাঝিগিরি করে পয়সা রোজগার করে।

সমুদ্রতলের জগৎ

উইলিয়ম বিবের নাম বৈজ্ঞানিক মহলে সুপরিচিত। সমুদ্রের গভীরতম তলদেশের জীবকুল সম্বন্ধে ইঁহার গবেষণা জগদ্বিখ্যাত। প্রিন্স্ অফ্ মোনাকো ছাড়া এ সম্বন্ধে এত অনুসন্ধানও বোধ হয় বেশী লোকে করেন নাই।

১৯২৮ সালে মিঃ বিব্ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে বার্ম্মুডা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত নন্সাচ্ নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ সামুদ্রিক জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য চাহিয়া লন এবং ১৯২৯ সালে তথায় একটি গবেষণাগার স্থাপন করেন। এই দ্বীপটিকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকের সমুদ্রে ভ্রমণ করিবার জন্য একটি ছোট জাহাজও ক্রয় করা হয়। নিউইয়র্ক জীব-বিদ্যা-সমিতি এ বিষয়ে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। মিঃ বিবের অধীনে এই সমিতির ডিপার্টমেণ্ট অব্ ট্রপিক্যাল রিসার্চ্চ Department of Tropical Research এই-খানেই স্থাপিত হয়।

শিকারোদ্যত ড্রাগন মাছ।

মিঃ বিবের নিজের ভাষাতেই তাঁর গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল এইখানে ব্যক্ত করি।

"সমুদ্রের গভীরতম তলদেশের প্রাণীকুল সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানতে পেরেছি, যদি আমাকে কেউ এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাঁকে বলব যে, জ্ঞাতব্য বিষয়ের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও আমরা জানতে পারি নি।

ধরুন, এই নিউইয়র্ক সহরের দু' মাইল উপর দিয়ে অন্য কোন গ্রহের একটা এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে এরোপ্লেনের আরোহীরা একটা ছোট জাল নামিয়ে সহরের রাস্তাঘাটের আশপাশ থেকে একরাশ জঞ্জাল সংগ্রহ ক'রে উপরে তুললে। এখন যদি সেই সংগৃহীত ছেঁড়া কাগজ, কাপড়ের টুক্রো, ভাঙা কাঁচ, ভাঙা টিন কি বিস্কুটের বাক্স থেকে তারা এই সহরের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার জীবন-যাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করতে প্রবৃত্ত হয়, তবে প্রকৃত পক্ষে তারা নিউইয়র্ক সহর ও তার অধিবাসীদের কথা কতটুকু জানতে পারবে ?

আমাদের দশাও এই রকম। এ বিষয়ে অনুসন্ধান সুরু হয়েছিল ষাট বৎসর পূর্ব্বে, চ্যালেঞ্জার নামক জাহাজ যখন আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তলদেশস্থ প্রাণীকুলের সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। কিন্তু এই ষাট বৎসরে অনুসন্ধান-রীতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নি—জালের আকার ও জাল টেনে জাহাজে তুলবার গতিবেগ একই রকম আছে। এ জন্য গভীর তলদেশের অনেক শ্রেণীর প্রাণীকে জীবন্ত অবস্থায় উপরে নিয়ে আসার সুবিধা হয় নি—তুলতে তুলতে তারা মারা যায়। তা ছাড়া জালের আকৃতির পরিবর্ত্তন না হ'লে দ্রুত সন্তরণশীল অনেক প্রাণীকে জালে আটকানো সম্ভবপর হয় না।

আরও একটা কথা আমার মনে হয়েছিল এই যে, সারা দুনিয়ার সমুদ্র ঘুরে বেড়ানোর অপেক্ষা একটা জায়গা নির্দ্দিষ্ট করে নিয়ে কাজ আরম্ভ করলে অনুসন্ধান প্রণালীবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হ'তে পারে। নন্‌সাচ্ দ্বীপে গবেষণাগার স্থাপন করার মূলে এই উদ্দেশ্যই আমার ছিল। পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য প্রথমে আমি একদিন নিউইয়র্ক বন্দর থেকে ছোট একটা জাহাজ ভাড়া ক'রে সারারাত সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে হাডসন নদীর প্রাচীন খাতের কাছে উপস্থিত হই—এবং জাহাজের চারিধারে ছ'খানা জাল দু'মাইল লম্বা তারের সঙ্গে গেঁথে নীচে নামিয়ে দিই। তাতে ফল মোটের উপর ভাল হয়।

ড্রাগন মাছের হাঁ।

নন্‌সাচ্ দ্বীপের চারি ধারে আট বর্গ মাইলব্যাপী স্থান আমি চিহ্নিত ক'রে নিয়েছি এবং এরই মধ্যে আমি কাজ করি। বার্ম্মুডা দ্বীপের দুটো বড় বড় বাতিঘর দ্বারা এই স্থান উত্তরে ও দক্ষিণে সীমাবদ্ধ, ভুল হবার কোন উপায় নেই। গত তিন বৎসরের মধ্যে আমার জাহাজ এই জায়গায় দুশো একাত্তর বার বেড়িয়ে জাল ফেলেছে এবং তার ফলে অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব সামুদ্রিক প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছে।

নন্‌সাচ্ দ্বীপের দৈনন্দিন কার্য্য-প্রণালী আমাদের এই রকম।

ভোর সাড়ে ছ'টার সময় আমাদের জাহাজ ষ্টীম তৈরী ক'রে এসে হাজির হয়। দূরবীক্ষণ দিয়ে বাইরের সমুদ্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখি। বায়ুর গতি, ঢেউয়ের বেগ এবং বায়ুমান যন্ত্রের অবস্থা যদি অনুকূল হয়, তবেই আমরা জাহাজ ছাড়ি। কারণ সমুদ্রে ঝড় হবার আশঙ্কা থাকলে বা সমুদ্র তরঙ্গসঙ্কুল হ'লে জাল ছিঁড়ে যেতে পারে, এ জন্য সে অবস্থায় দিনের কাজ বন্ধ রাখা হয়।

দিন ভাল থাকলে আমার দু'জন সহকারী জাহাজে ওঠেন এবং জাহাজ পাঁচ মাইল দূরে বহির্সমুদ্রে চলে যায়। তারপর দুশো পাউণ্ড ওজনের ভার ঝুলিয়ে দু'মাইল লম্বা তারের সঙ্গে ছ'খানা রেশমের সূতায় বোনা বড় জাল সমুদ্রে ফেলে ধীরে ধীরে টানা হ'তে থাকে। চার পাঁচ ঘণ্টা জাল-টানার কাজ চলে।

আমরা জাহাজ থেকে ছোট মোটর-বোটে নামি এবং প্রজাপতির আকারের জাল দিয়ে বিচিত্র বর্ণের উড়ন্ত মাছ শিকার করি, কখনও নতুন ধরণের সামুদ্রিক পাখী কি বড় হাঙ্গরকে গুলি করে মারি। চার পাঁচ ঘণ্টা এই ভাবে কেটে যায়, তারপর আমরা জাল টেনে জাহাজের উপর তুলে আমরা ডাঙ্গায় ফিরে আসি। এইখানে গতির প্রয়োজন আছে, কারণ এমন সব প্রাণী আছে, তারা জলের উপরে বেশীক্ষণ বাঁচে না, যদি না কৃত্রিম উপায়ে তাদের বাঁচানোর

স্বচ্ছ মাছের ঝাড়।

চেষ্টা করা যায়। যেমন, সমুদ্রের গভীরতম তলদেশের জল খুব ঠাণ্ডা—ওই ধরণের ঠাণ্ডা জল ভিন্ন বাঁচতেই পারে না এমন অনেক প্রাণী আছে। নন্‌সাচ্ দ্বীপের গবেষণাগারে তাদের জন্য বরফ ও নাইট্রেট্ দিয়ে ঠাণ্ডা জল তৈরী করা আছে—সেখানে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওই সব প্রাণীকে তাতে ডোবানো হয়। এই সমস্ত জলের পাত্র যাতে সামুদ্রিক প্রাণীদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করার সুবিধা হয়, এ ভাবে নির্ম্মিত। তারপর আমরা অনুবীক্ষণ নিয়ে ব'সে যাই বহু বিচিত্র গঠন ও আকৃতিবিশিষ্ট সামুদ্রিক প্রাণীদের অবয়ব, ইন্দ্রিয় এবং পরস্পরের সম্বন্ধ অনুসন্ধান করতে।

মাইলখানেক গভীর সমুদ্রতলের অবস্থা এত অদ্ভুত যে, অল্প কথায় তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রথমতঃ সে সব স্থানে এত অন্ধকার যে, পৃথিবীর উপরের মসীকৃষ্ণ ঘোর অন্ধকারময় রাত্রিও তার তুলনায় আলোকোজ্জ্বল। আর এত নিস্তব্ধ, শব্দহীন সে জায়গা যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের অধিবাসীদের সে বিরাট শব্দহীনতার কোন ধারণাই নেই। এক মাইল গভীর তলদেশেই অনেক সময় জলের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এক টন—এবং শৈত্য মিষ্ট জল ও লোণাজল জমে বরফ হ'য়ে যাওয়ার মাঝামাঝি। সমুদ্রের তলার এই অন্ধকারময় শীতের রাত্রির অবসান নেই, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে সেখানে চির-রাত্রির অন্ধকার কখনও দূর হয় না।

সাপের মত দেখিতে ড্রাগন মাছ।

এখন ভাবুন, এই অদ্ভুত দেশের প্রাণীকুলও কত অদ্ভুত। এই ভয়ানক পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাদের বেঁচে থাকতে হয়—যুগ যুগ ধ'রে এই অবস্থার সঙ্গে যুঝে তাদের শরীর সেই ভাবে গ'ড়ে উঠেছে, যাতে এই ধারণাতীত শৈত্য ও বিরাট জলের চাপ সহ্য করতে পারে, যাতে এই নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যেও তারা নিজেদের আহার খুঁজে নিয়ে প্রাণ ধারণ করতে পারে। কারণ জীবন মানেই আহার এবং এ সব স্থানে আহার মানেই অন্য প্রাণীর প্রাণ হনন।

কিন্তু এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো একদিনের ব্যাপার নয়। এই সকল জীবের পূর্ব্বপুরুষেরা সমুদ্র-গর্ভের শৈলমালা কিংবা মহাদেশের যে অংশ ঢালু হয়ে ক্রমশঃ সমুদ্রে নেমে গিয়েছে—সেই ঢালু গা বেয়ে ক্রমশঃ নেমে এসেছিল—নেমে আসতে আসতে ক্রমপরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহেরও পরিবর্ত্তন ঘটে এসেছে—লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ভাবে পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এসে বর্ত্তমানে তাদের দৈহিক গঠন এই রকম দাঁড়িয়েছে। আর সে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! রূপ-কথার ড্রাগনরা কোথায় লাগে সমুদ্রতলস্থ এই সব প্রাণীদের কাছে!

এই ভাবে নামতে নামতে যারা পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক অবস্থাকে জয় করতে পেরেছে, আজ তাদের আমরা দেখছি—কিন্তু যুদ্ধে অপারগ হ'য়ে যারা ধ্বংস হ'য়ে গেছে, লুপ্ত হ'য়ে গেছে—তাদের হিসাব কোথাও লেখা নেই।

তবে শৈত্যের দরুণ এদের দৈহিক পরিবর্ত্তন খুব বেশী হয় নি। যাদের রক্ত ঠাণ্ডা, যে দ্রব্যের মধ্যে তারা ভাসে, তাদের দেহ সেই দ্রব্যের উত্তাপ গ্রহণ করে। জলের চাপও এদের দেহের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটায় নি। এদের দেহের যা-কিছু গঠনের অভিনবত্ব তা সবই হয়েছে সমুদ্রগর্ভের অন্ধকারের জন্য।

জলের তলার প্রাণীকুল অন্ধকারের মধ্যে বেঁচে থাকবার প্রধানতঃ দুটো উপায় বার করেছে। এক দল প্রাণীর মুখের সঙ্গে সরু লম্বা সুতোর মত জিনিষ আছে, অনেক সময় প্রাণীর দেহটার চেয়ে এই সুতো অনেক গুণ বেশী। গভীর অন্ধকারের মধ্যে এই সুতোটা এদিক ওদিক চালিয়ে তারা নিজেদের শিকার ধরতে পারে, গতিপথ নিরূপিত করতে পারে। সেই সুতোটা তাদের চোখের কাজ করে। আর এক ধরণের মাছ ডানার সাহায্যে ঠিক এই কাজ করে—তবে তাদের ডানা আরও পাতলা ও আরও খাঁজ-কাটা। এই সব প্রাণীর চোখ ক্রমে ছোট হ'তে হ'তে নিস্তেজ হ'য়ে যায়, চোখের স্নায়ু অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে—শেষে চোখ শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। জলের তলায় এই ধরণের অনেক প্রাণী আছে—তারা একেবারে অন্ধ।

আলোক-মাছের আলোর ব্যাপার এ ছবিতে স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে।

কিন্তু সমুদ্রের মাঝামাঝি জায়গায় যারা আছে—অর্থাৎ যারা কিছু কিছু সূর্য্যের আলো পায় এবং সেই অতি ক্ষীণ আলোর সাহায্য নিয়ে দর্শনেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে—তাদের শরীর দিয়ে লণ্ঠনের মত আলো বার হয়। গভীরতম তল-দেশের প্রাণীকুলের চেয়ে এই শ্রেণীর জীব জালে ধরা অপেক্ষাকৃত সহজ—সেই জন্য এদের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করার সুবিধাও বেশী। দেখা গিয়েচে, স্কুইড্ (squid) ও চিংড়ি-মাছ জাতীয় প্রাণীরা স্বয়ম্প্রভ হয়—আর বাণ্‌মাছ জাতীয় প্রাণীর থুত্‌নীতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের সুতো গজায়। তবে সুতোজাতীয় স্পর্শেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়সম্পন্ন প্রাণীরা আরও গভীরতর প্রদেশে বাস করে।

এই আলো যে কত রকমের ও কত রঙের! বাতির মত, দীর্ঘ আলোকদণ্ডের মত, জাহাজের পোর্ট-লাইটের মত, রঙীন্ আতসবাজির মত সবুজ, রাঙা, সাদা, নানা রঙের আলো। কোন কোন প্রাণীর ডানা দিয়ে আলো বেরোয়, কোন প্রাণীর পিঠ দিয়ে, কোন প্রাণীর গাল দিয়ে, কারুর বা কপাল দিয়ে।

আলোর ব্যবহারও নানা রকম। কোন কোন আলো খাদ্যকে আকৃষ্ট ক'রে খাদকের মুখের কাছে নিয়ে আসে—নতুবা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে শিকার খুঁজে বার করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। একই রকম আলোর সাহায্যে অনেক সময় প্রাণীরা স্বশ্রেণীভুক্ত অপরাপর প্রাণীকে চিনে নেয়।

আলোক-মাছের ঝাড়: দুই পাশে আলোকময় স্থান দ্রষ্টব্য।

আবার এক শ্রেণীর মাছ আছে, তাদের কপালে একটি মাত্র চোখ, একচক্ষু দৈত্যের মত, কিন্তু ওই একটা চোখের দৃষ্টিশক্তি প্রায় ছোটখাটো দূরবীক্ষণের মত—বহুদূর থেকে তারা নিজেদের শিকার চিনে নিতে পারে—তবে এ শ্রেণীর একচক্ষু মাছ খুব তলায় থাকে না—মাঝামাঝি জায়গাতেই তাদের বেশী দেখা যায়।

সূর্য্যের আলো সমুদ্রের মধ্যে যতদূর প্রবেশ করে, সে পর্য্যন্ত প্রাণীদের এক রকম রং, আবার যেখানে আলো একেবারেই নেই—সেখানকার প্রাণীদের আর এক রকম রং। তবে এর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী আছে। সাধারণতঃ যে সব প্রাণী জলের উপরের দিকে থাকে, তাদের পিঠের রং সমুদ্রের জলের রংএর মত ও পেট ধবধবে সাদা। তারপর যত নীচে যাওয়া যাবে, ততই নীল রং মিলিয়ে গিয়ে ধূসর, নয় তো একেবারে সবটাই সাদা। তারপর খানিক দূর পর্য্যন্ত প্রাণীদের দেহ একেবারে স্বচ্ছ, যেমন জেলি মাছ ও এক ধরণের চিংড়ি। এই শ্রেণীর সামুদ্রিক প্রাণী কিন্তু খুব বেশী—গভীর সমুদ্রের মাঝামাঝি স্থানের কাঁকড়া, চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, squid, প্রবাল—এরা প্রায়ই স্বচ্ছ। আরও গভীর প্রদেশের প্রাণীরা অর্দ্ধস্বচ্ছ, রূপোর মত চক্‌চকে সাদা, বিচিত্র বর্ণ—নয় তো গোলাপী। এই পর্য্যন্ত সূর্য্যের আলোর গণ্ডী শেষ হ'ল।

৮০০ ফ্যাদম তলের স্বচ্ছ চিংড়ি মাছ: এ পর্য্যন্ত মাত্র দুইটি জীবন্ত নমুনা জলের উপরে আনা সম্ভব হইয়াছে।

তারপর ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন চির-রাত্রির দেশ, যেখানে বেশীর ভাগ প্রাণীকুল সূতো চালিয়ে চলাফেরা করে ও শিকার ধরে, ব্যবহারের অভাবে যাদের চোখ নিষ্প্রভ, অকর্ম্মণ্য হ'য়ে দেহের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছে। এখানকার প্রাণীদের রং হয় চারিপাশের ওই অন্ধকারের মত কালো—নয় তো টক্‌টকে উজ্জ্বল লাল। পাঁচশো ফ্যাদমের নীচে অধিকাংশ চিংড়ি কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী টক্‌টকে লাল এবং মৎস্যজাতীয় প্রাণী ঘোর কালো।

সমুদ্রের উপরের দিক থেকে যতদূর সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে, ততদূর পর্য্যন্ত প্রাণীকুলের প্রধান খাদ্য এক ধরণের আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ্। বিজ্ঞানে এই জাতীয় উদ্ভিদের নাম ডায়াটম্ (diatom)—এই ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদ ছাড়া নানা জাতীয় সামুদ্রিক শেওলাও ওদের খাদ্য। মগ্নশৈলরাজির গুহায় গহ্বরে কিংবা পিচ্ছিল, আর্দ্র ঢালুতে অনেক রকম উদ্ভিদ জন্মায়—চিংড়ি জাতীয় মাছের এই উদ্ভিদ প্রধান খাদ্য।

কিন্তু যেখান থেকে অন্ধকারের রাজ্য আরম্ভ হ'ল, সেখানে ডায়াটম্ (diatom) আর মেলে না, সূর্য্যালোকের অভাবে কোন উদ্ভিদও গজায় না—সেখানকার আইন হচ্ছে 'আমি তোমায় খাই' 'তোমাকে আরে খায়'। অন্ধকারে খাদ্য জোটাও অত্যন্ত কঠিন—জীবন-যুদ্ধের নির্দ্দয় প্রতিযোগিতায় যে হেরে গেল, সেই হ'ল খাদ্য, যে জিতলে সে বিজিতকে ভক্ষণ ক'রে নিজে বাঁচল।

নিজের চাইতে তিন গুণ বড় মাছ গিলিয়া এই মাছের চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে।

আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, শরীরের আকারগত বৈষম্য খাদ্য ও খাদকের সম্বন্ধে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। যেখানে খাদ্য জোটানোই কঠিন সমস্যা, সেখানে সে খাদ্য ছোট কি বড় তা বাছবিচার করতে গেলে খাদকের চলে না—কাজেই এক হাত লম্বা প্রাণী হয় তো তিন হাত লম্বা প্রাণীকে খাচ্ছে—যার ওজন আধ সের, সে হয় তো দু' সের ওজনের জীবকে উদরসাৎ করছে। জীব-বিবর্ত্তনের কি অদ্ভুত রূপই সমুদ্রের অন্ধকার তলদেশে দেখা যায়!
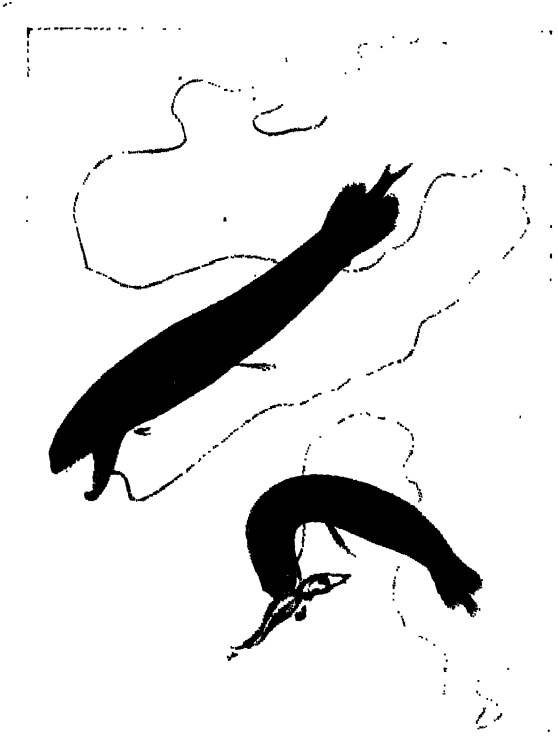
এক শ্রেণীর ড্রাগন মাছ: ইহার গণ্ডে সোণালী আলো এবং গায়ে সবুজ রংয়ের একটি ধনুক আঁটা দেখা যায়।

যাতে ছোট প্রাণী তার চেয়ে বড় প্রাণীকে আহার করতে সমর্থ হয়, তার জন্য এই রাজ্যের অধিকাংশ প্রাণীর চোয়ালের হাড় স্থিতিস্থাপক কস্তা দিয়ে আঁটা—দেখতে ছোট্ট হাঁ বটে, কিন্তু পাঁচগুণ বড় খাদ্য সে অনায়াসে গিলতে পারবে—তার চোয়ালের হাড় শিকার গিলবার সময়ে বেমালুম খুলে যাবে, কিংবা বাড়বে, খাদ্য উদরসাৎ হ'য়ে গেলে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হবে।

অধিকাংশ মাছের পাকস্থলী এমন ভাবে তৈরী যে, মাছটার অপেক্ষা তিন গুণ কি পাঁচ গুণ বড় মাছও অনায়াসে তার মধ্যে ঢুকতে পারে। অনেক সময় আমাদের জালে এমন গোল চেহারার মাছ পড়ে, যার পেট থেকে শিকার বার ক'রে না নেওয়া পর্য্যন্ত মাছটার আসল চেহারা বোঝা যায় না—লম্বা মাছ ফুটবলের মত গোল হ'য়ে গিয়েছে শিকার গিলবার পরে। পাকস্থলী অস্বাভাবিক ভাবে ঝুলে পড়েছে—এমন মাছ প্রায়ই জালে ধরা পড়ে। পাকস্থলী কেটে অনেক সময় শিকারকে অক্ষত ও অজীর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে—তা দেখে কোন্ মাছ কোন্ জাতীয় প্রাণী খায়, সে তথ্যও অবগত হওয়া যায়।

এই অন্ধকার রাজ্যে কোন প্রাণীরই কোন আশ্রয়-স্থান কি বাসা নেই—কোথাও একটু বিশ্রাম করবার স্থান পর্য্যন্ত নেই। তারা নিরালম্ব অবস্থায় কেবল উপরে নীচে, কিংবা পাশাপাশি, নয় তো তির্য্যক্‌গতিতে সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত। এ অবস্থায় তারা জলের চাপ ছাড়া আরও একটা প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করছে—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। এখানে প্রবাল, starfish, sea urchin জাতীয় প্রাণী অর্থাৎ যারা একটা আশ্রয়স্থান ভিন্ন বাঁচতে পারে না—আদৌ নেই। তবে প্রবাল না থাকলেও তাদের নিকটতম আত্মীয় জেলিমাছ অজস্র দেখা যায়—জেলিমাছ সমুদ্রের উপর দিকের জলেও থাকে, সূর্য্যালোকের যেটা গোধূলি অঞ্চল, অর্থাৎ মাঝামাঝি জায়গা, সেখানেও থাকে—আবার চির অন্ধকারময় গভীরতম তলদেশেও থাকে। সে অনুসারে এদের দেহবর্ণও নানা ধরণের হয়।

জেব্রাবর্ণীয় ষ্টার-ফিশ: আনী ক্যাদম তলে সমুদ্র-শৈবাল হইতে সংগৃহীত।

শামুক, গুগ্‌লি জাতীয় প্রাণী এই অঞ্চলে অজস্র—কিন্তু তাদের খোলা অত্যন্ত পাৎলা, প্রায় কাপড়ের মত পাৎলা—আর তাদের দেহের একটা খোলের মধ্যে খানিকটা গ্যাস পোরা থাকে—এই গ্যাসের সাহায্যে তারা জলে অনায়াসে ভাসতে পারে। স্কুইড জাতীয় প্রাণী এত বিভিন্ন ধরণের আছে যে, এক কথায় তাদের বর্ণনা দেওয়া চলে না। তাদের দেহ সরু লতার মত, জড়ানো জড়ানো, কখনও গোলাপী রংয়ের, কখনও বা ধূসর—কিন্তু বেশীর ভাগ স্বচ্ছ সাদা। স্কুইডদের একটা বড় চোখ আছে, প্রায় হরিণ কিংবা বড় পাখীর মত পূর্ণতাপ্রাপ্ত ও সুগঠিত—এদের দেহ এমন ভাবে তৈরী যে, গভীরতম তলদেশ থেকে—যেখানে জলের চাপ অতি ভয়ানক—এরা জলের চাপহীন উপরের স্তরে অনায়াসে আসাযাওয়া করতে পারে। খুব কম সামুদ্রিক প্রাণীর এ ক্ষমতা আছে।

আমাদের জালে একবার দুটো স্কুইড ধরা পড়ে, তাদের সরু লতার মত দেহের মাঝামাঝি একটা জল্‌জলে চোখ বসানো, সরু সরু দড়ির মত হাত-পা একরাশ, নাগ-পাশের মত কঠিন বন্ধনে এরা শিকার জড়িয়ে ধরে। এই দড়াদড়ির মত অবয়ব-গুলির মধ্যে দুটো খুব বড়, দুটো খুব ছোট, বাকীগুলো মাঝারি। বরফজলে এরা অনেক দিন বেঁচে ছিল।

গভীর সমুদ্রতলের সূতা জাতীয় স্কুইড।

স্কুইড দেখতে অতি অদ্ভুত প্রাণী—এদের শরীর যেন দামী কোন স্বচ্ছ স্ফটিকে তৈরী, দুষ্প্রাপ্য চীনেমাটির বাসনের মত এদের সুঠাম গড়ন, মাঝে মাঝে রাঙা ও গোলাপী রংয়ের ছিট—মুখটা দেখতে গাছের পাতার মত কতকটা। কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এদের চোখ—অবিকল হরিণের চোখের মত দেখতে—নাক নেই, মুখ নেই, কান নেই, হাত-পা নেই—সরু স্বচ্ছ, দীর্ঘ দড়ির মত দেহের মাঝখানে হরিণ-চোখের মত একটা সুগঠিত চোখ বসানো—সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক দৃশ্য!

সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে চিংড়ি কাঁকড়া জাতীয় প্রাণীই কিন্তু বেশী—এদের যে কত বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণী সমুদ্রের তলায় আছে, তার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হিসাব এখনও দেওয়া শক্ত—আমরা কতটুকুই বা দেখেছি। এদের দেহ-বর্ণ টক্‌টকে লাল। সমুদ্রের এই অংশে এক ধরণের পোকাজাতীয় প্রাণী আছে, বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাদের শ্রেণীকে copepods বলে, এই পোকাই চিংড়ি জাতীয় প্রাণীর খাদ্য। বড় বড় রঙীন্ দাড়ার সাহায্যে চিংড়ি মাছেরা জলে সাঁতার

দেয়—এদের কারুর কারুর চোখ আছে, কেউ কেউ একেবারে অন্ধ, কারুর শরীর দিয়ে রঙীন্ আলো বার হয়, কেউ পাৎলা ও স্বচ্ছ।

আমাদের জালে একধরণের মাছ পড়েছিল, অন্য কোন নামের অভাবে আমরা একে ড্রাগন মাছ বল্‌ব। ড্রাগন মাছের রং ঘোর কালো, দেহ সরু ও লম্বা, শরীরের দু'ধারে জাহাজের দু'পাশের ঘুলঘুলির মত দু'সারি আলো বসানো আছে—আবার কোন কোন ড্রাগন মাছের শরীর ষড়ভুজ আঁশে ঢাকা—প্রত্যেক আঁশখানার কেন্দ্রস্থানে একটা ক'রে ছোট গোলাপী রংয়ের আলো বসানো। এদের দাঁত শুদ্ধ হাঁ-করা মুখ দেখতে অতি বিকট, রূপকথার ড্রাগন নিছক কল্পনা ব'লে মনে হয় না এদের দেখলে। ড্রাগন মাছের শরীরের দু'পাশের দু'সারিতে সবশুদ্ধ একশো নব্বইটা বাতি জ্বলে। সাধারণতঃ সাড়ে চারশো ফুট থেকে দু' মাইলের মধ্যে এদের পাওয়া যায়—তার নীচে এরা বোধ হয় বাঁচে না।

বর্শেল মাছ : সরু লিক্‌লিকে লম্বা দাঁড়া ও তৎসংলগ্ন বঁড়শী দ্রষ্টব্য।

আর এক ধরণের মাছকে আমরা বর্শেল মাছ বল্‌ব। এদের দেহের গঠন এমন অদ্ভুত যে, ফটো না দেখলে লোকে আষাঢ়ে গল্প বলে উড়িয়ে দেবে এদের কথা। এদের দেহ চার থেকে দু' ইঞ্চি লম্বা, উঁচু-নীচু মেরুদণ্ড এখানে-ওখানে ঠেলে ফুঁড়ে বেরিয়েছে, বড় বড় দাঁত আছে, দাঁতগুলো ইচ্ছামত ঠোঁটের ওপর দিকে ওঠানো যায়, আবার নীচের দিকে নামানো যায়। এদের কপাল থেকে একটা সরু লিক্‌লিকে, লম্বা দাঁড়ামত বেরিয়েছে, এই দাঁড়ার সঙ্গে সুতো ও তিনটে বঁড়শীর মত ব্যাপার আছে। এই বঁড়শী তিনটের সরু মুখ দিয়ে আলো বার হয়। এই ছিপ, সুতো, বঁড়শী ও আলোর টোপ কি জন্য তা আমরা বল্‌তে পারি না—কারণ গভীর তলদেশ থেকে যখন জালে টেনে ওপরে তোলা হ'ল, তখন এ মাছ জীবন্ত ছিল না। কে বলবে যে এ জাতীয় মাছ ছিপের সাহায্যে শিকার সংগ্রহ করে কি না।"

জলের তলায় নূতন জগৎ

আমরা ডাঙ্গার মানুষ, জলের খবর বিশেষ কিছু রাখি না, বিশেষ করিয়া মহাসমুদ্রের গভীর তলদেশে যে অজ্ঞাত জগৎ বিরাজমান তাহার খবর তো একেবারেই আমাদের কাছে পৌঁছায় না।

সমুদ্রতলের স্বয়ম্প্রভ নিশাচর মৎস্য-যূথ।

উইলিয়ম বিব্ একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডুবুরী। গভীর সমুদ্রের প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে ইঁহার মত আজকাল সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে ইনি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থের লেখক। ডুবুরীর পোষাক পরিয়া মিঃ বিব্ অনেক-বার প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তলদেশে নামিয়াছেন, আট্‌লান্টিক মহাসমুদ্রে নামিয়াছেন, পৃথিবীর সপ্তসমুদ্রে নামিয়াছেন। এই অভিযানগুলির বিবরণ অতীব কৌতূহলজনক ও বিচিত্র তথ্যে পরিপূর্ণ। মিঃ বিবের এইরূপ একটি বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল।

"ডুবুরীর পোষাক পরবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল আমি আনন্দপূর্ণ পার্থিব জীবনের চেতনাকে আর এক নতুন দিকে হাজার হাজার মাইল বাড়িয়া নিতে চলেচি—এ যেন একটা নতুন গ্রহে ভ্রমণের আনন্দ! কারণ সমুদ্রের তলায় নেমেছেন যাঁরা তাঁরা জানেন ওখানকার জগৎ একেবারে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ডাঙার উপর-কার জগতের সঙ্গে ওখানকার কোনো মিল নেই, সত্যিই মনে হয় যে অন্য গ্রহের মধ্যে এসে পড়েচি।

অনেকবার যাঁরা সমুদ্রের মধ্যে নেমেচেন তাঁদের মন থেকে সমুদ্রের তলার প্রাণীদের সম্বন্ধে নানা আজগুবি ভয় দূর হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় কত গল্প শুনতাম—যেমন অক্টোপাশে মানুষ ধরে খায়, বিষাক্ত কাঁকড়ার দাড়ার ঘায়ে মানুষ মরে, তা ছাড়া হাঙ্গর-মকরের তো কথাই নেই। প্রথম কয়েকবার সমুদ্রের নীচে নেমে বুঝলাম এসব গল্প কতটা

ভিত্তিহীন, ভয় তো দূর হয়ে গেলই, সঙ্গে সঙ্গে চোখের সাম্‌নে একটা বিচিত্র সৌন্দর্য্যভরা অজানা জগৎ ফুটে উঠল—সে কি অদ্ভুত জগৎ ও কি তার সৌন্দর্য্য, রহস্য, বিরাটতা! যে কখনো না দেখেচে তাকে বোঝানো যে কি মুস্কিল!

এই নতুন অজ্ঞাত জগতে যে-কেউ নাম্‌তে পারে। এতে বিশেষ কোনো শিক্ষা বা কৌশলের প্রয়োজন হয় না—চাই কেবল একটু সাহস ও ধৈর্য্য, আর অবশ্য চাই নতুন জিনিষ দেখ্‌বার চোখ, জ্ঞানসঞ্চয়ের স্পৃহা। ডুবুরীর পোষাক পরে জলের তলা থেকে উঠে এসে যে লোক আশ্চর্য্য হয়ে যায়নি, অভিভূত হয়ে পড়ে নি, তাকে বুঝ্‌তে হবে নিতান্ত বর্ব্বর, তার মন এখনও ঠিক মত গড়ে উঠে নি, চোখ এখনও ফোটে নি। বুঝতে হবে যে শুধু জলের তলায় কেন, ডাঙার ওপরেও সে কোন সৌন্দর্য্য দেখতে পায় না কখনো, এই পৃথিবীটা এতদিন তাকে কি ফাঁকিই দিয়ে এসেচে!

ত্রিশ ফিট জলের তলে ডুবুরী নূতন জগতের সন্ধান পাইয়াছে।

আমি নিউইয়র্ক জীববিদ্যা সমিতির তরফ থেকে আট দশ বার সমুদ্রের মধ্যে নেমেচি। একটা ডুবুরীর পোষাক যোগাড় করা নিতান্ত দরকার—সমুদ্রে নাম্‌তে হলে এটার উপকারিতা বুঝেছি, অনেকে শুধু একটা সাঁতারের পোষাক, রবারের জুতো ও কাচবসানো তামার মুখোস পরে নামেন, কিন্তু তাতে জলের চাপে কাণের ভিতরকার পাতলা চামড়ার পাত ছিঁড়ে যেতে পারে, সে বিপদের মধ্যে যাওয়া উচিত নয়। ডুবুরীর পোষাক পরে নামাই সবচেয়ে নিরাপদ। ডুবুরীর পোষাকে প্রথমটা একটু অস্বস্তি মনে হয় বটে, কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেলে কোনো কষ্টই হয় না।
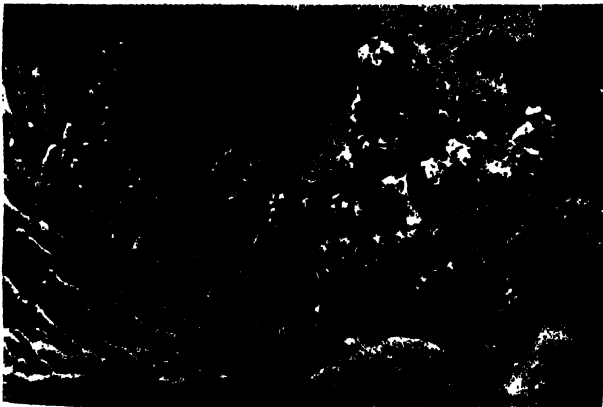
উদ্ভিদের মত দেখিতে সমুদ্রতলের এই প্রাণীরা অবিরাম আন্দোলিত হয়।

চল্লিশ ফুটের নীচে সাধারণ ডুবুরীর নাম্‌বার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ অগভীর জলেই প্রাণীজগতের বৈচিত্র্য বেশী, এখানে রৌদ্রসম্পাতে যে অপূর্ব্ব বর্ণের সৃষ্টি হয়, গভীর জলে তা দেখা যায় না। আর একটা কথা এই যে যাঁরা প্রবাল ভালবাসতেন, তাঁদের এর বেশী নাম্‌বার দরকারই হবে না। পঞ্চাশ ষাট ফুটের নীচে প্রবালকীটের

উপনিবেশ নেই বল্লেই হয়, প্রবাল সাধারণতঃ অগভীর জলের প্রাণী! এমন ওস্তাদ ডুবুরী আছেন, যাঁরা হাজার ফুটও নামেন, কিন্তু অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে সে সব নিতান্ত বিপজ্জনক। সমুদ্রের মধ্যে পাহাড়-পর্ব্বত আছে, গুহা-গহ্বর আছে। বে-কায়দায় ডুবুরীর পোষাকের কোনো অংশ কিংবা বাতাসের নল যদি এ সবে আট্‌কে যায়, কি ধারালো পাথরে লেগে কেটে যায়, তবে অনভিজ্ঞ লোক প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে না, অভিজ্ঞ ডুবুরী বাঁচলেও বাঁচ্‌তে পারে।

প্রথম কয়েকবার নামবার পর আমার মনে হল এই বিচিত্র প্রাণীদের কিছু নমুনা সংগ্রহ করে আনা দরকার। বা ওদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু লেখা দরকার, জলের তলায় বসেই যাতে লিখতে পারি এ জন্যে ওয়াটারপ্রুফ্ কাগজ, দস্তার পাত নীচে নিয়ে গেলাম সঙ্গে। এতে লেখার কোনো অসুবিধা হয় না, মনে হয় যেন ঘরের টেবিলে বসে লিখছি। পেন্সিল দড়ি দিয়ে শক্ত করে হাতের সঙ্গে বেঁধে নিতে হয়, নৈলে জলের চাপে পেন্সিলের কাঠ আলাদা হয়ে ওপরে ভেসে ওঠে, আর সীসেটা জলে ডুবে যায়।

জলের তলায় ক্যামেরা নিয়ে কতবার ফটো তুলেচি, শক্ত কাচবসানো আঁটাসাটা পেতলের বাক্সের মধ্যে ক্যামেরা নিয়ে যেতে হয়, বিশ ফুট পর্য্যন্ত বেশ আলো থাকে, তারও নীচে গিয়ে তুল্‌তে হলে কৃত্রিম আলোর ব্যবহার করা দরকার হয়। এই উপায়ে জলের তলাকার প্রাণী জগতের কত ফিল্‌ম্ তোলা হয়েচে। অনেক চিত্র-শিল্পী এখানকার ছবি আঁকেন। তার জন্যে বিশেষ ধরণের ক্যান্‌ভাস, কাগজ, রং প্রভৃতি কিন্‌তে পাওয়া যায়। মাছের ঝাঁক তাড়াবার জন্যে শিল্পীর কাছে আর এক জন মোতায়েন থাকা দরকার, নৈলে রংয়ের গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ এসে বড় বিরক্ত করে, ঠুক্‌রে ক্যানভাস ফুটো করে দেয়।

উইলিয়ম বিব সমুদ্রতলে নোট টুকিতেছেন।

সমুদ্রের তলায় প্রবালদের মধ্যে বসে এ ধরণের ছবি কতবার তুলেচি। কি অপূর্ব্ব বর্ণ বৈচিত্র্য সেখানকার। হাঙ্গর বা অক্টোপাসের ভয় কখনো করিনি তবে এক ধরণের ছোট সোনালী মাছে বড় ঠুক্‌রে নেয়, নতুন ধরণের জীব দেখে তাদের কৌতূহলের অবধি থাকে না, ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে পরখ করে দেখ্‌তে চায় এরা কি ধরণের জীব।

সমুদ্রের তলায় আপনার বাগান করার সখ আছে? আমি কতবার করেচি। একটা ঢালু জায়গা ঠিক করুন, ত্রিশবত্রিশ ফুটের নীচে যাবেন না। একটা কুড়ল কিংবা বড় ছুরির সাহায্যে পছন্দমত নানা বর্ণের প্রবালের ডালপালা কেটে এনে ওখানে বসিয়ে দিন, পাহাড়ের ফাটল হলে ভাল হয়, নতুবা জলের তোড়ে ভেসে যেতে পারে। কিছুদিন পরে ফিরে এসে দেখবেন আপনার বাগানে বিচিত্র বর্ণের প্রবাল ফুটে আছে, তাদের ডালপালার মধ্যে কত রকমের ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে, যেন রঙিন প্রজাপতির ঝাঁক! নানারঙের ঝিনুক খুঁজতে হলে একটা অক্টোপাসের

বাসা খুঁজে বার করা দরকার। উষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্রে অক্টোপাস প্রায়ই অগভীর জলে বাসা বাঁধে, পাহাড়ের ফাটলে কিংবা গুহায়, শৈবালদলের অন্তরালে। অক্টোপাসের বাসার চারিধারে ঝিনুক ছড়ানো পড়ে থাকে, কারণ অক্টোপাস ঝিনুকের শাঁস খেতে খুব ভালবাসে।

সমুদ্রতলে বায়োস্কোপের ছবি তোলা হইতেছে।

সমুদ্রের তলায় যে অপূর্ব্ব দৃশ্যরাজি আছে, যে বর্ণাঢ্য প্রবাল-উপনিবেশ মহিমায় খুব সৌখীন মোর্‌শুমী ফুলে ভরা বাগানকেও হার মানায়, তার রূপ অনেকেই আজগুবি বলে মনে করে থাকেন, বিশেষতঃ যাঁরা নিজের দেশটি ছেড়ে কখনও বিদেশে যান নি, যিনি ছবিতে ছাড়া কখনও সমুদ্র দেখেন নি, এমন লোকেরা। তাঁদের অবগতির জন্য বলি তাঁরা যেন একবার ডুবুরীর পোষাক পরে জলের তলায় নেমে দেখেন।

জলের তলাকার প্রাণীদের দেখ্‌তে হলে জলের তলায় গিয়েই দেখ্‌তে হয়—তাদের স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থাতে দেখার চেষ্টা করাই ভালো। এখানেই তারা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরে যুদ্ধ করে মানুষ হচ্চে, বিবর্ত্তনের ছন্দে তাদের এই অগ্রগতির আসল রূপটি এখানেই ঠিক ধরা পড়ে।

জলের মধ্যে নাম্‌বার জন্যে ডুবুরী জাহাজে সাধারণতঃ ধাতুনির্ম্মিত সিঁড়ি ব্যবহৃত হয়, দড়ির মই লোনা জলে পচে যায়। সিঁড়ি বেয়ে জলে নাম্‌লেই একেবারে অন্য জগতে গিয়ে পড়তে হবে, প্রথমে বড় বড় সামুদ্রিক শেওলার রীতিমত ঘন অরণ্য, তার পর ছোটখাটো রঙীন্‌ মাছের রাজ্য, তারপরে ঝিনুককড়ির দেশ, সর্ব্বশেষে প্রবালউপনিবেশ, এই গেল ষাট ফুট পর্য্যন্ত। তারও নীচে নানা অদ্ভুতদর্শন বাইন মাছ, ঘোড়া মাছ, করাত্‌ মাছ, হাঙর প্রভৃতির রাজ্য, তারও নীচে অন্ধকার তলদেশে আরও বিচিত্র প্রাণীজগৎ, কিন্তু সাধারণ ডুবুরীরা ততদূর নাম্‌তে বড় একটা ভরসা করে না।
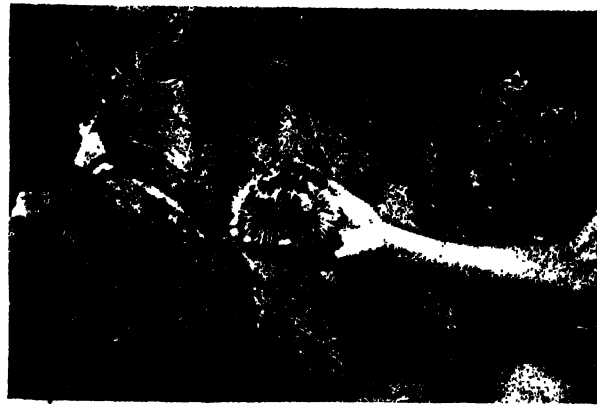
ডুবুরী টোপ দেখাইয়া সমুদ্রতলের মাছদিগকে খেলাইতেছে।

উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রে দশ বার ফুট নীচে চিংড়ি মাছের ঝাঁক দেখা যায়, জাপান সমুদ্রে এই রকম জলে একধরণের রাক্ষুসে কাঁকড়া বেড়ায়, তাদের দাড়া ছ'সাত ফুট লম্বা। জেলি-মাছ, কাট্‌ল মাছ, নক্ষত্র মাছও এই রকম অগভীর জলেই দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশের সমুদ্রে প্রবাল খুব কম, একরকম নেই বলা চলে, যদিও দুই এক জাতীয় প্রবাল দেখা যায়। উষ্ণ মণ্ডলের প্রবালদলের অপূর্ব্ব বর্ণসমৃদ্ধি তাদের নেই। নিউইয়র্কের নিকটে সমুদ্রে ডালপালাওয়ালা একধরণের প্রবাল আছে, চারপাঁচ বছরের মধ্যে তারা reef অর্থাৎ বাঁধ তৈরী করে—প্রবালের

বাঁধের নিকট দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই সব প্রবাল উপনিবেশে একধরণের সুদৃশ্য সামুদ্রিক কাঠবেড়ালী দেখা যায়, তাদের চোখ বড় বড়, রং টকটকে লাল। বারমুডা দ্বীপের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে এক জাতীয় কাঠবেড়ালী আছে, তারা রামধনু রংয়ের।

সমুদ্রতলের বায়োস্কোপ তোলা ছবির নমুনা।

প্রথমে প্রথমে সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য প্রাণীরা ডুবুরী পোষাকপরা মানুষ দেখে ভয় পেয়ে কাছে ঘেঁসে না—কিন্তু বার কয়েক একই জায়গায় নাম্‌বার পরে ওদের ভয় কেটে যায়। তখন তারা কৌতূহলের সঙ্গে এগিয়ে দেখতে আসে। ওদের সঙ্গে তখন যেন একটা বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে যায়।

যাঁরা কখনো সমুদ্রে নামেন নি, তাঁরা যদি প্রথম বার রাত্রে নামেন, তা হলে সামুদ্রিক জীবনের বৈচিত্র্য যে কত অদৃষ্টপূর্ব্ব তা বুঝবার সুযোগ পাবেন। সমুদ্রের তলদেশ স্বয়ম্প্রভ জীবকুলের রাজ্য—অধিকাংশ মাছ, প্রবাল, ঝিনুক, চিংড়ি, এদের শরীর থেকে রাত্রে আলো বার হয়—সে আলো কেমন তা বর্ণনা দিয়ে বোঝানো অসম্ভব, সমুদ্রগর্ভ ছাড়া সে ধরণের আলো আর কোথাও জ্বলে না। তারাখচিত অন্ধকার রাত্রে একদিন উষ্ণমণ্ডলের যে কোনোও স্থানে সমুদ্রে ডুবে দেখলে জীবনে যে কি জ্ঞান ও আনন্দভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়ে যাবে! দেখবেন সমুদ্রগর্ভের অন্ধকার ভেদ করে মাঝে মাঝে বড় বড় মাছ আলোর পাখায় জল আলোড়িত করে চলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে অমনি লক্ষ লক্ষ আনুবীক্ষণিক সামুদ্রিক জীবাণু ঢেউয়ের ভেতর জোনাকী পোকার মত জ্বলে উঠ্‌ল—দেখ্‌বেন কোনো চিংড়ি মাছের শরীর দিয়ে নীল আলো, কোনো পোকার শরীর থেকে রংমশালের মত আলো, কোনো প্রবালদল থেকে চাপা ধরণের সাদা আলো বার হচ্ছে—এসব বর্ণনা করবার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। যে কখনো দেখিনি, তাকে এর সম্যক মহিমা বোঝানো যায় না।

মরুভূমির মধ্যে লেখিকার তাঁবু।

সমুদ্রতলের অদ্ভুত উদ্যান।

জাপানী চন্দ্রমল্লিকা কি চেরী দেখে আপনারা কত তারিফ্‌ করেন, জাপানসমুদ্রে একবার ডুব দিয়ে দেখ্‌বেন। সমুদ্রের নীচে যা প্রাকৃতিক ফুলের বাগান আছে, তাদের বৈচিত্র্য, রং, সৌন্দর্য্যের কাছে ডাঙার ফুল লজ্জায় মুখ লুকোয়। তবে সামুদ্রিক ফুল উদ্ভিদ নয়—জীবন্ত প্রবাল; দু'এক স্থানে জলের মধ্যের শেওলায় পাতা এমন চমৎকার সাজানো, মনে হয় মানুষে যেন সারি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েচে।

জাপান-সমুদ্রে এক রকম বৃহদাকার রাক্ষুসে কাঁকড়া আছে, তার পিঠের খোলায় দৈত্যের মুখের মত নাক চোখ আঁকা—সামুরাই যুগের অনেক বিকটাকার যুদ্ধের দেবতার মুখ এই কাঁকড়া থেকে পরিকল্পিত।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রে অদ্ভুত ধরণের সামুদ্রিক জীব ও প্রবাল অপেক্ষাকৃত অগভীর জলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। হাওয়াই দ্বীপ থেকে আরম্ভ করে অষ্ট্রেলিয়ার গ্রেটবেরিয়ার রীফ, Great Barrier Reef পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটি ছোটখাটো নানা ধরণের প্রবাল দ্বীপে ভরা। এত ধরণের, এত রংএর প্রবাল, ঘোড়া মাছ, ঝিনুক, সামুদ্রিক উদ্ভিদ এ অঞ্চলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, এ অঞ্চলকে ডুবুরীর স্বর্গ বলা যেতে পারে। প্রত্যেক জীবতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতের উচিত অন্ততঃ জীবনে একবারও যেন দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের কোন প্রবাল-দ্বীপের নিকট স্থির জলে ডুব দিয়ে দেখ্‌বার সুযোগ খুঁজে নেওয়া। খুব বড় আর্টিষ্ট এ সব অঞ্চলের সমুদ্রগর্ভের সমগ্র রূপ একটি হাজার ছবি এঁকেও বোঝাতে পারবেন না।

অষ্ট্রেলিয়ার এই অঞ্চলে সমুদ্রগর্ভে এক ধরণের বড় ঝিনুক আছে। তাদের খোলা পাঁচ ফুট লম্বা, ওজনে অনেক সময়ে ছ'মণ পর্য্যন্ত হয়। এরা সমুদ্রের মধ্যে গুহায় লুকিয়ে থাকে—এদের খোলার ওপরে সবুজাভ কালো ছাতলা জমে থাকে বলে পাথরের স্তূপের মত দেখায়। দৈবাৎ কোন ডুবুরির পা যদি তার খোলার ফাঁকে পড়ে, তবে ইঁদুর-কলের মত তখনি ওপরকার খোলাটা ঝপ্‌ করে বন্ধ হয়ে যায়। ডুবুরির সাধ্য থাকে না পা ছাড়িয়ে নেবার। মুক্তা তুল্‌বার সময় কত অনভিজ্ঞ ডুবুরি এভাবে প্রাণ হারিয়েচে।"

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের আশ্চর্য্য বস্তু

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ বলিতে কয়েক সহস্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বীপের সমষ্টি বোঝায়। ইহাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য জগতে অতুলনীয়, লোকসংখ্যাও অনেক এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের সকল প্রকার জাতিই এখানে কিছু না কিছু আছে।

অগ্ন্যুৎপাতে বিধ্বস্ত সেণ্ট পিয়ের সহরের গির্জ্জা: দূরে মাউন্ট পিলি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

আমাদের মত লোক যাহারা কখনো কোথাও যায় নাই, তাহাদের কাছে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বহু আশ্চর্য্য জিনিসে ভরা কিন্তু উহাদের মধ্যে কয়েকটী দ্বীপে এমন সব দ্রষ্টব্য বস্তু বা স্থান আছে, যাহা কি না নিতান্ত ঝুনো ভ্রমণকারীরও বিস্ময়ের ও আনন্দের উদ্রেক করিতে পারে।

প্রথমে মার্টিনিক্ দ্বীপের কথা ধরা যাক। মার্টিনিক্ উইণ্ডওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত একটী বড় দ্বীপ, কারিব সাগর ও আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত, দৈর্ঘ্যে ৫০ মাইল, চওড়ায় ১৩ মাইল, এবং সমস্ত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের মধ্যে সর্ব্বোত্তম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাক্ষাৎ এই মার্টিনিক দ্বীপেই পাওয়া যায়।

মার্টিনিক্ দ্বীপের প্রধানতম দর্শনীয় বস্তু হইতেছে মাউণ্ট পিলি আগ্নেয়গিরি ও অগ্ন্যুৎপাতে বিধ্বস্ত সেণ্ট পিয়ের নগর। মাউণ্ট পিলির উচ্চতা দক্ষিণ আমেরিকার বা আফ্রিকার বড় বড় আগ্নেয় গিরিগুলির তুলনায় কিছুই নয়—মাত্র চারি হাজার চারি শত ফিট মাত্র, শিখরদেশ হইতে দূরের সুনীল কারিব সাগরের দৃশ্য অতি মনোরম—নিম্নের অধিত্যকায় সেণ্ট পিয়ের সহর, বর্ত্তমানে একটী বৃহৎ ধ্বংসস্তূপ হইলেও এক সময় এখানে চল্লিশ হাজার লোক বাস করিত ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপের ফলের ব্যবসায়ের অন্যতম কেন্দ্র ছিল।

ট্রিনিদাদের পিচ্-হ্রদ।

গত শতাব্দীর শেষভাগে প্যারিসে প্রচলিত সকল প্রকার ফ্যাশানের পোসাক পরিচ্ছদ সেণ্ট পিয়ের সহরের বড় বড় দোকানের জানালায় প্রদর্শিত হইত—নাট্যশালাগুলিতে ফরাসী নাটকের অভিনয় হইত। এখানকার স্থানীয় কৃষ্ণকায় অধিবাসীরা হাস্যজনক মিশ্র ফরাসী বুলি বলিত—পথে পথে ভাঙা ভাঙা অশুদ্ধ ফরাসী উচ্চারণে ফরাসী গান গাওয়া হইত—সর্ব্বপ্রকারেই প্যারিসের একটী ক্ষুদ্রকায় ট্রপিক্যাল সংস্করণ ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন মাউণ্ট পিলি রুদ্রমূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিয়া নগরের সকল সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যকে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা দিয়া ফেলিল।

মাউণ্ট পিলি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ঘুমাইতেছিল। এই শান্তদর্শন পর্ব্বত যে কোনোদিন এমন একটা অঘটন ঘটাইতে পারে, এমন কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। পর্ব্বতের ঢালুতে ধনী ব্যবসায়ীরা প্রমোদভবন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিল, চাষবাসও চলিতেছিল। সেণ্ট পিয়ের সহর ধীরে ধীরে সমুদ্রবাণিজ্যের একটী প্রধানতম কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছিল।

নিগ্রোসম্রাট ক্রিষ্টফের রাজপ্রাসাদ।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগে মাউণ্ট পিলির অভ্যন্তর হইতে মেঘগর্জ্জনের মত রব শ্রুত হয় এবং সহর হইতে মেঘ ও উষ্ণ বাষ্প উঠিতে থাকে। দিন যত যাইতে লাগিল এই বাষ্প ও মেঘ ক্রমেই এত ঘনীভূত হইতে থাকিল যে দিনমানেও সেণ্ট পিয়ের সহর প্রদোষের মত অস্পষ্ট অন্ধকারাবৃত হইয়া পড়িল। ৫ই মে উষ্ণ লাভাস্রোত প্রথম বহিতে সুরু করে এবং সহরের প্রান্তবর্ত্তী কয়েকটী গৃহস্থের বসতবাটী নষ্ট করিয়া দেয় ও দু' চারটী লোককে আহত করে। গহ্বর-নিঃসৃত ভস্মরাশির চাপে অনেক গাছপালা ভাঙিয়া পড়িল, মার্টিনিক্ ও সান্তো ডোমিঙ্গো দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সামুদ্রিক টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া গেল এবং ফলে মার্টিনিক্ দ্বীপ বহির্জগৎ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল!

কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও লোকের চৈতন্য হইল না। সেণ্ট পিয়ের সহরে ব্যবসা বাণিজ্য, আমোদ প্রমোদ, নাচ থিয়েটার পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। বিজ্ঞ লোক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'যা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর কিছু হইবে না।' ৭ই মে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত হইল বটে কিন্তু বৃষ্টির জলে বায়ুমণ্ডল ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া গেল। পরদিন নির্ম্মল আকাশে সূর্য্য উঠিল, প্রকৃতির মুখে অনেকদিন পরে হাসি দেখা দিল, সেণ্ট পিয়েরের অধিবাসীদের অনেকেই ঠিক করিল, এইবার বড় রকমের একটা উৎসবের আয়োজন করিতে হইবে।

মুলি মঠের তীর্থক্ষেত্র মিটুজুগা পর্ব্বত।

তারপরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সর্ব্বজনবিদিত ইতিহাস। পরদিন অর্থাৎ ৯ই মে প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পরিবর্ত্তে আসিল নিষ্ঠুর ধ্বংসের ভয়াল লীলা—মাউণ্ট পিলি বজ্রগর্জ্জনে কালাগ্নি বর্ষণ করিতে সুরু করিল—অগ্নিস্রোত পাহাড়ের ঢালু বাহিয়া তর তর বেগে নামিয়া আসিয়া সহর ডুবাইল, বন্দর ধ্বংস করিল, গাছপালা, পশুপক্ষী পুড়াইল, বন্দরের জলে যত নৌকা ও জাহাজ ছিল মাত্র একখানি বাদে বাকীগুলি হয় পুড়িল, নয় ডুবিয়া গেল। এই জাহাজখানি ব্রিটিশ জাহাজ—কোন গতিকে নঙ্গর তুলিয়া এখানি বাহিরের সমুদ্রে আসিয়া পড়াতে বাঁচিয়া গেল বটে কিন্তু ডেকের উপরে সে সময় যাহা কিছু বা যে কেহ ছিল—রক্ষা পায় নাই।

সেণ্ট পিয়ের সহরের চল্লিশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে একটী মাত্র লোক প্রাণে বাঁচিয়া ছিল। এই লোকটী একটী ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষে বন্দী ছিল, দুদিন পরে তাহাকে সেখান হইতে উদ্ধার করা হয়।

সেণ্ট পিয়ের সহর একেবারে ধুইয়া মুছিয়া লুপ্ত হইয়া যায়। ঘর বাড়ী, নাচঘর, থিয়েটার, গির্জ্জা সবশুদ্ধ। তার পরে বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে যেখানে সেণ্ট পিয়ের সহর ছিল, এখন সেখানে বন্য দ্রাক্ষা ও অন্যান্য বন্য গাছ-পালার জঙ্গল—মাঝে মাঝে কঠিন লাভার স্তূপ, বিধ্বস্ত ইষ্টক-প্রস্তর স্তূপ।

শচু নদীর ধারের একটী পাহাড়ী গ্রাম।

পুরাতনের এমনি আকর্ষণ যে মাঝে মাঝে লোকে এখনও ফিরিয়া আসিয়া বন্য আইভিমণ্ডিত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ছোট-খাট গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, অসুবিধা দেখিয়া আবার চলিয়া যায়, হয় তো কিছুকাল পরে আবার আসে।

তিন বৎসর পূর্ব্বে মাউণ্ট্ পিলি আবার গর্জ্জন সুরু করিয়াছিল। লোকজন তখনই পলাইয়া গেল, বন্দর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল—কিন্তু যেই সব থামিয়া গেল লোকে আবার ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাজকর্ম্ম আরম্ভ করিল। আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে জনৈক বিশেষজ্ঞ আজকাল মাউণ্ট্ পিলি পর্ব্বতের উপরেই থাকেন, তাঁর আপিস্ হইতে হাজার হাজার ফিট্ তার পর্ব্বতের আগ্নেয় গহ্বরের মধ্যে গিয়া ঢুকিয়াছে—তাদেরই সাহায্যে আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে তিনি আগ্নেয়গিরির মেজাজ বুঝিতে পারেন।

মার্টিনিক দ্বীপের দ্রষ্টব্য বস্তু দুইটি—মাউণ্ট্ পিলি ও বিধ্বস্ত সেণ্ট পিয়ের সহর, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের পম্পেয়াই।

হেইতি দ্বীপে নিগ্রো সম্রাট্ ক্রিষ্টফ্ নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ আর একটী দর্শনীয় বস্তু। ইহা টাওয়ার অফ্ লণ্ডনের দ্বিগুণ, তিন হাজার ফিট উচ্চ একটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহার দেওয়ালগুলির উচ্চতা আশী ফিট হইতে একশত ফিট, দেওয়ালের চারিধারে তিন শত পঁয়ষট্টিটা ব্রোঞ্জ কামান বসানো আছে—বৎসরের এক এক দিনের জন্য এক একটা। এই বিশাল প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ কোনো অন্ধকার গুপ্ত কক্ষে রাজা ক্রিষ্টফের রাজকোষ অবস্থিত—বহুকাল চলিয়া গিয়াছে, রাজা ক্রিষ্টফও নাই, তাঁর রাজত্বও নাই—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার এই গুপ্ত ভাণ্ডার বহু অনুসন্ধানের পরও কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

ইংয়াসি নদীর উপত্যকার এক অংশ।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের আর একটি আশ্চর্য্য বস্তু ট্রিনিদাদের পিচ্ হ্রদ। এই হ্রদের পরিমাণ-ফল প্রায় একশত একার,

আমাদের হিসাবে পাঁচশত বিঘার কিছু উপর। ইহার উপরিভাগ সমতল ও কঠিন, বেশ হাঁটিয়া যাওয়া চলে। এমন কি পিচ বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য ইহার উপর দিয়া ছোট রেল পাতা আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে পিচ হ্রদের যে কোনো স্থানে মজুরেরা গর্ত্ত করিয়া আজ পিচ তুলিয়া লইল—কাল দেখা যাইবে ভিতর হইতে পিচ ঠেলিয়া উঠিয়া সে গর্ত্ত বুজাইয়া দিয়াছে। সার ওয়াল্টার র‍্যালে ট্রিনিদাদে এই পিচ দিয়া তাঁহার জাহাজের তক্তার জোড় বুজাইয়াছিলেন—সেই হইতেই এখানকার পিচ তুলিয়া লওয়া হইতেছে। বিশেষ করিয়া গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এখান হইতে লক্ষ লক্ষ টন পিচ তোলা হইয়াছে—কিন্তু চোখে দেখিয়া মনে হয় হ্রদে আগে যে পরিমাণ পিচ ছিল, এখনও তাহাই আছে, বিন্দুমাত্র কমে নাই। হ্রদের গভীরত্ব নির্ণয় করিবার জন্য কয়েক শত ফিট বোরিং করা হইয়াছিল, কিন্তু তলদেশ বাহির করিতে পারা যায় নাই। কে জানে এই হ্রদ অতলস্পর্শ কিনা?

শুচু নদীর উপরে কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু।

সার ওয়ালটার র‍্যালে ট্রিনিদাদ দ্বীপের গেছো ঝিনুক ও গাইয়ে মাছের কথা লিখিয়া গিয়াছেন; সমুদ্রকূলবর্ত্তী ম্যানগ্রোভ বনের ডালে ডালে অজস্র গেছো ঝিনুক এখনও দেখিতে পাওয়া যায় ও সমুদ্রের জলে গাইয়ে মাছের দল এখনও গান করে।

তিব্বতী দস্যুদের পবিত্র শিখর—কংকা

১৯২৮ সালে জনৈক ইংরেজ পর্য্যটক চীনদেশের অজ্ঞাত প্রদেশ সমূহ ভ্রমণ করিতে বাহির হন। বহু বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অবশেষে এই ভ্রমণ কার্য্য সমাধা করেন। যে সকল স্থানে তিনি গিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোনো ইউরোপীয় পর্য্যটক সেস্থান চক্ষে দেখেন নাই। তাঁহার ভ্রমণের বিবরণ অতীব কৌতূহলপ্রদ, চীনদেশের নানাবিধ অদ্ভুত অজ্ঞাত রীতিনীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি। এই সকল প্রদেশে বর্ত্তমান চীন গভর্ণমেণ্টের শাসন অচল, পথঘাট দুর্গম ও দস্যুসঙ্কুল—চীনদেশের অধিবাসীদের মধ্যেও অনেকে এ সকল স্থানে ভ্রমণ করিতে সাহস করে না, বিদেশী তো দূরের কথা।

জাম্বেইয়াং পর্ব্বতের পবিত্র গুহা।

হিল্‌হিন রমণী।

এই ইংরাজ পর্য্যটকের নাম যোশেফ রক—১৯২৩ সালে একবার ইনি তিব্বত ও চীনের প্রান্তবর্ত্তী লামা-রাজ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, সেখানকার রাজার সঙ্গে সেই সময়েই যথেষ্ট বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। একদিন দূরের তুষারাবৃত পর্ব্বত-চূড়া দেখাইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন—ওগুলি কোন্ দেশের পাহাড়! রাজার উত্তরে অবগত হন যে সেগুলি চীনের কংকালিং প্রদেশের পর্ব্বতমালা, ভীষণ দুর্গম, ঘন অরণ্যময় ও দুর্দ্দান্ত চীন ও তিব্বতী দস্যুদলে পূর্ণ। সেই হইতেই মিঃ রকের মনে বাসনা জাগিল একদিন না একদিন কংকালিংয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশ তাঁহাকে বেড়াইতেই হইবে।

১৯২৮ সালের ২৫শে মার্চ্চ—পাঁচ বৎসর পরে তাঁর এই আশা সফল হয়। ইতিমধ্যে ইনি দেশ হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং ইউনানফু হইতে জন কয়েক অভিজ্ঞ চীনা কুলি সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বাহির হন। প্রথমেই তিনি মুলি রাজ্যের লামা-রাজার নিকট গেলেন—পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি কংকালিং-এর দস্যুসর্দ্দারদের যেন বলিয়া দেন যাহাতে তাহারা ভ্রমণের দলটীর উপর কোনো অত্যাচার না করে। মুলির লামা-রাজ তাহাতে সম্মত হইয়া দস্যুসর্দ্দারদের কাছে চিঠি দিয়া নিজের লোক পাঠাইয়া দিলেন ও মিঃ রক্‌কে ভরসা দিলেন যে তাঁহার কোনো বিপদ ঘটিবে না।
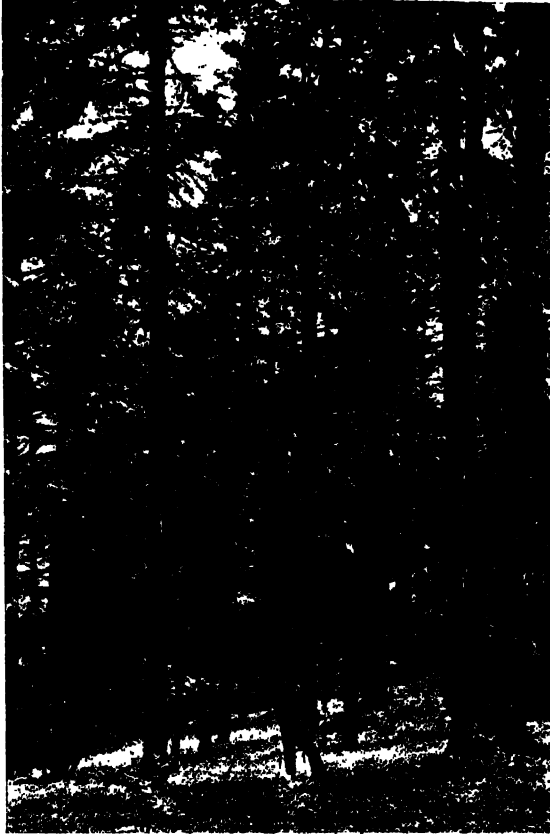
শুচু নদীর তীরে স্প্রুস্ গাছের অরণ্য।

তাহার পর লামারাজ মিঃ রকের কাছে বহির্জগতের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৯২৮ সালেও তিনি খবর রাখিতেন না যে কাইজার আর জার্ম্মানিতে রাজত্ব করেন না, বা রাসিয়ার জার ইহজগতে নাই। তারপরে তিনি এরোপ্লেনের বিষয় জানিতে চাহিলেন—আমেরিকায় এরোপ্লেনে চড়িলে সেখান হইতে চীনদেশ দেখা যায় কি না? লোকে এরোপ্লেনে করিয়া চাঁদে যাইতেছে না কেন?

১৩ই জুন মিঃ রক্ লোকজন লইয়া মুলি হইতে কংকালিং রওনা হইলেন। লামা-রাজ মঠের একজন শ্রমণকে সঙ্গে দিলেন। দস্যুরা দুর্দ্দান্ত হইলেও ধর্ম্মভীরু মঠের জনৈক ভিক্ষু দলের মধ্যে থাকিলে সে দলের উপর অত্যাচার না-ও করিতে পারে—রাজার অনুরোধ যদিও না রক্ষা করে, ধর্ম্মকে ভয় করিবেই। মুলি ছড়াইয়া শুধু পর্ব্বত ও অরণ্যের মধ্য দিয়া পথ—ফুলে ভরা রডোড্রেণ্ডন্ বনে ভরা।

জাম্বেইয়াং পর্ব্বতের অপর এক অংশ।

খানিক দূর অগ্রসর হইলে অরণ্য আর গভীর—ওক্ ও ফার গাছই বেশী, নানা জাতীয় রডোড্রেণ্ডন্ বনের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। নানা জাতীয় পুষ্পিত লতা, নানা ধরণের অজানা বৃক্ষ ও বনমূল। কংকালিং পর্ব্বতমালার পাদমূলে

শুচু নদী প্রবহমানা, 'শুচু' অর্থাৎ লৌহ নদী। এই নদীর উভয় তীরের মাটী ও পাথরের মধ্যে লৌহের ভাগ অত্যন্ত বেশী বলিয়া নদীর এই নাম। শুচুর জন্মস্থান কংকালিং হইতে আরও এগারো মাইল উত্তরে, সিয়াংচেং প্রদেশে।

শুচু নদীর পার হইয়া পথ আরও দুর্গম, বনফুল আরও নানা ধরণের কিন্তু উপরে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরণের ডাঁশ মাছির উপদ্রব এত বাড়িতে লাগিল, যে অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। কংকালিং পর্ব্বতের ১৫,৫০০ ফিট্ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ধরণের বনস্পতি দেখিতে পাওয়া যায়, তার উপরে শুধুই রডোড্রেণ্ড্রন্ বন, নানা রংএর রডোড্রেণ্ড্রন্।

শুচু নদীর উপরকার সেতু একটী দেখিবার জিনিস। শুচুর ন্যায় বেগবতী পার্ব্বত্য নদীর উপর মাত্র একটা বড় গাছের গুঁড়ি আড় করিয়া পাতা আছে—তাহারই সাহায্যে পারাপার হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। লোকে গাধার পিঠে বোঝা চাপাইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত মনে সেতু পার হইতেছে।

কংকালিং পর্ব্বতমালার দক্ষিণ দিকের ঢালুতে গারু জাতির বাস। ইহাদের মুখাবয়ব অনেকটা তিব্বতীদের মত, কিন্তু রং আরও ফর্সা, শক্তি সামর্থ্য আরও বেশী। দস্যুবৃত্তিই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা নয়, শুচু নদীর উপত্যকায় ইহারা গম ও ধানের চাষ করে, নদীতে মাছ ধরে, ভেড়ার লোমের টুপি জামা ইত্যাদি তৈরী করিয়া বিক্রয় করে। গারু জাতি নির্ভীক ও স্বাধীনতাপ্রিয়, কাহারও কাছে মাথা নীচু করিয়া থাকা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ।

চানাদর্জ্জি পর্ব্বতের পাদদেশে অভিযানকারীদের তাঁবু।

এই স্থানে কুলীরা বনের শুষ্ক ডাল পালা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইয়া পর্ব্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা আরম্ভ করিল—এই পর্ব্বত গারু জাতির বাসস্থান হইতে অস্পষ্ট দেখা যায় মাত্র। ইহার তিব্বতী নাম মিনিয়া কংকা—স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এই পর্ব্বতে নানা জাতীয় ভূত ও অপদেবতার বাস, তাহাদের প্রসন্ন রাখিতে ইহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট।

শুচু নদীতে সোনা পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক ধরণের উন্নততর যন্ত্রতন্ত্রের অভাবে সোনার কাজ এখানে লাভজনক হইতে পারে নাই। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সুহিন্ জাতি এই কার্য্যে খুব পটু—নদীর বালি ধুইয়া সোনা বাহির করাই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা, অবশ্য মাঝে মাঝে সুবিধামত দস্যুবৃত্তিও করে।

মিনিয়া কংকা হইতে একটী বড় তুষারনদী (glacier) নামিয়া আসিয়া এইখানে শুচু নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে—সে দৃশ্য মহিমময়, অপূর্ব্ব, একবার দেখিলে সারা জীবনে তার গম্ভীর সৌন্দর্য্য ভুলিতে পারা যায় না।

প্রকৃতির অপূর্ব্ব রাজ্য। যে দিকে চোখ যায়, শুধু বনফুলে ভরা পর্ব্বত সানু, চিরতুষারাবৃত উত্তুঙ্গ শিখর রাজি, তুষার প্রবাহ, বেগবতী নদী, ওক্ ও হেমলকের ঘন অরণ্য! মাঝে মাঝে প্রিম্‌রোজে ছাওয়া সমতল ভূমিতে বন্য গয়াল চরিতেছে, জন মানুষের চিহ্ন বড় একটা নাই, যাহারা আছে তাহারা বড় একটা দেখা দেয় না, অন্তরালে থাকিয়া গুলি

চালাইতে তাহারা সুপটু। কিছু দূরে ইয়াকা গিরিবর্ত্ম। এখানে পাহাড়ের ফাটলে অপূর্ব্ব লাল রংএর প্রিমরোজ অজস্র ফুটিয়া আছে, ফুল এত বড় যে ডাঁটা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, প্রিমরোজের থাকের উপরে ঘন নীল ফর্গে ট-মি-নটের সারি। তাদেরও উপরে জাম্বেইয়াং শিখরের দুরারোহ, উত্তুঙ্গ খাড়াই—জাম্বেইয়াং এই পর্ব্বতমালার সর্বোচ্চ শিখর—উচ্চতায় বিশ হাজার ফিটেরও বেশী—অপর দুই শৃঙ্গ শেন্‌-রে-জিগ্‌ ও চানাদর্জি প্রায় বিশ হাজার ফিটের কাছাকাছি হইবে।

জাম্বেইয়াং অত্যন্ত পবিত্র শিখর—এখানে সে দেশের বাগ্‌দেবীর অধিষ্ঠান-ভূমি, বহুদূর হইতে যাত্রীর দল পথের বিপদ তুচ্ছ করিয়া পূজা দিতে ও শিখর পরিক্রমা করিতে আসে। জাম্বেইয়াং-এর পাদদেশে, উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটা বড় গুহায় যাত্রীর দল আশ্রয় লইয়া থাকে এবং প্রায়ই অনেকে দস্যুর হাতে প্রাণ হারায়। অন্যদিক দিয়াও এই গুহায় রাত্রিবাস নিরাপদ নয়—বড় একটা ঝড়ঝঞ্ঝার পরে উপর হইতে বড় বড় বরফের চাঁই প্রায়ই গড়াইয়া পড়ে, কত বিশাল বনস্পতি বরফের চাঁইয়ের মুখে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে—মানুষ তো নিতান্ত তুচ্ছ।

চানাদর্জি তুষারপ্রবাহ।

ইয়াক্‌ গিরিবর্ত্ম পার হইয়া একটী বৌদ্ধমঠ আছে। এই মঠটী এখানকার দস্যুদলের প্রধান আড্ডা। মুনির লামা—রাজের অভয় পাওয়ায় মিঃ রক এখানে কয়েকদিন বাস করিতে পারিয়াছিলেন। এই মঠটী অতি প্রাচীন, কত দিনের তাহা কেহ বলিতে পারে না। দেওয়ালে চীনা ও তিব্বতী ছবি টাঙানো, বাহিরে যাত্রীদলপ্রদত্ত ঘণ্টা, মালা, পাখীর পালক প্রভৃতি খুঁটীর গায়ে বাঁধা। ধূপ ধুনার পরিবর্ত্তে দেবতার কাছে জুনিপার গাছের ডাল জ্বালানো হয়। উঠানে একটী বৃহৎ জপচক্র আছে, প্রত্যেক যাত্রী মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া একবার করিয়া জপচক্রটী ঘুরাইয়া দিতেছে।

কেপ্রিদ্বীপের পাখীর আড্ডা

The Story of San Michele নামক উৎকৃষ্ট বইখানা অনেকেই পড়েছেন। এই বইখানার লেখক ডাঃ এক্সল্ মুন্থি একজন নরওয়েদেশীয় চিকিৎসক। বর্ত্তমানে তিনি জগদ্ব্যাপী যশের অধিকারী। অনেক দিন পূর্ব্বে যখন তিনি প্যারিসে ডাক্তারী পড়ছিলেন, সে সময় Capri দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যে তিনি মুগ্ধ হন। সেই থেকে তাঁর জীবনের একটা সাধ ছিল, একদিন কর্ম্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে এই সাগর-মেখলা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুরম্য দ্বীপে নির্জ্জনে বাস করবেন। কেপ্রিদ্বীপস্থ তাঁর বাস-ভবনের নাম সান্ মিকেল্—এবং কি করে সারাজীবন ধরে এখানে এই বাড়ী গড়া হোল, সেই সঙ্গে, তাঁর জীবনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতারাজির বর্ণনা ডাক্তার মুন্থির বিখ্যাত বইখানাতে পাওয়া যাবে। ডাক্তার মুন্থি শুধু চিকিৎসক নন, সুনিপুণ কথাশিল্পীও বটে।

ডাঃ মুন্থি এখন ৭৫ বছরের বৃদ্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিহীন। তিনি অনেকদিনই দুটি চোখ হারিয়েছেন। তবুও এখনও বিনা অবলম্বনে তাঁর বাস-ভবনের জলপাইকুঞ্জে বেড়াতে পারেন—Old Tower-এর সাইপ্রেস গাছের শ্রেণীর মধ্যে বসে পাখীর ডাক শোনেন। তাঁর বইয়ে এই Old Tower-এর অদ্ভুত বর্ণনা আছে।

নানাদেশ থেকে ডাঃ মুন্থির নামে চিঠিপত্র আসে। তাঁর সেক্রেটারী সেগুলো তাঁকে পড়ে শোনায়, কোন খানার কি ভাবে উত্তর দিতে হবে তিনি বলে দেন। যশকে তিনি বড় ভয় করেন—লোকজনের সামনে যেতে তাঁর বড় আপত্তি। কত লোক জিজ্ঞাসা করে, আপনি এর পর কি বই লিখবেন? তিনি সে কথার কোন স্পষ্ট জবাব দেন না।

ডাঃ মুন্থী পশুপক্ষী অত্যন্ত ভালবাসেন—বিশেষতঃ পাখী। তিনি তাঁর বইয়ের মধ্যে লিখেছেন—পাখী ভালবাসি বলেই, এই নির্জ্জন দ্বীপে আমার জীবন অত্যন্ত সুখের হয়েছে। কেপ্রি দ্বীপে আগে পাখীদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করা হোত—সমগ্র ভূমধ্যসাগরের মধ্যে এই দ্বীপটি রোমানদের সময় থেকে ফাঁদ পেতে পাখী ধরবার একটা প্রধান স্থান ছিল। ডাঃ মুন্থির চেষ্টায় সেই বর্ব্বর ব্যাপারের অবসান হয়েছে। প্রথম যৌবনে তিনি যখন কেপ্রিদ্বীপে আসেন তখন থেকেই এই বর্ব্বর পক্ষীহনন ব্যাপার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তখন থেকেই তাঁর জীবনের ব্রত হয় এর উচ্ছেদ সাধন করা। বহুকালব্যাপী চেষ্টা ও বহু অর্থব্যয়ের পরে তিনি কৃতকার্য্য হন।

প্রতি বৎসরই বসন্তের প্রথমে নানা জাতীয় পাখী—থ্রাশ্, ঘুঘু, নাইটিঙ্গেল, চাতক, রবিন, ওরিওল আফ্রিকার দিক থেকে উড়ে উত্তর-ইউরোপের হিমপ্রধান স্থানে যায়, এবং সেখানে সন্তান প্রসব ও লালন-পালন করে। শরতের প্রথমেই আবার উত্তর ইউরোপ থেকে আফ্রিকায় উড়ে চলে যায়।

ইজিপ্ট ও কেপ্রিদ্বীপের মধ্যে দীর্ঘ সমুদ্রপথ—এই পথ পার হতে গিয়ে ক্ষুধায় পরিশ্রমে ক্লান্তপক্ষ কত পাখী ভূমধ্যসাগরের বুকে প্রাণ হারায়। এই সুদীর্ঘ আকাশ-পথে কোথাও বিশ্রামের অবকাশ বা স্থান নেই। আকাশে সিন্ধু-শকুনের দল অনেক ছোট ছোট পাখীকে মেরে ফেলে, আবার জলের খুব নিকট দিয়েও ওড়বার উপায় নেই, ভূমধ্যসাগরের উড়নশীল মাছেরা অত্যন্ত হিংস্র, তারা লাফিয়ে পাখী ধরে।

প্রাচীন কাল থেকে কেপ্রিদ্বীপেই এই যাযাবর পাখীর দল বিশ্রাম করবার জন্যে নামে। এর প্রধান কারণ এই দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান। ইজিপ্ট থেকে উড়ে আসবার পথে ভূমধ্যসাগরের এপারে এই ক্ষুদ্র, সুন্দর দ্বীপটি প্রথমেই তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট পাহাড়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনরাজি, শাখাপ্রশাখার অন্তরালে ক্লান্ত পক্ষকে বিশ্রাম দেবার জন্ম স্বভাবতঃ তাদের ইচ্ছা হয়।

ডাক্তার মুন্থি লিখছেন—

বারবারোসা দুর্গের এই ধ্বংস স্তূপ কেপ্রিদ্বীপের সর্ব্বোচ্চ ভূমি—রাজ্যের পাখীর ভাড় এইখানে।

এর কারণ এই যে, কেপ্রিদ্বীপ দেখতে সুন্দর বটে, কিন্তু যাযাবর পাখীদের পক্ষে এটি মৃত্যুর দ্বারস্বরূপ। গ্রীক এবং রোমানদের সময় থেকে এই দ্বীপটি পক্ষীশিকারীর স্বর্গবিশেষ। স্মরণাতীত কাল থেকে প্রতি বসন্তে এই পক্ষীকুল আসে, আর তাদের ফাঁদ পেতে ধরা হয়। কেপ্রিদ্বীপের সুন্দর বনানী শোভিত পাহাড়ের মাথায় বড় বড় জাল পাতা—যেমন নামে, অমনি ফাঁদে পড়ে। সমস্ত রাত্রি ধরে তারা পালাবার বৃথা চেষ্টা করতে গিয়ে আরও ফাঁদে বেশী করে জড়িয়ে যায়। সকাল বেলায় তাদের কাঠের বাক্সে পোরা হয়—এবং এখান থেকে জাহাজে ইউরোপের বড় বড় সহরে প্রেরিত হয়—সেখানকার হোটেলে রেষ্টোরেন্টে সুখাদ্য হিসাবে এই সব পাখীর খুব আদর।

এই পাখীর ব্যবসা বহুকাল থেকে কেপ্রি দ্বীপের একটি প্রধান ব্যবসা বলে গণ্য। পাখীর ব্যবসার ওপর শুল্ক বসিয়ে কেপ্রি দ্বীপের পক্ষিব্যবসায়ীদের কাছে বিস্তর রাজস্ব

"প্রতিবারই বসন্তের প্রথমে পাখীরা দলে দলে আসে—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পাখী, ওদের সুদীর্ঘ সারির যেন শেষ নেই, ভুমধ্যসাগরের এপার ওপার, ইটালি থেকে ইজিপ্ট ব্যাপী সারি আসছেই, আসছেই। সান মিকেলের বাগানে ডালে পালায় তাদের আনন্দকাকলী সারাদিন বসে শুনতাম।

কিন্তু এমন এক সময় এল যখন আমার মনে হোত ওরা না এলেই ভাল হয়। কেন ওরা এখানে আসে, এখানে নামে? কেপ্রিদ্বীপে না নেমে ওরা আরও উঁচু দিয়ে উড়ে চলে যাক। বন্য হাঁসের দলে মিশে—সুদূর নরওয়েতে যেখানে ওদের কোনও বিপদ ঘটবে না।"

ডাঃ আক্সেল মুন্থির বিশ্ববিশ্রুত সান-মিকেলের উদ্যানবাটী। ডাহিনে ডাঃ মুন্থি তাঁহার পোষা কুকুর লিসাকে লইয়া দাঁড়াইয়া—হাতে গোম—আর একটি কুকুর, সুইডেন-রাজ ইহা ডাক্তারকে উপহার দেন।

আদায় হয় গবর্ণমেণ্টের। ভারুই (quail) পাখীর ঝাঁক এসময়ে হাজারে হাজারে আসে—গ্রীক ও রোমানেরা ভারুই পাখী খেতে পছন্দ করত—এখনও ইউরোপে ভারুই পাখী সুখাদ্য বলে গণ্য। কেপ্রিদ্বীপ থেকে হাজার হাজার এই পাখী অন্য অন্য দেশে চালান হয়। এতে গবর্ণমেণ্টের ও ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের খুব লাভ অর্থের দিক থেকে। কাজেই এরা এই নিষ্ঠুর পক্ষিহননের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলে না। রোমানদের সময়ে এই দ্বীপ ছিল রোমান সম্রাটদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। রোমান সম্রাট টাইবিরিয়াসের বিপুল প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও এই দ্বীপে বর্ত্তমান। সে সময়ে এখানকার পাখী ধরে সম্রাটের আহারার্থ পাঠানো হোত—সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পরে দ্বীপটি অপরের হাতে গিয়ে পড়ে। ব্যবসায়ী লোকে দ্বীপের পাহাড়গুলো ইজারা নিয়ে ১০৩৩ খৃষ্টাব্দ থেকে পাখী-চালান দেওয়ার ব্যবসা আরম্ভ করে।

পোপ যখন কেপ্রিদ্বীপে প্রথম বিশপ পাঠাবার ব্যবস্থা করেন, তখন তিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন যে, বিশপের আয় নির্ভর করবে পাখীর

উপরের অংশে সান মিকেলের উদ্যান-বাটীর গির্জ্জার প্রবেশ-পথ। নীচে কেপ্রির মোটামুটি দৃশ্য

ব্যবসায়ের শুল্কের ওপর। বিশপের সহানুভূতি ও উৎসাহ পেয়ে পাখী-ধরা কাজ আরও বেড়ে গেল। সাধারণ লোকে ভাবতো তাদের দ্বীপে যে এত পাখী প্রতি বৎসর আসে, এ ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ তাদের ওপর আছে বলেই—নইলে তাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলত কি করে? গির্জ্জার ব্যয়নির্ব্বাহই বা হোত কি করে? ১৬১০ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপের জনৈক অধিবাসী নেপল্‌স্‌-এর রাজার কাছে একখানা দরখাস্ত পাঠাবার সময় তাতে লিখেছিল :—

"যীশু খৃষ্টের অসীম দয়ায় প্রতি বৎসর আমাদের দ্বীপে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী আসে, আমরা নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে দুর্গম পাহাড়ের ওপর জাল পেতে ওই সব পাখী ধরি। আমাদের জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায়ই এই।"

উপরে বারবারোসার প্রাচীন ঘণ্টাঘর। মাঝের ছবিতে ঘণ্টাটি দেখা যাইতেছে। নীচে উদ্যানের একাংশ।

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ঃ ঝিনুক উপসাগরের একাংশ।

নেপিয়ার ক্রম উপসাগরে ধৃত ষ্টিং-রে [শঙ্কর জাতীয় মাছ]।

ভারুই পাখীকে ভুলিয়ে জালে আনবার জন্য যে উপায় অবলম্বিত হয়, তা অত্যন্ত হৃদয়হীন। কতকগুলি পক্ষিণীর চোখ গরম সূঁচ বিঁধিয়ে নষ্ট করে অন্ধ করা হয়—বহুকাল থেকে ওদেশের লোকে জানে অন্ধ পাখীর ডাক থামে না—সে দিন রাত সমানভাবে ডাকবে। ভারুই পাখী পক্ষিণীর ডাক শুনে লুব্ধ হয়ে এসে জালে পড়ে। কি অদ্ভুত ট্র্যাজেডি!

অন্ধ করবার সময় কত পাখী যে মারা পড়ে! একশো পাখীর মধ্যে একটা এ অবস্থায় বাঁচে—এজন্যে অন্ধ পক্ষিণীর দাম বাজারে খুব বেশী।

ডাঃ মুন্থি এই সব বর্ব্বর প্রথা উঠিয়ে দেবার জন্যে গত ত্রিশ বছর থেকে চেষ্টা করছেন। নেপ্‌ল্‌স্‌-এর শাসনকর্ত্তার কাছে আবেদন করেন প্রথমে, তা অগ্রাহ্য হয়। পরে তিনি রোমে গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁকে জানান যে কেপ্রিদ্বীপের ওই পাহাড়গুলি একজন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সে সেখানে যা খুসী করতে পারে, গবর্ণমেণ্ট এতে হস্তক্ষেপ করবেন না।

ডাঃ মুন্থি কত চেষ্টা করলেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হোতে পারলেন না। কতগুলো কুকুর কিনে আনলেন, তারা সারা রাত ধরে চীৎকার করলে পাখী আর বারবারোসা দ্বীপের পাহাড়ে বসবে না—এই আশায় পাহাড়ের তলায় তাদের নিয়ে গিয়ে বাঁধলেন—যাদের পাহাড় তারা পুলিসে খবর দিলে, ডাক্তারের জরিমানা হোল।

অবশেষে ভগবান দিন দিলেন। পাহাড়ের মালিক ছিল একজন কসাই—তার শক্ত অসুখ হোল। স্থানীয় অন্য সব ডাক্তার কিছুই করতে পারলে না, অবশেষে ডাঃ মুন্থির ডাক পড়ল। ডাঃ মুন্থি এই সর্ত্তে তাকে আরোগ্য করতে রাজি হোলেন যে, সেরে উঠলে সে বারবারোসা পাহাড় তাঁর কাছে বিক্রি করবে। সে সেরেও উঠল, পাহাড় ডাঃ মুন্থি কিনে নিলেন। সেই থেকে এই নিষ্ঠুর পক্ষীহনন ব্যাপার কেপ্রিদ্বীপ থেকে উঠে গেল। সে আজ ২৯ বছর আগেকার কথা। তারপর ১৯২৩ সালে পাখীকে অন্ধ করবার নিষ্ঠুর প্রথা ইটালিয়ান গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা রদ করেছেন।

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকটি আশ্চর্য্য বস্তু

পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর মধ্যে একটি আশ্চর্য্য দেশ—কি অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর জন্য, কি খনিজ সম্পদের জন্য, কি অদ্ভুত জন্তু-জানোয়ারের জন্য।

কাছিমের বাসা। একসঙ্গে প্রায় দুই শত ডিম এক একটি বাসায় দেখা যায়। বালি খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া এই সব বাসা বাহির করিতে হয়।

পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্ত্তী সমুদ্র থেকে গত ১০ বৎসরের মধ্যে বহুকোটি টাকার ঝিনুক ও মুক্তা উত্তোলিত হয়েছে। ১৮৫০ সাল থেকে এদেশে মুক্তা উত্তোলনের ব্যবসা চলেছে—বেশীর ভাগই ইউরোপীয়দের হাতে, কিছু কিছু চীনা ও জাপানী আছে। ব্রুম সহর এর বড় কেন্দ্র। ব্রুম থেকে উইণ্ড্হাম পর্য্যন্ত সমস্ত সহরটি মুক্তা-ধরা জাহাজে ভর্ত্তি। ওদিকে আর লোকের বাস নাই—জলের ধারে শুধুই ম্যান্‌গ্রোভ গাছের বন।

এই সব ম্যান্‌গ্রোভের বনের তলায় লক্ষ লক্ষ সামুদ্রিক কাঁকড়া বাস করে—টক্‌টকে লালরঙেরও আছে, আবার নীল রঙেরও আছে। আর এক রকম কাঁকড়া আছে—তারা আকারে এদের চেয়ে বড়, প্রায় তিন ইঞ্চি চওড়া—তাদের রং হল্‌দে। এই হল্‌দে কাঁকড়ার নাম soldier crab, লড়ায়ে কাঁকড়া। এরা হাজারে হাজারে দল বেঁধে বালির উপরে চলে—এবং প্রত্যেক দলে একজন সর্দ্দার থাকে। এদের বিরক্ত করলে এরা দলবল নিয়ে আক্রমণ করে।

কেম্ব্রিজ উপসাগরে যথেষ্ট পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ ধরা হয়। তারের এক-রকম ফাঁদ পেতে এই সব মাছ ধরে—কেম্ব্রিজ উপসাগর থেকে বহু টন মাছ প্রতিদিন চালান যায়। ডুগং নামে একপ্রকার সামুদ্রিক জন্তু এখানে অনেক পাওয়া যায়—তিমি জাতীয় জীব, কিন্তু অত্যন্ত নিরীহ। নৌকা থেকে বর্শা ছুঁড়ে এদের শিকার করা হয়। ডুগং
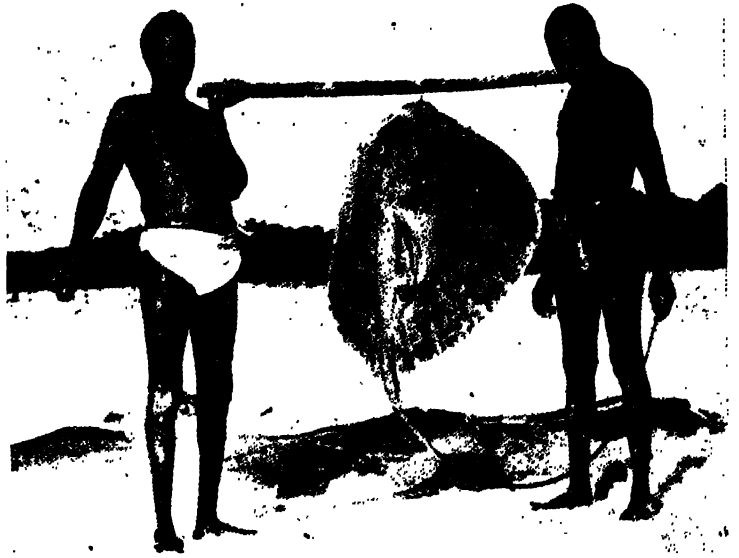
লম্বমান শঙ্কর মাছটির ওজন পাঁচ মণ।

শিকার খুব সহজ কাজ নয়, এদের চামড়া অত্যন্ত পুরু, সহজে বর্শা গায়ে বেঁধে না। ডুগংএর চর্ব্বি ঔষধের জন্যে ব্যবহৃত হয়

বলে ডুগং শিকার অত্যন্ত লাভজনক। ডুগংএর চামড়াও অনেক কাজে লাগে। সান্‌ডে দ্বীপের কাছে একটা ডুগং ধৃত হয়েছিল—তার দৈর্ঘ্য ১২ ফুট এবং ওজন সাড়ে সাত মণ।

এখানে সমুদ্রের ধারে যথেষ্ট জঙ্গল দেখা যায় এবং এই সব জঙ্গলের মধ্যে বড় বড় খাল—খালগুলি বড় বড় কুমীরে পরিপূর্ণ, অনেকটা আমাদের দেশের সুন্দরবনের মত। ডুগং জাতীয় আর এক প্রকার মাছ কেম্ব্রিজ উপসাগরে বহুল পরিমাণে ধৃত হয়, এদের sail fish বা পাল মাছ বলে। এদের ডানা পালের মত হাওয়া আটকায়, এবং সম্পূর্ণ প্রসারিত অবস্থায় এই পালের আয়তন প্রায় ছয় বর্গফুট হতে দেখা যায়।

আর এক রকমের মাছকে বলে শোষক মাছ—এরা হাঙ্গর জাতীয়। কিন্তু এরা বড় নিরীহ। এদের একমাত্র সাধ এই যে, অন্য বড় মাছের শরীরের কোন স্থানে নিজেদের গলার নীচের এক প্রকার যন্ত্র-সাহায্যে আঁকড়ে ধরে অনেক দূর চলে যাওয়া। যেমন কল্‌কাতার রাস্তায় সাইকেল আরোহীদের অনেক সময় চলন্ত ট্রামগাড়ী ধরে যেতে দেখা যায়।

অতিকায় ডুগং। লম্বায় বারো ফুট। ওজন প্রায় ৭॥০ মণ। প্রায় তিমির মত বিরাট এই মাছের মাংস শাদা—কালো নির্ব্বিশেষে সকলেই ভক্ষণ করে।

এই স্থানের সমস্ত সাগর উপসাগর প্রবালপুঞ্জে পরিপূর্ণ। নানা ধরণের, নানা রঙের বিচিত্র প্রবাল—মনে হয় যেন সমুদ্রের জলের মধ্যে রঙীন ফুলের বাগান সাজানো রয়েছে। Butcher inlet নামে সমুদ্রের খাড়ির প্রবাল উপনিবেশ সুপ্রসিদ্ধ। প্রায় কুড়ি বর্গমাইল স্থান বিপজ্জনক প্রবাল শৈলে ভর্ত্তি—জোয়ারের সময় এদের অস্তিত্ব নিরূপণ করা যায় না, সে জন্য জাহাজের পক্ষে এগুলো বড় সর্ব্বনেশে জিনিস। এ্যাড্‌মিরাল্‌টি উপসাগর থেকে নেপিয়ার উপসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান এই রকম মগ্ন প্রবালশৈলে পরিপূর্ণ—কত জাহাজ যে আগে আগে মারা গিয়েছে এই পথে!

সমুদ্রের জলের ওপর এক প্রকার সামুদ্রিক সর্পকে প্রায়ই কুণ্ডলী পাকিয়ে নিদ্রিত থাকতে দেখা যায়—এদের দৈর্ঘ্য বারো তেরো ফুট সচরাচর হয়ে থাকে এবং এরা অত্যন্ত বিষাক্ত।

নেপিয়ার উপসাগরের ধারে কয়েকজন খৃষ্টান মিশনারী আছেন। এঁরা প্রায় একশো বিঘে জমিতে কলা, আনারস,

ম্যান্‌গ্রোভের ডোঙায় দণ্ডায়মান পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার মৎস্যশীকারী-বর্শা সাহায্যে ইহারা অসাধ্য সাধন করে।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম শাল্‌তি.

লাক্রোজ দ্বীপে ধৃত কচ্ছপ, সংখ্যায় প্রায় এক শত। কেম্ব্রিজ উপসাগর হইতে রাত্রিতে ডিম পাড়িতে ডাঙ্গায় উঠিলে ইহাদিগকে ধরা হইয়াছিল।

পেপে, নারিকেল প্রভৃতির বাগান করেছেন—ধান, তামাক ও আমের চাষও আছে। চারিপাশের আদিম অধিবাসীরা অত্যন্ত বর্ব্বর, প্রায়ই এঁদের বাসস্থান আক্রমণ করে—তখন দস্তুরমত খণ্ডযুদ্ধ না করলে তাদের তাড়ানো যায় না। মিশনারীদের শরীরের অনেক স্থানে এরূপ যুদ্ধের চিহ্ন স্বরূপ বর্শার আঘাতের দাগ আছে।

এদিকের জঙ্গলে এক প্রকার বন্তকুকুর আছে—এখানে তাদের বলে ডিঙ্গো। ডিঙ্গোরা দল বেঁধে বেড়ায়, এক এক দলে সত্তর আশীটা পর্য্যন্ত থাকে। এরা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির, গরু ছাগল ভেড়া তো এদের উৎপাতে পালন করাই দায়, মানুষকে পর্য্যন্ত একা দেখতে পেলে অনেক সময় আক্রমণ করে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা প্রায়ই ডিঙ্গোর পালের সামনে পড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়, প্রাণও হারায়।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী। পৃষ্ঠ ম্যান্‌গ্রোভ বৃক্ষের শিকড়গাত্রের কর্দ্দমসাহায্যে অলঙ্কৃত হইয়াছে।

কেম্ব্রিজ উপসাগর ষ্টিং-রে (sting ray) নামক শঙ্কর জাতীয় মাছের জন্ত প্রসিদ্ধ। এক একটা পূর্ণবয়স্ক রে ওজনে সাত আট মণ পর্য্যন্ত হয়—এদের লেজের তলায় আর একটা হাড়ের লেজ আছে—সেটা আকৃতিতে ছোট, বর্ষার মত সূচ্যগ্র ও অত্যন্ত বিষাক্ত। রে মাছ ধরতে গিয়ে অনেকে এই বর্ষার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে। এই অঞ্চলে অত্যন্ত বড় বড় হাঙ্গরও দেখা যায়—দৈর্ঘ্যে ত্রিশ ফুট হয়, এমন হাঙর যথেষ্ট।

কাছেই লাক্রোজ নামে একটা ছোট দ্বীপে বড় বড় সামুদ্রিক কচ্ছপের আড্ডা। সে দ্বীপে লোকের বসতি নেই—জলের ধারে শুধুই বৃহদাকার কচ্ছপ বালির উপর খেলা করে বেড়াচ্ছে, রোদ পোয়াচ্ছে। এদের ধরে চিৎ করে দিলেই আর এরা নড়তে পারে না, পালাতেও পারে না। সানডে দ্বীপের কয়েকটি কৃষ্ণকায় অধিবাসী এই উপায়ে এক রাত্রে তিরাশীটি বড় বড় কচ্ছপ ধরেছিল।

এই অঞ্চলের অসভ্য অধিবাসীরা পিঠের মাংস ঝিনুক দিয়ে কেটে নানারকম আঁকজোঁক কাটে। যার আঁক-জোঁক যত বেশী থাকবে, সে তত সুশ্রী। ঝিনুক দিয়ে মাংস কেটে ম্যান্‌গ্রোভ গাছের শিকড়ের গায়ে যে নোনা কাদা লেগে থাকে, তাই দিয়ে ক্ষত স্থান মর্দ্দন করতে থাকে—এতেই ওই সব ভয়ানক দাগের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে অনেকে এখনও সভ্য মানবের সংস্পর্শে আদৌ আসে নি—অন্ত আকৃতির মানুষ দেখলে ছুটে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে। বন্ত পশুর মতই এদের প্রকৃতি।

ব্যাঙের চাষ

আমেরিকায় ব্যাঙ্‌পালন একটি লাভজনক ব্যবসায়। কোলাব্যাঙ্‌ জাতীয় একপ্রকারের বড় ব্যাঙ্‌ আমেরিকায় অতি সুখাদ্য বলিয়া গণ্য হয় এবং প্রায় চার পাঁচ কোটী সবুজ কোলাব্যাঙ্‌ বৎসরে বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে।

আমেরিকার অনেক স্থানে লোক কোলাব্যাঙ্‌ পালন করিয়া থাকে। কোলাব্যাঙের ঠ্যাং ছাড়া দেহের অন্য কোন্‌ অংশ খাদ্যরূপে পরিগণিত হয় না—একজোড়া ঠ্যাং বাজারে ৩০ সেণ্ট হইতে ৫০ সেণ্ট মূল্যে বিক্রীত হয়—সুতরাং অর্থের দিক হইতে দেখিতে গেলে ব্যাঙ্‌পালন,—গরুপালন, মুর্গীপালন প্রভৃতি ব্যবসায় হইতে মূল্যবান্‌।

বড় বড় ফার্ম্মে ব্যাঙ্‌পালন তো করা হয়ই, তা ছাড়া মিসিসিপি, ফ্লোরিডা অঞ্চলে একদল লোক আছে, ব্যাঙ্‌শিকারই তাদের উপজীবিকা। আমেরিকার এই অঞ্চলে জলাভূমি অত্যন্ত বেশী, বিশেষতঃ এভারগ্লেড্‌স্‌ অব ফ্লোরিডা, Everglades of Florida একটি অত্যন্ত সুবৃহৎ ও সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি। ফ্লোরিডাতে যে ব্যাঙ্‌ পাওয়া যায়, তা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু—ফার্ম্মে চাষ করিলেও অত বড় ব্যাঙ্‌ কিছুতেই জন্মাইতে পারা যায় না—বা অত সুস্বাদুও হয় না—এই জন্য বাজারে বন্য ব্যাঙের দাম বেশী। এক এক রাত্রিতে এই সব ব্যাঙ্‌ শিকারীরা চার হইতে দশ ডলার রোজগার করে।

এই কোলাব্যাঙ্‌ আমেরিকার এক প্রকার সুখাদ্য।

সবুজ কোলাব্যাঙই পালনের উপযুক্ত, শীঘ্র শীঘ্র ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় এবং ইহারা সহজে রোগগ্রস্ত হয় না। মিসিসিপি অঞ্চলের বন্য ব্যাঙের আকার ইহার প্রায় দ্বিগুণ হইলেও বন্দী অবস্থায় তাহাদের বংশ আশানুরূপ বাড়ে না। শীঘ্র শীঘ্র মারাও পড়ে। এক বৎসর বয়সের ব্যাঙের মাংস অতীব নরম স্বাদু। ইহার বেশী বয়স হইলে মাংস সহজে সিদ্ধ হয় না ও রং আর শাদা থাকে না। মিসিসিপি অঞ্চলের ব্যাঙ্‌কে এই এক বৎসরই বাঁচাইয়া রাখা অত্যন্ত শক্ত, কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর সবুজ কোলাব্যাঙ্‌ অনায়াসেই পাঁচ ছয় বৎসর বাঁচে। এই জন্য ফার্ম্মে সবুজ কোলাব্যাঙ্‌ ছাড়া অন্য জাতীয় ব্যাঙের চাষ হইতে বড় একটা দেখা যায় না। কালিফোর্নিয়া অঞ্চলের ব্যাঙ্‌ সুস্বাদু বটে, পালনের সুবিধাও আছে কিন্তু আকারে ইহারা অত্যন্ত ছোট বলিয়া বাজারে অত্যন্ত কম দামে বিকায়।

বন্য কোলাব্যাঙ্‌ দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ বিশ বাইশ ইঞ্চি হয় এবং ছয় সাত বৎসরের মধ্যে ওজনে প্রায় দু'সের আড়াইসের হয়—কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর সবুজ কোলাব্যাঙ্‌ ডিম হইতে বাহির হইবার একবৎসর পরে আধ সের ওজনের হইয়া থাকে—এবং সেই সময়ই ইহাদের মাংস বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয়—বয়স বাড়িলে ব্যাঙের দাম কমিয়া যায়।

এই জাতীয় ব্যাঙের কোন রোগ হইতে দেখা যায় না বটে কিন্তু তা বলিয়া অন্য অন্য শত্রু ইহাদের যথেষ্ট। সাপ ও পাখী এই দুটি ব্যাঙের ভীষণ শত্রু—ইহাদের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য অনেক তোড়জোড় করিতে হয়—লোহার জাল্‌তির বেড়া দিয়া চারিপাশে ও উপরে ঘিরিয়া দিতে হয়—অনেক সময় তাহাতেও রক্ষা হয় না—র‍্যাট্‌ল্‌ সাপ ইহাদের একবার সন্ধান পাইলে যেরূপে হোক আক্রমণ করিবেই—সেজন্য বেড়ার নীচে খানিকটা কংক্রিটের গাঁথুনি

রাখিতে হয়। আমেরিকাতে ব্যাঙ্‌পালন-ব্যবসায় দিনে. দিনে বাড়িতেছে—কারণ আজকাল শুধু আমেরিকায় নয়, ইউরোপের লোকেও ব্যাঙের আস্বাদ পাইয়া মজিয়াছে—ইউরোপের সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া ফ্রান্স ও ইটালিতে ব্যাঙের চাহিদা যথেষ্ট।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একজন উদ্যমশীল যুবক সম্প্রতি ব্যাঙ্‌পালন ব্যবসায়ে মন দিয়া নিজের অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছেন। মিসিগান ষ্টেটে ইঁহার পৈত্রিক ভিটা। সেখানে নিজেদের জমিজমা কিছুই ছিল না।

বাড়ির কাছে খানিকটা জমিজমা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল—চারিধার বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, ভদ্রলোক এই জমিটুকু বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া এখানেই ব্যাঙের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এই হাত-জাল দিয়া ব্যাঙ্‌ ধরা বড় সহজ ব্যাপার নয়।

নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন:—জলাজমিটুকু বন্দোবস্ত করে নিয়েই লুইসিয়ানা থেকে পঞ্চাশ জোড়া পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় কোলাব্যাঙ্‌ এনে ছেড়ে দিলাম সেখানে। তাদের রং ছিল নানা রকম—কারুর ফিকে সবুজ, কারুর বা ঘন সবুজ—আবার কারুর সবুজের সঙ্গে একটু মেটো রং মেশানো। ছায়া না পেলে ব্যাঙ্‌ বাড়তে পায় না, এজন্য জলের ধারে বেশ ঘন করে বন্য উইলো পুঁতেছিলাম—কিন্তু উইলো গাছ বাড়তে তো সময় নেবে, ততদিন কি করবো? ভেবে ভেবে দেখলাম উইলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে রেড়ির গাছ পোঁতা সবচেয়ে প্রশস্ত, কারণ রেড়ির গাছ বাড়বে খুব তাড়াতাড়ি। রেড়ির গাছ পুঁতে দিতে মাস দুই তিনের মধ্যে দশ বারো ফিট লম্বা হয়ে পড়লো বটে কিন্তু একটু অসুবিধাও লক্ষ্য ক'রলাম। উইলো গাছে যেমন পোকা মাকড় এসে বসে—রেড়ির গাছে তা আসে না—অথচ পোকা মাকড় ব্যাঙের অতি প্রধান খাদ্য।

মদ্দা ব্যাঙের চোখের পাশের বড় বড় কান দুইটা দেখিবার মত: মাদী ব্যাঙের কান এত বড় লম্বা হয় না।

এদের খাবারের জন্যে ছোট ছোট কুচো মাছ অনেক ছেড়ে দিলাম ডোবাতে। আমি দেখেছি চিংড়ি মাছ ও কাঁকড়া ছাড়াই ভাল। ওদের দেহের শক্ত আবরণের জন্যে ব্যাঙেরা ওদের খেতে পারে না কিন্তু ওদের ডিম ও ছানা খেয়ে বাঁচে। এতে মূলধন নষ্ট হয় না, সুদেই কারবার চলে যায়!

ব্যাঙ ডিম ছাড়ে সাধারণতঃ মে মাসের প্রথমে—ডিম তখনি আলাদা করে রাখ্‌তে হয়। আমি কাছেই একটা চৌবাচ্চা গাঁথিয়ে সেখানে ডিম রেখে দিয়েছিলাম, ব্যাঙাচি না বেরুনো পর্য্যন্ত। আলাদা করে না রাখ্‌লে ব্যাঙেরাই নিজেদের ডিম খেয়ে ফেলে এ ছাড়া অন্যান্য শত্রুও যথেষ্ট। ব্যাঙাচি বার হয়ে গেলে তাদের ময়দার গুঁড়ো খেতে দিয়ে উপকার

পেয়েচি—এতে খুব শীঘ্র বাড়ে। রাত্রে জলার ধারে আলো জ্বালিয়ে রাখ্‌লে অনেক পতঙ্গ এসে আলোর চারি পাশে উড়ে পড়ে—ব্যাঙের দল সারারাত ধরে ধরে খায়—এতে খাবার জোগাড় করবার পয়সা বেঁচে যায়।

অনেকেই ইহার মধ্য হইতে ব্যাঙটি খুঁজিয়া পাইবেন না : একেবারে ঠিক মধ্যখানে সে লুকাইয়া আছে।

ডিম ফুটে বার হবার দু'বছর পরে সাধারণতঃ আমি ব্যাঙ্‌ বাজারে পাঠাই—তখন তিন পোয়া থেকে এক সের পর্য্যন্ত এদের ওজন হয়। এদের বংশ এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে, শুনলে অবাক হয়ে যেতে হবে। আমার এক বন্ধু মাত্র একজোড়া কোলাব্যাঙ্‌ ও ছোট একটা ডোবা নিয়ে প্রথম ব্যবসা সুরু করে, এই মে মাসের শেষে ডোবাতে বিশ হাজার ব্যাঙ্‌ হয়েছে, ছোট ডোবাটাতে সে আর এদের স্থান সঙ্কুলান কর্ত্তে পারচে না—আবার আগামী বৎসরে মে মাসে যখন এরা ডিম ছাড়বে, তখন ভাবুন অবস্থাটা কি দাঁড়াবে।

কোমোডো দ্বীপের অতিকায় গিরগিটি

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীতে গিরগিটি জাতীয় একপ্রকারের প্রাণী বাস করিত। এখন তারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পৃথিবীর সব দেশের যাদুঘরে রক্ষিত আছে, একথা আজকাল স্কুলের ছেলেরাও জানে। কিন্তু একটা জিনিষ হয়তো অনেকেরই জানা নাই—সেটা এই যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় গিরগিটি-দের বংশধর আজও পৃথিবীতে আছে—এবং তারা নিতান্ত ছোট নয়।

বালিদ্বীপ হইতে অল্পদূরেই কোমোডো—ইহা সাণ্ডা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর এই অঞ্চলে মাটীর নীচে আগ্নেয় উৎপাৎ লাগিয়াই আছে, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি এ অঞ্চলের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বলিলেও চলে—পৃথিবীর দৈনন্দিন ভূকম্পের অধিকাংশের উৎপত্তি-স্থান এই অঞ্চলে। এখান হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ছোট বড় দ্বীপের উৎপত্তি এই আগ্নেয় উপদ্রব প্রসূত। এই কোমোডো দ্বীপেই উপরোক্ত শ্রেণীর অদ্ভুত ধরণের গিরগিটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

কোমোডো হইতে নির্ব্বাসিত গিরগিটি।

এখানে একটা কথা আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সব অতিকায় সরীসৃপের কাহিনী মানুষের মনে এমন একটা বিস্ময় ও মোহের সৃষ্টি করিয়াছে যে, বহুকাল হইতেই এদের লইয়া নানা আজগুবি গল্প প্রচলিত আছে। অধিকাংশ গল্পের বক্তব্য এই যে, এইসব অতিকায় সরীসৃপ এখনও পৃথিবীতে আছে—মানুষে তাহাদের লইয়া গিয়া ফেলিয়াছে দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম বনভূমির মধ্যে, কখনও বা মধ্য আফ্রিকার, কখনও বা ভারতবর্ষের। আর্থার কোন্যান্ ডয়েলের লস্ট ওয়ার্ল্ড, 'Lost World' নামক উপন্যাস ও এইচ, জি, ওয়েল্‌সের ইন দি অবজার্ভেটরি, 'In the Observatory' নামে ছোট গল্প এই বিষয় লইয়া লেখা। গত শতাব্দীর শেষভাগে, এমন কি বিংশশতাব্দীর প্রথমেও লোকে এই ধরণের কথা বিশ্বাস করিত। কিন্তু আজকাল ভৌগোলিক তত্ত্বে আর রোমান্সের অবকাশ নাই। মেরুপ্রদেশের চারিধারে দেবলোকের ন্যায় অদ্ভুত দেশ যে নাই ক্যাপ্তার বার্ড বা জেনারেল নোবিলের কৃপায় এখন সেকথা সকলেই জানে।
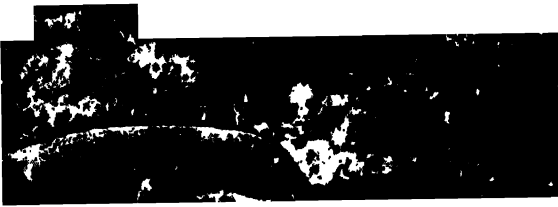
অতিকায় গিরগিটিদের মৃত শূকর ভক্ষণ।

তাই কোমোডো দ্বীপের গিরগিটির কথা প্রথমে লোকে অবিশ্বাস করিত। কোমোডো দ্বীপে সভ্যমানুষের যাতায়াত ছিল না বলিলেই হয়—ক্বচিৎ এক আধজন নাবিক বা ভবঘুরে কি করিয়া ঐ দ্বীপে গিয়া পড়িয়াছিল কে জানে—তাহারাই ফিরিয়া আসিয়া গল্পটা প্রচার করে। সবাই শোনে বটে কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না। অবশেষে ১৯১২ সালে একজন ডাচ্ বৈজ্ঞানিকের কাছে খবর পাওয়া গেল যে কথাটা সত্য—এত বড় গিরগিটি সত্যই সেখানে আছে।

বন্দুকের গুলিতে হত গিরগিটি।

এর বছর কয়েক পরে যুক্তরাষ্ট্রের মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিষ্ট্রি, Museum of Natural History-র তরফ থেকে একটা দল কোমোডো দ্বীপে রওয়ানা হয়, তারা যে শুধু কোমোডো দ্বীপের গিরগিটির বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্যই গিয়াছিল তাহা নয়—পৃথিবীর ওই দিকটা ছিল অনেকটা অজ্ঞাত, ওখানকার সমুদ্র, পাহাড় ও অরণ্যে কত অজ্ঞাত ধরণের প্রাণী আছে তাদের নমুনা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছাও ছিল ইঁহাদের।

ইঁহারা অনেকগুলি ফটো তুলিয়া আনেন ও অঞ্চলের, ফটোগুলি অতি মূল্যবান। এই ফটোগুলির সাহায্যে পৃথিবীর একটি অপরিচিত অন্ধকার কোণ আমাদের নিকট পরিচিত আলোকময় হইয়া উঠে—বিচিত্র পৃথিবী আমাদের চোখে আরও বিচিত্র ও লীলাময়ী হইয়া প্রতিভাত হন—সাগরপারের কোন্ সুদূর দেশের পাহাড়, নির্জ্জন সৈকতভূমি, তালীবন, ঘন অরণ্য আমাদের কোলাহলমুখর প্রাণকে ক্ষণকালের জন্য শান্ত ও উদাস করিয়া তুলে।

কোমোডো দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

বালি ও কোমোডো একই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হইলেও এদের মধ্যে প্রভেদ অনেক। শুধু এই দ্বীপের বলিয়া নহে, এ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যেকার কোন দ্বীপের সঙ্গে কোনটার মিল নাই—কি লোকজন, কি ধর্ম্ম, কি প্রাণী ও উদ্ভিদ্ সংস্থান,—এক একটার এক একরকম।

বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত, অধিবাসীদের চেহারা সুশ্রী, শিল্প ও সভ্যতা উন্নত। বালিদ্বীপে ভাল চাষবাস হয়, বিশেষ করিয়া ধানের চাষ খুব বেশী। কিন্তু কোমোডো দ্বীপে লোকজন বেশী বাস করে না, দ্বীপটি আগ্নেয়-পর্ব্বত-সঙ্কুল ও বনময়—চাষবাস তো দূরের কথা, কোমোডো দ্বীপে স্থায়ী বাসিন্দা লোক নাই বলিলেও চলে। এখানকার ঘন অরণ্যের মধ্যে হরিণ, বন্য বরাহ, মহিষ ও নানা জাতীয় বিচিত্র বর্ণের পাখী প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমে বাহির হইতে দেখিলে মনে হয় না যে দ্বীপের অভ্যন্তরভাগ এত দুর্গম। বেলাভূমি অতি সুন্দর ও তাল নারিকেল গাছের প্রাচুর্য্যে স্বপ্নময়, কিন্তু দ্বীপের ভিতরে কিছু দুর গেলেই কেবলই ছোটখাটো পাহাড়, কাঁটাবন ও বড় বড় ঘাসের জঙ্গল। অতিকষ্টে প্রবেশ করিতে হয়, তা ছাড়া বিষধর সর্প তো যেখানে সেখানে—সাবধানে চলাফেরা না করিলে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসাই দুষ্কর।

সব দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দ্বীপটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় সরীসৃপের বর্ত্তমান বংশধরদিগের উপযুক্ত বাসভূমি বলিয়া মনে হয় বটে।

ইঁহারা অবশ্য দ্বীপে পদার্পণ করিয়াই এই গিরগিটির সন্ধান পান নাই। কারণ তাহারা মানুষকে দেখা দিবার
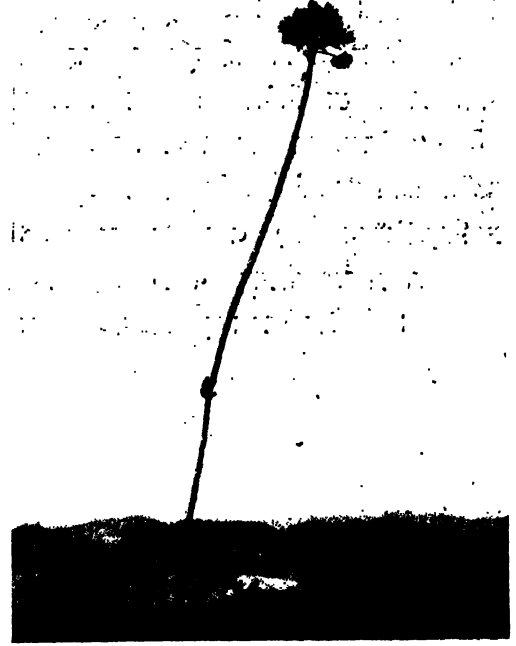
কোমোডো দ্বীপের তাল গাছ : যে লোকটি উঠিতেছে তাহার অবস্থা চিন্তনীয়।

এই জন্তুটিকে ধরিতে বহু মাল-মশলা খরচ করিতে হইয়াছে।

অপেক্ষায় কাতারে কাতারে বসিয়া নাই বহু কষ্টে, বহু টোপ্ ফেলিয়া, ফাঁদ পাতিয়া, বহুবার অকৃতকার্য্য হইবার পরে তবে ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু শেষকালে এত বেশী ফাঁদে পড়িতে থাকে যে ইঁহারা বাছিয়া বাছিয়া মিউজিয়মের উপযুক্ত কতকগুলি রাখিয়া বাকীগুলি ছাড়িয়া দেন।

এই গিরগিটির বৈজ্ঞানিক নাম Varanus Komodoensis—সাধারণতঃ ইহাদের দৈর্ঘ্য দশ ফুট ও ওজন সাড়ে চার মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এক একটা এর বেশীও হয়। ডাচ্ বৈজ্ঞানিক Ouwens সাড়ে বারো ফুট লম্বা ও প্রায় পাঁচ মণ ওজনের একটি গিরগিটি দেখিয়াছিলেন।

গিরগিটির নাম শুনিয়া যেন কেহ ভুল না করেন যে বোধ হয় ইহারা আমাদের গৃহবাসী গিরগিটির একটু বড় সংস্করণ মাত্র। আসলে ইহারা অত্যন্ত হিংস্রস্বভাব, নির্দ্দয় ও ক্রূর প্রকৃতির। মানুষ দেখিলে অনেক সময় তাড়া করিয়া

আসে—অনেক বন্য জন্তু ইহাদের দেখিলে ভয়ে পালায়। ইহাদের প্রাগৈতিহাসিক পূর্ব্বপুরুষদের মত ইহারা শিকার ধরিয়া করাতের মত ধারালো দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া এক এক গ্রাসে মাংসের বড় বড় টুক্‌রা অধীর ও ব্যগ্রভাবে গিলিতে থাকে—তখন তাহাদের মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর দেখায়।

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা Eocene যুগে, অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় দুই কোটী বৎসর পূর্ব্বে এই জাতীয় গিরগিটির সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু Eocene যুগের পূর্ব্বের শিলাস্তরে ইহাদের আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতেই মনে হয় ঐ সময়ে উহারা প্রথমে আবির্ভূত হয়। সুতরাং কোমোডো দ্বীপের অতিকায় গিরগিটি যে পৃথিবীর অতি বনিয়াদী বাসিন্দা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের বিষয় দাঁড়াইয়াছে এই যে, কোমোডো দ্বীপ অপেক্ষাকৃত আধুনিক—পণ্ডিতেরা বলেন, মাত্র কয়েক লক্ষ বৎসর সমুদ্রগর্ভস্থ আগ্নেয় উপদ্রবের ফলে ইহার জন্ম—শুধু ইহারা নহে, তাবৎ সাণ্ডাদ্বীপ পুঞ্জটিরই উৎপত্তি এইভাবে ও প্রায় একই কালে ঘটে—এত প্রাচীন যুগের প্রাণী এই অপেক্ষাকৃত নবীন দ্বীপে কি করিয়া আসিল? এ সমস্যার মীমাংসা এখনও হয় নাই।

কোমোডো দ্বীপের নিকটে উইটার নামে আর একটা দ্বীপ আছে—সেটা আরও অরণ্যময়, আরও পাহাড় পর্ব্বতে ভরা। উইটার দ্বীপের অভ্যন্তরে সভ্য মানুষে এখনও যায় নাই, সেখানে কি আছে কেহ জানে না। তবে যতদূর জানা গিয়াছে এই জাতীয় অতিকায় ড্রাগন গিরগিটি ওখানে নাই। উইটার দ্বীপের তীরবর্ত্তী অঞ্চলে অল্পসংখ্যক অসভ্য পাপুয়ান্ অধিবাসী নারিকেল পাতার কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করে ও প্রধানতঃ মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

এই দুই দ্বীপ হইতে Museum of Natural History-র দলটি অনেক সরীসৃপ ও উভচর প্রাণী সংগ্রহ করিয়া আনেন। চৌদ্দটি অতিকায় গিরগিটি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইটিকে জীবন্ত অবস্থায় আনা হয়। অতি-কায় গিরগিটি শিকার করা বড় শক্ত, ইহাদের গাত্রাবরণের নীচে কঠিন হাড়ের পাত সাজান আছে, বন্দুকের গুলি ছাড়া সহজে মারা যায় না।

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান পক্ষী

প্রবন্ধের নাম লইয়া হয় তো বিতর্ক উঠিতে পারে। কাহারো মতে অমুক পাখী সকলের চেয়ে মূল্যবান, কাহারো মতে বা অমুক পাখী। কিন্তু টাকা-পয়সার দিক হইতে যে দক্ষিণ আমেরিকার গুয়ানে পাখী খুবই মূল্যবান, এবিষয়ে যাঁহারা খবর রাখেন তাঁহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই।

গুয়ানে পক্ষীর ঝাঁক।

গুয়ানে এক জাতীয় সামুদ্রিক পক্ষী। পেরুতে সাধারণত এই পক্ষী প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদেশিক ব্যবসায়িগণের হাতে এই পাখীর বংশ একরূপ নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছিল বলিয়া পেরুর গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা ইহার অবাধ শিকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের অনুর্ব্বর, বৃক্ষলতাহীন, পাষাণময় তীরভুমিতে পারীনা অন্তরীপ হইতে গুয়াকিল উপসাগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রায় এই পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দীর্ঘ উপকূল-রেখা বাহিয়া প্রায় সমান্তরাল ভাবে একটি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা সামুদ্রিক স্রোত উত্তর দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে, তাহার নাম প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Humboldt হুম্‌বোল্‌ট এর নামানুসারে দেওয়া হইয়াছে Humboldt Current হুমবোল্‌ট কারেণ্ট। উপকূল রেখার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার উত্তাপ হইতেছে ৬০ ডিগ্রী ফারেণহাইট—যেখানে অপেক্ষাকৃত দূরতর সমুদ্র জলের উত্তাপ ৭৮ হইতে ৮১ ডিগ্রি ফারেণহাইট। এই ঠাণ্ডা জলে একজাতীয় মাছ ও উদ্ভিদ জন্মায়, গুয়ানে পাখীদের তাহাই আবার প্রিয়-

খাদ্য। Humboldt Current যতদূর বিস্তৃত, গুয়ানে পাখীদের ঝাঁক ততদূর দেখিতে পাওয়া যায়; Humboldt Current যেখানে শেষ হইল গুয়ানে পাখীর বসতিও সেখানে শেষ হইল। এই উপকূলে বহু ছোট-খাটো প্রস্তরময় দ্বীপ আছে—প্রায়ই এই সব দ্বীপে জনমানব বাস করে না—এই দ্বীপগুলিও গুয়ানে পাখীর আড্ডা।

উড্ডীয়মান গুয়ানে।

গুয়ানে পাখীর বিষ্ঠাকে গুয়ানো বলে। গুয়ানো কৃষিক্ষেত্রের অতি উপাদেয় সার—এবং প্রাচীন কাল হইতেই পেরু ও বলিভিয়ার কৃষিক্ষেত্র সমূহে গুয়ানো প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পেরু উপকূলের দ্বীপগুলি গুয়ানে পাখীর ঝাঁকে ভর্ত্তি—এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এই সব অনুর্ব্বর দ্বীপের জমির উপর গুয়ানো জমিয়া স্তূপীকৃত হইয়া আছে—কিন্তু বাতাসে আর্দ্রতা না থাকায় উহা বিকৃত হয় নাই। এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনীই গুয়ানোকে বরং অধিকতর উপযোগী ও মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ব্যবসায় হিসাবে ইহার যে বিশেষ কোনো উপযোগিতা আছে, তাহা পনেরো বৎসর পূর্ব্বেও ওখানকার লোকের পক্ষে সন্দেহের বিষয় ছিল।

যখন গুয়ানে পাখীর ঝাঁক সমুদ্রের জলে শিকার খুঁজিতে থাকে—তখন দূর হইতে ইহাদিগকে একটা কালো রংএর খুব বড় ভাসমান ভেলা বলিয়া মনে হয়। আবার যখন তাহারা কোন দূরবর্ত্তী স্থানে শিকারের সন্ধানে যায় তখন আকাশে সুদীর্ঘ সরু সারি বাঁধিয়া উড়িতে থাকে—এত সুদীর্ঘ যে কোনো একটা বিশেষ স্থান পার হইতে গোটা সারিটার চার পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগিয়া যায়।

গুয়ানে-মাতা ডিমে তা দিতেছে।

গুয়ানের সমজাতীয় অন্য কোন পক্ষী দক্ষিণ আমেরিকার অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। কেবলমাত্র মাগেলন প্রণালীতে ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে ইহাদের নিকটতম জ্ঞাতি এক জাতীয় cormorant * পাখী বাস করে। এই জাতীয় cormorant দক্ষিণ মেরুর তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশে বিস্তর আছে—কিন্তু Humboldt current বাসী গুয়ানে পাখী হইতে হিমময় মেরুপ্রদেশীয় এই সকল পাখীর শরীরগত পার্থক্য বিস্তর।

গুয়ানে পাখী জলের উপর হইতে ছোঁ মারিয়া অনেক সময় শিকার ধরে। এইখানেও মাগেলন প্রণালীস্থ

* লিপ্তপদ সর্ব্বভুক্ সামুদ্রিক পক্ষীবিশেষ।

ও মেরুপ্রদেশীয় পাখীদের সহিত গুয়ানের শিকার-প্রণালীর পার্থক্য আছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর পাখী অনেক সময় গভীর জলে ডুব দিয়া শিকার ধরে কিন্তু গুয়ানে ডুব দিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না বলিয়া অল্প জলে যে সকল মাছ সাঁতার দিয়া বেড়ায়—তাহাই ছোঁ মারিয়া ধরে।

সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় দশ বিশটা গুয়ানে উপকূল হইতে উড়িয়া সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে—ইহারা নিচের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এদিক ওদিক উড়িতে থাকে এবং যেমন জলের উপর মাছের ঝাঁক ভাসিতে দেখে, অমনি ছোঁ মারিতে সুরু করে—ইহাদের ছোঁ মারিতে দেখিয়া তীরবর্ত্তী পাখীর ঝাঁক বুঝিতে পারে যে এইবার শিকারের সন্ধান মিলিয়াছে অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী নানাদিক হইতে উড়িয়া আসিতে থাকে।

পেস্কাদোর দ্বীপপুঞ্জের গুয়ানে জনসভা।

গুয়ানে পাখী পেঙ্গুইনের মত সোজা হইয়া মানুষের মত হাঁটে। সাধারণতঃ ইহাদের উচ্চতা আঠারো ইঞ্চি হইতে কুড়ি ইঞ্চি ও ওজন দুই সের হইতে আড়াই সের। ইহাদের গলা নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ, বুক দুধের মত সাদা। এক একটা দ্বীপে বহুসংখ্যক পাখী একত্রে বাস করে—ডাঃ কোকার একবার হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন দক্ষিণ চিনকা দ্বীপে একটিমাত্র বাসস্থানে অন্ততঃ দশলক্ষ পাখী থাকে। কোনো কোনো স্থানে ইহাদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি।

সমুদ্রতীরে পাহাড়ের শীর্ষে উৎসুক গুয়ানে-কুল।

মানুষ দেখিলে ইহারা সকলে একসঙ্গে উড়িয়া যায় না—প্রথমে মানুষকে খুব কাছে আসিতে দেয়—এমন কি অনেক সময় দুই হাত দূরে আসিলেও নড়ে না। মনে হয় বুঝি হাত বাড়াইলেই ধরা যাইবে। হঠাৎ খুব নিকটের দু' দশটা পাখী উড়িতে আরম্ভ করে—তাহাদের দেখা দেখি বিশটা পঞ্চাশটা ক্রমে দুশো পাচশো পাখী ডানার ভীষণ ঝটাপট্ শব্দ করিতে করিতে আকাশে উঠিয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে কালো রংএর সচল ঝাঁকে আকাশ আবৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু বেশীক্ষণ আকাশে থাকে না, মানুষ সরিয়া ক্রমে দূরে যাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে ঝাঁকটা উড়িয়াছিল, সেটা মাটীতে নামে। এই রকমে একে একে আগের সব ঝাঁকগুলাই আবার মাটিতে আসিয়া বসে—তখন দূরতম প্রান্তের ঝাঁকগুলি উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, একদিকে যত ওড়ে, অন্যদিকে তত বসে। বেশী কুইনিন্ সেবনে যেমন কান ভোঁ ভোঁ করে, নিকটে গিয়া শুনিলে ইহাদের অসংখ্য ডানার অনবরত ঝটাপট্‌ধ্বনিতে কানের মধ্যে তদ্রূপ অস্বস্তি অনুভূত হইতে থাকে।

গুয়ানে পাখীর ঝাঁক শিকার অন্বেষণে অনেক সময়ে বহুদূর সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িলেও সমুদ্রের মধ্যে তাহারা কখনো রাত্রি যাপন করে না—পেলিকান জাতীয় পাখীদের মত। ডাঃ কোকার লিখিয়াছেন, "আমি অনেক সময় গুয়ানে পাখীর ঝাঁক দূর সমুদ্র হইতে ফিরিতে দেখিয়াছি—বেলা দুইটার সময় ঝাঁকের প্রথম পাখী দেখা দিল এবং শেষের দলটি যখন তীরে আসিয়া পৌছিল তখন রাত্রি প্রায় সাতটা।" অনেক সময় তিন চারটি দীর্ঘ শ্রেণীতে বড় ঝাঁকটি বিভক্ত হইয়া যায়—প্রত্যেক শ্রেণীতে একজন দলপতি আগে আগে পথপ্রদর্শক ভাবে থাকে—শ্রেণীগুলির মধ্যে ১০।১৫ গজ তফাৎ থাকে, কখনও বা বেশী।

গুয়ানের শত্রু অনেক। তীরবর্ত্তী পাখীদের ছানা ও ডিম অধিকাংশ সময়ই জলসিংহ sea lionএর সুখাদ্য। গভীর রাত্রে চুপি চুপি জল হইতে উঠিয়া প্রায়ই ইহারা ছোট ছোট ছানাগুলিকে খাইয়া ফেলে—সুবিধা পাইলে ধাড়ী পাখীও বাদ দেয় না—ডিমগুলি কতক খাইয়া ফেলে, কতক শরীরের ভারে ভাঙিয়া ফেলে, কতক শরীরের ভারে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়। ছানাগুলির গায়ে অনেক সময় একপ্রকার উকুন জন্মায়, তাহাদের উৎপাতে ছানাগুলি বাড়িতে পারে না, রোগগ্রস্ত হইয়া মারাও পড়ে। সিন্ধুশকুন ও কণ্ডর্ নামে সুবৃহৎ শিকারী পক্ষীও ইহাদের ভয়ানক ভক্ত। অনেক সময় ইহাদের উৎপাতে ধাড়ীপাখীর ঝাঁক ছানা ও ডিম ফেলিয়া পলাইয়া যায়—বহু দূর পর্য্যন্ত তীরভূমি জুড়িয়া শুধু দেখা যায় ভাঙা ডিমের খোলা ও ছানার রক্তাক্ত মৃতদেহ। এই অবস্থায় একটা কণ্ডর্ পাখীকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছিল—তার পাকস্থলী হইতে ষোলটা ডিমের শ্বেতসার ও হরিদ্রাংশ পাওয়া যায় কিন্তু একটুকরাও ডিমের খোলা পাওয়া যায় নাই।

ধাড়ী পাখীরা ছানাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য গলার মধ্যে পুরিয়া আনে এবং পিতামাতা ফিরিয়া আসিলে ছানারা তাহাদের গলার মধ্যে মুণ্ড পুরিয়া দিয়া খাবার বাহির করিয়া খায়। গুয়ানে পাখীর ছানা মানুষ দেখিয়া ভয় পায় না, বরং মানুষ দেখিলে কৌতুহলের দৃষ্টিতে কাছ ঘেঁসিয়া আসে আরও ভাল করিয়া দেখিবার জন্য।

পনেরো বৎসর পূর্ব্বেও যেরূপ অবস্থা ছিল, সেরূপ অবাধ শিকার ও ডিমসংগ্রহ এখনও চলিতে থাকিলে এতদিন গুয়ানে পাখীর বংশ নির্ম্মূল হইয়া যাইত। কিন্তু ১৯১৮ সালে পেরু গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা গুয়ানে পাখীর ডিমসংগ্রহ ও শিকার অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস ভিন্ন অন্য সময় গুয়ানের বাসস্থানে যাওয়াও আইনানুসারে নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। পাখীদের পরিরক্ষণ ও গুয়ানো ব্যবসায় সুপরিচালনার উদ্দেশ্যে ঐ সালে জাতীয় গুয়ানো পরিচালন National Guano Administration নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কর্ম্মীগণ সকলেই পেরু গবর্ণমেণ্টের বেতনভুক্ কর্ম্মচারী। পাখীদের মধ্যে সংক্রামক রোগ যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে বা রোগ দেখা দিলে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা হয়—এজন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ পক্ষীতত্ত্ববিদ্ চিকিৎসক নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই সমিতির উদ্যমে গুয়ানো ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতিও সাধিত হইয়াছে—যেখানে ১৯১৪ সালে পেরু হইতে ২৫,০০০ টন গুয়ানো বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল সে স্থলে দশ বৎসর পরে ১৯২৪ সালে ৯০,০০০ টন গুয়ানো রপ্তানী হইয়াছিল। বর্ত্তমানে গুয়ানো ব্যবসায়ের আরও উন্নতি হইয়াছে।

লিবীয় মরুভূমি

ইজিপ্টের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, ইজিপ্ট ও ত্রিপোলির মধ্যে লিবীয় মরুভূমি। এই মরুভূমির সর্ব্বত্রই বেদুইন আরব জাতি বাস করে। 'বেদুইন' আরবী শব্দ, ইহার অর্থ 'মরুবাসী'—কিন্তু আজকাল বেদুইন বলিতে যে কোনো ভ্রাম্যমান পশুপালক জাতি বোঝায়—তাহারা শ্বেতকায় হৌক্ বা কৃষ্ণকায় হৌক্, আরব হৌক্ বা নিগ্রো হৌক্!

আসল বেদুইন জাতি আফ্রিকার নিগ্রো অপেক্ষা সুশ্রী- শ্বেতকায় বেদুইন প্রায়ই আরব; কৃষ্ণকায় বেদুইন (বিশেষতঃ যাহারা লিবীয় মরুর দক্ষিণে বাস করে) প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—টেবু, গোরান ও বিদিয়াৎ। অনেকে সেন্নুসি সম্প্রদায়কে বেদুইন আরবের একটি শ্রেণী বলিয়া ভুল করেন—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেন্নুসি কোন একটি পৃথক জাতি নহে, ইহা একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়, মুসলমান ধর্ম্মেরই একটি ভিন্ন সম্প্রদায় মাত্র। উত্তর আফ্রিকার সর্ব্বত্রই এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত প্রবল।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে আলজিরিয়া হইতে সিদি মোহম্মদ ইবন্ আলি এল্ সেন্নুসি নামে জনৈক সাধুপুরুষ মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন ও সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে এই ধর্ম্মমত প্রচার করেন। ইঁহার অনেক শিষ্য অন্য অন্য দেশেও প্রচারকার্য্যে চলিয়া যায় দেখিতে দেখিতে কুফ্রার উত্তরে সমগ্র স্থানে সেন্নুসি মত বিস্তৃতি লাভ করে। সেন্নুসি প্রসিদ্ধ জগ্‌বাহব্ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।

মরুভূমির পথে।

জগ্‌বাহব্ লিবীয় মরুভূমির প্রান্তবর্ত্তী একটি ওয়েসিস্ ও ক্ষুদ্র সহর। এই জগদ্বিখ্যাত বিদ্যাকেন্দ্রই ইহার সবটুকু, মস্‌জিদ ও বিদ্যালয়ের বাহিরে সহরের কোনো পৃথক্ অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। মস্‌জিদে একসঙ্গে ৫০০।৬০০ শত লোক বসিয়া উপাসনা করিতে পারে এবং ইহার সুবৃহৎ গম্বুজের নীচে সিদি মোহাম্মদ সেন্নুসির সমাধি অবস্থিত। সেন্নুসি সম্প্রদায়ের লোকের নিকট ইহা একটি পবিত্র তীর্থস্থান—বহুদূর হইতে লোকে এখানে তীর্থ করিতে আসে।

জগ্‌বাহব্ ওয়েসিস্ ছাড়াইয়া একশত মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে সিউয়া ওয়েসিস্। এখানকার খেজুর প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এখান হইতে খেজুর রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে খেজুরের বাজারে একটি অদ্ভুত ধরণের প্রথা প্রচলিত আছে। বাজারে যখন শুষ্ক বা সুপক্ক খেজুর স্তূপীকৃত করা থাকে, তখন যে কোনো ভিক্ষুক বা পথিক তাহা হইতে পেট ভরিয়া যত ইচ্ছা খেজুর খাইতে পারে, কিন্তু সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। সিউয়ায় কেহ উপবাসী থাকে না। সিউয়া লিবীয় মরুভূমির একটি প্রাচীনতম ওয়েসিস্—খেজুর ও জলপাইয়ের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানকার ব্যবসায়িগণ প্রায়ই শ্বেতকায় বেদুইন আরব।

সিউয়া হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে জাকো—আর একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার বাণিজ্যদ্রব্য হস্তীদন্ত, খেজুর ও অষ্ট্রিচের পালক। এখানকার ব্যবসায়ে বেদুইন আরবদের স্থান নাই—মাজাব্রা জাতিই এখানকার প্রধান ব্যবসায়ী এবং সুবিস্তৃত লিবীয় মরুভূমির মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। এক একজন সওদাগর এক হাজার দেড় হাজার উটের মালিক, উত্তর আফ্রিকায় সর্ব্বত্র ইহাদের উট যাতায়াত করে।

মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রতিদিন বহু বণিকদল যাতায়াত করে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণও সরকারী কাজে একস্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে। মরুভূমিতে কেহই একা ভ্রমণ করে না—সবাই দল বাঁধিয়া যায় এবং এক এক দলে অনেক উট ও লোকজন থাকে। লিবীয় মরুভূমিতে ভ্রমণ খুব নিরাপদ নয়—বেঘোরে পড়িলে মরুভূমির মধ্যে প্রাণ হারানোও বিচিত্র নয়। এই সকল মরুভূমিতে প্রায় ভীষণ ঝড় উঠিয়া চারিধারে বালি উড়াইতে থাকে—একটু আধটু বালি নয়, সে ভয়ানক ব্যাপার। মরুভূমির মধ্যেকার বালির পাহাড় তখন সচল হইয়া উঠে, উড়ন্ত বালিরাশি সূর্য্যদেবকে ঢাকিয়া ফেলে। এই অবস্থায় পথিক প্রায়ই বিপদে পড়ে—বালি উড়িয়া চোখে মুখে আসে বলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে তো হয়ই—কিন্তু মুস্কিল এই যে অত্যন্ত সতর্ক থাকিলেও এই সময় অনেকে পথ হারাইয়া ফেলে এবং এই জনমানবহীন পদচিহ্নহীন মরুপ্রদেশে পথ হারানো মানে নিশ্চিত মৃত্যু।
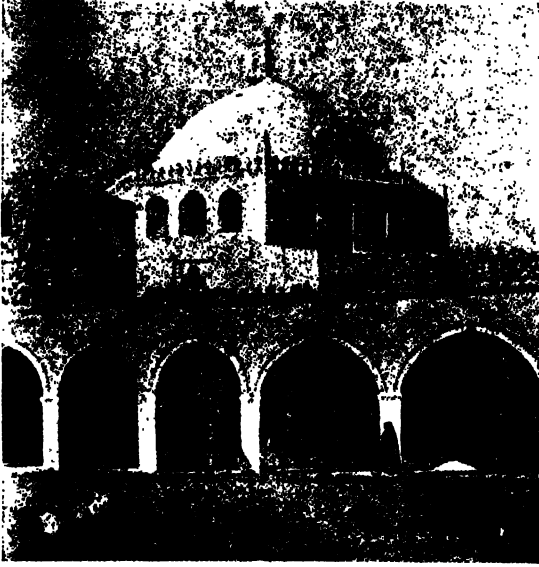
জাঘবুবের মসজিদের গুম্বজ: প্রধান সেনুসীর সমাধি ইহার নীচে অবস্থিত।

মরুভূমিতে ঝড় উঠিলে কখনো দাঁড়াইয়া থাকিতে নাই—অগ্রসর হওয়া যতই কষ্টকর হউক না কেন, অগ্রসর হওয়াই বিধেয়—নতুবা বালুরাশি দ্বারা প্রোথিত হইতে হইবে। অথচ সে সময় যদি সামনের দিক হইতে ঝড় বয়, তবে অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে—ডান দিক বা বাম দিক হইতে ঝড় বহিলে ভ্রমণ তত কষ্টকর হয় না। কিন্তু অগ্রগমন কষ্টসাধ্য হইলেও অভিজ্ঞ পথিক ঝড়ের সময় কখনোই এক জায়গায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে না—এমন কি উটেরাও ইহা বুঝিতে পারিয়া যত ধীরে ধীরেই হৌক—অগ্রসর হইবেই।

মরুভূমিতে চলাফেরার কতকগুলি নিয়মকানুন আছে—ঝড়ের সময় কি করিতে হয়, পথ হারাইয়া গেলে কি করিতে হয়, জল কি ভাবে খুঁজিতে হয় ইত্যাদি। এগুলি না জানা থাকিলে প্রায়ই বেঘোরে পড়িয়া প্রাণ হারাইবার

জালোর ওয়েশিস্। ইহার খর্জ্জুর তালবীথির আশ্রয়ে প্রায় ২০০০ লোকের বসতি।

সম্ভাবনা। এই জন্য উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক ভিন্ন কখনই মরুভূমির পথে যাইতে নাই—অনেক সময় অভিজ্ঞ ভ্রমণকারীর দলও মারা পড়ে।

পথিকদের সঙ্গে খাদ্য থাকে প্রধানতঃ চাউল, ময়দা, খেজুর ও বেদুইনদের মাখন। এই মাখন অতি অদ্ভুত পদার্থ। ভেড়ার দুধ হইতে ইহা তৈয়ারী হয়, কিন্তু বেদুইনরা টাট্‌কা মাখন ব্যবহার করিতে জানে না। চামড়ার

থলির মধ্যে রাখিয়া যখন বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ হইয়া পড়ে—তখন বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরিত হয়। লিবীয় মরুভূমির সর্ব্বত্র এই ধরণের মাখন ছাড়া মেলে না।

বেদুইনরা চায়ে দুধ মিশাইয়া খায় না। সমান পরিমাণে চা ও চিনি জলে খুব কড়া করিয়া সিদ্ধ করে এবং বড় গ্লাসে করিয়া সেই ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের কড়া ও তিক্ত চা মহা আনন্দে পান করে। উহারা কফিতেও দুধ মেশায় না। দুধ পাওয়া যায় না বলিয়া নয়—এই রকম ভাবে চা ও কফি খাওয়াই উহাদের অভ্যাস।

মরুভূমির প্রধান খাদ্য কিন্তু ভাত। এখানকার চাউল মোটা হইলেও সাদা ও দেখিতে ভাল। বেদুইনরা গরম ভাত ছাড়া বাসি ভাত কখনও খায় না। ময়দা দিয়া আমাদের দেশের হাতে গড়া চাপাটি রুটীর মত মোটা মোটা রুটী প্রস্তুত করে—কিন্তু তাহা খাইতে আদৌ সুস্বাদু নয়। রুটী গড়িয়া চামড়ার থলির মধ্যে পুরিয়া লয় ও পথে খাইতে খাইতে যায়।

লিবীয় মরুভূমির দক্ষিণ দিক হইতে যাযাবর পাখীরা উড়িয়া ইউরোপের দিকে যায়—একটা একটা ছোট রবিন পাখী একবারও জল না খাইয়া ২৫০ শত মাইলেরও বেশী উড়িতে পারে। অনেক সময় সচল পক্ষী উটকে বৃক্ষ ভ্রম করিয়া তাহাদের উপর বসে। এই ক্ষুদ্রকায় পথিকদল কখনো দিক ভুল করে না। একা থাকিলেও ঠিক গন্তব্যস্থান অভিমুখে যাইতে পারে। কিন্তু মাঝে মাঝে ট্রাজেডিও ঘটে,—তার নীরব কাহিনী অনেক সময় লেখা থাকে বালির উপর ছড়ানো ছোট ছোট ডানার হাড় ও পালকে। হয় তো অবসাদ, ক্লান্তি, হয় তো জলাভাব, কিংবা অতিরিক্ত গরম কে জানে? শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষে নানা তোড়জোড় সঙ্গে লইয়া দল বাঁধিয়া যে দুস্তর মরুভূমি পার হইতে হিমসিম খাইয়া যায়—এই ক্ষুদ্র, অসহায় পক্ষীর দল অনেক সময় একটা পাখী—কি করিয়া তাহা পার হইয়া, সমুদ্র পার হইয়া, নানা দিগ্‌দেশ পার হইয়া, পূর্ব্ব বৎসরের অভ্যস্ত স্থানটিতে পৌঁছায়। এ রহস্যের কে মীমাংসা করিবে?

কুফ্রার লবণাক্ত হ্রদ। এই হ্রদ প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত। ইহারই চারি পাশে ওয়েশিস। সম্মুখে কুফ্রা সর্দ্দার দাঁড়াইয়া।

এই ভীষণ মরুভূমিতে অভিজ্ঞ লোকও অনেক সময়ে বিপদে পড়ে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জিঘেন্ হইতে কিছু দূরে অনেক দিন পূর্ব্বে এল্ ফাডিল্ নামক অভিজ্ঞ ও নিপুণ পথপ্রদর্শক দলবল সহ তৃষ্ণায় প্রাণ হারাইয়াছিল। এল্ ফাডিল বহু বৎসর ধরিয়া জালো ও কুফ্রার মধ্যে পথপ্রদর্শকের কাজ করিয়াছে। পথ তাহার নখদর্পণে। একবার সে একদল বণিক্‌কে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে ভয়ানক ঝড় উঠিয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া দিল। এল্ ফাডিল্ পথ চিনিতে না পারিয়া জলের কূপ হইতে দূরে অন্য এক পথে সকলকে পরিচালিত করিয়া লইয়া গেল। অনেক দূর আসিয়া এল্ ফাডিল্ তাহার ভুল বুঝিতে পারিল বটে, কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। ফলে এই দলের প্রত্যেক লোক ও উট তৃষ্ণায় প্রাণ হারাইল।

বহু চেষ্টার ফলে পনেরো বৎসর পরে বালুসমুদ্রের মধ্যে ইহাদের কঙ্কাল ও জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছিল।

এঞ্জিনবিহীন এরোপ্লেন

আমাদের দেশের অনেকেই হয় তো এ খবর রাখেন না যে ইউরোপে বিশেষতঃ জার্ম্মাণীতে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এঞ্জিন্‌বিহীন এরোপ্লেনের যথেষ্ট ব্যবহার চলিতেছে এবং এ সম্বন্ধে নূতন নূতন পরীক্ষার অন্ত নাই। এঞ্জিন্‌বিহীন এরোপ্লেনকে গ্লাইডার, glider বলে। জার্ম্মানির অধিকাংশ স্কুলে বারো তেরো বছরের বালকদিগকে গ্লাইডার নির্ম্মাণ ও চালনা-কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার মূল্যও এরোপ্লেনের অনুপাতে অবশ্য অনেক কম, তৈয়ারী করিয়া লওয়াও খুব কঠিন নয়। ১৯২৮ সালে সাড়ে তিন হাজার স্কুলের ছাত্র জার্ম্মানির বিভিন্ন স্কুল সমূহে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে।

প্রথম শিক্ষার্থীর গ্লাইডার-পরিচালনে দীক্ষা।

এ ধরণের এরোপ্লেনে এঞ্জিন্ নাই, একথা সত্য, তৎসত্ত্বেও ইহা আকাশে ওড়ে, এ কথাও ঠিক। তা ছাড়া শুধু বাতাসের গতি ও বায়ুস্রোতের অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া গ্লাইডার-চালক ছাত্র বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারে। চালানোও খুব কঠিন নয়, অনেক সময় একদিন মাত্র শিখিয়াই ছাত্রেরা আকাশে উড়িতে সমর্থ হয়।

গ্লাইডার-চালনায় বিপদ নাই একথা বলা যায় না। এরোপ্লেন চালনা অপেক্ষা ইহাতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর একাগ্রতা, ক্ষিপ্রতা ও সুবিবেচনার প্রয়োজন হয়। জার্ম্মানিতে চৌদ্দ বছরের অপেক্ষা কম বয়সের কোন ছেলেকে গ্লাইডার-চালনা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না, কারণ অল্প বয়সের ছেলেদের কাছে অতটা বুদ্ধি বিবেচনা ও সাহস আশা করা যায় না। তবে প্রথম অবস্থায় গ্লাইডার চালানো

শিক্ষার্থীরা গ্লাইডারকে উচ্চস্থানে টানিয়া লইয়া যাইতেছে: অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থান হইতে গ্লাইডারের প্রথম চালনা নিরাপদ।

খুব বিপজ্জনক নয়, একটু আধটু শিখিলে দশ বারো ফুটের বেশী গ্লাইডারকে উঠানো যায় না, অতটুকু উপর হইতে পড়িয়া গেলে খুব বেশী আঘাত লাগিবার কথা নয়। কিন্তু বছর খানেক শিখিবার পরে চালক যন্ত্রকে চার পাঁচশত ফুট

উঠাইতে পারে ও ত্রিশ চল্লিশ মাইল পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে সমর্থ হয়—একাদিক্রমে আট দশ ঘণ্টা কিংবা তার বেশীও আকাশে থাকিতে পারে।

গ্লাইডার-পরিচালনার ব্যাপারটি যে শুধু স্কুলের ছেলেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে তা নয়—জার্ম্মানিতে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আজকাল এ বিষয়ে যথেষ্ট কৌতূহল দেখাইতেছে। গ্লাইডার নির্ম্মাণের নূতন নূতন কৌশল বাহির করিবার জন্য বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরীক্ষাগারে বহুসংখ্যক ছাত্র কার্য্য করিতেছে, তাহারা নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সমিতি স্থাপন করিয়াছে, সেখানে নানা ধরণের গ্লাইডারের নক্সা প্রদর্শিত হয়, ইহার কল-কব্জাসংক্রান্ত খুঁটিনাটি টেক্‌নিক্যাল ব্যাপারের আলোচনা হয়।

গ্লাইডার আকাশে উড়িয়াছে: দুই পাশে দড়ি যাহারা টানিয়া ধরিয়াছিল তাহারা দূরে সরিয়া গিয়াছে।
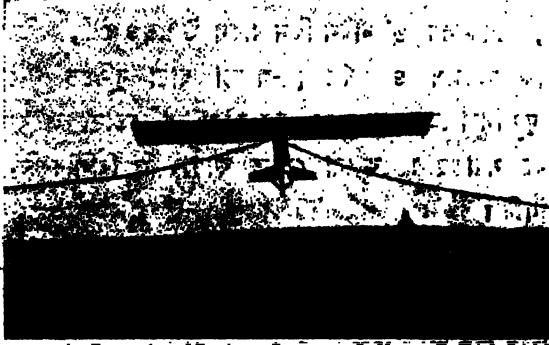
মোটর-এঞ্জিনবিহীন এরোপ্লেনের কথা আজকাল অনেকের কাছে আজগুবি ঠেকিলেও এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে এরোপ্লেনের আবিষ্কারক রাইট্‌ ভ্রাতাদ্বয় ও লিলিয়েনথেল্‌ যে যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমে আকাশে উড়িয়াছিলেন তাহাতে কোনো এঞ্জিন্‌ ছিল না, এই গ্লাইডার শ্রেণীর এরোপ্লেনেই অর্‌ভিল্‌ রাইট্‌ প্রথম সাড়ে ছ' মাইল উড়িয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়া দেন। গ্লাইডারে এঞ্জিন্‌ বসানোর কথা অনেক পরে রাইট্‌ ভ্রাতাদ্বয়ের মাথায় আসে। কালে মোটরযুক্ত এরোপ্লেন এমন সব অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল যে গ্লাইডারের কথা লোকে ভুলিয়াই গেল। কিন্তু দু'দশ জন লোকে পৃথিবীর এখানে ওখানে গ্লাইডার-চালনার রীতিটা কোনো প্রকারে বাঁচাইয়া রাখিয়া চলিল—বিস্মৃতির গর্ভে তলাইতে দিল না। বিশ বৎসর ধরিয়া বহু তুচ্ছতাচ্ছিল্য সহিয়াও তাই ইহা আজও বাঁচিয়া আছে এবং বর্ত্তমান কালে জগতের তৈলনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে ইউরোপের দৃষ্টি আবার এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

ইউরোপের মধ্যে জার্ম্মানি এ বিষয়ে অগ্রণী এবং গত দু' তিন বৎসরে জার্ম্মানি গ্লাইডার নির্ম্মাণের নবযুগ আনয়ন করিয়াছে বলা চলে। পাখীরা বায়ুসমুদ্রের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা জানে মানুষে যদি তাহা এতদিন শিক্ষা করিত, তবে মানুষকে পেট্রোল পুড়াইয়া মোটরযুক্ত এরোপ্লেনের ব্যবহার করিতে হইত না, মানুষে সত্য সত্যই উড়িতে পারিত। যে নদীতে নৌকায় যাইতেছে সে যেমন সাঁতার দিয়া যাইতেছে একথা বলা যায় না, তেমনি এরোপ্লেনে যে যায়, সে আকাশে উড়িয়া যাইতেছে একথাও বলা চলে না। কিন্তু গ্লাইডারে মানুষে চলে বায়ুসমুদ্রে সত্যকার পাড়ি দিয়া, যন্ত্রের ডানা ও পাইলের সাহায্যে অনুকূল বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া। মাথার উপরের বিশাল বায়ুসমুদ্রের প্রকৃতি জানিবার জন্য মানুষে এখন উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এখন সে বুঝিয়াছে আকাশের উড়িবার নতুন যুগ সম্মুখে আসিতেছে, যখন পেট্রোল দরকার হইবে না, দামী এঞ্জিন্‌-বসানো যন্ত্রের দরকার হইবে না, ঘরে তৈরী পাৎলা কাঠের বা কেম্বিসের ডানালাগানো গ্লাইডারের সাহায্যে যে কেহ অতি সহজে ষাট সত্তর হইতে একশত দেড়শত মাইল উড়িতে সমর্থ হইবে।

টানা দড়ি ছাড়িতে ভুল হইলে গ্লাইডারের পক্ষে বিপদ।
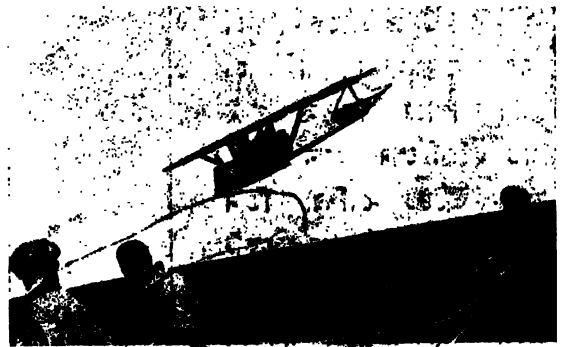
বায়ুস্রোতের নানাবিধ গতি আছে—এ গতি কখনও উর্দ্ধমুখী, কখনও ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল, কখনও কোণাকুণি। গ্লাইডার-চালককে বায়ুস্রোতের প্রকৃতির সহিত পরিচিত হইতে হয়—হইতে পারিলে যেমন সুবিধা যথেষ্ট, না জানিলে বিপদও বহু। বায়ুস্রোতের গতি ঠিকমত বুঝিতে পারার উপরই এই যন্ত্রপরিচালনের কৃতিত্ব ও সাফল্য নির্ভর করে, বায়ুস্রোত বুঝিয়া যন্ত্র ছাড়িয়া দিলেই হইল যন্ত্র তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট দিকে আপনিই উড়িয়া চলিবে; চালকের কাজ তখন দড়াদড়ি টানিয়া ডানা ও পাইল ঠিক রাখা। উর্দ্ধমুখী বায়ুস্রোতে যন্ত্র আপনা-আপনি হু হু করিয়া উপরে উঠিয়া যায়, অনেক সময় দু' মাইল তিন মাইল উপরেও ওঠে, অভিজ্ঞ চালক অভ্যাস ও পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা দ্বারা বুঝিতে পারে কতদূর গিয়া স্রোত ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, এইবার ভূমির সমান্তরাল কোনো স্রোত কাছাকাছি মিলিবে কিনা ইত্যাদি।
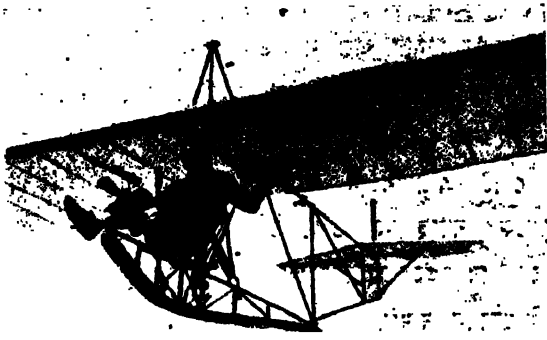
উড্ডীয়মান গ্লাইডারের নিরাপদ শিক্ষার্থী।

জার্ম্মান বিমানবীর ব্যারণ ক্রন্‌ফিল্ড এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছেন। তিনি একদিন বেলুনে উড়িতেছিলেন, তাঁহার বেলুনের অনেক নীচে একদল সারসপাখীও উড়িতেছিল। হঠাৎ তিনি দেখিলেন সারসের দল ডানা স্থির রাখিয়া হু-হু করিয়া খাড়া উপরে উঠিয়া আসিতেছে, ডানা এতটুকু নাড়াইতেছে না, দেখিতে দেখিতে তাহারা বেলুন ছাড়াইয়াও উপরে উঠিয়া গেল। ক্রন্‌ফিল্ডের বেলুন ভূমির সহিত সমান্তরাল অবস্থায় চলিতেছিল। যে স্থান হইতে সারসের দল উপরে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই স্থানের উপরে কিন্তু সেই একই সরল রেখায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বেলুনটিও হঠাৎ ঠেলিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সারসদলের ডানা না নাড়িয়া উপরে উঠিবার ব্যাপারে ক্রন্‌ফিল্ড খুবই বিস্মিত হইয়াছিলেন—এখন নিজের বেলুনকে উঠিতে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন ঐস্থানে একটি উর্দ্ধমুখী প্রবল বায়ুস্রোত প্রবহমান —তাহারই সুযোগ লইয়া সারসদল ডানা স্থির রাখিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে এবং সেই স্রোতের মুখে তাঁহার বেলুনও এখন উপরে উঠিতেছে। এই বায়ুস্রোতই মোটরবিহীন এরোপ্লেনের এঞ্জিনের কার্য্য করে—তবে যে বুঝিতে পারে তাহারই হাতে এ অস্ত্র ভাল খেলে, অন্যথায় বিপদ তো আছেই, মৃত্যুও বিচিত্র নয়।
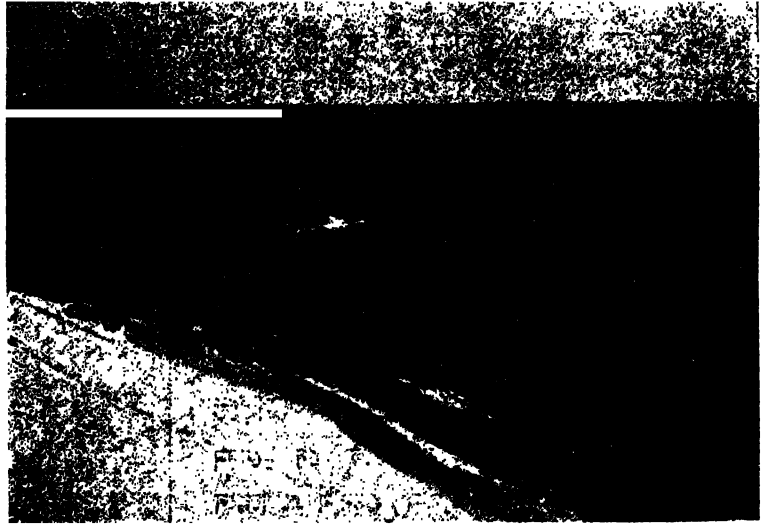
নামিবার পথে গ্লাইডারের বিপদ: সমুদ্র বক্ষে শাদা পাখীর পালকের মত গ্লাইডারকে দেখা যাইতেছে।

এ সকল বিষয়ে পরীক্ষা ও আলোচনার জন্য বর্ত্তমানে জার্ম্মানিতে প্রায় দুইশত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ১৯২৮ সালে মধ্য জার্ম্মানিতে মোটরবিহীন এরোপ্লেনে উড়ন-প্রতিযোগিতায় ১০৫টি যন্ত্র যোগদান করিয়াছিল। পরবর্ত্তী এই কয় বৎসরের মধ্যে সমিতির সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে, বিভিন্ন সমিতিসংলগ্ন কয়েকটি বড় বড় পরীক্ষাগারও স্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধমুখী বায়ুস্রোতের ব্যবহার ক্রন্‌ফিল্ডই প্রথমে করেন এবং গ্লাইডার পরিচালনায় যে ইহা কত মূল্যবান, তিনিই একথা সকলকে শিখাইয়া দেন। তিনিই আবিষ্কার করেন যে কোনো পর্ব্বতশ্রেণীর উভয়পার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলে এই স্রোত তির্য্যগগতিতে অবস্থান করে এবং ইহার বেগও সে সব স্থানে অত্যন্ত প্রবল। ভূমির সহিত সমান্তরালগতি বায়ু স্রোত হঠাৎ পর্ব্বতগাত্রে প্রতিহত হইয়া এইরূপ ঊর্দ্ধমুখী স্রোতের সৃষ্টি করে। অনেক সময় সমুদ্রের ধারের বালিয়াড়ির নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলেও ঠিক এই কারণেই ঊর্দ্ধমুখী স্রোতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অনভিজ্ঞ বিমান চালকের পক্ষে সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বায়ুস্রোতের ব্যবহার সব সময় নিরাপদ নয়, বায়ুস্রোতে সমুদ্রের মধ্যে বেশী দূর গিয়া পড়িলেই মুস্কিল। এ সম্বন্ধে জনৈক তরুণ জার্ম্মান বিমানচালকের অভিজ্ঞতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।
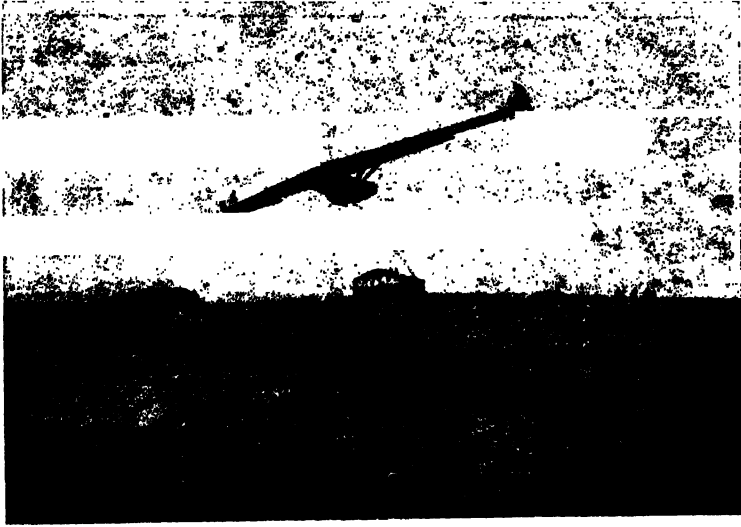
এ গ্লাইডারের পিছনে ডানা নাই : লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে সম্মুখের ডানাও অনেকটা শাদাসাটা। সম্প্রতি এই গ্লাইডার লইয়া উড়িবার চেষ্টা চলিতেছে।

"সেদিন যখন উড়ি, তখন আকাশের অবস্থা বেজায় খারাপ। মেঘে আকাশ একেবারে ঢাকা। পাশেই সমুদ্র, সমুদ্রের জলে অনেকদূর পর্য্যন্ত মেঘের ঘন ছায়া। ওড়বার একটু পরেই ঊর্দ্ধগতি স্রোতের সাহায্যে আমার যন্ত্র হু হু করে' ওপরে উঠতে লাগ্‌ল, মেঘের নিম্নতম স্তরে পৌঁছে সময় নিলে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপর মেঘে আমায় চারিদিক থেকে ঘিরে ফেল্‌লে।

"কিছুই আর দেখ্‌তে পাইনে, কোন্‌দিকে চালাবো? তখনও বায়ুর গতি ওপরের দিকেই। ভেবে দেখলাম মেঘের ভিতর দিয়ে যখন রোদ দেখা যাচ্চে তখন মেঘের স্তর খুব পুরু নয়। আর খানিকটা ওপরে উঠলেই নীল আকাশ পাবো।
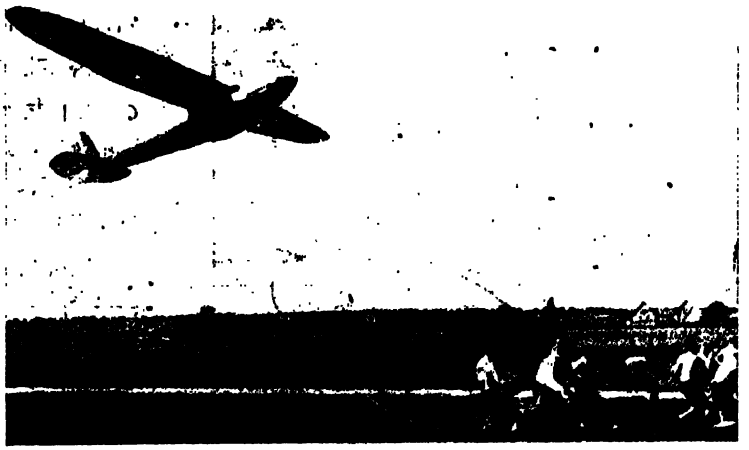
টানা-দড়ি হইতে মুক্ত যান : নীচের ভূমি একেবারে সমতল।

"আমার অনুমানই ঠিক হোল। মেঘ কেটে গেল, ক্রমে মেঘের হাজার ফুট ওপর দিয়ে আমার যন্ত্র উড়লো—পৃথিবী তখন আমার চোখের সাম্‌নে থেকে অদৃশ্য হয়েছে, আমার মাথার উপরে রৌদ্রালোকিত নীল আকাশ, নীচে সেই ঘন

মেঘের পর্দা। আমার আরও ওপরে, প্রায় মাইল খানেক ওপরে আর একটা ঘন মেঘের স্তর, সেটা ভেদ ক'রেও এখান দিয়ে ওখান দিয়ে সূর্য্যের আলো এসে আমার যন্ত্রের ওপর পড়ছিল। মিটারে দেখি প্রায় ১১০০ ফুট উঠেছি।

"হঠাৎ মেঘ সরে গেল। নীচে চেয়ে দেখি আমি সমুদ্রের উপর উড়ছি। যন্ত্রটা চালিয়ে তীরের ওপর নিয়ে গেলাম। সেখানে কাদের একখানা ছোট কাঠের ঘর। একটি ছোট ছেলেকে তার মা খুব প্রহার দিচ্ছে। আমি 'হেলো!' বলে চীৎকার করে উঠলাম। মা চম্‌কে ওপর দিকে চেয়ে দেখলে, ছোট ছেলেটা এই অবসরে টেনে দিলে দৌড়। মা ধপ করে বালির ওপর বসে পড়ল—আমি তাদের ৭০ ফুট মাত্র ওপর দিয়ে উড়ে চল্‌লাম।
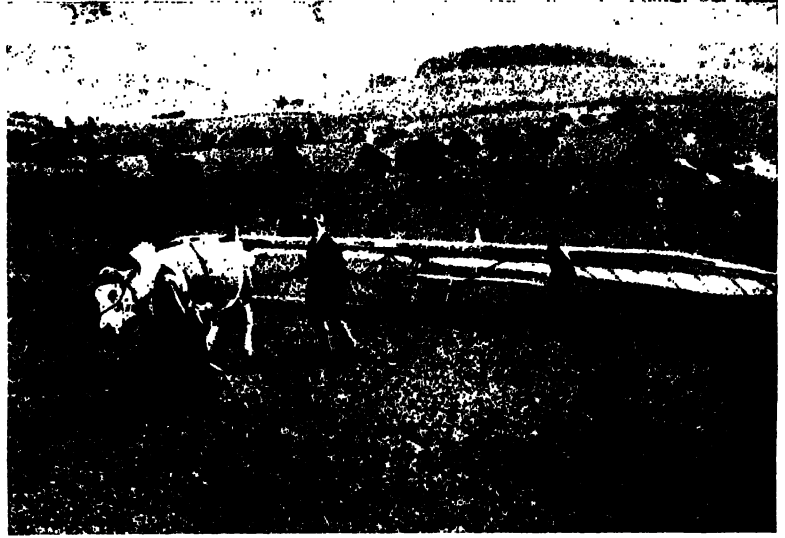
গো-চালিত ব্যোমযান নয়, গরু দ্বারা গ্লাইডারকে টানা হইতেছে মাত্র।

একটু পরেই দেখি একটা প্রস্তরময় অন্তরীপ—সেটা ঘুরে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হোল, কারণ তখন আমার যন্ত্রটা মাটী থেকে মোটে ত্রিশ চল্লিশ ফুট ওপরে কিন্তু অন্তরীপের কাছাকাছি গিয়ে আমার যন্ত্র আরও নামতে লাগল। জলের দিকে সরে গেলাম, বাঁ দিকে আমার যন্ত্রের ডানা ঘেঁসে খাড়া পাহাড় ঠেলে উঠেছে, আমার নীচে সমুদ্র, তখন আমি জলের বারো ফুট মাত্র ওপরে, ঢেউ ছিটকে জল গায়ে লাগছে।

মোটর বিহীন বাইপ্লেন: ডাচ্‌ বৈমানিক কোকারের আবিষ্কার।

কোনো রকমে চোখ বুঁজে অন্তরীপ পার হয়ে গেলাম। বিপদ কেটে গেল, নীচে বালুময় সমতল সৈকত-ভূমি, অনেক লোকে সমুদ্রে স্নান কচ্ছে, ছেলেমেয়েরা খেলা কচ্ছে, সমুদ্রতীরে চেয়ার পাতা, একটু দূরে গোটাকতক হোটেল।

আমি ধীরে ধীরে নামলাম। চারধার থেকে লোক-জন ছুটে এল, আমার ওপরে চারিদিক্ থেকে নানা প্রশ্নবাণ বর্ষিত হ'তে লাগল। কেউ জিগ্যেস কর্ত্তে লাগল আমি আমেরিকা থেকে আস্‌ছি কিনা, কেউ বল্লে আমার এরোপ্লেনের এঞ্জিন কৈ? কাষ্টমস্-এর একজন কর্ম্মচারী এসে আমার পাস্‌পোর্ট দেখতে চাইলে। তারপর যখন আসল ব্যাপারটা সবাই শুন্‌লে, তখন তারা আমায় নিয়ে খুব হৈ চৈ সুরু করে দিলে, এ নাচের নিমন্ত্রণ করে, ও ডিনারের নিমন্ত্রণ করে। আমি কিন্তু মনে মনে ভাবছিলাম আমার বিপদপূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা। আর একটু হোলেই সমুদ্রে ডুবে যেতে বসেছিলাম।"

আমেরিকার কাঠবিড়ালীর আশ্চর্য্য ঘুম

উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশে কালিফোর্ণিয়া থেকে আলাস্কা এবং সেখান থেকে সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগে এক ধরণের কাঠবিড়ালী বাস করে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় তাহারা 'সিটেলাস' (citellus) নামক বৃহৎ শাখার অন্তর্ভুক্ত। এরা মাটীর মধ্যে গর্ত্তে বাস করে এবং মাঠের ফসল ও উদ্ভিজ্জ মূল খেয়ে সাধারণতঃ জীবন ধারণ করে।

কাঠবিড়ালীর ছানা : এখনও ১ মাস বয়স হয় নাই।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যে এরা প্রতি বৎসর দশ কোটী ডলার মূল্যের শস্যের অনিষ্ট করে থাকে। কয়েক প্রকার সংক্রামক রোগও এদের দ্বারা সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সব কারণে যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট এদের ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

এরা মাটীর তলাতেই থাকে, মাটীর মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত গর্ত্ত খোঁড়ে। উত্তর আমেরিকার বিস্তৃত তৃণভূমিতে এদের আড্ডা। গাছপালা যেখানে নেই সেখানে এরা টিকতে পারে না। পূর্ব্ব ওয়াশিংটন, ওরিগণের কিছু অংশ এবং ইডাহো অঞ্চলের তৃণাচ্ছাদিত মালভূমিতে এই শ্রেণীর কাঠবিড়ালীর একটি বিশেষ জাতি বাস করে। এদের সম্বন্ধে জানবার জন্যে বিশেষজ্ঞদল নিযুক্ত হয়েছেন।

পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানবিদ্ কর্ত্তৃক তৈয়ারী বাসায় কাঠবিড়ালীর ছানা বড় হইতেছে।

এদের প্রকৃতি ও জীবনযাত্রা-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করা খুব সহজ কাজ নয়। এদের রং ধূসর, এরা সূর্য্যালোকপ্রিয় এবং অল্পেই ভয় পায়। যেখানে গমের ক্ষেত থেকে ভাল করে আগাছা দূর করা হয় না, সেখানে এরা হু-হু করে বেড়ে ওঠে।

এদের জলের দরকার হয় না। জলের চেয়ে এরা উদ্ভিদের রসাল ডাঁটা বেশী পছন্দ করে। এই জন্যেই এদের দ্বারা এত বেশী ফসলের ক্ষতি হয়। যদি সময়মত এদের উপদ্রব নিবারণ করবার চেষ্টা না করা যায়, তবে কচি গমের ক্ষেত অতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শীর্ষবিহীন ও পত্রবিহীন ভাঙা ডাঁটার ক্ষেতে পরিণত হয়।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি এদের বাসভূমিতে অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত জলকষ্ট ঘটে। তখন কোন-রকম ফসলও ক্ষেতে থাকে না, অন্য কোন উদ্ভিদের কচি রসাল ডাঁটাও দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে, তখন তৃষ্ণায় এদের মারা যাওয়ার কথা, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মরণের পরিবর্ত্তে তারা এ সময়ে ছয়মাসব্যাপী দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ে।

অনেক প্রাণী শীতকালে গর্ত্তে বা কোটরে জড়ের মত অবস্থান করে, একথা সকলেই জানেন। তাদের সঙ্গে কাঠবিড়ালীদের পার্থক্য এই যে, এদের নিদ্রা আরম্ভ হয় ভীষণ গ্রীষ্মের সময়। জুলাই মাসের প্রথম থেকেই এদের সংখ্যা কমতে সুরু করে, মাটীর ওপর নড়ে চড়ে বেড়াতে কমই দেখা যায়। আগষ্ট মাসের প্রথমে একটা কাঠবিড়ালীও আর দেখা যায় না কোথাও। ফেব্রুয়ারী মাসে বরফ গলতে সুরু না করা পর্য্যন্ত আর এদের দেখা যায় না।

এই কয়মাস তারা গভীর ভাবে নিদ্রা যায়—এ নিদ্রা এক ধরণের মৃত্যু বললেও চলে। সাধারণতঃ এদের দেহের উত্তাপ ৯৮° ফরেনহাইট্। নিদ্রিতাবস্থায় সেই উত্তাপ নেমে পড়ে ৪০° ফরেনহাইটে। ডিসেম্বর মাসের মাঝা-মাঝি এদের সে অবস্থায় কেউ দেখলে বলতে পারবে না যে, এরা একদিন আবার বেঁচে উঠে মাটীর ওপর ছুটো-ছুটি করে বেড়াবে—এরা এমন নিৰ্জ্জীব ও হিমাঙ্গ হয়ে পড়ে এ সময়ে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঘুম ভেঙে উঠে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এরা পূর্ব্ব সজী-বতা ফিরে পায়।
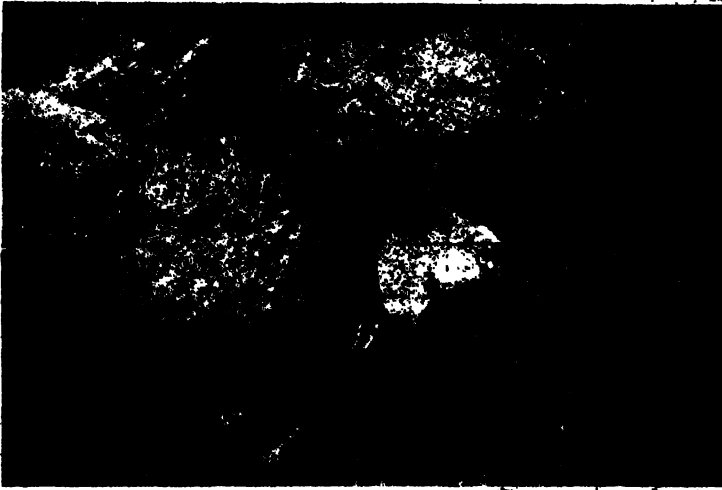
কুম্ভকর্ণের নিদ্রা যাইবার জন্য কাঠবিড়ালীরা এই গর্ত্ত ব্যবহার করে।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি স্ন্যালুস্ নদীর ধারের সমতল ভূমিতে বেড়াতে গেলে আগ্নেয়-গিরির ছাই-মিশ্রিত মাটীর তৈরী অসংখ্য ছোট বল্মীকস্তূপের মত দেখা যাবে—ওই-গুলি কাঠবিড়ালীর নিদ্রিতাবস্থার বাসগৃহ। এ সময় এসব স্থানে একটি কাঠবিড়ালীর চিহ্ন দেখা যায় না—কিন্তু আর সপ্তাহখানেক পরে এই অঞ্চল জীবন্ত হয়ে উঠবে কাঠবিড়ালীর ভিড়ে।

আগষ্ট মাসের ভয়ানক গরমের সময় এরা ঘুমিয়ে পড়ে, এবং ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে ঘুম ভেঙে ওঠে। মার্চ্চ থেকে জুলাই এই পাঁচ মাসের মধ্যে তাদের গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা চাই। আগষ্ট মাসের পূর্ব্বে সে-সন্তান এমন সবল হওয়া চাই যাতে তারা দীর্ঘ সাতমাসব্যাপী নিদ্রার উপযুক্ত হতে পারে। সুতরাং নষ্ট করবার মত সময় এদের হাতে একেবারেই নেই। এপ্রিল মাসের প্রথমেই এদের বাসায় সদ্যপ্রসূত সন্তান দেখা যাবে এবং আর মাসখানেক পরে ছোট ছোট লোমশ বাচ্চাগুলিও গর্ত্তের মুখে খেলা করবে।

কাঠবিড়ালীদের এই অদ্ভুত নিদ্রার বিষয় জানতে মার্কিণ দেশের বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। জুলাই মাসের প্রথমে এত কাঠবিড়ালীর ভিড়, হঠাৎ আগষ্ট মাসে এরা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—এ তথ্য অনেকদিন পর্য্যন্ত জানা যায়নি।

ফার্ণ

আমাদের দেশে ফার্ণের তত আদর নেই। বিলাত বা আমেরিকার লোকে ফার্ণ বলতে অজ্ঞান। দু'একটা দুষ্প্রাপ্য জাতীয় ফার্ণ সেখানে এত দামে বিক্রী হয় যে, আমরা তার কল্পনাই করতে পারি নে। সে দামে কলকাতায় একখানা বাড়ী কেনা যায়।

ব্রহ্মদেশ: গাছের উপর পাখীর বাসার মত এক জাতীয় ফার্ণ দেখা যাইতেছে।

পাতার সৌন্দর্য্যে ফার্ণ আর সব গাছকে ছাড়িয়ে যায়। অত ছোট ছোট পাতা, অমন সুন্দর করে সাজানো আর কোন্ গাছের আছে! ঠিক যেন পাখীর পালক। কোনো দিকে একটু বেশী নেই, কোনো দিকে একটু কম নেই, ডাঁটার দুধারে অদ্ভুত সামঞ্জস্যের সঙ্গে সাজানো। আমেরিকার লোকে বলে, একটা ভাঙা ফার্ণের ডাল সহরে বসে দেখলে তাদের বহুদূরের রকি-পর্ব্বতমালা, জ্যাস্পার-ন্যাশনাল-পার্কের কথা মনে পড়ে, সহরের কলকোলাহল যেন এক মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হয়ে যায়। এই জন্য এঁদো গলির মধ্যে, ছোট বাড়ীর জানালায়, ছোট মাটির কি কাচকড়ার টবে, ফার্ণ ঝুলিয়ে রেখে সেখানকার অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অধিবাসীরা মুক্ত প্রকৃতির আনন্দ আস্বাদনের চেষ্টা করে।

অনেক রকমের ফার্ণ আছে। অনেক সময় ফার্ণের মত পাতা থাকলেই যে তা ফার্ণ হবে তা নয়। আমাদের দেশে যাকে 'বিস্তেপাতা' বলা হয় বা ফুলের তোড়া বাঁধবার সময় যে অ্যাসপেরেগাস ফার্ণ asparagus fern-এর ব্যবহার করা হয়—এরা কেউই প্রকৃত ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ নয়।

ফার্ণ কোথায় নেই? আর্কটিক সার্কল থেকে আরম্ভ করে উষ্ণমণ্ডলের ঘন অরণ্যানী, সমুদ্রের ধার, বড় বড় পর্ব্বতমালার গুহা ও শিখরপ্রদেশ, আফ্রিকার বাঁশবন, শ্যাম, যবদ্বীপ, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা, সুমাত্রা, অষ্ট্রেলিয়া—সর্ব্বত্রই বহুজাতীয় ফার্ণের রাজত্ব। ইংলণ্ডে ফার্ণ জন্মায় না বলে হট-হাউসে ফার্ণের চাষ করা হয়। বড় বড় বীজ-ব্যবসায়ীরা

আজকাল ফ্রান্সে নানাজাতীয় ফার্ণ আমদানী করে পরীক্ষা করে দেখছে, তাদের দেশের মাটিতে, অন্ততঃ দক্ষিণ-ফ্রান্সে কোন্ ধরণের ফার্ণ জন্মায়। ফার্ণের ব্যবসায় ইউরোপের সর্ব্বত্রই অতি লাভজনক ব্যবসায়।

বহু প্রাচীনকালের অনেক ফার্ণ এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অঙ্গার-যুগে ফার্ণ জাতীয় গাছের প্রাচুর্য্য ছিল পৃথিবীর সর্ব্বত্র —তাদের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ এখন পাথুরে কয়লায় পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে আজকাল যে সব ফার্ণ দেখা যায়, তাদের উৎপত্তি মেসোজোইক্-যুগে অর্থাৎ যে যুগে পৃথিবীতে অতিকায় সরীসৃপদল বিচরণ করত। তবে সে যুগে ছিল ফার্ণের রাজত্ব, বর্ত্তমান কালের প্রায় কোন গাছ-পালাই তখন আদৌ ছিল না। পরে তাদের উৎপত্তি সুরু হয়। বর্ত্তমানে প্রায় ৮০০০ জাতীয় ফার্ণ পৃথিবীতে দেখা যায়। ইউরোপে বিচিত্র ধরণের ফার্ণ বেশী দেখা যায় না—যত দেখা যায় মেক্সিকো ও দক্ষিণ-আমেরিকায়। এক মেক্সিকোতেই আড়াই-শো জাতির ফার্ণ আছে। প্রকৃত পক্ষে উষ্ণমণ্ডলের ঘন

এক জাতীয় ফার্ণ (Interrupted Fern)।
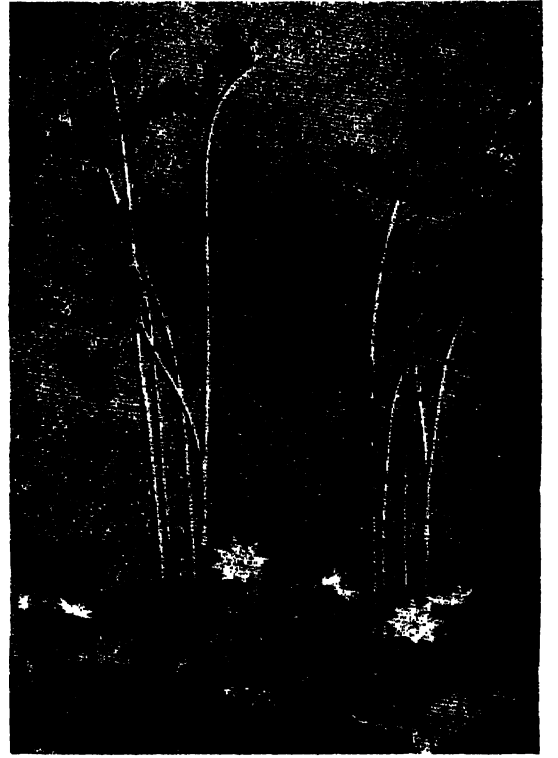
ব্রাকেন (Bracken) : এই ফার্ণ মানুষ এবং পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

আরণ্য প্রদেশেই কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জাতির ফার্ণ জন্মায়—প্রচুর বৃষ্টিপাত, আবহাওয়ায় সমতার জন্য এই সব স্থানই এই জাতীয় উদ্ভিদের অনুকূল।

তবে ট্রপিকাল ফার্ণের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাদের অধিকাংশই জন্মায় বড় বড় গাছের কাণ্ডে, শাখা-প্রশাখায়। অনেক সময় এত উঁচুতে এরা জন্মায় যে, ফার্ণ-সংগ্রহকারীকে বিশেষ বেগ পেতে হয় এদের সংগ্রহ করতে। গোটা গাছটা কেটে ফেলা ছাড়া আর উপায় থাকে না। অনেক সময় এ কাজও অসম্ভব হয়ে পড়ে—তখন কোন সেই দেশী লোক যে ভাল গাছে চড়তে জানে, তাকে মজুরী দিয়ে ফার্ণ সংগ্রহে নিযুক্ত করতে হয়। যারা ফার্ণ ভালবাসে তারা এক একটা দুষ্প্রাপ্য জাতীয় ফার্ণের জন্যে জীবন বিপন্ন করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এ এমন একটা দারুণ বাতিক।

উষ্ণমণ্ডলের ফার্ণের বৈচিত্র্য শুনলে অবাক হয়ে যেতে হবে। যেখানে সারা ইউরোপের উত্তর অঞ্চল খুঁজলে হয় তো বড় জোর পঁচিশ ত্রিশ রকমের ফার্ণ পাওয়া যায়—সেখানে এক শুধু জ্যামেকা দ্বীপেই পাঁচশো রকমের ফার্ণ আছে—হেইতি দ্বীপে আরও কিছু বেশী। মেক্সিকো থেকে চিলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত আন্দিজ পর্ব্বতমালার অরণ্যে কয়েক হাজার রকমের ফার্ণ পাওয়া যায়।
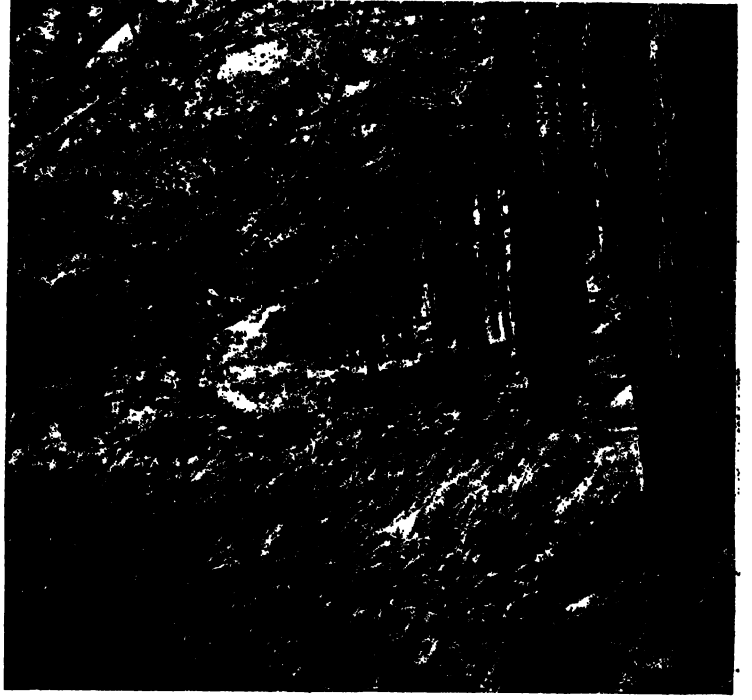
মাসাচুসেট্স : আর্নল্ড আর্বোরিটামের হেমলক-কুঞ্জচ্ছায়ায় পরিবর্দ্ধমান ফার্ণ।

ট্রপিক্যাল আমেরিকাতে ফার্ণের বৈচিত্র্য খুব বেশী নয়—এক ফ্লোরিডাতে ছাড়া। ফ্লোরিডার ফার্ণ ট্রপিক্যাল ও নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলের ফার্ণের মাঝামাঝি—উভয় জাতির মধ্যে এখানে যেন একটি সেতুপথ স্থাপিত হয়েছে। পূর্ব্ব আফ্রিকার উপকূলবর্ত্তী রিইউনিয়ন দ্বীপে

নানা অদ্ভুত ও বিচিত্র ধরণের ফার্ণ দেখা যায়। মেডেন্-হেয়ার ফার্ণের জন্মস্থানই হল এই দ্বীপ। গ্রামের প্রথমে রিইউনিয়ন ও জ্যামেকার অরণ্যের মধ্যে তরুচ্ছায়ায় পুষ্পিত ফার্ণবনের সৌন্দর্য্য যে একবার দেখেছে—জীবনে সে কখনো ভুলতে পারবে না তার অবর্ণনীয় অপার্থিব রূপ।

ব্র্যাকেন (Bracken) : এই ফার্ণ মানুষ এবং পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

উত্তর-আমেরিকার পার্ব্বত্য অঞ্চলে এক ধরণের ফার্ণ দেখা যায়, তার পাতা অনেকটা চামড়ার মত পুরু, কিন্তু রং অতি সুন্দর সবুজ। নিউ জার্সি অঞ্চলের পাইন বনে এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য ফার্ণ পাওয়া যায়, পাতা কোঁকড়ানো বলে এর নাম কুঞ্চিত-পল্লব, curly grass ফার্ণ। ইংলণ্ডের হট-হাউসে এ ধরণের ফার্ণ নেই।

মরুভূমিতেও কয়েক প্রকার ফার্ণ আছে এবং তাদের জীবন-ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ। অন্যান্য ফার্ণ সাধারণতঃ বৃষ্টিবহুল স্থানে ভাল জন্মায় ও বংশ বৃদ্ধি করে, মেক্সিকোর প্রত্যন্তদেশে অনুর্ব্বর পর্ব্বতমালায়, যেখানে বৎসরের মধ্যে খুব কম বৃষ্টিপাত হয়—সেখানে কি করে ফার্ণ জন্মায় ও বাঁচে, তা উদ্ভিদের বিবর্ত্তন ও আত্মসংরক্ষণের অতি

ভিক্টোরিয়া (অষ্ট্রেলিয়া) : ট্রী-ফার্ণ।

বিস্ময়কর কাহিনী। এখানে বারোমাস অনাবৃষ্টি ; ছায়া বলে পদার্থ এ অঞ্চলে প্রায় অজ্ঞাত। এখানে পাহাড়ের সামান্য ফাটলে কিংবা যেখানে হয় তো পাহাড়ের চূড়ায় একটুখানি ছায়া পড়েছে—সেখানেই ফার্ণ গাছ ঠেলে উঠেছে। এদের গায়ে আবার মোমের মত জিনিসের একটা আবরণ আপনিই গড়ে ওঠে—এক উদ্দেশ্য কাণ্ডস্থিত রসকে খররৌদ্রের হাত থেকে রক্ষা করা। কত লক্ষ বৎসরের অবিরাম চেষ্টার ফলে তবে উদ্ভিদ এই অঙ্গাবরণটুকু তৈরী করে নিতে সমর্থ হয়েছে।
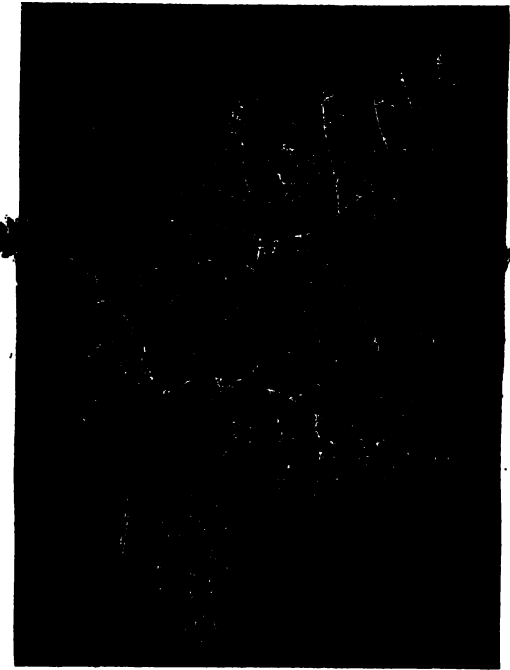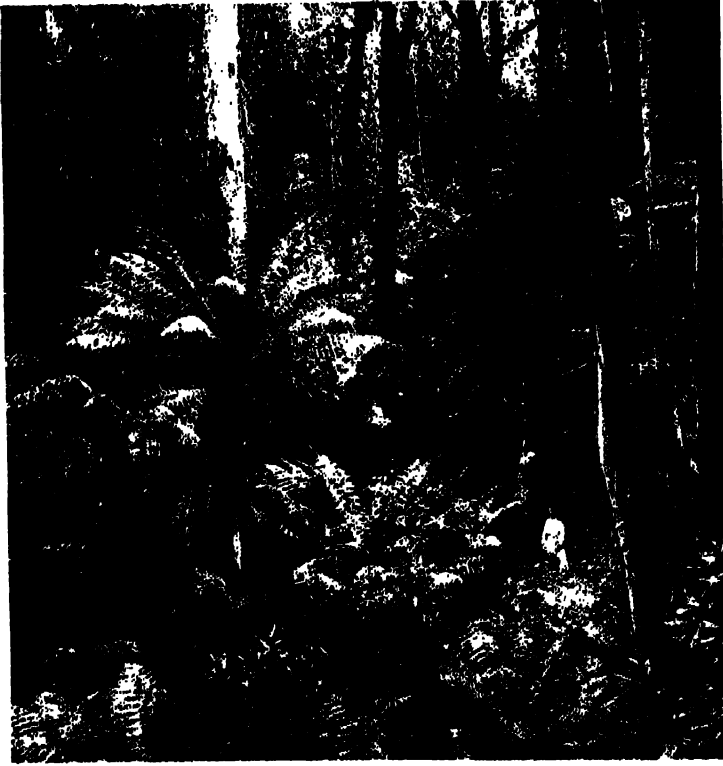
আর এক ধরণের ফার্ণের নাম ষ্টারক্লোক্ ফার্ণ—উত্তর-মেক্সিকো ও সিলা নদীর তীর-বর্ত্তী মরুদেশে এদের জন্ম। যখন সূর্য্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর হয়, তখন এর পাতা আপনা-আপনি মুড়ে যায়। যতদিন বৃষ্টি না পড়ে, ততদিন পাতা এই অবস্থায় থাকে, হঠাৎ দেখলে মনে হবে এ গাছ শুকিয়ে গিয়েছে, এর আর জীবনীশক্তি নেই—কিন্তু যেই বৃষ্টি হতে সুরু হবে, অমনি এর শুষ্ক, সঙ্কুচিত পাতাগুলো একটু একটু করে খুলতে আরম্ভ করবে, প্রসারিত সর্ব্বদেহ দিয়ে জীবনদায়িনী বারিধারা পান করে আবার সবুজ সতেজ ও সজীব হয়ে উঠবে।

মরুভূমির ফার্ণ : উত্তাপাধিক্যে ইহার পাতাগুলি অধিকাংশ সময়ে কুঁকড়াইয়া থাকে। বর্ষাগমে দল মেলিলে এই ফটো তোলা হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে বৃক্ষজাতীয় ফার্ণের কথা বলা যেতে পারে। উষ্ণমণ্ডলের সে অরণ্য অরণ্যই নয়, যেখানে ট্রী-ফার্ণ, tree fern নেই। পোর্টোরিকো, হাওয়াই দ্বীপ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্রোপকূল থেকে অভ্যন্তরভাগের উচ্চ পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ট্রী-ফার্ণ, tree fern দেখা যায়। আমাদের দেশে হিমালয়ে, বিশেষ করে দার্জ্জিলিং, সিকিম ও ভুটান অঞ্চলে যথেষ্ট এ জাতীয় ফার্ণ দেখা যায়। এদের কাণ্ড অন্যান্য বৃক্ষকাণ্ডের মত সোজা ঠেলে ওঠে—উচ্চতায় বিশ ফুট থেকে আশি ফুট পর্য্যন্ত হয়।

ভূমধ্যসাগর হইতে পিকিং

মেনার্ড উইলিয়াম্‌সের বিবরণ হইতে উদ্ধৃত হইল :—

এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। মধ্য-এসিয়ার আদব-কায়দা অনুযায়ী সকলেই আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্রতা করেছে। কাশগর সহরে আমরা বিদায়কালীন চা পান করছিলাম। আমাদের মোটর তৈরী। কাশগর থেকে আক্‌সু যাবার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে বসে আছি।

বর্ত্তমান চীনা শাসনকর্ত্তা আমাদের পছন্দ করেন না। একমাস আগে গেলে তিনি আমাদের পথ রোধ করতেন, কিন্তু এখন তাঁর সঙ্গে পান-ভোজন করে বন্ধুত্ব স্থাপিত করবার খানিকটা চেষ্টা আমাদের দিক্ থেকে আমরা করেছি। তার ফলে তিনি আমাদের যাওয়ায় বাধা দেবেন না, এটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি।

আমরা সাতখানি মোটরগাড়ী নিয়ে বেরিয়েছি বৈরুথ থেকে পিকিং যাব বলে। আমাদের দলের অধ্যক্ষ মঁসিয়ে জর্জ্জেস্-মেরি হার্ড। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তর দিয়ে রুশীয় তুর্কিস্থানের পূর্ব্বে মরুপথে মোটর চালনা করে সোজা পিকিং যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বটে, কিন্তু রাজ-নৈতিক কারণে পদে পদে আমাদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল, চীন গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনেক কষ্টে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু আমরা যখন হিন্দুকুশ পর্ব্বতের কাছে, তখন তাঁরা সে অনুমতি প্রত্যাহার করেন। বহু-কষ্টে আবার তা আনা হয়েছে।

লিয়াংচাউ সহরে পথপ্রান্তবর্ত্তী একটি পুস্তকের দোকান : ভাষার দুরূহতা সত্ত্বেও চীনদেশে পাঠক ও পুস্তকের সংখ্যা দ্রুতগতি বাড়িতেছে।

এদেশে চীনা রাজপ্রতিনিধি সিকিয়াং-এ থাকেন। তিনি নানাপ্রকার সন্দেহ করেছিলেন আমাদের সম্বন্ধে। আমরা হয়ত কোথাও মূল্যবান খনির সন্ধান পেয়েছি, কিংবা প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার করেছি, কিংবা সোভিয়েট গবর্ণ-মেণ্টের গুপ্তচর হিসেবে পিকিংয়ে বিদ্রোহীদলকে সাহায্য করতে যাচ্ছি, ইত্যাদি নানারূপ সন্দেহের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা।

শেষে অবিশ্যি সব পরিষ্কার হয়ে গেল। যেখানে যেখানে আমরা গিয়েছি, স্থানীয় অধিবাসীরা আমাদের যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করেছে। একটা ছবি আমাদের মনে আসছে, কাশগরের পূর্ব্বে ভয়জাবাদ সহরে একটা ডালিম-বেদানার বাগানে আমরা বসে আছি, ঝোপের আড়াল থেকে উদ্যান-স্বামীর পোষা কৃষ্ণসার হরিণ আমাদের দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে আছে, আর একটি সুন্দরী তুর্কী মেয়ে এক চুবড়ী ফল নিয়ে আসছে আমাদের জন্য। মিশর দেশের প্রাচীর চিত্রের একটি নারীমূর্ত্তির মত দেখাচ্ছে তাকে।

বড় বড় মরুভূমির প্রান্তে প্রাচীর বেষ্টিত নগরী।

আমরা দু' একদিন মাত্র অপেক্ষা করতাম এই সব সহরে। আমাদের লোভ ছিল খরমুজা খাবার। পৃথিবীর মধ্যে এমন সুমিষ্ট খরমুজা আর কোথাও নেই।

হাটের দিনে রঙীন পোষাক পরা নরনারীর ভিড়ে সহরের রাস্তা ভর্ত্তি হয়ে যায়। রাস্তার ধারে ভাত ও রুটীর দোকান, লোকে রাঁধা ভাত-তরকারী কিনে সেখানে বসেই তৃপ্তির সঙ্গে ভোজনে ব্যাপৃত। মাঝে মাঝে সরাইখানা। ধানের বোঝা পিঠে নিয়ে গাধার দল সার বেঁধে পথে চলেছে।

শরৎকালে মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাওয়া অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ব্যাপার, নীল শূন্যে একটা বাজ পাখী উড়ছে, কি বালুকারাশির মধ্যে কোন মরু-উদ্ভিদের সোনালী ফুল ফুটে আছে, যেন এক একটি জীবন্ত কবিতার মত মনে হয়।

একটি ছোট সহরে একজন তুর্কী মা তার পীড়িতা কন্যাকে নিয়ে এল আমাদের কাছে। ডাক্তার জর্ডান দেখে বললেন, খুব শক্ত একটা অস্ত্রোপচার আবশ্যক। করাও হল, বোধ হয় মেয়েটি এ যাত্রা বেঁচে যাবে, কিন্তু সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার পূর্ব্বেই আমাদের স্থান পরিত্যাগ করে অগ্রসর হতে হল।

যখন আমরা রওনা হই, মায়ের চোখে সে কি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি!

পথে অনেক গুহা পড়ে। তার অনেকগুলিতেই কিজিল শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ অনেক প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্র আছে। এগুলির ফটোগ্রাফ নেওয়ার অনুমতি আমরা পাই নি। ফটো নেওয়া তো দূরের কথা, কোন প্রকার প্রতিলিপি গ্রহণ করা বা নোট্ বইয়ে কিছু লিখে নেওয়া পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

মুরটক জননী ও তার সন্তান। এই দোলাতে সন্তানকে বয়ে নিয়ে গিয়ে কোন নিরাপদ স্থানে রেখে মা তার দৈনন্দিন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

শরৎকালের শেষে আমরা কুচা সহরে পৌছুলাম। কুচা অতি প্রাচীন সহর, হিউয়েনশাং-এর বিবরণে এই সহরের উল্লেখ আছে। এখানকার শাসনকর্ত্তা তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। চমৎকার বাগান, ফুলের গাছই বেশী। রেশমী সামিয়ানা ও চীনা-লণ্ঠনের তলায় বসে আমরা সবুজ চা ও মেওয়া ফল খেলাম। চীনা বাদ্যকার দল বাজনা বাজাল।

চা পান শেষ হবার পরে সেই টেবিলেই মাখনে ভাজা আস্ত ভেড়া আনা হল। যথেষ্ট পানভোজন ও আলাপ-আলোচনার পর আমাদের অধ্যক্ষ মঁসিয়ে হার্ড শাসন-কর্ত্তাকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিলেন।

কারা সহর চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। এখানে আমরা মাসখানেকের মধ্যে উপস্থিত হই। ফিরিওয়ালার দল বাঁশের বাঁকে জিনিষপত্র ঝুলিয়ে বিক্রি করছে। মোঙ্গল মেয়েরা জরির কাজ করা পোষাক পরে পথে বেড়াতে বেরিয়েছে। তাদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল, আমাদের মোটর—দেখে তারা আনন্দের সঙ্গে ছুটে এল।

কারা সহরে আমরা চীনা শাসনকর্ত্তার গৃহে অতিথি হই। তিনি অতি ভদ্রলোক, আমাদের আরও কয়েক দিন থাকতে বার বার অনুরোধ করলেন। কিন্তু সময় অত্যন্ত কম থাকায় আমরা সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না।

কিছুদূরে তকুসান 'গর্জ্জ'। এই বিশাল গর্জ্জের মধ্য দিয়ে মোটর নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এখানে আমরা আর একদল ভ্রমণকারী ও তাঁদের অধ্যক্ষ লেফটেনাণ্ট পয়েণ্টের সাক্ষাৎ পেলাম। এঁরা পিকিং থেকে ফিরে পামীরের পথে বৈরুথ যাচ্ছেন। এদের মুখে গোবি মরুভূমিতে এঁদের ভ্রমণের কথা শুনলাম—

"২৪শে মে গোবি মরুভূমির বালিরাশির মধ্যে আমরা গিয়ে পড়ি। প্রথমে আমাদের মনে আশঙ্কা হল। সঙ্গের মোটরগুলি অত্যন্ত বোঝাই ছিল। মরুভূমি অতিক্রম করতে গেলে ১২৫০ মাইল চলবার উপযুক্ত তেল সঙ্গে থাকা দরকার তো?

বিপদের ওপর বিপদ। সবে মরুভূমির প্রান্তে পা দিয়েছি, এমন সময়ে পিকিং থেকে রেডিওতে সংবাদ পাওয়া গেল সিংকিয়াং সীমান্তে আমাদের একটা মোটর লুঠ করেছে মোঙ্গল দস্যুরা। সংবাদ পাঠাচ্ছে ফরাসী দূতাবাস।

তারপর উনিশ দিন কেটে গেল মরুভূমির মধ্যে। দু'বার ভীষণ বালির ঝড় বয়ে গেল। দুবার আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম। অবশেষে নিরাপদে সুচৌ পৌছে গেলাম তেল ফুরিয়ে যাবার সামান্য কিছু আগে।

ফরাসী দূতাবাস থেকে পুনরায় রেডিও পাওয়া গেল এই মর্ম্মে যে, সিংকিয়াং-এর শাসনকর্ত্তা আমাদের যেতে অনুমতি দেবেন এই সর্ত্তে যে সঙ্গে আমরা কোন চীনা রাখতে পারব না। নান্‌কিং থেকে কয়েকজন চীনা রাজকর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে আসছিলেন, তাঁদের আমরা বিদায় দিতে বাধ্য হই।

কিন্তু বিপদ তাতেও কাট্‌ল না।

১৫ই মে তারিখ শাসনকর্ত্তা আমাদের দুর্গ ত্যাগ করতে নিষেধ করে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রেডিও বা গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ব্যবহার করা বন্ধ করে দেওয়া হল। শেষোক্ত আদেশের ফলে বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেল।

পেইলিংমিয়াও-এর বৌদ্ধ মঠ: দেয়ালে যে দেবতার ছবি দেখা যায়, ইনি পৃথিবীর চারি দিক্‌ হইতে মানুষের জীবনে যে-সব অশুভ আসিতে পারে, তাহার হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করেন।

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল যে, এবার আমরা যে প্রদেশের মধ্যে দিয়ে যাব, সেখানে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে, বৈদেশিকগণের ধনপ্রাণ সে পথে নিরাপদ নয়। আমরা বললাম, আমাদের যেতে দেওয়া হোক্‌, মরুভূমির পথে আমরা যেতে প্রস্তুত আছি। সেই সর্ত্তে আমাদের যেতে দেওয়া হল। সিংকিয়াং সহর থেকে কিছু দূরে একটা কূপের নিকট একটা নোটিশ মারা আছে, তাতে লেখা আছে, "যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও, সহরে প্রবেশ করার চেষ্টা না করে পর্ব্বতের দিকে পালিয়ে যাও।"

আমরা এ নোটিশে কর্ণপাত না করে অগ্রসর হলাম।

পরদিন সকালে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধের চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখতে পেলাম। গাড়ী উল্টে পড়ে আছে, ঘোড়া ও মানুষের মৃতদেহ খানায় পড়ে পচতে সুরু করেছে, অগ্নিদগ্ধ গৃহ-প্রাচীরে গোলাগুলির দাগ! চীনা সেনাপতি মা চুং ইং পূর্ব্বদিন সিংকিয়াং-এ প্রবেশ করার উদ্যোগে এখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন শোনা গেল।

ঘরের মধ্যে বহু আহত লোকের আর্ত্তনাদ আমাদের কানে আসছিল। ডাক্তার ডিলেয়ার গাড়ী থেকে নেমে এই সব হতভাগ্যদের চিকিৎসা-কার্য্যে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। কিন্তু বেশীক্ষণ সে গ্রামে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, দিনের আলো থাকতে থাকতে ১২৫ মাইল দূরবর্ত্তী হামি সহরে আমাদের পৌছতে হবেই, অন্যথায় পথে লুঠতরাজ হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

পথের ধারে গ্রামগুলির কি শোচনীয় অবস্থা! বিদ্রোহীরা গ্রাম প্রায় পুড়িয়ে দিয়েছে, লোকজন গাছতলায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কূপগুলির জল অব্যবহার্য্য, অনেক কূপে মৃতদেহ ফেলে জল নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। হামি সহরে না গিয়ে আমরা ২৭৫ মাইল দূরবর্ত্তী তুর্ফান সহরে যাওয়া মনস্থ করলাম।

মরুভূমির পথে তুর্ফান সহরে পৌঁছুতে আমাদের কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় নি। তুর্ফান পৌঁছে সিংকিয়াং-এর শাসনকর্ত্তার নিকট থেকে বেতারে সংবাদ পেলাম যে, কাশগরে যাবার পূর্ব্বে আমরা যেন একবার তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করি।

সঙ্গীদের নিয়ে সেই ঘোর বিপদসঙ্কুল পথে পুনর্ব্বার যেতে আমার মন চাইল না। ওদের কাশগরে যাবার আদেশ দিয়ে কয়েকজন চীনা অনুচরের সঙ্গে ছোট একখানা মোটরে সিংকিয়াং গিয়ে পৌঁছুলাম।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তোপ দাগা হল! বৃহৎ সামিয়ানার নীচে শাসনকর্ত্তার সঙ্গে চা পান করলাম।

মঙ্গোল রাজকুমারী পান্টা: ইনি পাশ্চাত্য জীবন-ধারার সঙ্গে পরিচিতা ও অনেকগুলি দেশী ও বিদেশী ভাষায় কথা বলিতে সক্ষম।

বিদায় নেবার সময় শাসনকর্ত্তা আমার করমর্দ্দন করলেন। আমি আমার মোটরে উঠতে যাব, এমন সময় দু'জন রাইফেলধারী সৈনিক এসে আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি বন্দী?

—আমরা কোন কৈফিয়ৎ দিতে ইচ্ছা করি না।

—আমি গভর্ণরের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

—না, তাও পারেন না।

—গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ব্যবহার করতে পারি?

—না, তাও না।

তিনদিন নজরবন্দী অবস্থায় থাকবার পরে সিংকিয়াং-এর বৈদেশিক মন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আপনার সঙ্গীদের এখানে আসতে আদেশ দিন।

আমি রাজী হলাম না।

—বেশ করে ভেবে দেখুন।

আরও এক সপ্তাহ কেটে গেল। আমাকে কড়া নজর-বন্দী অবস্থায় থাকতে হল আবার এক সপ্তাহ। অবশেষে আমি সম্মতি দিলাম।

বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ চেন তখন আমায় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আদেশপত্র দেখালেন। তাতে লেখা আছে, আমাদের অভিযানকে যে কোন প্রকারে ব্যর্থ করতেই হবে, এই তাঁদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ।

আমাদের দল এসে পৌঁছে গেল।

গভর্ণরের ইচ্ছা ছিল আমাদের ন'খানা মোটর গাড়ী তাঁদের কাজে লাগান। এতে আমরা বাধা দিলাম। আমাদের বেতারযন্ত্র ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ হ'ল। কিন্তু কয়েকজন অস্ত্রধারী প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও একদিন গভীর রাত্রে পিকিংএর ফরাসী দূতাবাসে আমরা আমাদের দুরবস্থার কথা বেতারে জানিয়ে দিলাম।

তারপর পাঁচ সপ্তাহ বন্দী অবস্থায় কেটে গেল। কোন দিক থেকে কোন খবর নেই।

পাঁচ সপ্তাহ পরে গভর্ণরের আদেশে আমরা মুক্তি পেলাম। চারখানা মোটর গাড়ী ও আমাদের বেতারযন্ত্রটি তাঁদের দিয়ে যেতে হবে, মুক্তির এ একটা সর্ত্ত।

তারপরে তকুসান গর্জ্জের মধ্যে যখন আমরা এসে পড়েছি, সংবাদ পেলাম যে আপনারা আসছেন। তাই এখানে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছি।"

লেফ্‌টেনাণ্ট পয়েণ্টের বিবরণ শুনে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের উপর আমার বিশ্বাস কমে গেল। এই সব অঞ্চলের ঘনীভূত রাজনৈতিক জটিলতার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই, এখানে দেখলাম যে, পিকিং নামেই চীন সাম্রাজ্যের রাজধানী, কার্য্যতঃ এই সব প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা যা ইচ্ছা তাই করেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট অনেক বিষয়েই হস্তক্ষেপ করতে চান না, অনেক বিষয় তাঁদের কর্ণগোচরই হয় না।

এর পরে দুই দল এক হয়ে আমরা উরুমচি পৌছুলাম

উরুমচি সহরে অনেক গণ্যমান্য চীনা রাজকর্ম্মচারী ও পণ্ডিত বাস করেন। এখানে একজন মোঙ্গল রাজবংশীয়া শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল। তিনি চমৎকার ঘোড়ায় চড়তে পারেন, গান গাইতে পারেন, ফরাসী ভাষা অনর্গল বলে যেতে পারেন; ভাঙা ভাঙা ইংরাজীও বলতে পারেন, কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের ইংরাজি নয়, মার্কিন যুক্তরাজ্যের ইংরাজি।

আমরা প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা রাজকুমারী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে সদ্ভাবের এত অভাব কেন? আপনারা আমাদের ভাল চোখেই বা দেখেন না কেন?

রাজকুমারী বললেন—আমি প্যারিসে গিয়েছি, ইংলণ্ডে গিয়েছি। সেখানেও দেখেছি আপনাদের বড় বড় ক্লাবে বা হোটেলে আমাদের প্রবেশের পথে বহু বাধা। সুতরাং বুঝতে পারছেন এটা শুধু আমাদের দোষ নয়। আসল কথা কি জানেন? চীনের বৃহৎ প্রাচীর যেমন, আমাদের মনেও আপনাদের সম্বন্ধে একটা মানসিক বৃহৎ প্রাচীর ঘেরা আছে। আমরা সেই প্রাচীরের আড়ালে নিরাপদে থাকতে চাই আমরা চাই না আপনারা আমাদের দেশে এসে আমাদের কাজের নিন্দা বা প্রশংসা করেন। আমরা আপনাদের নিন্দা বা প্রশংসা কিছুই চাই না। আমরা চাই আমাদের বৃহৎ প্রাচীরের আড়ালে শান্তিতে থাকিতে। বোধ হয় তাই আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। আপনাদের জীবন যাত্রার ধারা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

সুচৌ-এর মন্দিরে নরকে পাপীদের সাজার দৃশ্য।

১৫ই নভেম্বর তারিখে ক্রল. জোর্ডান এবং কার্ল সাইবিরিয়ার পথে প্যারিস যাত্রা করল। যাবার সময় তারা ফরাসী দূতাবাসের জন্য কিছু দরকারী কাগজ ও কয়েকখানা ফটোগ্রাফ নিয়ে গেল।

উরুমচি থেকে পিকিং ২৩০০ মাইল। এই পথে আমাদের পূর্ব্ব অভিযানের মোটর লুঠ হয়েছিল। বালিয়াড়ি, মরুভূমি, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি দ্বারা পথও অতীব দুর্গম। মঙ্গোলীয় মালভূমির শীত অত্যন্ত প্রচণ্ড। যাওয়ার জন্যে পশমের ওভারকোট ও লোমশ চামড়ার জুতা তৈরী করা হয়েছিল। আমাদের পরিচ্ছদের ভিতরের দিকে পশুলোমের আস্তর বসান ছিল।

উরুমচিতে শীতকালে মেরুপ্রদেশের মত শীত। যথেষ্ট শীতবস্ত্র এখানে পাওয়া যায় এবং বেশ সস্তা। পথে

অনেকগুলি পর্ব্বতগুহায় প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ চিত্র অঙ্কিত আছে, আমাদের সঙ্গী চিত্রকর জ্যাকভলেফ্ সেগুলি নকল করবার জন্যে রং, তুলি এবং চিত্রাঙ্কনের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম কিনে নিল।

প্রথম গুহায় যখন পৌছেছি, তখন এত শীত পড়েছে যে, রংয়ের পাত্রে পাছে রং জমে যায়, সে জনে গ্যাসোলিনের ষ্টোভের উপর রংয়ের পাত বসিয়ে রাখা হল। জ্যাকভলেফ্ ছবির পর ছবি নকল করে যাচ্ছে, আমরা বিষম শীতে গুহার মধ্যে আগুন জ্বেলে বসে বসে দেখছি তার ছবি আঁকা।

ছবির অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, লেখাগুলিও অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে কিছু কিছু পাঠোদ্ধার করা গেল। ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, বৃষবাহনে শিব, হুন দস্যু, মোঙ্গল পশুপক্ষী, মোনালিসার মত হাস্যমুখী তরুণী প্রভৃতি ছবির বিষয়বস্তু।

মুরটকের শাসনকর্ত্তা অনুগ্রহ করে আমাদের ফটোগ্রাফ তুলতে অনুমতি দিলেন। আমরা কয়েকটি পশুচর্ম্মের তাঁবু ও রাজপথের শোভাযাত্রার ফটো নিলাম।

চাংউইয়ের দক্ষিণে পীত নদী: ফেরি বোটে উঠিবার সময় বরফে গাড়ীর চাকা যাতে পিছলাইয়া না যায়, সে জন্য বরফে বালি বিছানো হইতেছে।

যে পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছি, এটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন বাণিজ্যপথ, টলেমির গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। মধ্যযুগেও ইউরোপের সঙ্গে এসিয়ার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল এই পথ দিয়েই। ফ্লোরেন্সের একজন কেরাণী মধ্যযুগে এই পথের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে গিয়েছে তার পুস্তকে। লোকটি যদিও মধ্য যুগের, কিন্তু তার মন সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের ছিল। এই সুদীর্ঘ পথের কোথায় কোন নগর বা গ্রাম, তার ম্যাপ ও নক্সা, পণ্যদ্রব্যের দর, খাদ্যবস্তুর তালিকা ইত্যাদি সব উল্লেখ করে লোকটি তার বইখানাকে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পক্ষে একটি আবশ্যকীয় বস্তু করতে চেয়েছিল এবং অনেক পরিমাণ কৃতকার্য্যও হয়েছিল।

ভলগা নদী পার হয়ে আস্ত্রাকান, সেখান থেকে কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী ভূভাগ দিয়ে খিবা ও বোখারা, তারপরে ইলি নদীর উপত্যকা দিয়ে কারা-খোজা—এই ছিল প্রাচীন যুগের বাণিজ্য পথ। এখান থেকে মরুভূমির মধ্য দিয়ে পথ চলে গিয়েছে তিয়েনশিন্।

শুধু পণ্যদ্রব্য নয়, শিল্প, ধর্ম্ম, রাজনীতি, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতিও এই পথে চলাচল করেছে।

কারা-খোজা থেকে পথ অতীব দুর্গম হয়ে উঠল। মোটরের ড্রাইভার ও মিস্ত্রীদের আমরা কতবার প্রশংসা করেছি যে, সেই ভয়ানক শীতের রাতে তারা কি অমানুষিক ধৈর্য্য ও সহ্যশক্তি প্রদর্শন করেছিল। এক আধ দিন নয় প্রায় তিন সপ্তাহ।

আমরা তাঁবু ফেলে বিশ্রাম করে সময় নষ্ট করিনি। আমাদের সঙ্গের একখানা মোটরে রান্না হত, আমরা পথে একবার মাত্র মোটর থামিয়ে রান্নার গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের পাত্রে গরম ঝোল বা রাঁধা মাংস নিয়ে আসতাম। কুমুল সহরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই যুদ্ধের চিহ্ন চোখে পড়ল।

পথে ঘাটে সর্ব্বত্র নিষ্ঠুর ধ্বংসের চিহ্ন। পোড়া দেওয়াল, গরু-ঘোড়ার মৃতদেহ, জনশূন্য গৃহ। তবে যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে আমরা এখানে আসার সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে। এ ধরণের খণ্ডযুদ্ধ চীনে লেগেই আছে। অধিবাসীদের মধ্যে যারা ছিল, তারা বললে, আমরা যদি সেখানে দু' চার দিন অপেক্ষা করি, তবে খুব সম্ভব এমন ধারা একটা যুদ্ধের ফিল্ম তুলে নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু এ অনুরোধ আমরা রাখতে সক্ষম হলাম না।

এত শীতে লেখা পর্য্যন্ত অসম্ভব। প্রতিবার কলমের কালি জমে যাচ্ছিল, কলমটা মুখের ভিতর পুরে গরম করে নিচ্ছি।

মুক্তপ্রান্তরে মোটরগাড়ী থামিয়ে আমরা সবাই গাড়ীগুলিকে ঘিরে সামান্য দু' একঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতাম। গ্রামে ঢুকতে আমাদের সাহস হত না।

একদিন একজন চীনা ভৃত্য আমাকে জাগিয়ে বললে—হুজুর, নিকটেই গ্রাম, তাতে একটা বাড়ীতে দু' তিনটি ঘর আছে।

ভৃত্যকে আমিই ঘরের সন্ধানে পাঠিয়েছিলাম। কারণ এ শীতে উন্মুক্ত প্রান্তরে শুয়ে থাকার মত কষ্ট আর কতদিন মানুষ সহ্য করতে পারে?

—ঘরগুলো ভাল? তাতে আর কেউ আছে?

—একটা ঘরে বার তেরটা মড়া আছে, আর একটা ঘর খালি।

—আচ্ছা, খালি ঘরটাতে বিছানা পেতে দে।

পথের শেষ: দশ মাস কষ্ট করিবার পর এই পিপিং সহরে পৌছাইয়া অভিযানকারীদের যাত্রা সমাপ্ত হয়।

মড়ার সঙ্গে একঘরে শুতেও আমার আপত্তি ছিল না, মনে ভাবলাম কাল সকালে চৌদ্দজনের একজন হওয়ার চেয়ে তেরটা মড়ার মধ্যে একজন জীবন্ত লোক হয়ে থাকাও ভাল। ক'দিন ধরে আমার নিশ্বাস জমে যাচ্ছে শীতে। নিমোনিয়ায় মরে যাওয়ার চেয়ে না হয় মড়ার সঙ্গেই শোব।

সারা গ্রামে একখানা বাড়ীতেও মানুষ নেই। কটা মড়া কোন্ ঘরে আছে, তা আমরা রাত্রির অন্ধকারে ঠাওর করতে পারলাম না।

সেনাপতি মা-চুং ইংয়ের হাতে এই গ্রাম পড়েছিল। তাঁর সৈন্যেরা গ্রামের এই অবস্থার জন্য দায়ী। গৃহ-

যুদ্ধে চীনের যে কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে, চোখে না দেখলে তার গুরুত্ব বোঝান যাবে না। আর এ সব আজকাল হয়ে দাঁড়িয়েছে চীনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

পথে আমরা একদল পলায়মান গ্রামবাসী দেখে মোটর থামিয়ে তাদের কফি খাবার দিলাম। এরা মা-চুং ইংয়ের সৈন্যদলের হাতে পড়বার ভয়ে সুচৌ সহরের দিকে পালাচ্ছে। দলে বৃদ্ধ আছে, স্ত্রীলোক আছে, শিশু ও বালকবালিকা আছে। এই তুষার-শীতল নৈশ বাতাসে মুক্ত প্রান্তরে ছিন্নবস্ত্রে রাত্রি যাপন করার ফলে প্রতিদিন দলের কত বৃদ্ধ, শিশু, বালকবালিকা মারা পড়ছে—কিন্তু তবু এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকবার সময় তাদের নেই। তা হলে শত্রুর হাতে পড়তে হবে।

সুচৌ সহরে পৌছে আমরা একটা বাড়ীতে বিশ্রাম করবার ব্যবস্থা করলাম। স্থানীয় চীনা সেনাপতি জানালেন, আমরা যদি তাঁকে পেট্রোল দিই, তার বদলে তিনি আমাদের নিরাপদে পিংকিং পৌছবার ব্যবস্থা করবেন। আমরা তাতে রাজী না হয়ে পারলাম না, পথঘাট অত্যন্ত বিপদ্-সঙ্কুল, এ সময়ে সামরিক কর্ম্মচারীর সুনজরে থাকা ভাল।

ও-দিকে মা-চুং ইং-এর সৈন্যদল ক্রমশঃ নিকটে এসে পড়ছে।

রাত্রে আমরা রেডিও ব্যবহার করবার চেষ্টা করতেই জনৈক চীনা কর্ণেল আমাদের বাধা দিলেন। যুদ্ধের সময় বেতারে কোথাও সংবাদ পাঠান নিষেধ। অবশেষে মা জং খেলায় তাঁর কাছে ত্রিশ ডলার হেরে যাওয়ার প্রস্তাব করে রেডিও ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গেল। পরদিন সকালে সুচৌ সহর পরিত্যাগ করে, আমরা আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সহর ত্যাগের চব্বিশ ঘণ্টা পরে মা-চুং ইং-এর বাহিনী সুচৌ সহরে প্রবেশ করে ও লুটপাট, খুন, জখম সুরু করে। সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা তখন বহুদূরে।

পথে একটা বিনষ্ট মন্দিরের ফটো নিলাম। সৈন্যদল ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির হাত পা ভেঙ্গে দিয়েছে, মন্দিরগাত্রের প্রাচীর-চিত্রগুলি সঙ্গীনের আঁচড় কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। দস্যুদল মন্দিরের ধনরত্ন অপহরণ করে নিয়ে পালিয়েছে।

এবার পথে বালিয়াড়ির জন্য মোটর চালান কষ্টকর হয়ে উঠছে। কিছুদূরে গিয়ে মরুভূমির মধ্যে হোয়াং হো বা পীত-নদী প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর ধারে পীত-নদীর খেয়া পার হয়ে, আমরা অতিকষ্টে সন্ধ্যার সময় অপর পারে উত্তীর্ণ হলাম।

সমাপ্ত